বনফুলের গল্প সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

যোগেন পণ্ডিত

হরিপুরের লোয়ার-প্রাইমারি স্কুলের যোগেন পণ্ডিত বড়ই মর্মাহত হলেন বৃদ্ধ বয়সে। নূতন যুগের নূতন চাল-চলনের সঙ্গে কিছুতেই তিনি মানিয়ে চলতে পারলেন না! এখনও তিনি ছেলেদের পড়া মুখস্থ করতে বলেন, না পারলে শাস্তি দেন। কানমলা, চড়, চাপড়, বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কান ধরে হাঁটু-গেড়ে-বসানো এসব তো আছেই, বেতও মারেন। ত্যাঁদড় ছেলেদের মারের চোটে আধমরাও ক'রে ফেলেন।

এসব ছাড়া আর একটা কাজও করেন তিনি। বরাবরই করে এসেছেন। পাঠশালায় এসে ঘণ্টা-দুই ঘুমোন।

প্রায় ক্রোশখানেক দূরে থাকেন তিনি এক সোনার বেনের বাড়িতে। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ ক'রে তাঁকে হিসাবপত্র লিখতে হয়। এর বিনিময়ে সেখানে তিনি থাকতে পান এবং সিধা পান। নিজের রান্না নিজেই ক'রে নেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক। সকলেই ভয় করে তাঁকে। ছাত্ররা আড়ালে বলে মহিষ-পণ্ডিত। যেমন কালো রং, তেমনি বলিষ্ঠ। চোখ দু'টিও লাল। কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না সহসা।

এক ক্রোশ হেঁটে প্রত্যহ বেলা বারোটা-আন্দাজ যখন তিনি পাঠশালায় হাজির হন, তখন তাঁর দুই পা হাঁটু পর্যন্ত ধূলি ধূসরিত। জুতো বা ছাতার বালাই নেই। হাতে একটি ছোট পুঁটুলি থাকে। পুঁটুলির ভিতর একখানি গামছা, কয়েকটি বই, চশমাটি এবং মসলার একটি ছোট কৌটো ছাড়া আর বড় কিছু থাকে না। স্কুলে এসেই তিনি আদেশ করেন—ওরে, জল আন। পাশের পুকুর থেকে ছাত্ররা জল বয়ে এনে দেয়। যোগেন পণ্ডিত পদপ্রক্ষালন করেন। পুঁটুলি থেকে গামছা বের ক'রে পা দুটি ভালো ক'রে মোছেন। তারপর ছাত্রদের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে বেঞ্চিগুলি জোড়া দিয়ে নেন। তারপর মসলার কৌটো থেকে একটা লবঙ্গ বা এলাচের দানা মুখে ফেলে দিয়ে পুঁটুলিটি সযত্নে বেঁধে ফেলেন আবার। তারপর ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে বলেন—যাও, এইবার তোমরা পড়া মুখস্থ করো গিয়ে। ঘুম থেকে উঠে পড়া নেবো। একটি ভুল যেন না হয় কারো। হ'লে আর আস্ত রাখবো না।

ছাত্ররা বেরিয়ে যায়। পুঁটুলিটি মাথায় দিয়ে যোগেন পণ্ডিত জোড়া-দেওয়া বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়েন।

পাঠশালার সামনে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে একটি। তারই তলায় বসে ছাত্ররা পড়াশোনা করে। ঘণ্টা-দুই পরে পণ্ডিতমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ছাত্রদের দিয়ে আবার বালতি ক'রে জল আনিয়ে তিনি চোখ-মুখ-নাক কান ধুয়ে ফেলেন—বিশেষ ক'রে নাক আর কান। তাঁর নাক আর কান দুই-ই বেশ বড়। শুধু বড় নয়, লোমও আছে বেশ।

হাত-মুখ মুছে, বটগাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে যোগেন পণ্ডিত পড়াতে বসেন তারপর। পড়ানো শেষ ক'রে যখন উঠেন তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ডালটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে।

এমনি প্রত্যহ।······

কিন্তু ছেলে ফেল হয়নি আজ পর্যন্ত যোগেন পণ্ডিতের স্কুল থেকে। প্রতি বছরই বৃত্তি পায়। বেচালও হয়নি একটি ছেলে। কারণ, শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও তাঁর প্রতাপ কম ছিল না। কারণ, কোনও ছেলে শাসন সত্ত্বেও উপর্যুপরি পড়া না পারলে কিংবা স্বভাব না বদলালে, যোগেন পণ্ডিত তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেন, তার মা বাপকে পর্যন্ত বকেন। ছেলে খারাপ হবে কি? তাঁর স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলেকে শায়েস্তা না-করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

তিনি ছেলেদের মারতেন বটে, কিন্তু ভালোও বাসতেন। কতই-বা মাইনে পান, কিন্তু তার থেকেই তিনি ভালো ছেলেদের পুরস্কার দিতেন, গরীব-ছেলেদের বই কিনে দিতেন। কারও অসুখ হ'লে, বার-বার গিয়ে খোঁজ নিতেন তার বাড়িতে। দরকার হ'লে সেবা করতেন।

সংসারে তাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। প্রথম-জীবনে বিয়ে করেছিলেন, বাঁকুড়ায়। সেইখানেই একটা স্কুলে পণ্ডিতিও করতেন। কিন্তু পত্নী-বিয়োগ হ'লো। আর সেখানে থাকতে পারলেন না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানে চলে এলেন। এখানে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এখানকার স্কুলের ছেলেরাই তাঁর সব। তাদের উপর নিজের অধিকারও তাই তিনি অপ্রতিহত রাখতে চান।

কিন্তু, যুগ বদলেছে। তাঁর সাবেক-চাল আর সহ্য করতে পারছে না লোকে। এতদিন মুখ ফুটে সাহস ক'রে কেউ কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু নূতন দারোগা-বাবুর ডেঁপো ছেলেটিকে যোগেন পণ্ডিত যেদিন গো-বেড়েন করলেন, সেইদিন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলতে লাগলো। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ যোগেন পণ্ডিতের এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, দারোগাবাবুও সামনাসামনি তাঁকে কিছু বলতে সাহস করলেন না। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। পণ্ডিতের সমস্ত দুষ্কৃতির বর্ণনা দিয়ে গ্রামের সমস্ত লোককে দিয়ে সই করিয়ে এক লম্বা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন তিনি শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে। যোগেন পণ্ডিত ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে, দরখাস্তকারীদের মুখপাত্র দারোগাবাবুকে কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, তদন্ত করার জন্যে জেলার ইন্‌স্‌পেক্‌টার শীঘ্রই যাবেন। হৃষ্ট হ'লেন দারোগাবাবু।

নির্দিষ্ট দিনে ইন্‌স্‌পেক্‌টার ভূতনাথ ভৌমিক এসে হাজির হ'লেন এবং দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্কুলে। যোগেন পণ্ডিত তখন তাঁর প্রাত্যহিক দিবানিদ্রা শেষ ক'রে আরক্ত নয়নে পড়াচ্ছেন ছেলেদের। স্কুলে গিয়েই কিন্তু ভূতনাথ ভৌমিক এমন অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ক'রে বসলেন যে, দারোগাবাবুর চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল। অত বড় জাঁদরেল একটা লোক, যোগেন পণ্ডিতকে দেখবামাত্র কেঁচোটি হ'য়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো কাচুমাচু হ'য়ে। দারোগাবাবু জানতেন না যে, ভূতনাথ ভৌমিক যোগেন পণ্ডিতের প্রাক্তন ছাত্র একজন। তিনি যখন বাঁকুড়ায় ছিলেন তখন বালক ভূতনাথকে পড়িয়েছিলেন। যোগেন পণ্ডিতও কম আশ্চর্য হননি। একবার দেখেই তিনি ভূতনাথকে চিনতে পেরেছিলেন।

"আরে, ভূতো না কি! তুই এখানে হঠাৎ কি ক'রে এলি!"

"আমি আজকাল স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার হয়েছি, পণ্ডিত মশায়।"

"তাই না কি! বেশ, বেশ। তা এখানে কেন? ও, ইস্কুল ভিজিট করতে এসেছিস বুঝি?"

যোগেন পণ্ডিতের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হ'য়ে গেল। চোখ থেকে উপছে পড়তে লাগলো, গর্ব আর স্নেহ।

লজ্জিত ভূতনাথ ভৌমিক বললেন, "না, এমনি একটু দরকারে এসেছি। কয়েকটি কথা আছে আপনার সঙ্গে!"

"কি কথা?"

"স্কুলের ছুটি হয়ে যাক, তারপরে বলবো'খন।"

"ইস্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেই তো হ'লো। ওরে, তোরা সব বাড়ি যা আজ। ইন্‌স্‌পেক্‌টারের অনারে ছুটি দিয়ে দিলাম তোদের। এ আমার ছাত্র জানিস? প্রণাম কর সব।"

প্রণাম ক'রে স্কুলের ছেলেরা বাড়ি চলে গেল সব।

গতিক মন্দ বুঝে দারোগাবাবুও সরে পড়লেন। যোগেন পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে একটি বাক্যালাপও করলেন না।

"তারপর, তোর খবর কি সব বল। বিবাহ করেছিস্? ছেলে-পিলে ক'টি?"

"দুটি ছেলে।"

"বেশ, বেশ।"

নানা কথার পর অনেক ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে আসল কথাটি ভূতনাথ ভাঙলেন। দরখাস্তটিও দেখালেন। দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন এসেছি তখন কোনও খারাপ রিপোর্ট দেবো না। কিন্তু—"

যোগেন পণ্ডিতের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন ভূতনাথ ভৌমিক।

যোগেন পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে দরখাস্তখানা দেখছিলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি যেন। যাদের ছেলেদের জন্যে এতকাল ধরে প্রাণপাত করেছেন তিনি, তারা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে! প্রত্যেকটি সই তাঁর পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকে তাঁর ছাত্রও।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "আমি আর এখানে থাকবো না ভূতনাথ! কালই এখান থেকে চলে যাবো।"

"কোথায়?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়।"

ভূতনাথ যোগেন পণ্ডিতকে চিনতেন। বুঝলেন তাঁর কথার নড়চড় হবে না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি বললেন, "একটা কথা বলতে সাহস হচ্ছে না পণ্ডিত-মশায়, যদি অভয় দেন, বলি।"

"কি, বল্।"

"আপনি এখান থেকে চলে যাওয়াই যদি ঠিক ক'রে থাকেন, তাহলে আমার বাড়িতে চলুন না, আমি আপনাকে মাথায় ক'রে রাখবো। আমার ছেলে দুটির ভার আপনি নিন, তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই। টুরে-টুরে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে—"

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "বেশ, তাই হবে!"

তার পরদিন খুব ভোরে হরিপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে যোগেন পণ্ডিত গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন গ্রামটার দিকে।

তারপর চলে গেলেন।

জন বুল

জন বুল থাকতেন বিলেতে আর বিপিন মল্লিকের বাড়ি ছিল বাঙলা দেশে। একজনের লণ্ডনে আর একজনের কোলকাতায়। তবু দু'জনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সূত্রটা ছিল পাটের। পাটের কারবারী ছিলেন দু'জনেই। বিপিন মল্লিক এখান থেকে পাট কিনে চালান দিতেন এবং জন বুল সেখানে সেটা বেচতেন। লাখ লাখ টাকার কারবার চলতো। দু'জনের কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

হঠাৎ একদিন জন বুলের খেয়াল হলো, বাঙলা দেশটা বেড়িয়ে আসা যাক। তাঁর কাছে বাঙলা দেশ মানে অবশ্য কোলকাতা শহর। চিঠি লিখলেন বিপিন মল্লিককে— মাই ডিয়ার মিস্টার মল্লিক, আমি···তারিখে কোলকাতা পৌঁচুচ্ছি···নামক স্টীমারে। একটা ভালো হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা কোরো এবং অসুবিধা না হয় স্টীমারঘাটে এসো। ব্যবসাটা আরও বাড়ানো সম্ভব কি না সেটাও দেখবো। তোমাদের শহরটাও দেখবো। যা যা ব্যবস্থা করা দরকার তা কোরো। তুমি তো আমাকে চেনো না, আমাদের আপিসের মিস্টার স্টিফেনকে সঙ্গে ক'রে এনো, তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। মিস্টার স্টিফেনকেও আমি চিঠি লিখলাম। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় তাহ'লে আসবার দরকার নেই। মিস্টার স্টিফেনের সহায়তায় আমিই তোমাকে খুঁজে বার করবো। আশা করি ভালো আছ। আমার শুভেচ্ছা নাও। ইতি—

ভবদীয়

জন বুল।

নির্দিষ্ট দিনে জন বুল এসে পড়লেন। বিপিন মল্লিক এবং মিস্টার স্টিফেন স্টীমারঘাটে ছিলেন। বিপিন মল্লিকের মনে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল—কি জানি কি রকম লোক হবে! খাঁটি বিলিতী সাহেব, তাছাড়া অত বড় লোক! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠনঠনের কালীতলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম ক'রে মাকে অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। জন বুলের সঙ্গে আলাপ হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। চমৎকার লোক! বেশ হাসি-খুশি, একটু দেমাক নেই, কথা বেশ স্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না একটুও। এইটেই তো ভয় ছিল মল্লিক মশায়ের সব চেয়ে বেশি—বিলিতী সায়েব হাঁউ-হাঁউ ক'রে কি বলবে, বোঝাই যাবে না হয়তো। জন বুলের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। সমস্ত বোঝা যাচ্ছে।

স্টীমার থেকে নেমে জন বুল ট্যাক্সিতে উঠলেন। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। অসংখ্য লোক, সবাই কর্মব্যস্ত, ঘর্মাক্ত-কলেবর।

—খুব পরিশ্রমী তো এখানকার লোক দেখছি, কতক্ষণ কাজ করে?

মল্লিক বললেন,—দিবারাত্রিই খেটে চলেছে।

—তাই নাকি ? বাঃ !

ম্বগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে চললেন জন ব্বল। মনে হতে লাগলো, খ্বব ভুল একটা ধারণা ছিল তাঁর। ট্যাক্সি ছ্বটে চলেছে।

জন ব্বল আবার হঠাৎ জিগ্যেস করলেন,—কি খায় এরা ?

—ডাল ভাত তরকারি। তাও পেট ভরে পায় না সব সময়ে—আবার উত্তর দিলেন মল্লিক একটু হেসে।

—আই সি ! ছোট্ট একটু শিশ দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন জন ব্বল। তারপর স্টিফেনের কানের কাছে ম্বখ নিয়ে গিয়ে কি একটা জিগ্যেস করলেন চুপি-চুপি।

—ও নো, মোটেই না। মাথা নেড়ে স্টিফেন বললেন। মল্লিক ব্যাপারটা ব্বঝতে পারলেন না ঠিক। চুপ ক'রে রইলেন।

হোটেলে পে'ছে জন ব্বল বললেন,—অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মল্লিক। আমি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করবো একটু। তারপর যাবো আপিসে। আপিসের কাজ-কর্ম সেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ বেড়াতে বের্বো। মিস্টার স্টিফেনের আজ কোথায় যেন একটা পার্টি আছে। বিকেলে তিনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে। আপনি আসতে পারবেন কি ?

—হাঁ, খ্বব পারবো।

—অনেক ধন্যবাদ।

ঠিক পাঁচটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে জন ব্বল এবং বিপিন মল্লিক শহর পরিদর্শন করতে বের্বলেন। মন্বমেণ্ট, চৌরঙ্গী, লাটসাহেবের বাড়ি, মিউজিয়ম প্রভৃতি নানা জিনিস দেখতে দেখতে অবশেষে ধর্মতলায় পে'ছিলেন তাঁরা এসে। জন ব্বল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, কিছ্বদ্বর অন্তর অন্তর ওই যে আলো দিয়ে আয়না দিয়ে সাজানো ছোট ছোট দোকান রয়েছে—কি ওগ্বলো ? দোকানদার দেখছি কোথাও প্বর্ষ, কোথাও স্ত্রীলোক, কোথাও বালক।

মল্লিক বললেন, ওগ্বলো পানের দোকান।

—পান ! সে আবার কি ? মিষ্টান্ন কোনও রকম ? সবাই তো কিনে কিনে খাচ্ছে দেখছি।

—না, মিষ্টান্ন নয়, তবে খেতে চমৎকার। আপনি খাবেন ?

—বেশ তো।

একটা ভালো পানের দোকানের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে মল্লিক নেমে গেলেন।

—একটা ভালো পান দাও তো, বেশ মসলা-টসলা দিয়ে দিও, সাহেব খাবে।

বেশী দাম দিয়ে র্বপোর তবক দেওয়া দ্ব'খিলি পান জন ব্বলকে এনে দিলেন মল্লিক।

—দ্বটোই খেয়ে ফেলবো ? একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন সাহেব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্বটোই একসঙ্গে খেয়ে ফেল্বন। সোৎসাহে বললেন বিপিন মল্লিক।

জন ব্বল দ্ব'খিলি পানই ম্বখে প্বরে চিব্বতে লাগলেন। ট্যাক্সি চলতে শ্বর্ব করলো আবার। একটু পরেই সাহেবের সাদা কস বেয়ে পানের ধারা গড়াতে লাগলো। সাহেব র্বমাল বার করে ম্বখ ম্বছলেন। ম্বছে র্বমালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন তিনি।—এ কি, রক্ত না কি—মল্লিক, এ কি কাণ্ড !

—ও কিছ্ব নয়, পানের পিক ! আপনি চিবিয়ে যান।

জন বুল চিবুতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই কি রকম যেন হতে লাগলো তাঁর। মাথাটা বনবন ক'রে ঘুরছে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে যেন সর্বনাশ, এ কি হলো!

—মল্লিক, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। হোটেলে ফিরে চলো। ওয়াক্ ওয়াক্।

বমি ক'রে ফেললেন জন বুল। দামী সুটে পানের ছোপ লেগে গেলো চারদিকে। কস বেয়ে পানের লাল রং ঝরছে—চোখ কপালে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেলো মল্লিক।

—হোটেলে চলো শিগ্গির।

হু-হু ক'রে ট্যাক্সিখানা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভীত মল্লিক জন বুলকে আস্তে আস্তে ধরে ধরে নামালেন ট্যাক্সি থেকে। তারপর কোনক্রমে লিফ্টের সাহায্যে নিয়ে গেলেন তাঁকে ঘরে।

দোতলায় সাহেবের জন্য আলাদা একটা ঘর ঠিক করাই ছিল। সাহেব ঘরে ঢুকে ধপাস ক'রে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন,—একজন ডাক্তার ডাকো মল্লিক! আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মল্লিক মশাই। হলো কি! পানে দোক্তা-টোক্তা ছিল না কি? সত্যিই যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তো সর্বনাশ! পুলিস-কেসে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন তিনি।

ডাক্তার নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন। এসে দেখেন, জন বুল মদ খাচ্ছেন। হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবারও তর সয় নি তাঁর। বোতলের মুখটা ঠুকে ভেঙেছেন। আধ বোতল শেষ ক'রে ফেলেছেন।

মল্লিককে দেখে তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

—এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর কোনও ভয় নেই।

ডাক্তারবাবু তবু তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনিও বললেন—না, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। ফী নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

তিনি চলে যাবার পর জন বুল বললেন,—একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেলো। আমি এসে থেকেই ভাবছিলাম।

—কি?

ভাবছিলাম, তোমরা এত খাটো কিসের জোরে। স্টিফেন বললে, আমাদের মতো যখন তখন মদ খাওয়া নিয়ম নয় তোমাদের। আমি ভাবছিলাম, কিসের জোরে খাটছো তাহলে! এখন দেখছি—ও বাবা—আমার মতো পাঁড় মাতালও যা খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়ে, তা অনবরত চিবুচ্ছ তোমরা! গড্!

জন বুল আর এক চুমুক নির্জলা হুইস্কি খেয়ে স্মিত মুখে মল্লিকের মুখের দিকে চাইলেন।

সুরবালা

তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমি আমার এক সহপাঠির বাসায় থাকিতাম। বাসাটি একটি গলির মধ্যে। খুব ছোট বাসা। একটি খোলা ছাদ ছিল। সেই ছাদে বসিয়াই আমরা পড়াশোনা করিতাম। আমাদের বাসার ঠিক পাশেই একটা খোলার ঘর ছিল। আমরা যখন আসিয়াছিলাম তখন ঘরটা ছিল খালি, কিন্তু কিছুদিন পরেই এক ভাড়াটে আসিয়া জুটিল এবং আমরা বিপদে পড়িয়া গেলাম। প্রথম দিন তেমন কোনও গোলমাল হইল না, গোলমাল শুরু হইল দ্বিতীয় দিন হইতে। আমরা সন্ধ্যার সময় পড়িতে বসিয়াছি, হঠাৎ সেই খোলার ঘরে চীৎকার চেঁচামেচি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, একটি স্ত্রীলোককে কে যেন মারিতেছে। আলিসার উপর ঝুঁকিয়া ব্যাপারটা কি অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম, কিছুই বুঝা গেল না! চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ কোনও জবাব দিল না। নীচে নামিয়া গেলাম এবং গিয়া দেখিলাম, সামনের কপাট ভিতর হইতে বন্ধ। অনেকক্ষণ কড়া নাড়িবার পর একটি প্রৌঢ়-গোছের লোক বাহির হইয়া আসিলেন।

—"ব্যাপার কি মশাই? এত হল্লা কিসের?"

—"ও কিছু নয়, আমার ভাই বিপিন তার বউকে ঠ্যাঙাচ্ছে।"

"ঠ্যাঙাচ্ছে! কেন?"

—"মদ খেয়ে, আবার কেন। রোজই এই কাণ্ড করে বোম্বেটেটা।"

—"আপনারা কিছু বলেন না?"

—"বলি বই-কি। এখুনি একটা থাপ্পড় দিয়ে এলুম, থেমে যাবে এখুনি, বউমা ঘরে খিল দিয়েছেন।"

কি আর বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর চলিয়া আসিলাম। সেদিন আর পড়ায় মন বসিল না।

তাহার পরদিনও ঠিক ওই কাণ্ড। তাহার পরদিনও। মহা মুশকিলে পড়িয়া গেলাম আমরা। সামনেই পরীক্ষা। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যদি এমন করিয়া পড়া নষ্ট হয় তাহা হইলে তো ফেল হইয়া যাইব! তাছাড়া একটা মাতালের হাতে প্রত্যহ এমনভাবে একটি স্ত্রীলোক নির্যাতিত হইতেছে, ইহা সহ্য করাও তো শক্ত। কিন্তু, কি যে করা যায় তাহা আমাদের মাথায় আসিল না।

একদিন আমরা সকালে হাসপাতালে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, এমন সময় সেই বিপিনের সহিতই দেখা হইয়া গেল। রোগা পাতলা চেহারা, রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে। মনে হইল, উহাকে গিয়া একটু বুঝাইয়া বলি, স্ত্রীকে প্রত্যহ এমনভাবে নির্যাতন করাটা কি ভাল? বুঝাইয়া বলিলে হয়তো লোকটা সুপথে ফিরিবে। আগাইয়া গেলাম এবং যতদূর ভদ্রভাবে ব্যাপারটা বলা সম্ভব বলিলাম। বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের সমস্ত কথা শুনিল। তাহার পর বলিল, "আমার স্ত্রীকে আমি মারি তাতে আপনাদের কি?"

ইহার উত্তরে তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটি চড় মারা ছাড়া আর কিছু করা যায়

না, কিন্তু তাহা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমরা গলি হইতে বাহির হইয়া বড়-রাস্তায় গিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলাম, কি করিয়া লোকটাকে শায়েস্তা করা যায়। আমার বন্ধু শশাঙ্ক বলিল যে বিপিনকে একদিন রাস্তায় ধরিয়া মার দেওয়াই উচিত, আমারও তাহাই ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পাড়ায় প্রতিবেশীর সহিত ছোটলোকের মতো মারামারি করাটা অশোভন হইবে ভাবিয়া পিছাইয়া যাইতেছিলাম।

—"সেলাম হুজুর!"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দীর্ঘকায় একটি লোক আগাইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম। কলকাতার গুণ্ডা একজন। ছোরা মারামারি করিয়া মেডিকেল কলেজে গিয়াছিল। উহার বাম বাহুর উপর ছোরার আঘাত বেশ জোরে লাগাতে কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। সেই সময় আমি উহার ঘা ড্রেস করিতাম। মাস-দুই পূর্বে হাসপাতাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

—"তোমার হাত বেশ ভাল হয়ে গেছে তো?"

—"হাঁ, হুজুর!"

তাহার পর ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে আমাদের জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া দিবে কি? তাহার এক দোস্তের ট্যাক্সি মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা হুকুম করিলেই সে আমাদের কলেজে পোঁছাইয়া দিবে।

আমি বলিলাম, "না, তার দরকার নেই, তার চেয়ে তুমি যদি একটি কাজ ক'রে দিতে পারো আমাদের খুব উপকার হয়।"

—"ফরমাইয়ে!"

বিপিনের সব কথা তাকে বলিলাম।

শশাঙ্ক বলিল, "লোকটার জ্বালায় আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হ'য়ে গেছে। ওকে যদি শিক্ষা দিয়ে দিতে পারো, ভারি ভাল হয়।"

"য়হ্ কৌন বড়ী বাত হ্যায়। চলিয়ে।"

আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিপিন তখনও রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। দূর হইতে আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিলাম।

গুণ্ডাটা একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর গোঁফে তা দিয়া বলিল, "ঠিক হ্যায়।"

সেদিন সন্ধ্যার সময়ও বিপিনের স্ত্রীর আর্তনাদ আমাদের পাড়াকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমরা ভাবিলাম, গুণ্ডাটা তাহা হইলে বোধ হয় কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার পরদিন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল। বুঝিলাম, নিশ্চয় কিছু করিয়াছে সে। কারণ, খোলার বাড়ি একেবারে চুপচাপ, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই। সমস্ত রাত কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরদিন আমরা সকালে যখন কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, দেখিলাম, বিপিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। কিছু বলিল না। হাসপাতালে গিয়া দেখি, সেই গুণ্ডা কলেজ-গেটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল। আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাশের বাড়িতে কাল কোনও গোলমাল হইয়াছিল কি না?

আমরা সানন্দে উত্তর দিলাম—"না, একেবারে গোলমাল হয়নি। কি করলে বল তো ?"

—"পকড়কে পিটা !"

সে যাহা বলিল তাহা এই :

আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিবার পর সে সমস্ত দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিল, বিপিন সমস্ত দিন কোথায়-কোথায় যায়, কি-কি করে। দেখিল, বিপিন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি করে। দশটার সময় আপিসে যায়। আপিস হইতে তাহাকে বড়বাজারে একটা গোলায় গিয়া মাল ওজন করাইতে হয়। তিনটা নাগাদ সে সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। বাড়ি ফেরে পাঁচটার পর। পরদিন গুণ্ডাটা তাহার বাড়ি ফিরিবার পথে ওত পাতিয়া বসিয়া রহিল। কাছাকাছি আসিতেই তাহাকে গিয়া বলিল—'তোমার বড়সাহেব তোমার সহিত কথা বলিতে চান, এসো !' বিপিন বলিল, 'কোথায় বড়সাহেব ?" গুণ্ডাটা উত্তর দিল, 'ওই যে ট্যাক্সিতে বসিয়া আছেন।' একটু দূরে তাহার দোস্তের সিডানবডি ট্যাক্সিখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল। দ্বিতীয় কথা না বলিয়া বিপিন সেদিকে আগাইয়া গেল। গাড়ির ভিতর তাহার আর-এক দোস্ত বসিয়াছিল।

বিপিন কাছাকাছি আসিতেই সে চাপা-গলায় ইংরেজীতে বলিল, 'কাম্ ইন।' বিনা দ্বিধায় বিপিন গাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই তাহার দ্বিতীয় দোস্ত তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে লইয়া ট্যাক্সি হাঁকাইয়া তাহারা চলিয়া গেল তিন নম্বর ব্রিজে। সেখানে গিয়া বেশ করিয়া চাব্‌কাইল তাহাকে। তাহার পর বলিয়া দিল যে, ফের যদি সে মদ খাইয়া আসিয়া বাড়িতে হাল্লা করে, তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে।

আমরা খুব আনন্দিত হইলাম। আমাদের উপকার করিতে পারিয়াছে জানিয়া গুণ্ডাটাও খুব খুশী হইল এবং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় মাস-দুই কাটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ি হইতে একদিনও আর কান্নাকাটি শোনা যায় নাই। আমরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম—যাক্ লোকটা বোধ হয় মারের ভয়ে ঠিক হইয়া গেল। বিপিনের দাদা নবীনের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একদিন রাস্তায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিপিনবাবু আজকাল মদ-টদ খাওয়া ছেড়েছেন মনে হচ্ছে।" নবীনবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ছাড়েনি, তবে কমিয়েছে।"

—"কই, একদিনও তো আর গোলমাল শুনিনি ?"

—"শোনেন নি, কারণ বউমা আর চেঁচামেচি করেন না। পরশুই তো এমন নির্মম মেরেছে যে, আমি গিয়ে না পড়লে মেরেই ফেলতো বোধ হয়।"

—"এত মার খেয়েও উনি চুপ ক'রে থাকেন ?"

—"তাই তো থাকছেন ইদানীং।"

কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

—আচ্ছা, উনি মদ খেয়ে স্ত্রীকে মারেন কেন, বলুন তো ?"

—"তখন ভূত চাপে ঘাড়ে একটা। নেশা ছুটে গেলে স্ত্রীর পায়ে ধরে কাঁদেও আবার। ওকি একটা মানুষ মশাই ? জানোয়ার। আচ্ছা, চলি।"

নবীনবাবু পাশের গলিটায় ঢুকিয়া গেলেন। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই রং বদলাইয়া গেল যেন। বিপিনের স্ত্রী সুরবালাকে মাঝে-মাঝে ছাত হইতে দেখিয়াছি। রোগা পাতলা চেহারা। আধময়লা একটা কাপড় পরিয়া, মাথায় আধঘোমটা টানিয়া সারাদিন ঘরের কাজ করিয়া বেড়ায়। বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর মোছে, রান্না করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জায়ের সেবাও করে সে-ই। ঘরের ভিতর হইতে 'সুরবালা', 'সুরবালা' বলিয়া তিনি প্রায়ই ডাকাডাকি করেন শুনিতে পাই।

মার খাইয়া কাঁদে না। অবাক্ কাণ্ড!

কিছুদিন পরে আবার একদিন সুরবালার কান্না শুনিতে পাইলাম। তখন কলিকাতায় হিন্দু-মোশ্লেম দাঙ্গা লাগিয়াছে। সেকালের দাঙ্গা আজকালকার মতো এমন ভয়াবহ হইত না। আমরা স্টেথোস্কোপ ঝুলাইয়া রাস্তায় যাতায়াত করিতাম, আমাদের কেহ কিছু বলিত না। সেদিনও আমরা ছাতে বসিয়া পড়াশোনা করিতে-ছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। অনেকদিন পরে সুরবালার কান্না শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি!" নবীনবাবু ঘরের ভিতর হইতে উঠোনে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"একবার নীচে নেমে আসুন তো!"

তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম। মনে হইল, আজ বোধ হয় প্রহারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাই সুরবালা কাঁদিতেছে। ডাক্তারী সাহায্য প্রয়োজন বলিয়াই নবীনবাবু আমাদের বোধ হয় ডাকিতেছেন। নামিয়া গিয়া কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহা একেবারে অন্যরকম।

নবীনবাবু বলিলেন, "মহা মুশকিলে পড়েছি মশাই। বিপিন দিন-পাঁচেক আগে বড়বাজারের সেই গোলায় গিয়ে মাল ওজন করাচ্ছিলো। ওজন-দাঁড়ির লোহার ভারী পাল্লাটা ছিঁড়ে গিয়ে তার পায়ে পড়ে পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে। সেইখান থেকেই তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি ক'রে দিয়েছে তাকে তার আপিসের লোক। আমিও গিয়ে দেখে এসেছি তাকে। কিন্তু বাড়িতে আমি আর খবরটি ভাঙিনি। ভাঙলেই বৌমা দেখতে যেতে চাইবেন। চারদিকে এখন দাঙ্গা হচ্ছে, তাছাড়া রোজ রোজ গাড়ি ভাড়া ক'রে যাওয়া-আসা কি সোজা খরচ মশাই? ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলাম তাই। বাড়িতে এসে বলেছিলাম, আপিসের কাজে বিপিন বাইরে গেছে, ফিরতে দেরি হবে কিছু। মাঝে-মাঝে ওকে মাল কিনতে বাইরে যেতেও হয়। এদিকে হয়েছে কি, বৌমার ভাই সুরেন আজ বর্ধমান থেকে এসেছে। সে এসে সোজা বিপিনের আপিসে গেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনেছে, বিপিন হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে সে পাঁচটার পর বিপিনের সঙ্গে দেখা করেছে। তারপর হাসপাতাল থেকে সোজা এসেছে এখানে। আমি বাড়িতে থাকলে টিপে দিতুম তাকেও। কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম না! বৌমার কাছে কথাটি ফাঁস ক'রে ফেলেছে সুরেন। বৌমা কেঁদে-কেটে অনর্থ করছেন। বলছেন, তাকে নিশ্চয় মুসলমান গুণ্ডায় ছুরি মেরেছে, আমরা আসল ব্যাপারটা লুকোচ্ছি তার কাছ থেকে। বলছেন, এখনই আমাকে নিয়ে চলুন একবার, আমি শুধু একটিবার দেখবো তাকে। এই রাত্তিরে এখন কি করি বলুন তো, এখন কি হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

আমরা দুইজনেই তখন মেডিক্যাল ওআর্ডে ছিলাম। সার্জিকাল ওআর্ডের খবর রাখিতাম না। তাই বিপিনবাবুর কোনও খবরই পাই নাই।

শশাঙ্ক উদ্দীপ্ত-চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চল্ না, আমরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। আমরা গেলে চুপচাপ দেখাটা করিয়ে দিতে পারবো, উনি যদি কোনও গোলমাল না করেন।" আমিও রাজী হইয়া গেলাম। নবীনবাবু একটু আমতা-আমতা করিতে-ছিলেন, কিন্তু আমরা দুইজন দায়িত্ব লওয়াতে শেষটা তাঁহাকেও মত দিতে হইল।

একটা গাড়ি ডাকিয়া সুরেন ও সুরবালাকে লইয়া শশাঙ্ক ও আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাহির হইয়া পড়িলাম। সুরবালা সমস্ত পথটা মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। আমরা তাঁহাকে বারম্বার বুঝাইয়া বলিলাম যে ওআর্ডের ভিতর ঢুকিয়া তিনি যেন কান্নাকাটি না করেন। গোলমাল করিলে বিপদ হইবে।

হাসপাতালে গিয়া দেখিলাম, নার্স এবং ও. ডি. (অফিসার অন ডিউটি) দুইজনেই আমাদের পরিচিত। সব কথা খুলিয়া বলাতে আমাদের খাতিরে তাঁহারা সুরবালাকে ওআর্ডে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন কোনও গোলমাল না হয়। আমরাও সুরবালাকে বারবার সে-কথা বলিয়া দিলাম। কিন্তু সুরবালা ওআর্ডে ঢুকিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া তাহার স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তাহাকে সেদিন হাসপাতাল হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। সুরবালার অশোভন আচরণের জন্য সেদিন ও. ডি.-র নিকট আমরা বকুনি খাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কেন জানি না, সুরবালার উপর সেদিন আমাদের রাগ হয় নাই। আজও তাহার সেই অশ্রুসজল মুখটা মনে আঁকা আছে।

বছর-দশেক পরে। আমি তখন মফস্বলের এক হাসপাতালে ডাক্তার। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত দেশ তখন আলোড়িত। অসহযোগী সত্যাগ্রহীদের মাথায় পুলিসের লাঠি ক্রমাগত পড়িতেছে এবং আমরা ক্রমাগত কাটা ঘায়ে টিঞ্চার আইয়োডিন লাগাইয়া ফাটা-মাথা ব্যাণ্ডেজ করিয়া চলিয়াছি।

একদিন একদল আহত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস হাসপাতালে লইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে দেখি, বিপিন! পরণে ময়লা খদ্দর। মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

—"আরে, আপনি এখানে কি ক'রে এলেন?"

—"মদের দোকানে পিকেটিং করছিলাম।"

—"আপনি মদের দোকানে পিকেটিং করছিলেন?"

—"হ্যাঁ।"

তাহার অকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম, বিপিন বদলাইয়া গিয়াছে। বন্দীর দলকে লইয়া পুলিস চলিয়া গেল। তাহার পরদিন আর একদল আসিল। তাহাদের মধ্যে ছিল সুরবালা। পুলিসের মার খাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

নতুন সিংহ

"এবার পুজো কবে ঠাকুমা ?"

সাত-বছরের খোকন এসে জিজ্ঞেস করল তার ঠাকুমাকে। ঠাকুমা চোখে চশমা দিয়ে সেলাই করছিলেন কি যেন একটা। সেলাই থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন—

"এবার পুজো হবে না।"

"হবে না ? কেন !"

"মা দুর্গা আসবেন না।"

"আসবেন না ? কেন !"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না খোকন ! পুজোর সময় কত জামা কাপড় হবে, থিয়েটার হবে পাড়ায়—মা দুর্গা আসবেন না, তা কি হতে পারে কখনও।

"মা দুর্গা আসবেন না ? বল কি তুমি ঠাকুমা।"

"কিসে চড়ে আসবেন তিনি ?

"কেন, সিংহে চড়ে !"

"মাংসর যা দাম আজকাল, সিংহ খাবে কি ? মা দুর্গার অত পয়সা নেই।"

"আমরা চাঁদা দেব সবাই তো।"

"কত চাঁদা দিতে পারিস্ তোরা ! মা দুর্গার সিংহ কি যে-সে সিংহ, অনেক মাংস চাই তার !"

"কত ?"

"অনেক। মা দুর্গা হলেন শক্তি, তাঁকে ব'য়ে আনে যে সিংহ সে কি যে-সে সিংহ ?"

কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে খোকন বললে, "মা দুর্গা এরোপ্লেনে আসতে পারেন না ?"

"না। সিংহ ছাড়া আর কিছুতে চড়েনই না।"

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

মহা মুশ্কিল তো !

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একছুটে চলে গেল সে পাশের ঘরে।

ঠাকুমা মুখ টিপে হাসলেন একটু।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল খোকন।

"ঠাকুমা, আমি দুর্গাকে পিঠে ক'রে বয়ে আনব। এই দেখ সিংহ সেজেছি।"

ঠাকুমা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন খোকন কালি দিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ করেছে, ঝাঁকড়া উলের টুপিটা মাথায় পরে কেশর করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড়টা উঁচু ক'রে রেখেছে বীর-বিক্রমে।

ঠাকুমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খোকন বলে উঠল—গাঁক—গাঁক্—গাঁক্ !

হেসে ফেললেন ঠাকুমা।

পরমুহূর্তে স্নেহ উথলে উঠল তার দুই চোখে। বললেন, "হ্যাঁ, তুই যদি মা শক্তিকে পিঠে ক'রে বয়ে আনতে পারিস্ নিশ্চয় তিনি আসবেন।"

উৎসাহিত হ'য়ে খোকন বললে, "আমাকে খেতে দিতে তো কোন খরচই লাগবে না, নয় ঠাকুমা? আমি তো ঘরেই খাব।"

"তাতো ঠিকই।"

আবার সেলায়ে মন দিলেন তিনি।

"আচ্ছা ঠাকুমা, মা, দুর্গাতো কৈলাসে থাকেন, না। কৈলাস কোথায়?"

"হিমালয় পাহাড়ে।"

"অনেক উঁচুতে?"

"হ্যাঁ।"

"অনেক, উঁচুতে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে সেখানে যাব কি ক'রে আমি?"

"ভেবে চিন্তে উপায় বার করলেই হবে একটা। এখন তুমি একটু শোও দেখি।"

নিজের পাশে টেনে নিয়ে শোয়ালেন তাকে।

"আচ্ছা ঠাকুমা—"

"একটি কথা না, আগে ঘুমোও, তারপর কৈলাসে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

খোকন চুপটি ক'রে শুয়ে রইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে সে চলেছে মা দুর্গাকে আনতে। সত্যিই যেন সিংহ হ'য়ে গেছে সে। ঘাড়ে গজিয়েছে কেশর, চোখে জ্বলছে আগুন, গায়ে হয়েছে অসীম শক্তি। অরণ্য পর্বত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে কোনও বাধা এলেই সিংহগর্জনে ডাক ছাড়ছে—গাঁক্, গাঁক্, গাঁক্।

অসম্ভব গল্প

অভয় হঠাৎ যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন তার বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর সবাই যেন খুশীই হ'ল মনে মনে; পাড়ার থিয়েটার পার্টিতে অভয় অভিনয় করত, তারা অবশ্য দুঃখিত হ'ল খুব। কারণ চমৎকার অভিনয় করত অভয়। নূতন একটা নাটকে গিয়াসুদ্দিন বলবনের ভূমিকা নিয়েছিল সে। পাড়ার অধিকাংশ লোকেই কিন্তু ভাবলেন—ঠিক হয়েছে, যেমন বাহাদুরি করতে যাওয়া। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যখন হিন্দুদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করছে, তখন উনি এখানকার মুসলমানদের ওপর দরদ দেখিয়ে তাদের সভায় খাবার বিলি করতে গেছেন। গভর্নমেণ্ট তো পুলিস পাহারা দিয়ে ওদের ষোড়শোপচারে পুজো করছেনই, তোর আবার বাহাদুরি ক'রে পুলিসের চোখ এড়িয়ে সেখানে খাবার দিতে যাওয়া কেন? ওসমানের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িস বলেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে? পাগল না ক্ষ্যাপা। ওরা যে কি ভয়ানক জাত তা কি অজানা আছে কারও? পাড়ার অধিকাংশ লোকেই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন। অভয় যেদিন বাড়ি ফিরল না সেদিন সবাই

ভাবলে মুসলমান গুণ্ডার ছোরার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে ছোকরা। হয়তো পুঁতে ফেলেছে লাশটা, কিংবা ফেলে দিয়েছে কোথাও, ড্রেনে, পুকুরে, নয়ত গঙ্গায়।

··কাগজে কাগজে নিরুদ্দিষ্ট অভয়ের ছবি বেরুল যথারীতি। পুরস্কার ঘোষণা করে অভয়ের বাবা বেতারে আর কাগজের অফিসে ঘুরলেন, সন্ধান করলেন থানা এবং হাসপাতালে, কিন্তু অভয়ের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। অভয় আর ফিরল না। পাড়ার অভিজ্ঞ লোকেরা, বিশেষ ক'রে কোটপ্যাণ্ট পরা সেই সব চাকুরের দল, যারা ইংরেজ আমলের পরাধীনতার মোহে এখনও মুগ্ধ, 'স্টেট্সম্যান' ছাড়া অন্য কাগজ পছন্দ হয় না যাঁদের, তাঁরা মনে মনে অভিজ্ঞ মুচকি হেসে বাইরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অভয়ের বাবাকে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যে গ্রামে দারোগার সামনে হিন্দু নরনারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়ে গেছে, সেই গ্রামে যে ঘটনাটা ঘটল তার খবর কোন কাগজেই প্রকাশিত হল না। এসব খবর নাকি পাকিস্তানী খবরের কাগজে বেরোয়ও না।

মুসলমানের মুখোশ পরা সেই পিশাচ দারোগাটা রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিল বাইরের ঘরে। হ্যাঁ, বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একাই শুয়েছিল লোকটা, ভয় আর কাকে করবে, সব কাফের তো শেষ হয়ে গেছে। রক্তের দাগ পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে। চাঁদ হাসছিল আকাশে। গভীর রাত্রি। খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। আরামে নাক ডাকাচ্ছিল দারোগা।

জানালা দিয়ে টপ্ ক'রে ঘরে লাফিয়ে ঢুকল কে যেন। মুখে ঘন কালো গোঁফদাড়ি, হাতে শানিত ছোরা। ঘরে ঢুকেই সে নিমিষের মধ্যে সেই ঘুমন্ত দারোগার বুকে চড়ে বসল। টুঁটি চেপে ধরল বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়ে।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত দারোগা।

"কে, কে তুমি—"

"আমি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, ইসলাম ধর্মের মাথা হেঁট করেছ তুমি কাপুরুষ। তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি—"

পরমুহূর্তে শানিত ছোরা আমূল বসে গেল দারোগার বুকে। তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, তার গোঁফদাড়ি খুলে গেল। ছুটে এল দারোগার রক্ষীরা।

অভয়ের মৃতদেহটাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল পিশাচেরা। ষোল বছরের ছেলে অভয়।···সত্যই কি অভয় মরেছে?

একালের রূপকথা

ছুটির দিন। রমেন একটা রূপকথার বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। সেই পুরাতন চার বন্ধুর গল্পটা। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, "মনু, হাবুল, গণশা আর আমি, আমরাও তো চার বন্ধু, কিন্তু আমরা তো রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর পাত্রপুত্র নই। আমার বাবা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, মনুর বাবা ডাক্তার, হাবুলের বাবা ওভারশিয়ার আর

গণশার বাবা দালাল। আমাদের নিয়ে কি আর রূপকথা হয়? তাছাড়া আমরা অমন পক্ষিরাজই বা পাব কোথা? আকাশ-পথে অমন হু-হু ক'রে উড়ে যাওয়া সে কি আর সম্ভব আমাদের পক্ষে? নাঃ, এ যুগে আর রূপকথা হয় না। হাবুলের ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার, ও হয়তো কোন দিন আকাশ-পথে হু-হু ক'রে উড়বে। কিন্তু সে ওড়া চাকরির ওড়া, তাতে কি আর রূপকথা হয়?"

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুমের ভিতর রূপকথা এসে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে।

টেলিগ্রাম নয়, একটি ছোট্ট পরী এসে ঢুকল রমেনের পড়ার ঘরের কপাট ঠেলে।

"আপনিই রমেনবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"হাবুলবাবু চিঠি দিয়েছেন একখানা। মনুবাবু আর গণেশবাবু থাকেন কোথায় বলুন তো, তাঁদের নামেও চিঠি আছে।"

মনু আর গণেশের ঠিকানাটা বলে দিলে রমেন।

প্রজাপতির মতো ডানা মেলে পরী উড়ে চলে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রমেন এতে আশ্চর্য হ'ল না একটুও। টেলিগ্রাম, টেলিফোন বা রেডিও দেখে সে কি আশ্চর্য হত। এ দেখেই বা হবে কেন? পরীরা উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে আসবে এইটাই তো বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার।

হাবুল লিখেছে—"রমেন, ক'দিনের ছুটি পেয়েছি। প্লেন নিয়ে বেড়াতে বেরোব। তোমাদেরও যেতে হবে। পরশু দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ির ছাতে তৈরি হ'য়ে থেকো। মনু আর গণেশকেও খবর পাঠালাম। তুমিও তাদের বলে দিও নিজে গিয়ে। যেতেই হবে সক্কলকে। আমি কেমন প্লেন চালাতে শিখেছি, দেখিস্। হিমালয় থেকে কুমারিকা আর গুজরাট থেকে আসাম চক্কোর দিয়ে আসা যাবে।"

আনন্দে নেচে উঠল রমেনের মন। এরোপ্লেনে চড়ে' ভারত-ভ্রমণ!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা তিনজনে গিয়ে হাবুলের বাড়ির ছাতে বসে রইল। আজকাল এরোপ্লেনে চড়বার জন্যে এরোড্রোমে যাবার দরকার হয় না।

ছাত একটু বড় হলেই তাতে এরোপ্লেন নামাতে পারে। আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল তিনজনে। ওটা কি চিল? চিল কি অত বড় হয়? বোঁ বোঁ ক'রে ছাতের দিকেই তো ছুটে আসছে। গুররর্, গুররর্...শব্দও পাওয়া গেল ক্রমশ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল হাবুল। বাঃ, কি চমৎকার প্লেনটি ওর, যেন জীবন্ত একটি রাজহংস। টুক্ ক'রে এসে নাবল ছাতের উপর। নাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডানা দুটি তুলে ধরল। হাবুল বসে আছে। আর তিনটি খালি সীট।

"দেরি করিস্ না, চট্ ক'রে আয়।"

উঠে বসল তারা। রাজহংস ডানা মেলে উড়ল আবার। মাঠ বন নদী পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে উড়ে চলল, কখনও ভোরের আলোয়, কখনও চাঁদের আলোয়, কখনও মেঘের ভিতর দিয়ে, কখনও রামধনুর ভিতর দিয়ে, নক্ষত্রালোকে, সূর্যালোকে —কতদিন কতরাত্রি যে চলল তার ঠিক নেই। রমেনের মনে হতে লাগল, যুগযুগান্ত পার হয়ে গেল বুঝি! কোথায় চলেছে হাবুল?

"কোথায় যাচ্ছি ভাই আমরা ?"

"নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের।"

সামনের দিকে চেয়ে স্টিয়ারিং ধরে চুপ ক'রে বসে রইল হাবুল। রমেন চেয়ে দেখলে, একটু নীচে পেঁজা-তুলোর বিরাট একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলছে যেন।

"এই রে—"

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল হাবুল।

"কি হল ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হু-হু ক'রে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজহংস।

"ক্র্যাশ্ হ'ল নাকি ?"

"তাই তো মনে হচ্চে !"

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল চারজনেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ মরল না। রাজহংস কিছুদূর নেবেই খুব আস্তে আস্তে নাবতে লাগল। শেষে মনে হ'ল কে যেন তাকে কোলে ক'রে নাবিয়ে নিলে! একটু শব্দ পর্যন্ত হ'ল না।

নেবে পড়ল চারজনেই। নেবে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল, চারিদিকে মখমল বিছানো! অবাক্ কাণ্ড! এ কোথায় এসে হাজির হ'ল তারা? চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কেবল মখমল আর মখমল! ঘাস নেই, সবুজ মখমলের গদি কেবল। চুমকি-বসানো, জরি-বসানো, কত রকমের!

হাবুল বললে—"একটা 'নাট্' আলগা হ'য়ে পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কি পাওয়া যাবে? চল খোঁজ করা যাক।"

হাঁটতে লাগল চারজন।

মনু বললে—"মখমলের উপর দিয়েই হাঁটবি? যা ময়লা জুতো আমাদের—"

গণেশ বললে—"তাছাড়া হাঁটাই যে যাচ্ছে না ভাল ক'রে। মখমলের গদির উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনও? শক্ত মাটির উপর হাঁটা অভ্যেস আমাদের।"

হাবুল বললে—"তবু হাঁটতেই হবে। 'নাট্' চাই একটা।"

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বাবা বকবে ভাই! আমি বাড়িতে কিছু বলে আসিনি"—রমেন বললে অপ্রস্তুত হাসি হেসে।

হাঁটতে লাগল তারা। হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল শেষে।

মনু বলল—"অনেক দিন আগে একবার বালির চড়া ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু এত হয়নি—বাপ্স্!"

মখমলের গদি মাড়িয়ে হেঁটে চলল তারা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তাদের। বড় বড় হীরের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'টাকার দেশ'। কি উজ্জ্বল অক্ষরগুলো!

"দেখ দেখ ওটা কি"—মনু বলে উঠল হঠাৎ। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে আকাশচুম্বী বিরাট একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত চকচক করছে যে চাওয়াই যায় না তার দিকে! মনে হচ্ছে বরফ, রুপো আর চাঁদের আলো গলিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা! তার উপর পড়েছে সূর্যের কিরণ!

হাবুল বৈজ্ঞানিক লোক। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে—"প্ল্যাটিনামের তৈরি। চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক। একটা গেটও আছে মনে হচ্ছে—"

"ওপাশে আরও একটা গেট আছে।"

"চল—"

আবার হাঁটতে শুরু করলে চারজনে।

সেই মখমলের তেপান্তর পার হ'য়ে প্ল্যাটিনামের প্রাচীরের কাছে পেঁছিতে যুগ-যুগান্ত কেটে গেল রমেনের মনে হ'ল। প্রাচীরের কাছে এসে তারা যখন পেঁছিল অবশেষে, তখন চারজনেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর কারো পা উঠছে না। মনু, গণেশ, রমেন তিনজনে বসেই পড়ল। হাবুলের বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে কাজের লোক, ভাবলে একটা গেটের ভিতরে ঢুকে একটু খোঁজ ক'রে আসা যাক আগে। একটা 'নাট্' না পেলে তো ফেরাই যাবে না এখান থেকে।

"তোরা এখানে বোস, বুঝলি। আমি একবার ভিতরে ঢুকে একটু দেখে আসি কি ব্যাপার! 'নাট্' একটা যোগাড় করতেই হবে কোনও রকমে।"

"বেশী দেরি করিস না যেন!"

"আমরা আর পারছি না ভাই, একটু জিরিয়ে নিই।"

"বেশ, বোস্ তাহলে, আমি আসছি!"

হাবুল যখন যাচ্ছে তখন এক টুকরো আলো এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। কিন্তু সেটাকে লক্ষ্যই করলে না কেউ। হাবুল ডান দিকের গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকেগেল।

হাবুল ভিতরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। এটা এরোপ্লেনের কারখানা না কি? আশ্চর্য কারখানা! প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার থালায় এরোপ্লেনের জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে রাস্তার দু'ধারে! অথচ মানুষ একটিও নেই!

একটু এগিয়ে সে দেখলে, যে 'নাট্' সে খুঁজছিল তা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একটা সোনার থালায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে একটা তুলে নিলে। তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা। হাবুল নিজেই 'নাট্' হ'য়ে সেই নাটের স্তূপে মিশে গেল!

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন হাবুল ফিরল না তখন মনু চিন্তিত হ'ল খুব। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। রমেন আর গণেশ মখমলের গদির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গণেশের নাক ডাকছিল।

মনু ভাবলে, "ওদের আর ওঠাব না এখন, বেচারারা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি দেখি ভেতরে যদি শরবত-টরবত পাওয়া যায়।"

মনু উঠে যখন যাচ্ছে তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না তত। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডান দিকের গেটটায়, হাবুল একটু আগে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। ভেতরে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল এটা শরবতের দোকান নাকি? বড় বড় সোনার থালায় স্ফটিকের গ্লাসে সারি সারি শরবত সাজানো রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে, দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর সে স্থির থাকতে পারলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বেচারার। কিন্তু যেই সে একটি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে এক গ্লাস শরবত হয়ে গেল!

গণেশের ঘুম ভাঙল খিদের চোটে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে—হাবুল মনু নেই, রমেন ঘুমুচ্ছে।

"ওরে ওঠ, ওঠ, মনু আবার কোথায় গেল? হাবলুও এখনও ফেরেনি দেখছি!"

রমেন উঠে বসল।

গণেশ বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই! চল্, ওঠা যাক্। মনু কোথা গেল বলতো!

"হাবুলকে খুঁজতে গেছে হয়তো!"

"চল, আমরাও যাই।"

দু'জনে উঠে পড়ল। একটু গিয়ে রমেন বলল, "আমাদের একজনের কিন্তু থাকা উচিত! ওরা যদি ফিরে আসে, আমাদের কাউকে না দেখতে পেলে আবার ভাবনায় পড়বে।"

"বেশ, তুই বোস্ তাহলে। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, দেখি যদি খাবার পাওয়া যায় কোথাও।"

"বেশ।"

গণেশ যখন যাচ্ছিল তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল, কিন্তু গণেশ সেটা দেখেও দেখলে না! গণেশ খাবারের স্বপ্ন দেখছে তখন। অন্য কিছু দেখবার তার অবসর কোথায়? ডানদিকের গেট লক্ষ্য ক'রে হন হন ক'রে এগিয়ে গেল সে।

গেটে ঢুকেই দেখলে কি আশ্চর্য, চারদিকেই যে খাবার। সোনার থালায় সাজানো নানা রকম খাবার। সন্দেশ রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রকম মিষ্টান্ন! যেমন রং তেমনি সুগন্ধ। শুধু কি মিষ্টান্ন? নিমকি কচুরি সিঙ্গাড়া চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই—প্রচুর পরিমাণে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

গণেশের মুখ লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু দোকানদার কই? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে টাকা রয়েছে, সামনে খাবার, কিন্তু···। যা থাকে কপালে বলে গণেশ রসগোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই রসগোল্লায় হাত দিয়েছে আর অমনি সে নিজেই রসগোল্লা হয়ে গেল!

রমেন অনেকক্ষণ বসে রইল, কেউ আর ফেরে না। অন্ধকার হ'য়ে এল ক্রমশ। তার মনে হ'ল, আর তো এমন ভাবে অপেক্ষা করা উচিত নয়। খিদে পেয়েছে বেশ। উঠে পড়ল সে, ডান দিকের গেটের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সেই আলোর টুকরোটাও আবার এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। অন্ধকার হয়েছিল বলেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, রমেন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। টর্চ ফেলছে নাকি কেউ? চেয়ে দেখলে, একটা আলোর রেখা বাঁ-দিকের ভেতর থেকে আসছে।

আবার আলোর টুকরোটার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে সে। এবার দেখতে পেলে, কি যেন লেখা রয়েছে আলোর অক্ষরে! ঝুঁকে দেখলে লেখা আছে—"ডান দিকের গেটে খবরদার ঢুকো না। বাঁ-দিকের গেটে এস।"

রমেন ইতস্ততঃ ক'রে বাঁ-দিকের গেটে ঢুকল গিয়ে। গেটের ভিতর ঢুকে দেখে, সামনেই একটি চমৎকার বাড়ি। সেই বাড়ির ছাতে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে ক'রে একটি

ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি দেখেই ভাল লাগল রমেনের! যেমন চোখ মুখ নাক, তেমনি রং, প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমা জ্বলজ্বল করছে!

রমেনকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ছাত থেকে নেমে এল। রমেন কাছে যেতে আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু অবাক্ হ'ল রমেন। ছেলেটি বোবা নাকি?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে রমেন দেখতে পেল, ছেলেটি একটি বাংলা টাইপ-রাইটারে বসে খটাখট্ ক'রে কি যেন লিখে চলেছে! রমেন ঢুকতেই মুচকি হেসে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললে। বিস্মিত রমেন বসল। ছেলেটি টাইপ করতে লাগল দ্রুতবেগে। টাইপ করা হ'য়ে গেলে কাগজখানা বার ক'রে এনে রমেনের সামনে ধরে দিল সে।

রমেন পড়তে লাগল—"আমার নাম সুবুদ্ধি। আমি বোবা নই, কিন্তু এদেশে আমার কথা কইতে মানা। এ কামনা-যক্ষিণীর দেশ। আমাকে এরা বন্দী ক'রে রেখেছে। হয়তো মেরেই ফেলত, কিন্তু আমি অমর, আমাকে নিঃশেষ করা যায় না। আমাকে ধরে এনে এরা নানা রকম যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষে আমি এদের বললাম—'আমাকে যন্ত্রণা দিও না, আমাকে কি করতে হবে বল।' এরা বললে, 'তুমি শুধু চুপ ক'রে থাক, আর কিছু চাই না।' আমি বললাম, "বেশ, আমি চুপ ক'রে থাকতে রাজী আছি যদি তোমরা আমাকে সময় কাটাবার জন্যে বই খাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এনে দাও। চুপ ক'রে বসে থাকব কি ক'রে?" তাতেই তারা রাজী হ'ল। এই বাড়িতে আমার ল্যাবরেটরি আছে; লাইব্রেরিও আছে। ল্যাবরেটরিতে আমি অনেক জিনিস তৈরি করেছি। যে টর্চের আলো ফেলে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, সেটাও আমারই তৈরি। এ ভয়ানক দেশ, এখানে যে যা কামনা ক'রে আসে, তাই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না আর। হাবুল 'নাট' হ'য়ে গেছে, মনু হয়েছে শরবত, গণেশ রসগোল্লা। আলো ফেলে ফেলে ওদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার ইশারা বুঝলে না। যাক, তুমি যখন আমার ইঙ্গিত বুঝে এখানে এসে পড়েছ তখন তোমার আর ভয় নেই। এমন কি, হয়তো তুমি এদের সকলকে উদ্ধারও করতে পারবে!"

রমেন কাগজ পড়া শেষ ক'রে সুবুদ্ধির দিকে চাইলে। দেখতে পেলে সে একটা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে! তার বিস্ময় যদিও সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল তবু সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়নি!

সে বললে, "সবাইকে না পারি, হাবুল, মনু আর গণেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুবুদ্ধি লিখে উত্তর দিলে—"দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু সকলে এ দুঃসাধ্য সাধন ত করতে পারবে না! যে মিথ্যুক, যে চোর, যে পরশ্রীকাতর, তার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

"আমি মিথ্যুক নই, চোরও নই, পরশ্রীকাতরও নই! কি করতে হবে আমাকে বলুন না!"

"অন্যমনস্ক হলেও চলবে না।"

"আমি মোটেই অন্যমনস্ক নই।"

"সাহসীও হওয়া চাই।"

"কি করতে হবে বলেই দেখুন না, আমি পারি কি না।"

"সে খুব শক্ত কাজ—"

"বলুনই না।"

"কামনা-যক্ষিণীর মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে। কোনও সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোক যদি তার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই যক্ষিণীর মৃত্যু হবে। আর তার মৃত্যু হ'লে সবাই বেঁচে উঠবে।"

"তার মুখের মধ্যে লাফাব কি ক'রে?"

"তার মুখ মোটেই ছোটখাটো নয়, বিরাট মুখ, বহু যোজন বিস্তৃত, আর সে মুখ থেকে লকলক ক'রে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে।"

"বলুন, কোন্ দিকে আছে, আমি এখনই লাফিয়ে পড়ছি তার মধ্যে—"

"তার কাছে যাওয়াও খুব সহজ নয়। খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, ক্ষুরের ধারের মতো সরু। খুব একগ্র না হ'লে সে রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না।"

"ঠিক পারব"।

"বেশ, যাও তাহলে—"

সুবুদ্ধি টর্চের আলোটা আকাশের দিকে ফেললে। রমেন দেখতে পেল খুব সরু তারের মতো একটা পথ চলে গেছে—টেলিগ্রাফের তারের মতো। চুলের চেয়ে পাতলা সরু তার।

"ওখানে উঠব কি ক'রে?"

"সিঁড়ি আছে।"

"আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে তোমার ভয় হচ্ছে না? মারা যাও যদি—"

"গেলামই বা। সবাই যদি বেঁচে ওঠে, আমি একলা না হয় মারাই গেলাম।"

"বাঃ, তুমি ঠিক পারবে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ। তোমাকে অন্যমনস্ক ক'রে দেবার জন্যে তোমার দুপাশে সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ, রেডিওর গান, ভাল ভাল ম্যাজিক, বড় বড় নেতার গালভরা বক্তৃতা, ফুটবল ম্যাচ—এই সব নানারকম হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পড়ে যাবে কিন্তু।"

"না, আমি অন্যমনস্ক হব না।"

সুবুদ্ধি টর্চের আলো ধরে রইল, রমেন এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। একটু গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেলে।

সরু তারের উপর দিয়ে রমেন চলেছে। রমেন যেন আর রমেন নেই, সে যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অশরীরী আগ্রহে। তার চারদিকে যে তুমুল কোলাহল ঘটছে, তা সে শুনতেই পাচ্ছে না, সরু তারটা ছাড়া দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। কিছুক্ষণ পরে সে কামনা-যক্ষিণীর মুখের কাছে হাজির হ'ল এসে।

দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট একটা গহ্বর থেকে লকলক ক'রে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। কত রকমের কত রঙের শিখা। লাল নীল সবুজ হলদে—শত শত ইন্দ্রধনু যেন শিখায় পরিণত হয়েছে। আর তাতে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রমেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকেও পুড়ে মরতে হবে। তা হোক। লাফিয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল! আগুন নিবে গেল। তারপর অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। সবাই বেঁচে উঠেছে! ওই যে হাবুল, মনু আর গণেশও আসছে তার দিকে ছুটে।

"রমেন. রমেন, ওঠ, এখনও ঘুমুচ্ছিস্? বি-টিমের সঙ্গে আজকে যে ম্যাচ আমাদের, মনে নেই? ওঠ্ ওঠ্।"

হাবুলের ডাকেই রমেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে মনু আর গণেশও দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা।"

"নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার।"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশোনা করব না, সকলের অবাধ্য হব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা?"

"না সার!"

"তাহলে?"

সুবল চুপ ক'রে রইল। পণ্ডিতমশায় একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে?

পণ্ডিতমশায় বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল ক'রে বুঝতে হবে কথাটার মানে কি! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতাই বোঝায়। কিন্তু 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায়? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের ক'রে নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে? ভালোটাই নেবে নিশ্চয়। পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের ভালো চায় না, নিজেদের ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস ক'রে একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের

থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না ; কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনও হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশী ঘোরালো গোছের। ভগবান-টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূরসম্পর্কের আত্মীয় হ'ন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে। বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে ভাঁড়ার ঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মনুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়—মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক ক'রে উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের ক'রে নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মনুকে দিতে কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে ; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মনুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলদের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"

খোকনের স্বপ্ন

রাত্রে খোকন ছাতে শুয়েছিল। অগণ্য নক্ষত্র উঠেছে আকাশে। অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে। কি অদ্ভুত সমারোহ! লক্ষ কোটি মণিমাণিক্য কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে কালো মখমলের উপর। অবাক হ'য়ে দেখছিল খোকন। পাশে শুয়েছিলেন তার কাকা। এম্. এস্. সি. পাস করেছেন সম্প্রতি। নামকরা ভাল ছেলে। খোকন কাকাকে জিজ্ঞেস করলে—"কাকা, ওই নক্ষত্রগুলো কি?"

"ওরা প্রত্যেকটা এক একটা সূর্য।"

"তাই নাকি! প্রত্যেকটা?"

'চাঁদ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো—এই কটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতো! বাকী সব সূর্য। অধিকাংশই আমাদের সূর্যের চেয়ে বড়।"

"ওই সাদা মতন চলে গেছে ওটা কি?"

"ছায়াপথ। ওতেও অনেক নক্ষত্র আছে, তাছাড়া আছে নেবুলা, যার বাংলা নাম নীহারিকা—।"

কাকা বলতে লাগলেন, খোকন শুনতে লাগল অবাক্ হয়ে! 'আমাদের সূর্য নাকি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়! সূর্যের চেয়েও বড় বড় ওই নক্ষত্রগুলো, অত দূরে আছে বলে ছোট দেখাচ্ছে। বহু দূরে আছে। এত দূরে যে মাইল দিয়ে তা বলা যায় না। কার আলো কতক্ষণে পৃথিবীতে এসে পেঁছায় তাই দিয়ে ওদের দূরত্ব বলা হয়। আমাদের সূর্যের আলো আসে কয়েক মিনিটে। কোনও নক্ষত্রের আলো দু'বছরে, কারও বা চল্লিশ বছরে, কারও বা তার চেয়ে বেশি! বিরাট বিরাট জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সব মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে অজস্র। দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে কতদিন থেকে তা ঠিক কেউ জানে না! প্রত্যেকটাই জ্বলন্ত শিখা লক্ লক্ করছে।"

খোকনের ভয় করতে লাগল। সে ছাত থেকে নেবে গেল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমাও শুয়েছিলেন আকাশের দিকে চেয়ে; তাঁর বিছানার পাশে যে খোলা জানালাটা ছিল তাই দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের খানিকটা।

"ওই নক্ষত্রগুলো কি জান ঠাকুমা? কাকা বললে—"কাকা যা যা বলেছিল সবিস্তার বর্ণনা ক'রে গেল সে। সমস্ত শুনে ঠাকুমা মন্তব্য করলেন—"কাকা তো সব জানে!"

"কি তাহলে ওগুলো—"

ঠাকুমা যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

ওই ছায়াপথ দিয়ে আসবে নাকি রাজপুত্র। তাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে দেবতারা।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

……চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলছে। অসংখ্য জ্বলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে দূরে আলো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন।

অর্থাৎ আটটা বেজে গেল। দ্বিতীয় দিন আর একটু সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন ঃ কিন্তু গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতেই হরু ঘোষের সঙ্গে দেখা! তিনি ওই আটটার ট্রেনে এসেছেন! সুতরাং সেদিনও ট্রেন পাওয়ার আশা নেই। ফিরতেই হলো! নিতাই মণ্ডল গাড়ির বলদ দুটোর পানে এমনভাবে চাইলেন যেন যত দোষ তাদেরই। তৃতীয় দিন আর একটু ভোরে উঠলেন। এমনিভাবে চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্য তরফদার বেশ চটপটে লোক। তাঁর কাজ হাতে-পায়ে লাগে না! কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব নয়। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চান তিনি। মনে কর, বাড়িতে লোক খাওয়াতে হবে, সন্ধ্যা আটটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আসবার কথা; ত্রৈলোক্য তরফদার তাড়াহুড়ো ক'রে ছ'টার মধ্যেই রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়ে ফেলবেন। তাঁর চরিত্রে 'হচ্ছে-হবে' বা 'গয়ংগচ্ছ' ভাব মোটেই নেই। তেমন লোক তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই চটপট সেরে নাও, কাজ সেরে সময় থাকলে দু'দণ্ড না হয় গল্প কর—এই তাঁর আদর্শ।

তাঁকেও ওই দিন ওই আটটার ট্রেন ধরতে হবে। যদিও নিতাই মণ্ডলের গ্রামে তাঁর বাড়ি নয়, কিন্তু তাঁর গ্রামও স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।

তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুলেন। বাইক আছে, সুতরাং ভয় নেই। নিতাই মণ্ডলের মতো নিড়বিড়ে লোক নন তিনি। তাছাড়া পুজো-ফুজোর অত হাঙ্গামাও নেই তাঁর! তিনি উঠবেন আর সুট ক'রে বাইক চড়ে বেরিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিতাই মণ্ডলের গরুর গাড়ি যখন স্টেশনের গুমটির কাছে এসেছে, তখন ট্রেনটি হুস হুস ক'রে ছেড়ে গেল। নিতাই অসহায় ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গাড়োয়ানটাকে গাল দিতে লাগলেন! গাড়োয়ান বেচারী কি আর বলবে! সে তো যথাসাধ্য জোরেই হাঁকিয়ে এনেছে। কিন্তু মনিবের সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না—ঘাড় নীচু করে বসে রইল সে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চীৎকার করার পর মণ্ডলমশায় অনুভব করলেন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আজ না খেয়েই বেরিয়েছেন তিনি। চিঁড়ে আর নারকোল পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিলেন।

গাড়োয়ানকে বললেন—জিনিসপত্তর নিয়ে ওএটিং রুমে চ। আগে খেয়ে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোদের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

জিনিসপত্র নিয়ে ওএটিং রুমের দিকে রওনা হলেন তিনি।

নিতাই মণ্ডলের পদশব্দে ত্রৈলোক্য তরফদারের ঘুম ভাঙল। ওএটিং রুমের বেঞ্চির উপর ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন তিনি।

তিনি স্টেশনে এসে পৌঁছেছিলেন ভোর পাঁচটায়। পৌঁছে ওএটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

বেচুলাল

অতিশয় জীর্ণশীর্ণ লোক। সারাজীবন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগছে। অথচ সাবধানতারও অন্ত নেই। যে যা বলে তাই করে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমি, টোটকা—সব রকম ক'রে দেখেছে। গলায় হাতে গোছা গোছা মাদুলি কবচ। দৈবও করেছে নানারকম। একজন বলল—ভূতেশ্বর শিবমন্দিরে অমাবস্যার রাত্রে বেলতলায় একপায়ে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যায়। তাই করলে। প্রার্থনার পর গাছ থেকে একটি শুকনো বেলপাতা পড়ল। বাড়ি ফিরে সেইটেই গঙ্গাজলে বেটে ভক্তিভরে খেলে। কিছু হ'ল না। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরনা দিয়েছিল একবার। একটানা তিনদিন তিনরাত্রি নিরম্বু উপবাস ক'রে পড়ে রইল বাবার মন্দিরে। স্বপ্ন দেখলে—একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন তাকে বলছে—ওষুধ টষুধে কিছু হবে না। সকাল সন্ধ্যে পেটে হাত বুলো, তা হ'লেই সেরে যাবে। হাত বুলিয়ে দেখলে কিছুদিন। কিছু হ'ল না। পেট তেমনি দমসম, বিকেলবেলা ঠিক সেই চোঁয়া ঢেঁকুর, বুক সমানে জ্বালা ক'রে চলেইছে। নানাজনে নানা পরামর্শ দেয়। পরামর্শদাতার অভাব নেই। একজনের পরামর্শে তেল খাওয়া বন্ধ করলে, আর একজনের পরামর্শে ঘি খাওয়া, তৃতীয় একজন বললে—মশলাই সব রোগের মূল, ওটাও ছাড়। তিনজনের কথাই শুনলে বেচারা। বিনা তেলে, বিনা ঘিয়ে, বিনা মশলায় অখাদ্য খাওয়া গলধঃকরণ করতে লাগল। অসুখ একটু কমল, কিন্তু অরুচি এসে গেল। খাবার কথা মনে হলেই গা বমি বমি করত। বমি শুনে একজন ডাক্তার বললেন—পেটে বোধ হয় কৃমি আছে, মলটা পরীক্ষা করাও। বেচুলাল শহরে গিয়ে মল পরীক্ষা করিয়ে এল। কৃমির কিছু পাওয়া গেল না। ডাক্তারবাবু তবু বললেন, অনেক সময় পাওয়া যায় না। না পাওয়া যাক, কৃমির ওষুধ খাও তুমি। কৃমির ওষুধ খেয়ে আধমরা হ'ল বেচারা। কৃমি বেরুলো না। পিসিমা বললেন, "তুই পাঁচজনের কথা শুনে মরবি দেখছি। বাঙালীর ছেলে ভাত ডাল মাছ তরকারি দিয়ে সপাসপ ক'রে কাঁসি ভরতি ভাত খা দিকি দুবেলা পেট ভরে, সব সেরে যাবে।" পিসিমার কথায় বাঙালীর স্বাভাবিক আহার শুরু করতেই আবার সেই পেট দমসম, চোঁয়া ঢেঁকুর। মহা মুশকিল।

অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে পড়ল বেচুলাল। ভাবছিল কি করি, এমন সময় বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ সিং একদিন একটি কথা বললে। কথাটি বেচুলালের মনে লাগল। শ্রীনাথ সিং লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত, অনেকরকম জানাশোনা আছে লোকটার।

শ্রীনাথ বললে, "দেখ বেচুলাল, অভিধানে দেখলাম জলের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জীবন'। জলই জীবন, জীবনই জল। আমার বিশ্বাস তুমি যদি বিশুদ্ধ জল পান করতে পার, তোমার অসুখ সারবে। বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট না ক'রে তুমি বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ ক'রে পান করবার চেষ্টা কর দিকি। পানাপুকুরে জল বা এঁদো পাতকোর জল কোনটাই বিশুদ্ধ নয়। এমন কি নদীর জলও নয়। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য থাকে ওসবে।"

"শহর থেকে কলের জল আনাতে বলছ? বাবুদের বাড়ির টিউব ওয়েলের জলও খেয়ে দেখতে পারি যদি বল।"

"আমার বিশ্বাস ওসবও 'বিশুদ্ধ' নয়। বোতলে ক'রে একরকম জল আসে—তাই বিশুদ্ধ জল শুনেছি। তাই খেয়ে দেখ দিকি। আমাদের ছিদাম ডাক্তারের কাছে পেতে পার।"

বেচুলাল গরীব নয়। ছিদাম ডাক্তারের কাছে থেকে একেবারে ত্রিশ বোতল 'ডিসটিল্‌ড্‌ ওআটার' কিনে ফেললে সে। তিনদিন অন্য কোন প্রকার জল স্পর্শ পর্যন্ত করলে না। শৌচাদি কর্মও সারলে বিশুদ্ধ জল দিয়ে, রোগের কিন্তু উপশম নেই। ঘড়ি ধরে চারটের সময় 'ঘেউ' করে চোঁয়া ঢেঁকুরটি ঠিক উঠতে লাগল। শ্রীনাথ সিং বললে,—"পেটে অনেক গরদা জমেছে, তিনদিনে কি হবে, মাসখানেক অন্তত ব্যবহার ক'রে দেখ "

ছিদাম ডাক্তারের কাছে বিশুদ্ধ জল আর ছিল না। শহরে লোক পাঠাবে কি না ভাবছিল এমন সময় শ্রীনাথ সিংয়ের চেয়ে বেশী বিদ্বান এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে প্ল্যান বদলে ফেলতে হল বেচুকে।

ব্যক্তিটি গ্রামে আগন্তুক। রমেশ চৌধুরীদের পরিচিত। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। এম্‌. এস্‌. সি. পড়ে। পালবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আলাপ হয়ে গেল বেচুর সঙ্গে। বিশুদ্ধ জলের প্রসঙ্গ তুলতে সে বললে—"সাধারণ ডাক্তারখানায় যে-সব ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওআটার থাকে তাকেও ঠিক বিশুদ্ধ জল বলা যায় না। সে-সব সস্তা শিশিতে রাখা থাকে তার কাঁচ ঠিক 'অ্যালক্যালি ফ্রি' নয়। কিছুদিন পরে জলেও অ্যালক্যালি এসে ঢোকে—"

এই আগন্তুকটির কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে আলক্যালি বস্তুটা কি তা জিজ্ঞাসা করতে বেচুর লজ্জা হ'ল। একটু মুচকি হেসে সে এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন অ্যালক্যালি সম্বন্ধে সে সব কথা জানে। মনে মনে কিন্তু সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। সর্বনাশ, না জেনে কি বিষই না জানি সে খেয়েছে। ত্রিশ বোতল। অ্যালক্যালি যে সাধারণ সোডা জাতীয় জিনিস তা জানলে এত ভয় হ'ত না তার। সোডা তো সে কত খেয়েছে!

গোপনে গোপনে সে সন্ধান করতে লাগল বিশুদ্ধ জল কোথায় পাওয়া যায়। একটা দৃঢ় ধারণা ক্রমশ তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল যে, বিশুদ্ধ জল খেলেই সে ভাল হয়ে যাবে। দুচার ফোঁটা বিশুদ্ধ জলও যদি তার পেটে যায় তাহলেও তার অসুখ কমে যাবে অনেকটা। বিশুদ্ধ জল যোগাড় করতেই হবে যেমন ক'রে হোক।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। শ্রীনাথের সহায়তায় বহু অনুসন্ধান ক'রে অবশেষে বেচুলাল খবর পেলে যে রাসায়নিক গবেষণাগার ছাড়া বিশুদ্ধ জল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

···অনেক খরচপত্র ক'রে কোলকাতায় এসে হাজির হ'ল সে। উঠল মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি শ্যামবাজারে। মাসতুতো বোনের ভাসুর-পো নীলু বেশ চালাক চতুর ছোকরা। তাকেই ধরে পড়ল বেচুলাল। রাসায়নিক গবেষণাগারে নিয়ে যেতে হবে! নীলুও প্রথমটা 'রাসায়নিক গবেষণাগার' কথাটার তাৎপর্য বোঝেনি—(বেচুলাল কথাটা শিখেছিল শ্রীনাথ সিংহের কাছ থেকে)—কিন্তু সে চালাক চতুর ছোকরা।

দু'চার কথার পরই সে বুঝতে পারল যে কেমিষ্ট্রির ডিমন্‌স্ট্রেটার শিবনাথবাবুর কাছে নিয়ে গেলেই সমস্যাটার সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

…শিবনাথবাবু রসায়নে পণ্ডিত লোক। বেচুলালের কাতর নিবেদন শুনে বললেন—"বিশুদ্ধ জল ক'রে দিতে পারি বটে, কিন্তু বেশী তো হবে না। দুচার ফোঁটা হতে পারে।"

বেচুলাল ঢোঁক গিলে বললেন—"যে আজ্ঞে।"

"ওতেই কাজ হবে আপনার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপাতক্…"

কথা আর সে শেষ করতে পারলে না। তার মনে হ'ল যা পাওয়া যাচ্ছে তাই বা ছাড়ি কেন!

"বেশ, তা যদি হয় তো দেব ক'রে।"

ভয়ে ভয়ে বেচুলাল আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"দাম কি এখনই দিয়ে দেব ?"

"দাম ? দাম লাগবে না।"

দাম লাগবে না! বেচুলালের সন্দেহ হল : ঠিক 'বিশুদ্ধ জল' দেবে তো!

"আজ্ঞে, জলটা ঠিক বিশুদ্ধ হবে তো ?"

"আপনি দুপুরে আমার ল্যাবরেটরীতে আসবেন, আপনার সামনেই ক'রে দেব…"

সেই দিনই দুপুরে নীলু আপিস যাবার মুখে বেচুলালকে শিবনাথবাবুর ল্যাবরেটরিতে পেঁাছে দিয়ে গেল।

বেচুলাল ল্যাবরেটরি দেখেনি। চমৎকৃত হয়ে গেল। কি কাণ্ডকারখানা! কত রকমের কাঁচের বাসন, সরু মোটা ঘোরানো কত রকমের নল, কি অদ্ভুত রকম উনুন, একটা নলের মুখে আগুন জ্বলছে নীলচে ধরনের, দেখাই যায় না ভাল ক'রে—একটা কাঁচের ভাঁড়ে টগবগ ক'রে ফুটছে লাল মতো কি একটা। সোঁ সোঁ ক'রে শব্দ হচ্ছে পাশের ঘর থেকে। রোগা মানুষ সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠেছে, বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল তার।

শিবনাথবাবু প্রবেশ করলেন।

"দেখুন এইটেতে পিওর হাইড্রোজেন আছে, আর এইটেতে পিওর অক্সিজেন আছে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে জল হয় জানেন তো ?"

দুটো পাত্র দেখালেন শিবনাথবাবু। বেচুলাল কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার মনে হ'ল দুটো পাত্রই খালি।

"এইবার এই দুটোকে মেশাতে হবে। দাঁড়ান পাশের ঘর থেকে মিশিয়ে আনি…"

বেচুলালের আবার সন্দেহ হ'ল ভদ্রলোক ঠকাচ্ছে না তো। কি মেশাবে! কিছুই তো নেই।

শিবনাথবাবু একটা বেঁটে গোছের শিশি নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করলেন। "হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়েছি এটাতে। এইবার আগুন দিলেই জল হবে…"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বেচুলাল শুনছিল। আগুন দিলেই জল হবে!

দড়াম্ ক'রে প্রচণ্ড শব্দ হ'ল একটা।

"এই দেখুন শিশির গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। এই হ'ল বিশুদ্ধ জল। উঠে এসে দেখুন···"

বেচুলালের কিন্তু উঠে আসবার মতো অবস্থা ছিল না। প্রচণ্ড শব্দের চোটে তার 'হার্টফেল' করেছিল।

বাবুলের কাণ্ড

বয়স না হয় কিছু কমই হ'ল, কিন্তু তাই বলে কি ছোটরা মানুষ নয়? তারা কি একলাটি কিছুই পারে না? তারই জবাব দিয়েছে বাবুল। যেমন করেই হোক একটা জবাব তো!

বাবুলের বয়স চৌদ্দ বছর হ'য়ে গেল, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু তার মা তবু তাকে একলা যেতে দেবেন না কোথাও। স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসা চাই; একটু দেরী হলেই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করবেন তিনি; বাড়ির সামনের মাঠটাতেই খেলতে হবে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে।

অনেক জোর-জবরদস্তি ক'রে স্কুলের ক্রিকেট-খেলাতে যাবার সে অনুমতি পেয়েছিল, তা-ও পাড়ার হারু মাস্টার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে যে তিনি নিজে মাঠে থাকবেন এবং বাবুলকে নিজে সঙ্গে ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবেন রোজ সন্ধ্যাবেলা।

সেবার গঙ্গার ঘাটে অর্ধোদয় যোগের অতবড় মেলা হয়ে গেল, পাড়ার সবাই দেখতে গেল, যাওয়া হ'ল না কেবল বাবুলের—বিশ্বাসযোগ্য কোনও সঙ্গী পাওয়া গেল না বলে। বাবুলের বাবা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্র্যাকটিস ক'রে বেড়ান, বাবুলকে সঙ্গে ক'রে মেলায় যাবার অবসর নেই তাঁর। মা নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরও সময় হ'ল না। এর কোনও মানে হয়?

স্কুল থেকে স্কাউটের দল কতবার কত জায়গায় ঘুরে এল—খড়গপুর লেক, মন্দারের পাহাড়, গৈবীনাথ, বটেশ্বরনাথ! মা কোথাও যেতে দিলেন না বাবুলকে। তাঁর কেবলি ভয়—যা অন্যমনস্ক ছেলে, কোথায় হারিয়ে যাবে হয়তো, কোথায় পড়ে যাবে···! সবাই সিনেমা দেখে—সে দেখতে পায় না।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবুল জেদ ধরে বসল এবারে সে বেরুবেই এবং একলা।

মাকে বললে—"মা, আমি মামার বাড়ি ঘুরে আসি।"

"কার সঙ্গে যাবি?"

"একাই যাব।"

"তিন তিনটে স্টেশন একা যাবি কি? সে কি হয় বাবা?"

"না আমি নিশ্চয়ই যাব, তুমি বাধা দিও না।"

"মিঠু সঙ্গে যাক না হয়।"

"না, কেউ সঙ্গে যেতে পাবে না। আমি কি একা যেতে পারি না তুমি ভাব?"

"গাড়িতে উঠতে গিয়ে পা-টা ফস্‌কে যদি যায়! যা ভিড় আজকাল বাবা!"

"না, আমি যাব ঠিক।"

"কি দরকার বাবা বিপদের মুখে যাবার?"

"না, আমি যাবই"

সোরগোল তুলে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসল বাবুল। মা কিছুতে রাজী হন না তবু। শেষকালে অনশন শুরু করলে সে।

বাবা সকালে উঠেই প্র্যাকটিসে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মা ডেকে বললেন, "তুমি বাবলুকে কিছু বলছ না, দেখ ও কি কাণ্ড শুরু করেছে!"

বাবা বললেন, "যেতে চাইছে, যাক না কি করবে বাড়িতে বসে বসে?—

"তিন-তিনটে স্টেশন, একা যেতে পারে কখনও ছেলেমানুষ?"

"কতদিন আগলে আগলে থাকবে তুমি ওকে? যাক ঘুরে আসুক।"

"চল না, আমরা সুদ্ধু যাই?"

"আমার সময় কই? তুমিই বা যাবে কি ক'রে, বিনুর পরীক্ষা সামনে। ও যাক। এই নে—"

বাবা হঠাৎ একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে দিয়ে দিলেন বাবুলকে। বাবুল হাতে স্বর্গ পেল যেন!

"ও একলা যাবে?" বিস্মিত মা প্রশ্ন করলেন।

"যাক না। দিনের ট্রেনে যাবে। ঘণ্টাখানেকের তো ব্যাপার!"

বাবুলের বাবা বেরিয়ে গেলেন।

"আমাকে খেতে দাও শিগ্‌গির"—বাবুলের আর তর সইছে না।

"ট্রেনের দেরি কত?"

"আর ঘণ্টাখানেক আছে মোটে।"

"একা যাবি? আমার ভয় করছে বাপু!"

"খেতে দেবে তো দাও, তা না হলে চললাম আমি।"

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন বাবুলের মা।

"কাপড়-জামা নিবি কিসে?"

"পুঁটলি ক'রে বেঁধে দাও না!"

"আর টাকাটা।"

"বুক-পকেটে থাকবে।"

'একটা ছোট মনিব্যাগ নিয়ে যা না হয়। খুচরো পয়সা পকেট থেকে পড়ে যাবে হয় তো—"

বাবুল আর মাকে বেশী কথা বলবার সময় দিলে না। কোন রকমে নাকে-মুখে গুঁজে দৌড় দিলে সে স্টেশনের দিকে। বগলে পুঁটলি, পকেটে মনিব্যাগ!

"ওরে শোন্ শোন্" মা পিছু ডাকলেন আবার।

"গিয়ে পৌঁছন-সংবাদ দিস্। এই পোস্টকার্ড নিয়ে যা। আর শোন্"

"কি আবার?"

"পুজোর ফুল বেলপাতা নিয়ে যা পকেটে ক'রে।"

ফিরে এল বাবুল। পুজোর ফুল-বেলপাতা মাথায় ঠেকিয়ে তার পকেটে সেগুলো দিয়ে দিলেন মা।

"খুব সাবধানে যেও। গোঁয়াতুমি ক'রে যাচ্ছ—"

"ঠিক পেঁৗছে যাব, কিছু ভেব না তুমি।"

বাবুল কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল। ফিরে এসে মাকে প্রণাম করল একটা টিপ ক'রে। তারপর দে ছুট।

স্টেশনে ভয়ানক ভিড়। থার্ড ক্লাস বুকিং-আপিসের সামনে তো একটা দাঙ্গা হচ্ছে যেন। থার্ডক্লাস টিকিট করেই যাবে সে। অনর্থক বেশী পয়সা খরচ করতে যাবে কেন? দেখাই যাক চেষ্টা করে।

পুঁটলিটা প্ল্যাটফর্মে একধারে রেখে ঢুকে পড়ল সে ভিড়ের মধ্যে।

জমাট ভিড়। তবু ঠেলে-ঠুলে এগুতে লাগল সে একটু একটু ক'রে। কারও বগলের তলা দিয়ে, কারও পাশ কাটিয়ে, কারও পা মাড়িয়ে হাজির হ'ল সে অবশেষে টিকিট-বিক্রির ঘুলঘুলির কাছে।

"বরিয়াপুরের টিকিট দিন তো একখানা।"

টিকিটের দাম বার করতে গিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। পকেটে মনিব্যাগ নেই।

সরে এল ঘুলঘুলির কাছ থেকে। যতটা সম্ভব এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখলে, কোথাও নেই ব্যাগটা। প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে দেখে পুঁটুলিটাও নেই।

বাবুলের পেঁৗছোন-সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত হ'য়ে বসে আছেন বাবুলের মা। ছেলে চারদিন গেছে, এখনও পর্যন্ত কোনও পেঁৗছোন-সংবাদ এল না। সঙ্গে পোস্টকার্ড দিয়ে দিয়েছেন।

"আজকাল ডাকের গোলমাল হচ্ছে"—বাবুলের বাবা বললেন।

"কাল এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি একটা!"

"তুমি চলেই যাওনা না হয় মিঠুকে নিয়ে। পরের ট্রেনে ফিরে এস কাল। বিনুর পরীক্ষার তো দেরি আছে এখনও হপ্তাখানেক। টেলিগ্রাম করতে যা খরচ, তোমাদের যেতে আসতেও তাই। টেলিগ্রামও ঠিক যাচ্ছে না আজকাল।"

মিঠুকে নিয়ে চলেই গেলেন শেষে তিনি বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে কিন্তু অকূল পাথারে পড়লেন। বাবুল আসেনি। বাবুলের মামা-মামী শুনে বললেন— "সে কি!"

হৈ চৈ পড়ে গেল। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ, থানায় খবর, হাসপাতালে খবর,—বাবুলের বাবাও চলে এলেন প্র্যাকটিস স্থগিত রেখে। চারিদিক তোলপাড় হ'তে লাগল, কিন্তু বাবুলের কোনও খবর পাওয়া গেল না।

শেষে সপ্তম দিনে—যখন বাবুলের মামা বাবুলের একটা ফটো-সুদ্ধ বিজ্ঞাপন পাঠাতে যাচ্ছেন কাগজে, তখন বাড়ির ছোট ছেলে খোকন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিলে—"বাবুল-দা এসেছে!"

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সবাই।

এসে দেখলেন বাবুলচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে—একপা ধুলো,—একমুখ হাসি!

"কি রে, কোথায় ছিলি তুই ?"

"হেঁটে এলাম।"

"কেন ?"

"স্টেশনেই টাকা পুঁটুলি চুরি হ'য়ে গেল সব।"

"ঐ চল্লিশ মাইল রাস্তা তুই হেঁটে এলি ?"—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"তোমাকে বলে এসেছিলুম যে ঠিক পেঁছিব। দেখ, ঠিক পেঁছেছি কি না।"

হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বাবুলের মুখ।

প্রদীপ

ঘরের কোণে চকচকে পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপটি জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার থমথমে করছে। ঝিঁঝি ডেকে চলেছে ক্রমাগত।

খোকন প্রদীপের আলোয় বসে পড়ছিল। কাছেই একটি আরামকেদারায় দাদু বসে বসে পা দোলাচ্ছিলেন আর টান দিচ্ছিলেন গড়গড়ায়; অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘর ভরপুর।

পিতৃমাতৃহীন খোকনকে তিনিই মানুষ করেছেন। স্কুলে পেঁছে দিয়ে আসেন এবং নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন স্কুল থেকে ছুটির পর। তার সঙ্গে খেলাও করেন, বেড়াতেও যান। এমনকি সিনেমাতেও নিয়ে যান। একদণ্ড চোখের আড়াল করেন না। বাড়িতে নিজেই তাকে পড়ান।

বিজ্ঞানের খুব বড় অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এখনও মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু এখন আর চাকরি করেন না, বছর দুই আগে চাকরির মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন পেনসন ভোগ করেন আর খোকনকে নিয়ে থাকেন। পেনসনের সবটুকু তিনি নিজে ভোগ করেন না, অধিকাংশই দান করে দেন। অনেক গরীব ছেলের স্কুল-কলেজের মাইনে দেন, অনেক গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করেন। তাই তাঁর বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই, মাটির প্রদীপ।

খোকন একটা গল্পের বই পড়ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, দাদু, তুমি হাড় থেকে বজ্র তৈরি করতে পার ?"

খোকনের ধারণা তার দাদু মস্তবড় একজন বিজ্ঞানী।

"না, আমি কিছুই পারি না, কেবল খেতে আর ঘুমুতে পারি।"

"তুমি খাও ত মোটে এক বেলা আর কখন যে ঘুমোও তাতো দেখতেই পাই না। কলেজে গিয়ে কত রকম এক্‌স্‌পেরিমেন্ট কর—আমি সব জানি। নরেশবাবু আমাকে সব বলেছেন—। বল না, হাড় থেকে বজ্র তৈরি করা যায় কি না। নিশ্চয় যায়, এইতো লিখেছে দধীচি মুনির হাড় থেকে বজ্র তৈরি ক'রে বৃত্রাসুরকে মারা হয়েছিল। অ্যাটম্‌ বম্‌ জিনিসটা কি—"

"আর একটু বড় হ'লে বুঝতে পারবে। তবে অ্যাটম্‌ বম্‌ আর বজ্র এক জিনিস নয়। অ্যাটম্‌ বম্‌ হাড় থেকে হয় না।"

"সেকালে দধীচি মুনির হাড় থেকে যখন বজ্র হয়েছিল, তখন একালেও নিশ্চয় হ'তে পারে,—পারে না ?"

"নিশ্চয় পারে। হচ্ছেও।"

"কোথা ?"

"সর্বত্র। তোমার চোখের সামনেই হচ্ছে, তুমি দেখতেও পাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না—"

"হাড় থেকে আমার চোখের সামনে বজ্র হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না ? কি রকম ?"

দাদু হাঁটু দোলাতে লাগলেন।

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল তারপর। তারপর বাইরের ঝিঁঝির শব্দ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। খোলা জানালা দিয়ে খোকন দেখতে পেল, বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। চাপ চাপ জমাট অন্ধকার।

"দাদু, কিছু বলছ না যে—"

দাদু হয়তো কিছু বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

রাঁধুনী এসে বললে, "খোকন, খাবার দিয়েছি তোমার। খেয়ে নাও এসে—"

দাদুও বললেন, "যাও খেয়ে এস—"

খোকনকে উঠে যেতে হ'ল।

খেয়ে এসেই খোকন বললে, "দাদু, বল না কোথায় বজ্র হচ্ছে আজকাল। আমার চোখের সামনে হচ্ছে ?"

"হচ্ছে। বড় হলে বুদ্ধি বাড়লে চোখের দৃষ্টি আরও পরিষ্কার হবে, তখন দেখতে পাবি—"

"এখন পাব না ?"

"কই পাচ্ছিস ?—"

খোকন বুঝতে পারলে, দাদু এখন অন্য কিছু একটা ভাবছেন, বজ্র নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। দাদুর মাঝে মাঝে ওরকম হয়। কি যেন ভাবেন বসে বসে। চোখ বুজে পা দোলাচ্ছেন খালি। নিশ্চয় ভাবছেন কিছু। খোকনের হঠাৎ মনে পড়ল, ফোর্থ মাস্টারমশাই চারটে অঙ্ক দিয়েছেন বাড়ি থেকে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। গল্পের বই পেয়ে সেকথা ভুলেই গিয়েছিল সে। তাড়াতাড়ি গিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। দাদু চোখ বুজে পা দুলিয়ে যেতে লাগলেন। বজ্র আর দধীচির কথা চাপা পড়ে গেল।

...অঙ্ক কষা শেষ ক'রে বই খাতা গুছিয়ে রেখে খোকন যখন শুতে এল, তখনও দাদু তেমনি ভাবে বসে আছেন।

"দাদু, শুতে যাবে না ?"

"চল—"

"আজ কিন্তু তোমার একটা গল্প বলবার কথা ছিল। ভুলে গেছ নিশ্চয়—"

"গল্পই ভাবছিলাম। চল বলছি—"

দাদু বলছিলেন, "কল্পনা কর একটা লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। করেছিস ?"

"করেছি—"

"দরদর ক'রে ঘাম পড়ছে তার। হাঁপিয়ে পড়েছে বেচারা। কিন্তু তবু থামছে না, ক্রমাগত কুপিয়ে চলেছে। মাটি কুপিয়ে জমা করছে একধারে। আর তার বউ কুয়া থেকে জল তুলে সেই মাটিতে জল ঢেলে কাদা তৈরী করছে। কল্পনা করেছিস্?"

"করেছি—"

"আচ্ছা, এইবার কোদালটার কথা ভাবা যাক। কোদাল কি ক'রে তৈরি হয় জানিস?"

"হ্যাঁ। লোহা আর কাঠ দিয়ে—"

"লোহা কোথা থেকে আসে?"

"খনি থেকে—"

"খনির লোহা থেকে কি ক'রে কোদাল হয়?"

"লোহা গলিয়ে, তারপর—"

খোকন থেমে গেল। লোহা গলাবার পরে আর কি কি করলে কোদাল হয়, তা সে ঠিক জানত না।

"তারপর, ঠিক জানি না। গলানো লোহাটা ছাঁচে ঢালাই করে বোধ হয়—"

হ্যাঁ। আরও অনেক কিছু করে। লোহাকে যে আগুনে গলাতে হয়, এইটুকুই শুধু মনে রাখ এখন। কোদালের বাঁটের কাঠ আসে কোথা থেকে?"

"গাছ থেকে কেটে নেয়—"

"ঠিক। এ কথাটাও মনে রেখ, গাছ কেটে তবে কোদালের বাঁট হয়। আচ্ছা, এবার আর একটা কল্পনা কর। ঘুম পাচ্ছে নাকি?"

খোকন এবার বিরক্ত হল।

"তোমাকে গল্প বলতে বলছি, আর তুমি আমাকে খালি জেরা করছ—"

"ওর থেকেই একটা গল্প গড়ে উঠবে, দেখ না—"

"কি কল্পনা করতে হবে এবার—"

"কল্পনা কর, একজন চাষী মাঠে চাষ করছে। কখনও রোদে পুড়ে, কখনও জলে ভিজে। এক কথায় সমস্ত শরীর পাত ক'রে। ছবিটা মনে মনে দেখ খানিকক্ষণ। দেখছিস?"

"দেখছি। কিন্তু গল্প কোথায়?"

"গল্প তুই নিজে তৈরি করবি। আমি গল্পের মালমসলা তোকে যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। এইবার ভাবতে হবে লাঙ্গলের কথা। আবার সেই কাঠ আর লোহা! গাছ কেটে চিরে ছুলে লাঙ্গল তৈরি হয়েছে, আর খনি থেকে লোহা তুলে আগুনে গলিয়ে ফাল তৈরি হয়েছে। তারপর, তার গরু দুটোর কথা। কত কষ্ট ক'রে লাঙ্গল টানছে তারা। কল্পনা করছিস?"

"করছি। কিন্তু এসবে গল্পের মালমসলা কি আছে—"

"আছে, আছে। আচ্ছা, এইবার মাটির কথাটা ভাব, যার বুক চিরে লাঙ্গলের ফাল চলেছে ক্রমাগত দিনের পর দিন। ভাবছিস? খুব ভাল ক'রে ভাব, আমি ততক্ষণ দু'চার টান তামাক খেয়ে নি—"

খোকন ভাবতে লাগল।

সত্যিই একটা নূতন কথা তার মনে হতে লাগল—কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, মাটির

বুক চিরে লাঙল চলছে, লোহা আগুনের তাতে গলে যাচ্ছে, গরু দুটোর কি কষ্ট, ওই চাষীর কষ্টও কি কম ?

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির শব্দ। জানলা দিয়ে চাপ চাপ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারের ওপারে আকাশ, তাতে তারা জ্বলছে কয়েকটা······

দাদুর তামাক খাওয়া শেষ হ'ল।

বললেন, "এইবার কল্পনা কর মাঠে ফসল হয়েছে। চারিদিকে সবুজে সবুজ—"

"কি ফসল—"

"রেঁড়ি আর কাপাস। একটা জমিতে রেঁড়ি আর একটা জমিতে কাপাস—"

"ধান নয় ?"

"তোমাকে যে গল্পের মালমসলা দিচ্ছি তাতে ধান দরকার নেই, রেঁড়ি আর কাপাসের দরকার। তাই এ কল্পনা করতে বলছি। করছ ?"

"করছি—"

"তারপর কল্পনা কর, মানুষ জীবন্ত রেঁড়ি আর কাপাস গাছ থেকে রেঁড়ির বীজ আর কাপাসের তুলো সংগ্রহ করছে। অসংখ্য জীবন্ত গাছ রেড়ি আর তুলো দিচ্ছে······"

আবার দাদু চুপ ক'রে গেলেন।

"তারপর—"

"সেই মাটির কাছে ফিরে যাওয়া যাক এবার।"

"কোন্ মাটি ?"

"সেই যে একটা লোক কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখছিল। কল্পনা কর, সে মাটির চেহারা বদলাচ্ছে। কুমোরের চাকে উঠে নানারকম বাসনে রূপান্তরিত হচ্ছে। কলসী, হাঁড়ি, সরা, ধুনুচি, প্রদীপ—নানা চেহারার নানারকম বাসন।"

"তারপর ?"

তারপর সেগুলোকেও আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। পুড়ে পুড়ে শক্ত হচ্ছে তারা—"

"তারপর ?"

"তারপর এইবার চল সেই রেঁড়ির বিচিগুলির কাছে। ঘানিতে ফেলে তাদের পেষা হচ্ছে। চোখে ঠুলি পরে একটা গরু ঘানি ঘোরাচ্ছে। ক্রমাগত ঘুরে চলেছে সে, ক্লান্তি আসছে, পা ব্যথা করছে, কিন্তু থামবার জো নেই। থামলেই পিঠে লাঠি পড়ছে। এইবার ঘানির কথা ভাব। গাছ কেটে যেমন কোদালের বাঁট হয়েছিল, লাঙল হয়েছিল, তেমনি ঘানিও হয়েছে। ঘানিতেও লোহা আছে, যে লোহা আগুনে গলে, তবে মানুষের কাজে লাগে—"

···আবার দাদু চুপ করলেন।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিগুলোও আর ডাকছে না।

খোলা জানালা দিয়ে কালো আকাশটা দেখা যাচ্ছে, আকাশের নক্ষত্রগুলো কি উজ্জ্বল। নক্ষত্রের আলো কি যেন বলতে চাইছে খোকনকে, কিন্তু খোকন বুঝতে পারছে না···

"কল্পনা করেছিস ?"

"করেছি।"

"আচ্ছা, এইবার চল কাপাস তুলোর কাছে। তুলোকে ছিন্নভিন্ন ক'রে পেঁজা হচ্ছে, তারপর ধোনা হচ্ছে। তারপর তা পাকিয়ে সুতো হচ্ছে, সেই সুতো থেকে কাপড় হচ্ছে। যে সব যন্ত্র এসব করছে, তা তৈরি হয়েছে লোহা আর কাঠ থেকে। গাছ নিজের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে কাঠ হয়েছে, লোহা আগুনে গলেছে।'

দাদু চুপ করলেন আবার।

"তারপর ?"

"এইবার দধীচি আর বৃত্রাসুরের গল্পে ফিরে যাওয়া যাক। অন্ধকারও অসুরের মতোই ভয়ঙ্কর। তাকে নাশ করে আলো। ওই ছোট্ট প্রদীপের আলো অন্ধকার অসুরের মাথায় বজ্র হেনেছে। এইবার ভেবে দেখ দিকি, ওই ছোট্ট প্রদীপের আলো-টুকুকে সম্ভব করবার জন্যে কতগুলি দধীচিকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। যখন বড় হবে তখন বুঝবে, নানারকম অসুর নানাভাবে আমাদের বিব্রত করতে চেয়েছে যুগে যুগে, কিন্তু পারেনি, কারণ দধীচিরাও জন্মেছে যুগে যুগে নানারূপে। এখনও জন্মাচ্ছে—"

দাদু চুপ করলেন।

খোকন চেয়ে দেখলে প্রদীপের শিখাটি যেন হাসছে আর আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন যোগ দিয়েছে সে হাসিতে।

টিয়া-চন্দনা

টিয়া আর চন্দনা, দুই বোন।

একই পিতা-মাতার সন্তান তারা, একই পরিবেশে মানুষ হয়েছিল। একরকম খাবার খেয়ে, একরকম পোশাক পরে, এক বিছানায় শুয়ে, একরকম খেলা খেলে ছেলেবেলাটা কেটেছিল তাদের। এক স্কুলে একই মাস্টারের কাছে পড়াশোনাও করেছিল দু'জন একসঙ্গে। কিন্তু জীবন তাদের একরকম হলো না। কেন হলো না বিচার করবেন পণ্ডিতেরা, কি হয়েছিল তা শোনো :

টিয়া ও চন্দনার চেহারা যদিও অনেকটা একরকম ছিল, কিন্তু রং ছিল আলাদা। টিয়া ছিল কালো, আর চন্দনা ছিল ফরসা। কি ক'রে একজনের রং কালো আর একজনের রং ফরসা হয়, আর কেন যে লোকে কালো ফরসা নিয়ে মাথা ঘামায় তার বিচার করুন পণ্ডিতেরা, কিন্তু রঙের এই সামান্য তারতম্য এদের দু'জনের জীবনে হঠাৎ যে ব্যবধান সৃষ্টি করলো তা বিপুল।

টিয়া-চন্দনার বাবা নিবারণবাবু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সজ্জন ছিলেন, কিন্তু ধনী ছিলেন না। অল্প বেতনে স্কুলে মাস্টারি করতেন, আর সকাল-সন্ধ্যে করতেন—প্রাইভেট ট্যুশনি। ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিশ্রম করেও কিন্তু তিনি মাসে আড়াইশো টাকার বেশী রোজগার করতে পারতেন না। এতে কোনক্রমে সংসার চলতো তাঁর, বিশেষ কিছু

বাঁচাতে পারতেন না। মেয়ে দুটিকে কিছুদূর পড়িয়েছিলেন তবু। নিজে মাস্টার ব'লে পড়াতে পেরেছিলেন। তাও সম্ভব হতো না, যদি তাঁর ছেলে থাকতো। আর ছেলেমেয়ে হয়নি ভদ্রলোকের। ছেলে থাকলে তাকেই পড়াতে হতো আগে।

টিয়া-চন্দনা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো। তাদের বাড়ন্ত গড়ন দেখে, স্বাস্থ্য দেখে আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু নিবারণবাবু আর তাঁর স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিয়ে দিতে হবে, অনেক টাকা চাই! কোথায় পাবেন অত টাকা! রোজগার থেকে কিছুই তো বাঁচাতে পারেন নি। বরং ধারই আছে বাজারে কিছু।

চন্দনা বড়। তার জন্যেই বিয়ের চেষ্টা হতে লাগলো আগে। দু'একজন দেখে গেছেন, একজন বলছেন, চন্দনা নাকি খুব সুলক্ষণা, কিন্তু পণের পরিমাণ শুনে পেছিয়ে আসতে হলো নিবারণবাবুকে। দশ হাজার টাকা চায়। কি সর্বনাশ! যতই দিন যায় ততই নিবারণবাবুর চিন্তা বাড়ে। শেষকালে এমন হলো যে, রাত্রে ঘুম হতো না তাঁর। নিবারণবাবুর স্ত্রী একদিন বললেন, "আমার যা দু'একখানা গয়না আছে তা বেচে দাও। দেশের জমিটাও বিক্রি ক'রে ফেল। কি হবে ওসব থেকে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে যেমন ক'রে হোক—"

নিবারণবাবু ইতস্ততঃ করছিলেন, এমন সময় একদিন অদ্ভুত কাণ্ড হ'য়ে গেল একটা। ঠিক যেন রূপকথার কাণ্ড। রূপকথায় নিশ্চয় পড়েছো, এক রাজাহীন রাজ্যের রাজহস্তী শূন্য সিংহাসন পিঠে নিয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিল, আর এক গরীবের ছেলেকে শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল—এও যেন অনেকটা তেমনি হলো।

রাস্তার কলে জল ভরছিল চন্দনা। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি ক্ষীণকান্তি লোক ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে তাকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে, একটু বিরক্তও হলো। তাড়াতাড়ি জল ভরে বাড়ির দিকে চলে গেল সে। বাড়িতে এসে দেখে, লোকটি তার পিছু-পিছু আসছে।

—"তোমার নাম কি মা?"

প্রশ্ন শুনে চন্দনা অবাক্ হয়ে গেল।

—"আমার নাম, চন্দনা।"

—"তোমার বাবা বাড়ি আছেন?"

—"আছেন।"

—"একবার ডেকে দাও তো—"

নিবারণবাবু বেরিয়ে এলেন। সব শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি। ক্ষীণকান্তি লোকটি কেউ-কেটা নন্। মধ্যপ্রদেশের এক রাজ-পরিবারের কুল-পুরোহিত। রাজকুমারের বধূপদে বরণ করবার জন্য তিনি এক সর্বসুলক্ষণা রূপসী কিশোরীর খোঁজে বেরিয়েছেন। চন্দনাকে দেখে পছন্দ হয়েছে তাঁর। তিনি চন্দনার জাতি-বংশ-পরিচয়গোত্র ইত্যাদি জানবার জন্য উৎসুক হয়ে এসেছেন। সব যদি মিলে যায় তাহলে চন্দনাকে তিনি রাজবধূ করবার জন্য নির্বাচিত করবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সব মিলে গেল। পুরোহিতমশায় চলে গেলেন, বলে গেলেন, চন্দনাকেই নির্বাচন করলেন তিনি। যথাসময়ে চিঠি আসবে।

চিঠি এলো সত্যি-সত্যি। অবাক্ হয়ে গেলেন নিবারণবাবু। আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনও বোধহয় এত অবাক হয়নি।

পর-পর সব ঘটনা ঠিক যেন যাদু-মন্ত্রবলে ঘটতে লাগলো। নিবারণবাবু ছুটি নিয়ে গেলেন বরকে আশীর্বাদ করতে! প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড হাতা, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, মোটর, সিপাহী-সান্ত্রী—এলাহি কাণ্ড-কারখানা দেখে হকচকিয়ে গেলেন তিনি। রাজকুমারকে যথারীতি আশীর্বাদ করলেন। রাজকুমার সুশ্রী, কিন্তু একটু রোগা বলে মনে হলো।

বিবাহের একসপ্তাহ আগে বরপক্ষের লোকেরা এসে পড়লেন কোলকাতায়। প্রকাণ্ত বাড়ি ভাড়া করলেন! তারপর একদিন প্রচুর গয়না, কাপড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন চন্দনাকে। তাঁদের খরচেই চন্দনাদের বাড়ির সামনেও নহবত বসলো বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই। বিয়ের দিন যা হলো তা অবর্ণনীয়। ফুলের, আলোর, রঙের আর সুরের মহোৎসব পড়ে গেল। বহুরকম বাজনা বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে বর এলো—ময়ূরে রূপান্তরিত এক প্রকাণ্ড মিনার্ভা গাড়ি চড়ে।

যে চন্দনা দারিদ্র্যের দুঃসহ শীতে কষ্ট পাচ্ছিলো, অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জীবনে বসন্ত এসে গেল হঠাৎ।

চন্দনার বিয়ের কিছুদিন পরে—টিয়ার জীবনেও বসন্ত এলো। কিন্তু এ-বসন্ত ঋতুরাজ বসন্ত নয়, বসন্তরোগ। যমে মানুষে টানাটানি চললো কিছুদিন, তারপর বাঁচলো সে কোনক্রমে। না বাঁচলেই বোধহয় ভালো ছিল; একে কালো রং, তার উপর মুখময় বসন্তের দাগ হ'য়ে সে যেন একটা বিভীষিকার মতো হ'য়ে উঠলো।

নিবারণবাবু আবার বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন।

অনেক কষ্টে টিয়ার বিয়ে হলো অবশেষে। কিন্তু অনেক খুঁজতে হলো, অনেকদিন অপেক্ষা করতে হলো, অনেক লোক এসে টিয়াকে অনেকবার দেখে, অনেকবার অপছন্দ ক'রে গেল, অনেক জলখাবার খাওয়ান হলো অনেক অবাঞ্ছিত লোককে, নিবারণবাবু অনেকের কাছে অনেকবার হাতজোড় করলেন—তারপর ঠিক লোকটি এলো।

লোকটি অবশ্য পাত্র হিসাবে ভালো। দেখতে ভালো, চরিত্র ভালো, বংশ ভালো, লেখাপড়ায়ও ভালো। কিন্তু প্রধান খুঁত—অবস্থা ভালো নয়। পিতৃ-মাতৃহীন সুশীল নিজের চেষ্টাতেই বি. এ. পাশ করেছিল, নিজের চেষ্টাতেই রেলের চাকরি যোগাড় করেছিল। মাথায় বুদ্ধি ছিল, মনে জোর ছিল, কিন্তু ব্যাংকে টাকা ছিল না। এই সুশীলই একদিন এসে বিনা-পণে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল কুৎসিত টিয়াকে।

চন্দনার স্বামী রাজকুমার গৌরীনাথ অসুস্থ ছিল বলে বিয়ের সময় চন্দনা আসতে পারেনি। কিছু গয়না আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল কেবল।

টিয়া আর চন্দনার বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই নিবারণবাবু সস্ত্রীক মারা গেলেন কলেরায়। সাংসারিক কর্তব্য শেষ হওয়ামাত্রই যেন চলে গেলেন তাঁরা।

টিয়া আর চন্দনার মধ্যে যে যোগসূত্রটুকু ছিল তা ছিঁড়ে গেল।

চন্দনা রইলো মধ্যপ্রদেশে এক ধনীর প্রাসাদে, আর টিয়া রইলো এক অখ্যাত স্টেশনের কোয়ার্টারে মালবাবুর বউ হ'য়ে।

বছর-দুই-কাটলো

চন্দনা আর টিয়ার কোনো খবর রাখে না, টিয়াও আর চন্দনার কোনো খবর পায়

না। আপন আপন সংসার নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। তারা যে এক মায়ের পেটের দুই বোন, একই রক্তধারা যে তাদের শরীরে বইছে, এ-কথা মনে করবার অবকাশই পেতো না কেউ।

চন্দনা ব্যস্ত তার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। রাজকুমার গৌরীনাথের রোজ জ্বর হয়, অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না। বিয়ের আগে থেকেই নাকি জ্বর হতো। রাজবাড়ির জ্যোতিষী নাকি কোষ্ঠী গণনা ক'রে বলেছিলেন, একটি সর্বসুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে রাজকুমার সুস্থ হতে পারেন। জ্যোতিষীর ফরমাশ-অনুযায়ী মেয়ে সুলভ হয়নি। দেশ-দেশান্তরে লোক পাঠাতে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সন্ধান মিলেছিল চন্দনার। গৌরীনাথ যে চির-রোগী, এ-খবর সযত্নে গোপন ক'রে রাখা হয়েছিল চন্দনার বাবার কাছ থেকে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে গৌরীনাথ ভালোও ছিল কিছুদিন। কিন্তু তা কিছুদিন মাত্র। আবার জ্বর শুরু হয়েছে। বড়-বড় ডাক্তার আসছে, হাওয়া বদল করবার জন্যে ভালো-ভালো জায়গায় বাড়ি নেওয়া হচ্ছে, অর্থব্যয় হচ্ছে জলের মতো, জ্বরের কিন্তু উপশম নেই।

টিয়া ব্যস্ত তার গৃহস্থালি সামলাতে। সুশীলের বদলির চাকরি। আজ এ-স্টেশন, কাল ও-স্টেশন। মাইনে বেশী নয়। গ্রামে এক বিধবা পিসী আছেন, প্রতিমাসে মাসোহারা পাঠাতে হয় তাঁকে। সুশীল যদি দুঃশীল হতো—অর্থাৎ অন্যান্য মাল-বাবুর মতো 'ঘুষ' নিতে পারতো, তাহ'লে টিয়ার সংসারে অসচ্ছলতা থাকতো না। এক-একজন মালবাবুর কি বাড়-বাড়ন্তই দেখেছে টিয়া। মালবাবু তো নয়—যেন লাটসাহেব। রেডিও, গ্রামোফোন, সিঙ্গার মেসিন, দামী-দামী ছিটের জামা, সিল্কের শাড়ি, ভারী-ভারী সোনার গয়না, জড়োয়ার নেকলেস-চুড়ি, ভালো গরু, বিলিতী কুকুর, ময়না, কাকাতুয়া, সিল্কের গেরুয়া-পরা গুরু,—কি নেই তাদের। কিন্তু সুশীল কিছুতেই ঘুষ নেবে না। তাই টিয়ার শাড়িতে তালির পর তালি, সুশীলের গেঞ্জি শতছিদ্র। সপ্তাহে একদিনের বেশী মাছ খাবার পয়সা জোটে না, দুধের কথা চিন্তা করাও যায় না। রেডিও-গ্রামোফোন তো কল্পনার বাইরে। চাকর-ঠাকুর রাখবার সামর্থ্য নেই। স্টেশনের একটা কুলীর বউ এসে একটু-আধটু কাজ ক'রে দিয়ে যায়। জল ঘেঁটে-ঘেঁটে টিয়ার হাতে পায়ে হাজা হ'য়ে গেছে। অল্প আয়ে সংসার চালাবার ধান্দাতেই ব্যস্ত বেচারী, চন্দনার খবর নেবার অবসরই তার নেই। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দু'দণ্ড বসে গল্প করবার সময়ও পায় না সে।

টিয়ারা তখন ভাগলপুরে।

সুশীল এসে বললে, "তোমার দিদি বোধহয় এসেছেন এখানে।"

—"দিদি? কোথা?"

—"স্টেশনে। মনে হচ্ছে, তাঁদেরই ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ি কেটে রাখা হয়েছে। এখানে বুঢ়ানাথে স্নান করতে এসেছেন শুনলাম। তারপর নাকি গৈবীনাথে যাবেন।"

—"তুমি দেখা করোনি?"

—"আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই। তুমি গিয়ে দেখা ক'রে এসো। ও'রা বোধ হয় জানেন না যে, আমরা এখানে আছি।"

—"কি ক'রে জানবেন, চিঠিপত্র তো লেখা হয় না। তুমি খবর নিয়েছো ভালো ক'রে?"

—"নিয়েছি। তুমি যাও না।"

—"কার সঙ্গে যাবো?"

—"কিষুণকে নিয়ে যাও!"

কিষুণ, স্টেশনের কুলী। কিষুণের বউই কাজ করে টিয়ার বাড়িতে।

—"তুমি যাবে না?"

সুশীল হেসে বললে, "আমি জামাইমানুষ, বিনা নিমন্ত্রণে কি যেতে পারি?"

সুশীলের আড়-ময়লা শতছিদ্র গেঞ্জিটার দিকে চেয়ে টিয়া মুচকি হাসলে একটু, কিছু বললে না। টিয়ার ছেলে হয়েছিল একটি। হৃষ্টপুষ্ট চমৎকার ছেলে। ছ মাস বয়স, কিন্তু এত ভারী যে, টিয়া ভালো ক'রে কোলে করতে পারে না তাকে। তাকে অতদূরে নিয়ে যাওয়া শক্ত। কিষুণ নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এখন ঘুমের সময় কাঁদবে হয়তো। তাই তাকে ঘুম পাড়িয়ে একাই গেল সে। ছেলেকে চট্ ক'রে ঘুম পাড়াবার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল লখিয়া, কিষুণের বউ।

চন্দনাকে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল।

চন্দনার মাথায় সিঁদুর নেই, চুলে তেল নেই, পরনে থান! চন্দনা বিধবা হয়েছে? খবর পায়নি তো সে!

টিয়ার দিকে চন্দনা নির্নিমেষে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "তুই এখানে কি ক'রে এলি?"

—"এইখানেই উনি বদলি হ'য়ে এসেছেন কিছুদিন আগে।"

—"ও।"

টিয়া এরপর কি যে বলবে তা ভেবে পেলে না। মনে হতে লাগলো, চন্দনা যেন তার বোন নয়, অপর কেউ। অনেক দূরে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কবে বিধবা হয়েছে, স্বামীর কি হয়েছিল, এসব কথা পাড়বার সাহস হলো না তার। চন্দনাও কিছু বললে না। নিষ্পলক চোখে টিয়ার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলো সে। টিয়ার মনে হচ্ছিলো পাথর হ'য়ে গেছে সে।

প্রায় মিনিটখানেক পরে (টিয়ার মনে হচ্ছিলো যেন যুগ-যুগান্ত পরে) চন্দনা প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে "আয়, ভেতরে আয়—"

ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ির ভিতর টিয়া ঢুকলো।

ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। কি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে! দেখলে, চন্দনার ছেলে হয়েছে একটি। ঘুমুচ্ছে। চমৎকার রেশমের বিছানা, নেটের মশারি। কতরকম খেলনা। বড়-বড় থার্মোফ্লাস্কই তিন-চারটে, থরে-থরে ফল সাজানো রয়েছে, ছোট-বড় রুপোর বাসন ছড়ানো রয়েছে, ওষুধের শিশি হরেক-রকমের···দাই, চাকর, আয়া, নার্স। টিয়া হকচকিয়ে গেল।

চন্দনার ছেলেটি কিন্তু রোগা। নেটের মশারির ভিতর রেশমের বিছানায় দামী কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে বটে, চেহারায় কিন্তু লালিত্য নেই।

—"খোকার অসুখ না কি?"

—"হ্যাঁ, উনি চলে যাওয়ার পর থেকেই অসুখ হয়েছে। কিছুতেই সারছে না। আমাদের কুলগুরু বশিষ্ঠপ্রসাদ বলেছেন, যেখানে যেখানে শিব আছেন, সেখানে নিয়ে

গিয়ে শিবকে গঙ্গাজলে নাইয়ে, সেই জল দিয়ে ছেলেকে নাওয়ালে ভালো হ'য়ে যাবে। তাই তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

দু'বোনের দূরত্ব-ভাবটা কেটে গেল ক্রমশ। আলাপ শুরু হলো আবার। টিয়া শুনে অবাক্ হয়ে গেল, বিয়ের আগেই নাকি গৌরীনাথের যক্ষ্মা হয়েছিল! সুলক্ষণা চন্দনাকে ওরা বউ হিসেবে নিয়ে যাননি, ওষুধ হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। রোগের কিন্তু উপশম হয়নি। গৌরীনাথ মৃত্যুর পূর্বে ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। উইল ক'রে চন্দনাকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। খোকন যতদিন-না সাবালক হচ্ছে, ততদিন চন্দনাই বিশাল বিষয়ের কর্ত্রী থাকবে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চন্দনা বললে, "তুই ছেলেকে নিয়ে এলি না কেন ?"

—"যা ভারী, আমি তুলতেই পারি না। ঘুমুচ্ছে, তাছাড়া—"

—"তোদের বাসা এখান থেকে কতদূর ?"

—"কাছেই।"

—"চল্, দেখে আসি তোর ছেলেকে।"

টিয়ার সঙ্গে চন্দনা গিয়ে হাজির হলো টিয়ার বাসায়। সঙ্গে গেল আসাসোটাধারী দু'জন বরকন্দাজ।

—"কই তোর ছেলে ?"

—"ঘুমুচ্ছে।"

—"কোথায় ?"

টিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেল খোকনকে আনতে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে খোকন। কিন্তু এ কি! ঠোঁট নীল, নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের তারা উল্টে আছে…। চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো টিয়া।

—"কি হলো ?"

চন্দনা ছুটে এলো তাড়াতাড়ি।

—"খোকন এমন হয়ে গেল কেন ?"

খোকন মারা গিয়েছিল।

দুরন্ত ছেলেকে সামলানো যেতো না, ঘুম পাড়ানো যেতো না বলে লখিয়া টিয়াকে শিখিয়ে দিয়েছিল, দুধের সঙ্গে একটু আফিম খাইয়ে দিলে ছেলে চট্ ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে। রোজ পড়তোও। সেদিনও পড়েছিল, সেদিন কিন্তু ঘুম আর ভাঙলো না। আফিমের মাত্রা বেশী হ'য়ে গিয়েছিল।

নির্বাক টিয়া আর চন্দনা পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন স্বামীহারা, আর একজন পুত্রহারা। ঘটনা প্রবাহে এক বোন আর-এক বোনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, গভীর শোকের মধ্যে আবার তাদের মিলন হলো।

সুশীল আপিস থেকে ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চন্দনার বরকন্দাজ দুজন ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কারণ, বুড়ানাথের মন্দিরে যেতে হবে, খোকার স্নানের সময় নাকি উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

চন্দনা সুশীলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অদ্ভুত প্রশ্ন করলে একটা।

—"সুশীলবাবু, আমি যদি আপনার বাসায় থেকে যাই, আপত্তি আছে আপনার ?"

—"সে কি কথা! আপত্তি হবে কেন, খুব খুশী হবো। টিয়ার কাছে কেউ থাকলে, ভালোই হয় এখন। কিন্তু আপনি কি থাকতে পারবেন এখানে?"

—"খুব পারবো। আমার খোকনকে নিয়ে টিয়ার কাছেই থাকবো আমি।"

—"আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি⋯"

—"আমার শ্বশুরবাড়িতে আমিই কর্ত্রী। আমার উপর হুকুম করবার কারও অধিকার নেই।"

"বেশ, থাকুন, আমার আপত্তি কি।"

আবার সেই রূপকথার কাণ্ড হলো।

চন্দনা আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ফিরে গেল না, গরীব বোন টিয়ার কাছেই থেকে গেল। দাই, নার্স আর আয়ার কবলমুক্ত হয়ে, মা-মাসীর স্নেহে খোকনও ভালো হয়ে উঠলো আস্তে-আস্তে। তীর্থে-তীর্থে আর ঘুরতে হলো না।

করুণা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও আমাদের পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়নি, জনক সূর্যের অগ্নি তখনও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে, চতুর্দিক উত্তপ্ত, সবুজের লেশমাত্র নেই কোথাও। কোনও প্রাণীর জন্ম হয়নি তখনও। কোথাও কোন নদী নেই, ঝরনা নেই, হ্রদ নেই, সমুদ্র নেই। পৃথিবী তখন বিশাল একটা উত্তপ্ত গোলকের মতো ঘুরে চলেছে সূর্যের চারিদিকে। যুগ যুগান্তে অবসান হচ্ছে, কল্প কল্পান্তে। কোথাও শান্তি নেই, স্নিগ্ধতা নেই, আনন্দ নেই, জীবনের বৈচিত্র্য নেই। জন্ম-সময়ে সূর্য তার কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন--তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, তোমার মধ্যে অনেক স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে। তপস্যা করো, তপস্যা করো।

পৃথিবী বুঝতেই পারেনি, তপস্যা মানে কি। কি করতে হবে তাকে। সে কেবল ঘুরে চলেছিল সূর্যের চারিদিকে। না ঘুরে উপায়ও ছিল না, একটা অদৃশ্য শক্তি ঘোরাচ্ছিলো তাকে। একটা জিনিস কিন্তু বুঝেছিল পৃথিবী। বুঝেছিল সে অসহায়। তাই হতাশা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো তার বুকের মধ্যে, মাঝে-মাঝে তা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিতে মূর্ত'ও হচ্ছিলো বুক ফেটে, তার আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত ক'রে। কিন্তু তাতে কোনও ফল হচ্ছিলো না। যে অদৃশ্য বন্ধন তাকে বন্দী করেছে তা একটুও শিথিল হচ্ছিলো না, জ্বালা একটুও কমছিল না, তার উত্তপ্ত উষরতায় শ্যামলতার লেশমাত্রও জাগছিল না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, আসছিল আর যাচ্ছিলো, কিন্তু তার অন্তরের দাহ কমছিল না একটুও। অবশেষে হঠাৎ একদিন তা কান্নায় রূপান্তরিত হলো। অতি তীক্ষ্ণ, অতি তীব্র সে ক্রন্দন, মহাশূন্য ভেদ ক'রে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে তা কোথায় হারিয়ে যেতে লাগলো তা কেউ জানতো না, সে নিজেও না। তার অন্তরের জ্বালা যে কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছে তা-ও সে জানতো না। এই কান্নাই যে তপস্যা, এও তার কল্পনাতীত ছিল।

এ-তপস্যার ফল ফলেছিল। কেমন ক'রে ফলেছিল সেই গল্পই তোমাদের আজ বলবো।

দেবকন্যা করুণা স্বর্গের নন্দনকাননে আনমনা হ'য়ে বসেছিল সেদিন। নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গ-সুখ তার ভাল লাগছিল না। স্বর্গে কোন দুঃখ নেই, তাই সুখের কোনও স্বাদ নেই। কোনও বৈচিত্র্য নেই স্বর্গের জীবনে। পারিজাতের রূপ, মন্দাকিনীর কলধ্বনি, অপ্সরার নৃত্য, ইন্দ্রের সভা, দেবদেবীর আমোদ-প্রমোদ—সবই ছিল, কিন্তু করুণার মনে তারা আর সাড়া জাগাতে পারছিল না। করুণা কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু স্বর্গে করবার মতো কিছু তো নেই, স্বর্গে সব করা হয়ে গেছে, নূতন কাজ নেই, নূতন কাজের প্রেরণাও নেই। স্বর্গের জীবন—একঘেয়ে বিস্বাদ জীবন। করুণা নন্দনকাননে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তার অন্তরের নিগূঢ়-লোকে ভাষাহীন একটা আগ্রহ, কিছু একটা কারবার আগ্রহ ধীরে-ধীরে জাগছিল কেবল। সেই ভাষাহীন ভাবকে কেমন ক'রে রূপ দেবে সে তাই ভাবছিল একা-একা। ভাবতে-ভাবতে মনে পড়লো বান্ধবী বিজলীর কথা। বিজলী হাসি-খুশিতে ভরা, সারা মুখখানিতে তার হাসি চিকমিক করছে সর্বদা। স্বর্গের সবাই ভালোবাসে ওকে ওর এই হাসির জন্য। হাসি নয়—যেন আলো। ফিক-ফিক ক'রে যখন হাসে, মনে হয়, আলো জ্বলে উঠলো যেন চোখের ভিতর। এই হাসির জন্যই গম্ভীর দেবতারাও ওকে ভালোবাসে। করুণার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। ও ভেবেই পায় না, কি ক'রে বিজলী এই একঘেয়ে স্বর্গলোকে এমন আনন্দে আছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো তার পিতা বরুণের কথা। তার মা নেই, কোনদিন ছিল কি না তাও সে জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে সে বাবাকেই দেখছে। বাবাকেও সে ক্বচিৎ দেখতে পায়। সৃষ্টির কাজে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। একদিন হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "করুণা, তুমি নূতন ধরনের কিছু শুনতে পেয়েছো কি ?"

করুণা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। নূতন ধরনের কি আবার শুনবে সে! স্বর্গের পাখিদের একঘেয়ে কাকলী, মন্দাকিনীর একঘেয়ে কলতান, নন্দনকাননের একঘেয়ে মর্মরধ্বনি আর অপ্সরীদের একঘেয়ে নূপুর-নিক্কণ, এ ছাড়া আর তো কিছুই শোনা যায় না এখানে। তাই সে উত্তর দিয়েছিল, "না, নূতন ধরনের কিছুই শুনিনি তো—"

"শুনবে···"

আর বেশী কিছু বলেন নি তিনি। করুণা কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি শুনবো ?"

"কি শুনবে তা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তোমার সেই শোনার উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটুকু শুধু বলেছেন আমাকে। দিবারাত্রি খেটে-খেটে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, সৃষ্টির এ বিশাল ভার আমার উপর দিয়ে পিতামহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর কাছে ছুটি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেটা তোমার মেয়ে করুণার উপর নির্ভর করছে। সে একদিন নূতন একটা কিছু শুনবে, আর তখনই তোমার ছুটির ব্যবস্থা হবে। এর আগে তোমার ছুটি নেই। তুমি কান পেতে রাখো, শুনবেই নিশ্চয় নূতন কিছু একটা···"

এইটুকু বলেই বরুণ চলে গিয়েছিলেন। কোন্ মহাশূন্যে কোন্ জ্যোতির্ময়লোক সৃষ্টি হচ্ছিলো নাকি। ব্রহ্মা, অগ্নি, বরুণ, মিত্র সকলেই তাই নিয়ে ব্যস্ত। করুণা ভাবতে লাগলো, কি সে শুনবে···কবে শুনবে···

"কি ভাবছো ভাই একা বসে ?"

হাসতে-হাসতে বিজলী এসে বসলো।

"জানি না।"

আর একটু হেসে বিজলী বললে, "কি ভাবছো তা জানো না ?"

"ঠিক জানি না—তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।"

বিজলী এর উত্তরে কিছু বললে না, কেবল তার চোখদুটি হাসতে লাগলো।

"অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি একটা আজ। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চলে এলাম তোর কাছে।"

"স্বপ্ন দেখে আমার কাছে ছুটে চলে আসবার মানে ?"

"স্বপ্নটা শোন্ আগে, তাহলেই মানে বুঝতে পারবি।"

"বল।"

"স্বপ্নে দেখলাম, আমার বর যেন তোর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। বর যখন ঘুরছে তখন আমাকেও ঘুরতে হচ্ছে। আমরা দু'জনেই যেন তোকে নিয়েই আছি।"

"তোর বর ? বিয়ে হলো কবে তোর ?

"বিয়ে হয়নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম হয়েছে। বরটির চেহারা—যমদূতের মতো! একটি পাথর যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। গলার স্বর শুনলে মনে হয়, পাথরটি বুঝি ফাটছে। তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলে তোমার কোন ভয় থাকবে না, কিন্তু আমার দশাটা কি হবে ভাবো তো!"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে করুণার গলা জড়িয়ে বললে, "কি ভাবছিলি, বলবি না ?"

"তেমন কিছু ভাবছিলাম না। শোনবার চেষ্টা করছিলাম···"

"উর্বশীর মেয়েটা বেশ বীণা বাজায় আজকাল।···বাজাচ্ছে নাকি কোথাও বসে ?"

"না।"

"তবে কি শোনবার চেষ্টা করছিলি ? আসবার সময় দেখলাম, মেনকা দেবী কি একটা সুর সাধছেন! এতদূর থেকে তা তো শোনা যাবে না!"

"না, ওসব কিছু নয়।"

"তবে ?'

"নূতন ধরনের কিছু একটা। ঠিক জানি না আমি।"

"অদ্ভুত মেয়ে তুই। চল্ মন্দার গাছে একটা দোল্না টাঙিয়ে এসেছি, দুল্‌বি চল্। নূতন ধরনের কিছুর জন্যে এমন ক'রে কান পেতে রাখলে তা শোনা যাবে না। যখন শোনবার তখন আপনি শুনবি। চল্, এখন দোলা যাক্!"

অবশেষে একদিন শোনা গেল। কান্নার শব্দ! তীক্ষ্ন তীব্র মর্মভেদী কান্নার শব্দ! করুণা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো। তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। কান পেতে শুনলে খানিকক্ষণ। না, এরকম সে আগে কখনও শোনে নি। কিন্তু কি অদ্ভুত শব্দ! বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো তার। মনে হতে লাগলো, যেন একটা অদৃশ্য ছুঁচ তার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে, মাথা ভেদ ক'রে অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মনে হতে লাগলো, সে আর সহ্য করতে পারছে না।

দু'কানে আঙুল দিয়ে বসে রইলো সে। কিন্তু তবু শোনা যেতে লাগলো কিসের শব্দ। এ? এ শব্দ বেশীক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যাবে সে। ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়েই দেখা হলো বিজলীর সঙ্গে।

"তুই শুনতে পাচ্ছিস?"

"কি?"

"একটা অদ্ভুত শব্দ! পাচ্ছিস না? এত জোরে-জোরে হচ্ছে তবু পাচ্ছিস না? ওই যে, ওই যে…"

বিজলী অবাক্ হ'য়ে করুণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। করুণার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন হ'য়ে গেছে।

"পাচ্ছিস না?"

"না।"

"শোন্ ভালো ক'রে শোন্।…ওই যে, ওই যে। উঃ, কি করি আমি‥"

আবার ছুটে চলে গেল সে। স্বর্গের পথে ফুলের পরাগ, সোনার রেণু ছড়ানো। তারই উপর দিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে চললো করুণা। মহাশূন্য ভেদ ক'রে পৃথিবীর যে কান্না এসে তার মর্মভেদ করছিল, সে কান্নার তীব্রতা অস্থির ক'রে তুললে তাকে। তার মনে হতে লাগলো, এই রোদনের শব্দ যদি বন্ধ না করতে পারে তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।

দেব-দেবীরা নন্দনকাননে বেড়াচ্ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগলো—"শুনতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছো না তোমরা?"

"কি? পাখির গান?"

"না না…"

"তবে, তরুর মর্মর?"

"না, ওই যে…ওই যে! থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওটাকে। আমি আর শুনতে পাচ্ছি না…"

ছুটতে ছুটতে আবার চলে গেল সে।

অবাক্ হয়ে গেলেন দেব-দেবীরা।

পারিজাতের কুঞ্জে গিয়ে পারিজাতকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি শুনতে পাচ্ছো না?"

পারিজাত কোনও উত্তর দিলে না, তার পাতাগুলি হাওয়ায় দুলতে লাগলো কেবল, করুণার মনে হ'লো, তারা যেন বলছে—"না কিছু শুনতে পাচ্ছি না।"

রাগে ক্ষোভে পারিজাতের কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন ক'রে চলে গেল করুণা।

শেষে সত্যিই পাগল হয়ে গেল সে। দেবকন্যা পাগল হ'য়ে যাওয়াতে দেব-দেবীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইন্দ্র বললেন, "করুণা হবে বরুণের মানস-কন্যা। বরুণ ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হোক্। তারপর বরুণ ফিরে এসে যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করা হবে।"

করুণা বন্দিনী হ'য়ে রইলো একটি নির্জন ঘরে।

কান্নার শব্দ কিন্তু একটুও কমেনি। বরং উত্তরোত্তর তা যেন বেড়েই চলেছিল।

করুণা পাগল হয়ে গিয়েছিল সত্যি। সত্যি সে দেয়ালে মাথা খুঁড়ছিল, মাথার চুল ছিঁড়ছিল, কানে আঙুল দিয়ে চীৎকার করছিল—"থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওই কান্না। আমি আর শুনতে পাচ্ছি না·· পাচ্ছি না।"

কান্না কিন্তু থামছিল না। দগ্ধ পৃথিবীর অন্তরের বাণী কান্নার রূপ ধরে বিরাট আকাশ পার হ'য়ে স্বর্গে এসে পেঁাছোচ্ছিলো। তপস্যা অহরহ চলছিল। কান্নার শব্দ তাই থামছিল না। করুণার চীৎকার থামছিল না। সে ক্রমাগত চীৎকার করছিল—থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও, আর আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

দেব-দেবীরা কেউ করুণার ঘরের দিকে যেতেন না। পাগলিনীর হাহাকার সহ্য করতে পারতেন না তাঁরা। করুণার হাহাকার স্বর্গের সৌন্দর্যকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। একজন কিন্তু রোজই তার খবর নিতে যেতো ঃ সে হচ্ছে—বিজলী। বন্ধঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই সে এসে প্রশ্ন করতো—"কেমন আছিস ভাই?"

"আমি ওই শব্দ কিছুতেই আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। স্বর্গের দেবতারা প্রত্যেকেই শুনেছি শক্তিশালী। তাঁরা কেউ এই শব্দ বন্ধ করতে পারছেন না? এর প্রতিকার করতেই হবে, করতেই হবে, যেমন ক'রে হোক্ করতেই হবে···"

"পারলে তুই নিজেই পারবি, আর কেউ পারবে না! দেবতাদের দৌড় কতদূর তা জানা আছে।"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক ক'রে উঠলো।

তারপর একদিন অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো একটা। করুণার চীৎকার থেমে গেল। বিজলী এসে দেখলে, তার ঘরের জানলা বন্ধ। করুণার নাম ধরে ডাকলে কয়েকবার, কোন সাড়া এলো না। কি হলো? স্বর্গে মৃত্যু নেই। করুণা যে মরে গেছে এ-কথা বিজলী ভাবতেই পারলে না। দ্বারে করাঘাত ক'রে বারবার সে ডাকতে লাগলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বিজলী কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে। তারপর আবার ডাকতে লাগলো। কোন ফল হলো না। বিজলী ছাড়বার পাত্রী নয়, ক্রমাগত ডাকতে লাগলো সে। বহুবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তার ভয় হলো। সে ছুটে গিয়ে খবর দিলে সকলকে। ইন্দ্রের আদেশে ঘরের কপাট ভেঙে ফেলা হলো। তারপর যা দেখা গেল তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। সমস্ত ঘর তুষারশুভ্র-বাষ্পে পরিপূর্ণ, আর কিছু নেই—করুণা নেই। ঘরের কপাট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই তুষারশুভ্র বাষ্পে ধীরে ধীরে বেরুতে লাগলো। দেব-দেবীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই ঘরে ঢুকে দেখলেন, করুণা নেই। তারপর দেখলেন, সেই তুষারশুভ্র বাষ্পরাশি আকাশে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নামছে ক্রমশ। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন না করুণাই মেঘ হ'য়ে পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে তারপর। উত্তপ্ত পৃথিবী শান্ত হয়েছে বিগলিত মেঘের শীতল স্পর্শ লাভ করে। মেঘ—জল হয়ে নেমেছে পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর বুকের উত্তাপ আবার তাকে মেঘে পরিণত করেছে। আবার বর্ষাধারায় নেমেছে সে, হাজার হাজার বছর এইভাবে কেটেছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে জলের

জগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটা···সমুদ্র, নদী, ঝরণা, উৎস, কত কি হয়েছে। তারপর এসেছে উদ্ভিদ্-জগৎ। যে পৃথিবী উত্তপ্ত উষর ছিল, তার সর্বাঙ্গে শ্যাম কান্তি জেগেছে।

যে বন্ধ্যা ছিল সে হয়েছে জননী। প্রাণীদের জন্ম হয়েছে তারপর। ছোট-ছোট জীবজন্তু থেকে শুরু ক'রে বড়-বড় জীবজন্তু জন্মেছে। অনেক পরে এসেছে দানব, তারপর মানব। আরও কত কি হয়েছে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ সহায়তা করেছে দেবতাদের। বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য মহামানব দধীচি নিজের অস্থি দিয়েছেন বজ্র নির্মাণের জন্য। ইতিহাসের পর ইতিহাস রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু করুণা যদি মেঘরূপে এসে উত্তপ্ত পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ না করতো এসব কিছুই হতো না।

পিতা বরুণ কিন্তু কন্যা করুণাকে ভোলেন নি।

বিরাট সমুদ্রের বুকে সেদিন বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশ থেকে। সমুদ্রের অধিপতি বরুণ, বর্ষাকে সম্বোধন করে বললেন—"কন্যা, তুমি পৃথিবীর কান্না শুনে মেঘ হয়েছিলে বলে সমুদ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, আর আমি তাই সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে নির্বিঘ্নে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে ভুলিনি আমি, তোমাকে আমি নিত্য আশীর্বাদ করি। সূর্যের উত্তাপ যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়ে তখন আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করি নব রূপে। তোমাকে আমি ভুলিনি···

ঝরঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের ঘনঘটায় আকাশ পরিপূর্ণ।

"আমরাও ভুলিনি তোমাকে। এই দেখ, আমার স্বামীটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, মনে নেই?"···বিজলী চকমক করে উঠলো! বজ্রের গর্জন শোনা গেল! বজ্রের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। করুণা কোন উত্তর দিলেন না। অসংখ্য বৃষ্টিধারায় সে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে

গৌরবগঞ্জের জমিদার হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে ওরফে রিদুবাবু, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর চেহারাও ছিল অনন্যসাধারণ। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, বিরাট গোঁফ, জমকালো জুলফি। চোখ দুটি বড়বড় লাল-লাল। নাকটা খাঁড়ার মতো। শরীর যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রিদুবাবুকে সবাই ভয় করতো, আবার ভালোও বাসতো।

আমার সঙ্গে তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। আমি তখন সবে ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছি—কোথায় বসবো ঠিক করতে পারিনি তখনও, পয়সার জোর ছিল না তেমন, একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম; এমন সময় রিদুবাবু হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রিদুবাবুর নামটা শোনা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখিনি কখনও আমি। বাবার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তাঁর জমিদারিতে কিছু জমিও ছিল আমাদের। যৌবনকালে, আমাদের জন্মের পূর্বে,

বাবা গৌরবগঞ্জে বাসও করেছিলেন। তারপর চাকরি নিয়ে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন। সেই থেকে কোলকাতাতেই আছি আমরা, আর গৌরবগঞ্জে যাওয়া হয়নি।

হঠাৎ রিদ্‌বাবুর চিঠি এসে হাজির হলো। বাবাকেই লিখেছিলেন তিনি—'শুনলাম তোমার ছেলে এবার ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে যদি আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও, খুবেই খুশি হবো। আমার একটা অসুখ হয়েছে, তাকে দেখতে চাই। কবে আসবে, আগে থাকতে একটু জানিও, স্টেশনে লোক রাখবো।'

আগে থাকতে খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। স্টেশনে নেমে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমার জন্যে হাতী, ঘোড়া, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটরকার—সব রকম যান পাঠিয়েছেন রিদ্‌বাবু। স্বয়ং নায়েরমশাই স্টেশনে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে, আসা-সোটাধারী বারোজন বরকন্দাজ। আমি তো অবাক্।

নায়েবমশাইকে বললাম, "এত সব কাণ্ড কেন! একটা যে-কোনও গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হতো। না পাঠালেও ক্ষতি ছিল না, কতটুকুই-বা পথ।

নায়েবমশাই মাথা চুলকে বললেন, "হুজুর বললেন, ডাক্তারবাবুর কিসে সুবিধে হবে তা তো জানা নেই, আমাদের যা আছে সবই নিয়ে যাও তুমি"—তারপর একটু হেসে বললেন, "পরিচয় হলে বুঝতে পারবেন, ওঁর স্বভাবই এই রকম।"

—"ওঁর কি অসুখ করেছে?"

—"অসুখ? অসুখের কথা শুনিনি তো!"

—"অসুখের জন্যই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!"

—"তা হবে। আমি কিছু জানি না।"

শাল-প্রাংশু মহাভুজ রিদ্‌বাবুকে দেখে আমারও মনে হলো না যে, তিনি অসুস্থ। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল একদিন। এখানে যখন ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতাম দু'জনে। তোমার বাবা হয়তো সে-সব কথা ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ভুলিনি। আমাদের গোমস্তা রমেনের মুখে শুনলাম, তুমি ডাক্তারি পাস করেছো, খুব আনন্দ হলো শুনে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি অসুখ করেছে?"

—"ফুসকুড়ি বেরিয়েছে একটা পিঠের উপর। এরকম ফুসকুড়ি প্রায়ই হয় আমার। দেখ দিকি, এর যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারো।"

ফুসকুড়িটি দেখলাম। অতি ছোট ঘামাচির মতো, বিশেষ কিছু নয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাকে কোলকাতা থেকে ডেকে আনিয়েছেন ভেবে শুধু যে অবাক্ হলাম তা নয়, মনে-মনে একটু অপমানিতও হলাম। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নয় তো! স্টেশনে একজন লোককে আনতে অত রকম যানবাহন যিনি পাঠাতে পারেন···

রিদ্‌বাবু বলে উঠলেন, "থাক্, ফুসকুড়ির কথা পরে চিন্তা কোরো। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে নাও আগে। নায়েবমশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক'টার সময় ওঠো তুমি?"

—"আমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস।"

—"বেশ ভালোই তো। কটায় সময় ওঠো।"

—"ভোর তিনটের আমার ঘুম ভেঙে যায়।"

—"আমি উঠি সাড়ে-পাঁচটায়। ঘুমটা কিছুতেই কমাতে পারছি না। তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি এরও কোনো ওষুধ থাকে, দিও। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। সকাল ছ'টা নাগাদ আবার দেখা হবে।"

রিদুবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই নায়েবমশাই হাজির হলেন এসে।

—"রাত্রে কি খাবেন, ডাক্তারবাবু ?"

—"যা আছে, তাই খাবো।"

—"সব রকমই আছে। যা হুকুম করবেন, তাই এনে দেবো।"

—"সব রকম মানে ?"

—"কয়েক রকম ভালো চালের ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সব রকম ডাল, রুটি, লুচি, পরোটা, ডালপুরী, রাধা-বল্লভী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, চার-পাঁচ রকমের মাংস, চার-পাঁচ রকম মাছ, তরি-তরকারি সব রকম, এ ছাড়া দই, ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টান্ন, মোরব্বা, চাটনি, এসব তো আছেই—"

—"বলেন কি! সব আমার জন্যে করিয়েছেন ?"

—"এসব রান্না রোজ হয়।"

—"এত রকম ?"

—"হ্যাঁ, মায় সাবু, বার্লি, হর্লিক্‌স, ওভালটিন পর্যন্ত।"

—"রিদুবাবু খুব খাইয়ে লোক বুঝি ?"

—"মোটেই না। নিজে খুব সামান্যই খান। কিন্তু কি খাবেন তা আগে থাকতে বলবেন না কিছুতেই। তাই সব রকম তৈরি রাখতে হয়। কোনও জিনিসটা চেয়ে না পেলে কুরুক্ষেত্র করেন।"

—"বলেন কি ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই রান্নার ব্যাপারের জন্যেই জন কুড়ি রাঁধুনি, আর গোটা-পঞ্চাশেক চাকর রাখতে হয়েছে।"

"এরকম করবার মানে কি ?"

—"খেয়াল! সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনি কি খাবেন বলুন।"

—"খানকয়েক লুচি, আর যা হোক দু'একটা তরিতরকারি পাঠিয়ে দেবেন।"

—"মাছ মাংস দুই-ই দেবো তো ?"

—"দেবেন।"

—"মিষ্টান্ন ?"

—"আপনার যা খুশি দেবেন মশাই, যা পারবো খাবো।"

—"বেশ। চা খাবেন ক'টায় ? হুজুর বলে দিলেন, আপনি তিনটের সময় ওঠেন, আপনাকে ঠিক সময়ে যেন চা দেওয়া হয়! সাড়ে-তিনটেয় দেবো।"

—"কি দরকার অত কষ্ট করে।"

—"কষ্ট আবার কি! দুটো ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেই হবে। একটা ঘড়ি যজ্ঞেশ্বর গোয়ালার কাছে থাকবে, আর একটা থাকবে হীরু খানসামার কাছে।"

—"গোয়ালার কাছে কেন ?"

—"সে আড়াইটের সময় উঠে দুধ দুয়ে আনবে। টাটকা দুধ না হ'লে কি চা ভালো হয়? লিপটনের দার্জিলিং চা আছে, অন্য চা-ও আছে, কোনটা—"

—"কেন অত হাঙ্গামা করছেন। যা আপনার সুবিধে হবে, তাই দেবেন।"

—"অত হাঙ্গামা না করলে আমার চাকরি থাকবে না। হুজুর যদি শোনেন যে আপনি উঠেই চা পাননি, তাহ'লে ভীষণ কাণ্ড হবে। সাড়ে-তিনটেয় চা পাঠিয়ে দেবো তাহ'লে।"

—"বেশ, তাই দেবেন।"

—"পাশের ঘরটাই স্নানের।"

—"ভালোই হয়েছে। ভোরে উঠেই আমার স্নান করা অভ্যেস।"

—"ও, তাহ'লে তো সে ব্যবস্থাও ক'রে রাখতে হয়—।"

নায়েবমশাই ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "পাশের ঘরে স্নানের এবং মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা রইলো।"

—"আচ্ছা।"

বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক ভোর তিনটেতেই ঘুম ভাঙলো আমার। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটি চাকর বসে আছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করলো, তারপর বললো, "এখনই স্নান করবেন কি? গরম জল তৈরি আছে, আনবো?"

—"নিয়ে এসো।"

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও এলাহি কাণ্ড। দাঁত মাজবার জন্যে কয়েকরকম দেশী-বিলাতী মাজন, টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশ, এমন কি, দাঁতন পর্যন্ত মজুত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানারকম তেল, সাবান, তোয়ালে, গামছা, এমন কি, স্নো, পাউডার, আতর-এসেন্স পর্যন্ত।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, হীরু খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেলাম ক'রে বললে, "চা তৈরি হুজুর।"

হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক সাড়ে-তিনটে বেজেছে।

ঠিক ছ'টার সময় রিদুবাবু এলেন।

তাঁর পিঠের ফুসকুড়িটা আর একবার দেখলাম ভালো ক'রে। সত্যিই বিশেষ কিছু নয়। আমার ব্যাগেই একটা মলম ছিল, লাগিয়ে দিলাম সেটা।

রিদুবাবু বললেন, "মাছ ধরতে ভালোবাসো তুমি?"

—"কখনও ধরিনি।"

—"মাছ ধরা দেখবে?"

—"তা দেখতে পারি।"

—"তাহ'লে বেড়াজালের ব্যবস্থা করতে হয়।"

রিদুবাবু তাঁর জলকরের নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসতেই বললেন, "জেলেদের খবর দাও। সাগরবিলে জাল ফেলুক তারা, বিকাশকে নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

সাগরবিল থেকে দশমণ মাছ উঠলো। বড় বড় রুই-কাৎলা। জল থেকে লাফিয়ে-

লাফিয়ে উঠছিল তারা। এত বড় বড় জীবন্ত মাছ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। দেখবার মত দৃশ্য বটে! আমি শহুরে-লোক, কোলকাতার গলিতে বাস করি, দৈনিক একপোয়া মাছ কেনা হয় আমাদের বাড়িতে, একটা কথা বারবার মনে হতে লাগলো আমার—দশমণ মাছ ধরবার কি দরকার ছিল। এ কি অপচয়! বাড়িতে একটিমাত্র মাছ গেল, বাকী সব মাছ বিলিয়ে দেওয়া হলো!

গৌরবগঞ্জে পাঁচ দিন ছিলাম। এই পাঁচ দিনের প্রতি মুহূর্তে একটি কথাই আমার কেবল মনে হয়েছে—ভদ্রলোক বড় বেশী অপব্যয় করেন। নায়েবমশাইয়ের মুখে শুনলাম, হুজুরের একজোড়া কাপড়ের দরকার হলে বিশজোড়া কাপড় আনাতে হয়। পাঞ্জাবি, কামিজ, গেঞ্জি, সমস্তই ডজন-ডজন করানো চাই, নানারকম ছিটের। এ-বছরের শাল ও-বছরের গায়ে দেন না। নিজে যে খুব বেশী ব্যবহার করেন তা নয়, কিন্তু কেনা চাই সব রকম। ওই ওঁর শখ। একটিমাত্র ছেলে, বিলেতে লেখাপড়া করে। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন আগে।

শেষকালে নায়েবমশাই হেসে বললেন, "বড়লোকের একটা নেশা তো চাই। ওই ওঁর নেশা। অপব্যয়ের নেশায় মশগুল হয়ে থাকেন।"

আমি যেদিন চলে আসি, সেদিন রিদুবাবুকে বলেছিলাম, "যদি রাগ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।"

—"কি বলো।"

—"এত অপচয় কেন করেন আপনি।"

—"অপচয়! অপচয় কোথায় দেখলে তুমি?"

—"রোজ এত রকম খাবার করবার দরকার কি? খান তো সামান্য একটু।"

—"বাকীটা আর পাঁচজনে খায়।"

—"ওদের খাওয়াবার জন্যে অন্নসত্র খুললেই হয়।"

—"সেখানে কি এমন খাবার তৈরি হবে? আমার জন্যে তৈরি হয় বলেই যত্ন ক'রে তৈরি করে সবাই।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো রিদুবাবুর চোখ দুটো।

বললেন, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি এটা জানো যে, পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না? তুমি হিন্দুর ছেলে, একথাটা শোনোনি যে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে! আমি হিন্দু। গৃহস্থ পাঁচজনকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করাই যে আমার কর্তব্য।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে রিদুবাবু হেসে বললেন, "দেখ, বলিষ্ঠ প্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে। ওই বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখ, সহস্র-সহস্র পাতা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটি কোটি বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, শত শত পাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে। এসব না করলেও ওর চলতো, কিন্তু তাহ'লে ও বটগাছ হতো না—"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

কোলকাতায় ফিরে আসবার দিন-সাতেক পরে রিদুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম একটা। চিঠিখানা এখনও আছে আমার কাছে। লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ। যদিও তুমি আমার ছেলের মতো, তবু তুমি ডাক্তার, তোমাকে 'ফি' না দিলে অন্যায় হইবে। তাই সামান্য কিছু পাঠাইলাম। দ্বিধা করিও না, ইহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। তোমার বাবাকে আমার ভালোবাসা দিবে, তুমি আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভার্থী
শ্রীহৃদয়েশ্বর মুখোপাধ্যায়

চিঠির সঙ্গে একটি পাঁচ হাজার টাকার 'চেক' ছিল।

রিদুবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় কুড়ি বছর পরে কাশীতে। তখন শীতকাল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, চাতালের একধারে একটি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ বসে আছেন একজন। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই। মুখটা চেনা-চেনা ঠেকলো, ক্ষীণভাবে মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি। একটু এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, "কে, বিকাশ নাকি!"

হঠাৎ রিদুবাবুকে চিনতে পারলাম। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম!

—"একি, আপনি এমনভাবে এখানে!"

—"আজকাল এখানেই থাকি।"

—"এখানেই? কেন?"

—"জীবনের শেষ আশ্রম যে, সন্ন্যাস।"

অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

—"কোথায় বাসা আপনার?"

—"বাসা নেই। এই মন্দিরে পড়ে থাকি, ভিক্ষা ক'রে খাই।"

যে-গল্পটি তোমাদের আজ বলতে যাচ্ছি, সেটি আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। ঠিক শুনিনি—দেখেছিলাম। চোখের সামনে ঘটনাগুলো পর-পর যেন ঘটে গেল।

···জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। পাহাড়ের উপত্যকাটি সাদা কাশফুলে ভরতি। মৃদু হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে সেই ফুলের সমুদ্রে। কুলকুল ক'রে একটি ঝরনা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ধাপে-ধাপে সুর চড়িয়ে একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকছে কোথায় যেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসছে। চাঁদের একটু দূরে একটা ছোট কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধীরে-ধীরে, তার কালো রং-এ লেগেছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। কালোই অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ কাশফুলের সাদা সমুদ্রেও ছোট একটি কালো মেঘ দেখা গেল। মনে হ'ল, আকাশের মেঘেরই ছোট্ট একটা টুকরো যেন নেমে এসেছে কাশের বনে। তারও চারপাশ ঘিরে জ্বলছে রুপোর জরি। আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল চাঁদের দিকে। হঠাৎ সে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন কাশের বনে যে ছোট্ট মেঘটি দেখা যাচ্ছিল, সে কথা কয়ে উঠল।

"আকাশের কালো মেঘ, চাঁদকে অমন ক'রে আড়াল কোরো না। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

আকাশের কালো মেঘ বলল, "কে তুমি?"

"আমি মানিনী রাজকন্যার সখী—মঞ্জরী। মেহেদিনগরে চলেছি—"

তখন বুঝতে পারলাম, কাশের বনে ছোট্ট মেঘের মতো যেটা দেখাচ্ছিল, সেটা মেঘ নয়—মঞ্জরীর খোঁপা।

আকাশের মেঘ জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মেহেদিনগরে কেন? সেখানকার লোকগুলো তো সুবিধে নয়!"

"জানি, তবু আমাকে যেতেই হবে। মানিনী রাজকন্যার শখ হয়েছে, তাঁর হাতের চম্পক-অঙ্গুলিতে মেহেদির রং লাগাবেন। তুমি চাঁদের সামনে থেকে সর, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

মেঘ চাঁদের সামনে থেকে সরে গেল।

মঞ্জরী চলল কাশের বন ভেদ ক'রে। কাশের বন পার হয়ে এল পম্পা সরোবরে, অসংখ্য কুমুদ ফুল ফুটেছিল সেখানে। তারা সকলে ডাকাডাকি করতে লাগল মঞ্জরীকে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী?"

"মেহেদিনগরে।"

"আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।"

"সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া কি চলে এখন? আমি লুকিয়ে যাচ্ছি, চুপিসাড়ে মেহেদিবনে ঢুকে চারটি মেহেদি পাতা নিয়ে আসব মানিনীর জন্যে। দলবল নিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে!"

"তাহলে আমাকে খালি নিয়ে চল, আমি চুপটি ক'রে থাকব। নিয়ে চল আমাকে, মঞ্জরী—"

তীরের কাছটিতে যে কুমুদ-কলিটি ছিল, সে একেবারে নাছোড়বান্দা। মঞ্জরী হেঁট হ'য়ে শেষে তুলে নিল তাকে।

সে বলল, "মাথায় পর আমাকে।"

"ইস্! ভারি আবদার দেখছি যে, মাথায় চড়ে যাবেন!"

মঞ্জরী বলল বটে, কিন্তু খোঁপায় গুঁজে নিল তাকে। কুমুদ-কলি ভারি খুশি, দুলতে দুলতে চলল।

পম্পা সরোবরের পর প্রকাণ্ড মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা। রাত্রে কিন্তু সবুজকে দেখাচ্ছিল কালো, মনে হচ্ছিল কালো মখমল যেন। তার উপর ফুটেছিল অসংখ্য ছোট-ছোট সাদা ফুল। মনে হচ্ছিল, আকাশের তারারা লুকিয়ে যেন নেমে এসেছে তেপান্তরের মাঠে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী?"

"মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে।"

"এত রাত্রে একা সেখানে যেও না। জায়গা ভাল নয়।"

"একা যাচ্ছে না, আমি সঙ্গে আছি"—কুমুদ-কলি বলল খোঁপা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

মঞ্জরী চলল। মাথার উপর পেঁচা ডাকল, বাদুড়ের সারি উড়ে গেল। টিটিভ

বলে গেল—কি-যে করিস, কি-যে করিস, কি-যে করিস। মঞ্জরীর ভয় নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে চলল সে। চলতে-চলতে চলতে-চলতে মেহেদিনগরের মেহেদির আভাস দেখতে পাওয়া গেল অবশেষে। মনে হ'ল দূরে আকাশের গায়ে লালচে রঙের একটা কুয়াশা জমে আছে।

কুমুদ-কলি জিজ্ঞেস করল, "ভোর হয়ে আসছে নাকি, আকাশের গায়ে ওটা কি উষার আলো?"

"না, ওটা মেহেদিকুঞ্জের আভা। দিনের বেলা দেখা যায় না, গভীর পূর্ণিমা রাতে চুপি-চুপি ওই আভা মেহেদিকুঞ্জ থেকে ফুটে বেরোয়। আমি কিন্তু আর চলতে পারছি না। এখনও অনেক দূর। একটু বিশ্রাম ক'রে নিই এইখানে—"

"সেই বেশ। ব'স একটু—"

ঘাসের ফুলরা সাদরে অভ্যর্থনা করল তাকে।

"একটু শুই?"

"শোও না।"

ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী। ঘাসের ফুলেরা গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগল:

আকাশ থেকে আসছে নেমে
জ্যোৎস্না-মাখা ঘুমের ঢেউ,
মঞ্জরিণীর ঘুম পেয়েছে
গোল কোরো না তোমরা কেউ।

খানিকক্ষণ পরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মঞ্জরী। ওমা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে, রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এল! রাত্রের মধ্যে মেহেদিনগরে পেঁছিতে না পারলে মেহেদিপাতা আনাই যাবে না যে, সবাই জেগে উঠবে।

ঘাসের ফুলেদের দিকে চেয়ে মঞ্জরী বলল, "ছি, ছি, তোমাদের পাল্লায় পড়ে কত দেরি হয়ে গেল আমার! মেহেদিনগরে আজ বোধহয় পেঁছিতেই পারব না—"

"ঠিক পারবে, আমি তোমাকে পিঠে ক'রে পেঁছে দেব—"

মঞ্জরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকাণ্ড এক সারস পাখি লম্বা-লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এত বড় আর এমন ধপধপে সাদা সারস পাখি মঞ্জরী আর কখনও দেখেনি।

"তুমি কে?"

"আমি মহাসারস। পথ চলতে-চলতে কোন ছোট মেয়ে যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, আমি তাকে পিঠে ক'রে বয়ে নিয়ে যাই। এস—"

মঞ্জরী চড়ে বসল তার পিঠে। দেখতে দেখতে মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে এসে হাজির হল তারা।

মহাসারস বলল, "আমি মেহেদিনগরে ঢুকব না। ওরা অভদ্র লোক। তুমি কাজ সেরে চট ক'রে চলে এস। আমি এই মাঠে ততক্ষণ একটু চ'রে নি…"

মঞ্জরী মেহেদিকুঞ্জে ঢুকে পড়ল।

"কে?"

ভাঙা চেরা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল কে যেন! মঞ্জরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কে, কে তুমি?"

লম্বা ক্ষীণকান্তি একটা লোক বেরিয়ে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে। গালের হাড় উঁচু, লম্বা নাক, চোখ দ‌ুটো যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে।

"কে তুমি ?"

ভাঙা চেরা গলায় আবার সে জিজ্ঞেস করল।

"আমি মানিনী রাজকন্যার সখী মঞ্জরী।"

"কি চাও ?"

"চারটি মেহেদিপাতা নিতে এসেছি।"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"পাতা না নিয়ে আমি যাব না।"

"বেরোও বলছি—" এগিয়ে এসে লোকটা মঞ্জরীর কান ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে তাকে বার করে দিল মেহেদিকুঞ্জ থেকে।

মঞ্জরী বলল, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়—মেয়েছেলের গায়ে হাত দাও।"

"যা, যা, তোর মতন মেয়েমান‌ুষের ম‌ুখ যে জ‌ুতিয়ে ছিঁড়ে দিইনি, এই যথেষ্ট"—বলেই লোকটা আবার অন্ধকারে অদ‌ৃশ্য হয়ে গেল।

কুম‌ুদ-কলি বলল, "এরা ভারী ছোটলোক তো। চল, এখানে থাকা আর ঠিক নয়।"

মঞ্জরী বলল, "দেখো, এর কি রকম প্রতিশোধ আমি নিই।"

মহাসারসের পিঠে চড়ে মঞ্জরী নিজের দেশে ফিরে এল।

…সাতদিন সাতরাত্রি মানিনীর ম‌ুখে অন্ন, চোখে নিদ্রা নেই। রাজকন্যা পণ করেছেন, মেহেদিনগরের ওই অসভ্য লোকটার যতক্ষণ না শাস্তি হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না, বিছানায় শোবেন না, গালে হাত দিয়ে গোসা-ঘরে বসে থাকবেন কেবল।

রাজা মহাবিপদে পড়লেন। মঞ্জরীর ডাক পড়ল রাজসভায়।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "মঞ্জরী, যে-লোকটি তোমায় অপমান করেছিল, তার চেহারা কেমন ?"

মঞ্জরী চেহারার হ‌ুবহ‌ু বর্ণনা দিল। রাজসভার লেখক সঙ্গে-সঙ্গে টুকে নিল সেটা।

মন্ত্রীমশায় বললেন, "তোমাকে যে অপমান করেছিল, তার প্রমাণ কি ?"

"আমি বলছি, এই প্রমাণ।"

মন্ত্রী বললেন, "ও প্রমাণ যথেষ্ট নয়, কেবল তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। সাক্ষী চাই। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?"

"কেউ ছিল না। ও হ্যাঁ, ছিল, দাঁড়ান দেখি, সে বেঁচে আছে কিনা।" একছ‌ুটে বেরিয়ে গেল মঞ্জরী এবং একটা স্ফটিকের ফ‌ুলদানি হাতে ক'রে ফিরে এল। ফ‌ুলদানিতে ছিল সেই কুম‌ুদ-কলি। বেচারী নেতিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বেঁচে ছিল তখনও।

মঞ্জরী বলল, "এও আমার সঙ্গে ছিল। কুম‌ুদ-কলি, তুমি মন্ত্রীমশায়কে বল, কি কি শ‌ুনেছ আর কি-কি দেখেছ।"

কুম‌ুদ-কলি অনেকবার থেমে-থেমে ক্ষীণকণ্ঠে সমস্ত কথা খ‌ুঁটিয়ে বলল।

মন্ত্রীমশায় তব‌ু মাথা নাড়তে লাগলেন।

শেষে বললেন, "একটা শ‌ুকনো ফ‌ুলের কথায়—"

মন্ত্রীমশায়ের কথা শেষ হল না। শোঁ-শোঁ ক'রে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠল একটা, তারপর ঝটপট ঝটপট পাখার শব্দ হ'ল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, রাজসভার জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে মহাসারসের প্রকাণ্ড লম্বা গলাটা ঢুকছে। গলাটা লম্বা হতে-হতে এগিয়ে এল মন্ত্রীমশায়ের কানের কাছ পর্যন্ত। মন্ত্রীমশায় একলাফে উঠে পড়লেন তাঁর আসন থেকে। সভায় সকলেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল, এমন কি রাজা পর্যন্ত সিংহাসনে বসে থাকতে পারলেন না।

বজ্র-নির্ঘোষে মহাসারস বলল, "মঞ্জরী যা বলছে, কুমুদ কলি যা বলেছে, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। আমার কথাতেও যদি মন্ত্রীমশায়ের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি হাজার হাজার ফুল আর ঝিঁঝি পোকাদের এনে হাজির করব। তারাও সব দেখেছে এবং শুনেছে।"

রাজা বললেন, "আর সাক্ষীতে দরকার নেই, আমাদের বিশ্বাস হয়েছে।"

মন্ত্রীও বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে—হয়েছে—ঢের হয়েছে।"

মহাসারস গলা টেনে নিল, আবার পাখার ঝটপটানি এবং শোঁ-শোঁ শোনা গেল। মহাসারস উড়ে গেল আকাশে।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "মন্ত্রীমশায়, মেহেদিনগরে রাজদূতের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে খবর দিন যে, তাঁরা ওই লোকটিকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি না থাকেন, আমরা স্বয়ং তাকে শাস্তি দেব।"

মঞ্জরী রাজকন্যার কাছে এই খবর নিয়ে যেতে তিনি আঙুরের শরবত এক ঢোঁক খেলেন। তারপর বললেন, "যতক্ষণ ও লোকটার সমুচিত শাস্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্নগ্রহণ করব না।"

পরদিন রাজদূত জবাব নিয়ে এল—মেহেদিনগরের রাজা উক্ত অশিষ্ট লোককে শাস্তি দিতে প্রস্তুত নন।

রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "এই সামান্য কারণে যুদ্ধ-ঘোষণা করাটা কি সমীচীন হবে?"

"কারণ মোটেই সামান্য নয়। মানিনীর মান রাখতে আমি সমস্ত রাজত্ব বিসর্জন দিতে পারি। অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

এর পর কথা চলে না।

...তিন দিন ধ'রে ঘোর যুদ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধে মেহেদিনগরের দলই জিতল। রাজা এটা প্রত্যাশা করেন নি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি।

মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ, আপনি আপনার গুরুদেব শিবসুন্দরের কাছে যান। এমনি যুদ্ধ ক'রে ওদের কাবু করা যাবে না।"

...রাজা কুলগুরু শিবসুন্দরের কাছে গেলেন। তপস্বী শিবসুন্দরকে দেখলেই মনে হয়, যেন তিনি মূর্তিমান বিপত্তারণ। সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "তোমার সৈন্যরা যে যুদ্ধে জিততে পারবে না, তা আমি জানতাম। চরিত্রবল না থাকলে কেউ যুদ্ধে জিততে পারে না। তোমার প্রত্যেকটি সৈন্য মিথ্যাবাদী, প্রত্যেকটি সৈন্য ঘুষখোর, এক কথায় প্রত্যেকটি সৈন্য অমানুষ, ওদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়।"

রাজা বললেন, "তাহলে উপায়?"

"উপায় একটা আছে। আমার কাছে ভাল একখানি তরবারি আছে, কোনও

সত্য বীর যদি সেখানি হাতে ক'রে যুদ্ধে যায়, তাকে কেউ হারাতে পারবে না, কেউ মারতে পারবে না। সে-ই একা যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসতে পারবে। তোমার রাজ্যে যদি সত্য বীর কেউ থাকে, তাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

"অধিকাংশ বীরই তো যুদ্ধে মারা গেছে।"

"তারা বীর ছিল না—তাই মারা গেছে, আপদ গেছে। যারা আছে, তাদের মধ্যেই বেছে পাঠাও কাউকে।"

"আচ্ছা।"

রাজা চলে গেলেন।

তারপর শিবসুন্দরের আশ্রমে একে একে আসতে লাগলেন বীরেরা। ইয়া ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি, ইয়া বুকের ছাতি—কিন্তু হায়! সবাইকে ফিরে যেতে হল একে একে। শিবসুন্দরের তরবারিকে কেউ তুলতে পর্যন্ত পারল না! বড় বড় সেনাপতি, বড় বড় সর্দার, মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গেলেন সবাই। খবর রটে গেল, শিবসুন্দরের তলোয়ার তুলতে পারে, এমন লোক রাজার রাজ্যে নেই।

মঞ্জরী তখন ছুটে চলে তার কিশোর বন্ধু অনিরুদ্ধের কাছে।

"তুম যাও শিবসুন্দরের কাছে!"

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে বলল, "অত বড় বড় বীরেরা যেখানে পালিয়ে এল, সেখানে আমি—"

"আর তো কেউ নেই, তুমিই যাও।"

মঞ্জরীর অনুরোধ উপেক্ষা করা অনিরুদ্ধের পক্ষে শক্ত। গেল সে শিবসুন্দরের আশ্রমে।

শিবসুন্দর তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি মিছে কথা বলেছ কখনও?"

"না।"

"চুরি করেছ?"

"না।"

"তাহলে তুমি পারবে।"

যা বড় বড় বীরেরা পারেনি, কিশোর অনিরুদ্ধ তাই পারল। তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এল সে!

তারপর আর দেরি হ'ল না। তপস্বী শিবসুন্দরের কথাই বর্ণে বর্ণে ফলে গেল।

তার পরদিনই অনিরুদ্ধ সেই অসভ্য লোকটার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করল রাজসভায়।

"মহারাজ, এইবার এর বিচার করুন।"

রাজা বললেন, "এর বিচার করবে মঞ্জরী।"

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, মঞ্জরী গিয়ে বসল সেখানে।

মঞ্জরী বলল, "কান মল, নাক মল।"

লোকটা তাই করল।

তারপর মঞ্জরী বলল, "রাজকুমারী মানিনী, তাঁর সমস্ত সখীরা এবং আমাদের রাজ্যের কিশোরী মেয়েরা হাতে আর পায়ে মেহেদি রং লাগাবে। তার জন্যে যত

মেহেদিপাতা লাগবে, তা তোমাকে এনে দিতে হবে, আর নিজের হাতে বেটে দিতে হবে।"

লোকটাকে রাজী হ'তে হ'ল।

মায়া-কানন

তাম্রপ‍ুরীর রাজপ‍ুত্রের মনে স‍ুখ নেই। তাঁর কেবলই মনে হয়—কি হবে রাজ্য-ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি মায়ের দ‍ুঃখই না ঘোচাতে পারলাম। মায়ের চোখে ঘ‍ুম নেই, ম‍ুখে অন্ন নেই, তিনি দিবারাত্রি কেবল কাঁদেন। রাজপ‍ুত্র ছেলেবেলা থেকেই এই দ‍ৃশ্য দেখছেন, মায়ের হাসিম‍ুখ মনে পড়ে না তাঁর। বাবার চেহারা মনেই নেই। রাজপ‍ুত্র যখন শিশ‍ু, তখনই তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। তাঁর সৈন্য-সান্ত্রী, অন‍ুচর-পরিচর, সামন্ত-সেনাপতি, হাতী-ঘোড়া, রথ-রথী কেউ ফেরেনি। তারপর থেকেই রাজ্যে অন্ধকার নেমেছে। অনেকদিন প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে রানী-মা শেষে শয্যা নিয়েছেন।

রাজপ‍ুত্র যতদিন ছোট ছিলেন, মন্ত্রীমশায় রাজ্য চালাতেন। রাজপ‍ুত্র বড় হ'তেই তিনি রাজ্যভার তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "রাজপ‍ুত্র, আমি ব‍ৃদ্ধ হয়েছি, তোমার রাজ্য এবার তুমি ব‍ুঝে নাও, আমি বানপ্রস্থে যেতে চাই।"

রাজপ‍ুত্র বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আমার বাবা কোথায় ?"

"তা'তো জানি না। তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন আর ফেরেন নি, মনে হয় আর ফিরবেন না, তুমিই সিংহাসনে বসে প্রজাপালন কর।"

"—কোন্ দিকে গিয়েছিলেন তিনি, জানেন ?"

"তিনি রজতপ‍ুরী জয় করতে গিয়েছিলেন।"

"কোন্ দিকে সে রজতপ‍ুরী ?"

"তা জানি না।"

"বাবা যখন ফিরলেন না তখন তাঁকে খোঁজবার জন্য লোক পাঠান নি ?"

"পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। কারণ মহারাজ চ'লে যাবার ঠিক পরেই ভীষণ বর্ষা নামে। বহ‍ুদিন অবিশ্রান্ত ব‍ৃষ্টিপাতের পর যখন বর্ষা থামল, তখন দেখা গেল আমাদের রাজ্যের চারিপাশে সম‍ুদ্র হ'য়ে গেছে। সে সম‍ুদ্র এখন তাম্রপ‍ুরীকে ঘিরে আছে, আগে তা ছিল না।"

"তাই না কি !"

"হ্যাঁ। মহারাজের জন্য কিছ‍ুকাল অপেক্ষা ক'রে আমরা আমাদের ময়‍ূরপঙ্খী নৌকোগ‍ুলি সব একে একে পাঠালাম তাঁকে খোঁজবার জন্য, কিন্তু একটিও ফিরল না।"

মন্ত্রীমশায় চুপ ক'রে রইলেন।

রাজপ‍ুত্র বললেন, "কি উপায় হবে তাহলে মন্ত্রীমশায় ? বাবাকে খোঁজবার কোনও চেষ্টাই কি তাহলে আমরা করব না ?"

"কি ক'রে যে করবে, তা তো ব‍ুঝতে পারছি না। আমি এতকাল ওই কথাই

ভেবেছি কেবল। কিছুই ঠিক করতে পারিনি। ভেবে ভেবে মাথার চুল পেকে গেল, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, এখন তো কোনও বুদ্ধিই আমার মাথায় আর খেলে না। আমাদের রাজ্যে আর নৌকো নেই, নৌকো তৈরি করবার লোকও নেই। সকলেই মহারাজের দিগ্বিজয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ ফেরেনি। অথচ নৌকো না হ'লে ওই দুস্তর সাগর পার হওয়ার তো কোন উপায় দেখি না—"

আবার চুপ করলেন মন্ত্রীমশায়।

তারপর বললেন, "আমাকে এবার বিদায় দাও রাজকুমার। আমি অসমর্থ হয়েছি, তোমার রাজ্যের ভার তুমি নাও। আমি বানপ্রস্থে গিয়ে বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাতে যদি কোনও ফল হয়—"

মন্ত্রীমশায় চলে গেলেন।

পরদিন তাম্রপুরীর রাজকুমার তামার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাম্রপুরীর ঘরবাড়ি, পথঘাট, আসবাবপত্র সবই তামার।

রাজপুত্র সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিলেন। সূর্যোদয় হচ্ছিল। উদীয়মান সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত তাম্রপুরী জ্বলজ্বল করছিল। মনে হচ্ছিল তাম্রপুরীর অন্তরের আক্ষেপ বুঝি মূর্ত হয়েছে রৌদ্রালোকিত তাম্রবর্ণের রক্তিম আভায়। রাজপুত্রের মনে পড়ল মায়ের চোখ দুটো। কেঁদে কেঁদে ঠিক এই রকমই লাল হয়েছে তারা।

রাজপুত্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমুদ্র দিগন্তবিস্তৃত।

"বন্ধু—"

রাজপুত্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন শ্রীধর দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজবাগানের মালী ভূধরের ছেলে শ্রীধর। ভূধরও মহারাজের সঙ্গে দিগ্বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিল। সে-ও ফেরেনি। শ্রীধর রাজপুত্রের দুঃখ বুঝত, তাই দু'জনে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব।

রাজপুত্র বললেন, "কি বলছ বন্ধু ?"

"একটা কথা মনে আছে তোমার? তুমি বলেছিলে, তুমি যখন রাজা হবে তখন আবার বাগান তৈরি করবে। এইবার তো রাজা হয়েছ, এস এইবার দু'জনে মিলে বাগান তৈরি করি। বাগানের কি দুর্দশা হয়েছে। সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, একটি ফুল ফোটে না—"

রাজপুত্র নীরবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজপুত্রের চোখের দিকে চেয়ে শ্রীধর বললে, "বন্ধু, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি, কারণ তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ সমান। কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল এমন ভাবে দিনের পর দিন চুপচাপ ব'সে ব'সে দুঃখ ক'রে লাভ কি। তার চেয়ে কিছু কাজ করা ভাল। তাতে দুঃখ খানিকটা কমবে বোধ হয়। তুমিও বাগান ভালবাস, আমিও বাগান ভালবাসি, এস দু'জনে মিলে ভাল বাগান করি একটা।..."

ম্লান হেসে রাজপুত্র বললেন, "বেশ, তাই হোক।"

কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে রাজপুত্রের বাগান তৈরি হ'য়ে উঠল। সে বাগানে কত রকম যে ফুল ফুটল, কত রকম যে ফল ধরল তার আর ইয়ত্তা নেই। সাগরপার

থেকে নানারকম পাখি উড়ে উড়ে এসে বসতে লাগল গাছের ডালে ডালে। রাজপুত্র খুশি হলেন। মাকে গিয়ে একদিন বললেন, "মা, শুনেছি বাবা দোলন-চাঁপা ভালবাসতেন, তাই অনেক দোলন-চাঁপা লাগিয়েছি বাগানে। দোলন চাঁপার বন হয়ে গেছে। আমি নিজে জল দিই তাতে। মনে হয় যেন বাবারই সেবা করছি।"

পরদিন রানী-মা নিজে এসে হাজির হলেন বাগানে। হাতে তাঁর তামার ঝারি, ঝারিতে ঝর্নার জল। সেই জল তিনি দোলন-চাঁপার গোড়ায় ঢালতে লাগলেন।

একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রত্যহ।

দোলন-চাঁপার পাতায় পাতায় জাগল উৎসব। গাঁটে গাঁটে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল অজস্র।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

কাটল কিছুদিন।

তারপর একদিন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা।

রাজপুত্র একা একা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দোলন-চাঁপা বনে প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে একটা। মস্ত বড়! অত বড় প্রজাপতি রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নি! কি চমৎকার তার রং! সন্ধ্যার মেঘের মতো লাল ডানা দুটি, আর তাতে সোনালি রঙের অসংখ্য ফুট্‌কি। ঠিক যেন লাল মখমলে সোনার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে কেউ।

রাজপুত্র বলে উঠলেন, "বাঃ, এমন সুন্দর প্রজাপতি তো আর কখনও দেখিনি!"

রাজপুত্রের কথা শেষ হতে না হতে প্রজাপতি ঘুরে দাঁড়াল। রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রজাপতির মানুষের মতো মুখ রয়েছে। ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ, মাথাটি কালো কোঁকড়া চুলে ভরা, চোখ দুটি হাসছে!

মেয়েটি হেসে বললে, "আমি প্রজাপতি নই, আমি রাঙা পরী। তোমাদের দোলন-চাঁপা বনে আমার সই থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

রাজপুত্র বললেন, "কই, দোলন-চাঁপা বনে আর কাউকে তো দেখিনি কোনদিন।"

রাঙা পরী হেসে বললে, "আমার সই বড় লাজুক, মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।"

তারপর একটি আধফুটন্ত দোলন-চাঁপার দিকে চেয়ে সে বললে, "ওলো সই বেরিয়ে আয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাপ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে আধফুটন্ত দোলন-চাঁপাটি আর একটি পরীতে রূপান্তরিত হল। এরও চোখ মুখ ঠিক রাঙা পরীর মতো, কেবল ডানা দুটি ধপধপে সাদা। ঠিক যেন দু টুকরো শরতের মেঘ কেটে কেউ বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠের উপর।

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

বললেন, "তুমি এখনই ফুল ছিলে, মানুষ হয়ে গেলে কি করে।"

"আমরা যখন যা খুশী হতে পারি।"

"কি করে?"

"মন্তরের জোরে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে সে মন্তর?"

"দিতে পারি। সরে এস তাহলে এদিকে, এ মন্তর জোরে বলতে নেই, কানে কানে বলতে হয়।"

রাজপুত্র সরে গেলেন। তাঁর কানের কাছে মুখ এনে রাঙা পরী মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলে তাকে।

"এ মন্তর কখ্খনো জোরে বোলো না। যখনি দরকার হবে মনে মনে বলবে।"

"আমি পাখি হতে পারব ?"

"নিশ্চয়। মন্তরটি বলে মনে মনে ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে করবে তাই হয়ে যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখ না।"

রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি পাখি হ'য়ে গেলেন। মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে লাগলেন চারিদিকে, প্রতিটি গাছের ডালে গিয়ে বসলেন। সমুদ্রের দিকে উড়ে গেলেন একবার, ইচ্ছে হ'ল উড়ে সমুদ্রটা পার হয়ে যান, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডানা দুটি। ভয় হতে লাগল যদি পড়ে যান সমুদ্রে। ফিরে এলেন। আবার মানুষ হ'য়ে যখন দোলন-চাঁপা বনে গেলেন তখন পরীরা চলে গেছে। প্রত্যেক দোলন-চাঁপাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী ? কথা কও না।"

দোলন-চাঁপারা নিরুত্তর হয়ে রইল।

দিন কাটে।

পরীর কথা রাজপুত্র কাউকে বলেন নি, এমন কি শ্রীধরকেও না। তাঁর ভয় হ'ত কাউকে বললে যদি মন্ত্রের শক্তি চলে যায়। আর কাউকে বলা চলবে কি না তা পরীদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ভাবেন, এবার পরীদের দেখা পেলে কথাটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু পরীরা আর আসে না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি প্রত্যেক দোলনচাঁপার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী ? এস না গল্প করি একটু।" ফুল কিন্তু ফুলই থাকে, পরী হয় না। যখন কেউ থাকে না, রাজপুত্র পাখি হ'য়ে পাখিদের সঙ্গে গল্প করেন। কত দূর-দূরান্তের পাখি যে আসে! যে সমুদ্র তাম্রপুরীকে ঘিরে রেখেছে সেই সমুদ্রের ওপার থেকে আসে খঞ্জনের দল। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে রাজপুত্রের। তারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার চলে যায়।

হঠাৎ নূতন ধরনের একটা পাখি এল একদিন। গায়ের রং তামাটে, বাঁকানো ঠোঁট, মাথার ঝুঁটি সাদায় কালোয়, চোখের দৃষ্টি প্রখর। অনেকটা চিলের মতো হাবভাব, কিন্তু চিল নয়। চিলের চেয়ে বড় দেখতে। উঁচু তালগাছের মগডালে এসে বসল সে, তারপর আকাশের দিকে মুখ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল। রাজপুত্রের মনে হ'ল ঠিক যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা—!"

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কি বলছে ও ?

রাজপুত্র মনে মনে পরীর মন্ত্র স্মরণ করে ইচ্ছা করলেন যেন তিনি ঠিক ওই রকম পাখি হয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে হয়েও গেলেন।

তখন তিনিও উড়ে গিয়ে বসলেন তার পাশে।

"কে ভাই তুমি—"

"আমি হিমালয়বাসী ঈগল। তোমার বন্ধু খঞ্জনদের সঙ্গে প্রতিবছর আমার দেখা হয়। এ বছরও হয়েছিল। তাদের মুখে তোমায় বাবার কথা শুনলাম। তোমার বাবার কি হয়েছে আমি জানি।"

"জান ?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবাকে, তোমার বাবার সৈন্য-সামন্তকে এক বিরাট অজগর গ্রাস করেছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, হিমালয়চূড়ায় বসে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু তোমার বাবাকেই নয়, অনেক রাজা-মহারাজাকে বণিক-সওদাগরকে গ্রাস করেছে ওই অজগর!"

"তুমি স্বচক্ষে দেখেছ গ্রাস করেছে? কি দেখলে?"

"ওই অজগর বিরাট হাঁ ক'রে বসে থাকে। এত বিরাট যে দেখলে মনে হয় না সাপের হাঁ, মনে হয় বুঝি ওটা রজতপুরীর তোরণদ্বার। ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। তার দাঁত থেকে, জিব থেকে, চোখ থেকে অপূর্ব এক রুপোলী আলো বেরুচ্ছে সর্বদা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, আর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়লেই অজগর মুখ বন্ধ ক'রে দেয়, তখন আর বেরুবার উপায় থাকে না!"

"তাহলে আমার বাবা বেঁচে নেই?"

"তা ঠিক বলা যায় না। শুনেছি ও অনেককে গ্রাস করে বটে কিন্তু সবাইকে হজম করতে পারে না। তোমার বাবা হয়তো ওর পেটের ভেতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। অজগরকে মেরে তার পেট চিরে যদি দেখা যায় তাহলে ঠিক বোঝা যাবে—"

"কোথায় থাকে সে? আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও, খড়্গ দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব তাকে।"

ঈগল হেসে বললে, "খড়্গ দিয়ে তাকে কাটা যায় না। আমরা সাপের শত্রু, সাপকে টুকরো টুকরো করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আমরা ওর কিছু করতে পারিনি। বরং ভয় হয় কাছে গেলে ও-ই আমাদের গিলে ফেলবে। ওর নাম কি জান? লোভ। স্বয়ং গরুড় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ওকে মারতে পারেন, আর কারও সাধ্য নেই। তবে তিনি বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে এসব ছোটখাটো কাজে মাথা ঘামাতে রাজী হবেন কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করলে হতে পারে—"

ঈগলের মাথার ঝুঁটিটা ফর্‌র্‌ করে খুলে গেল।

"কি—"

"গরুড় তো আমাদেরই সম্রাট্! সমস্ত পাখিরা যদি গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে তাহলে তিনি 'না' বলতে পারবেন না। কিন্তু সমস্ত পাখিরা কি তোমার বাবার জন্যে অত করবে? আমি অবশ্য ঈগল সমাজকে বলব, তারা রাজীও হবে হয়তো। তুমি অন্য পাখিদের বলে দেখ তারা যদি রাজী হয়"—

"বেশ, আমি বলে দেখব!"

"আমি এখন চললুম তাহলে। এই কথা বলতেই এসেছিলাম। কি হল আমাকে খবর দিও খঞ্জনদের মুখে। কেমন?"

"আচ্ছা।"

ঈগল পাখি উড়ে গেল।

রাজপুত্র শুনতে লাগলেন ঈগল পাখি উড়তে উড়তে যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা, হায় রাজা—"

চামেলীকুঞ্জে বাসা বেঁধেছিল টুনটুনি দম্পতি। তাদের সঙ্গে আগে থাকতেই ভাব ছিল রাজকুমারের। প্রায়ই টুনটুনি সেজে তাদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করতেন। টুনটুনিরা জানতই না যে আসলে তিনি রাজপুত্র, মন্ত্রবলে টুনটুনি হয়েছেন।

রাজপুত্র ভাবলেন সত্যি কথাটা এইবার ওদের খুলে বলা উচিত।

সব শুনে টুনটুনিরা প্রথমে অবাক্ হ'য়ে গেল, তারপর আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল।

"সে কি, তুমি আমাদের রাজপুত্র না কি?"—পুরুষ টুনটুনি বলে উঠল।

"কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য"—বলে উঠল টুনটুনি-গিন্নী।

তারপর তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচতে লাগল দুজনে।

রাজপুত্র বললেন' "সব তো শুনলে, এইবার বল তোমরা গরুড়ের কাছে যাবে কি না"—

"নিশ্চয় যাব। আমাদের দলবল সবাইকে নিয়ে যাব।"

রাজপুত্র তখন শালিক সেজে শালিকদের বললেন, টিয়া সেজে গেলেন টিয়াদের কাছে, বুলবুলি সেজে বুলবুলিদের অনুরোধ করলেন। দর্জিপাখি, দোয়েল, বসন্ত-বউ, বেনেবউ, ফটিকজল, প্রত্যেকের কাছে গেলেন তিনি। ফিঙে, নীলকণ্ঠ, বাদামীকালো মাছরাঙা, ছাতারে, কাক, বক, চিল, সারস কেউ বাদ রইল না।

সবাই রাজপুত্রকে কথা দিলে যেদিন রাজপুত্র তাদের যেতে বলবেন সেইদিনই তারা গরুড়ের কাছে যাবে।

তারপর আবার এল খঞ্জনের দল।

ঈগলের মুখে শুনেছ তো সব?"

"শুনেছি। এখানকার সব পাখিদের আমি অনুরোধ করেছি গরুড়ের কাছে যাবার জন্যে। তারা রাজীও হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের পাখিদের তো আমি চিনি না—"

খঞ্জনের দল বললে, "আমরা চিনি। তোমার হয়ে আমরা গিয়ে তাদের অনুরোধ করব।"

"তাহলে তো খুব ভাল হয়।"

"নিশ্চয় করব।"

মহা-উৎসাহে খঞ্জনের দল উড়ে চলে গেল। বড় বড় গাছ পাহাড় সমুদ্র নদী পেরিয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল তারা।

আবার কবে তারা ফিরবে?

রাজপুত্র রোজ প্রতীক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র আর এক কাণ্ড করলেন।

রানী-মা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তামার ঝারিটি নিয়ে বাগানে আসতেন, গাছে গাছে জল দিতেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ছিল না। রাজপুত্র মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন জল দিতে দিতে তাঁর চোখে জল পড়ছে। রাজপুত্র আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না, মাকে সব কথা খুলে বললেন একদিন। মা-তো বিশ্বাসই করতে চান না প্রথমে। রাজপুত্র তখন বললেন, "এস না আমি তোমার কানে কানে পরীদের সেই মন্ত্র বলে দিচ্ছি। তুমিও ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে যেতে পারবে। তুমি যে-পাখি হতে চাও, মনে মনে তাই ইচ্ছে কর।"

রানী-মা সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর হ'য়ে গেলেন।

তারপর আবার মানুষ হয়ে বললেন, "পাখিরা যেদিন গরুড়ের কাছে যাবে, আমিও সেদিন ময়ূর সেজে যাব তাদের সঙ্গে। ময়ূরেরা সাপের শত্রু। আমি সে অজগরকে মারতে না পারলেও ক্ষত-বিক্ষত করব।"

"আর আমি?"

"তুমি কুমার, তুমি আমার পিঠের উপর বসে থাকবে।"

রানী-মার চোখে ফুটে উঠল একটা অপূর্ব দীপ্তি, যে দীপ্তি নিবে গিয়েছিল এতদিন, যে দীপ্তি রাজপুত্র কখনও দেখেন নি।

কিছুদিন পরে ফিরে এল খঞ্জনেরা।

সব শুনে তারা বললে, "তুমি আর তোমার মা যদি যাও তাহলে তো খুব ভাল হয়। গরুড় নিজে যে মাতৃভক্ত। মাকে সৎমার পীড়ন থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। তোমার মা যদি যান, নিশ্চয় রাজী হয়ে যাবেন তিনি, আমরাও এদিকে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। সমস্ত পাখি রাজী হয়েছে। আমরা দিনের পাখি, আমরা সকালে যাব, পেঁচারা যাবে রাত্রে, তাদের দলপতি হুতোম পেঁচা নিয়ে যাবে তাদের। তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে কাল ভোরে ঠিক হয়ে থেকো। উষার রাঙা আলো যেই আকাশের গায়ে লাগবে, অমনি আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের ডাক শুনতে পাবে তোমরা—"

"বেশ।"

খঞ্জনের দল আবার উড়ে চলে গেল মাঠ বন গিরি নদী সমুদ্র মরুভূমি পেরিয়ে।

পরদিন ভোরে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

রাত দুপুরে পূর্বাকাশে যে মেঘগুলি জ্যোৎস্নায় টগরফুলের রাশির মতো দেখাচ্ছিল ভোর হতে না হতেই সেগুলি হয়ে গেল যেন রক্তজবার রাশি। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল অপূর্ব এক নহবত—লক্ষ পাখির কাকলী।

রানী-মা ময়ূর সেজে অপেক্ষাই করছিলেন। পাখিদের ডাক শোনামাত্র রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে উড়লেন আকাশে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ময়ূরের পিঠে চড়ে চলেছেন রাজকুমার। আর তাঁর পিছু-পিছু চলেছে অসংখ্য রকমের অসংখ্য পাখি। চেনা পাখিদের মধ্যে টিয়া, ময়না, বুলবুল, হীরেমন, দোয়েল, হরবোলা, পাপিয়া, চাতক, কোকিল, ফটিকজল, বউ-কথা-কও, পায়রা, হরিয়াল, ঘুঘু, কাক, বক, সারস, চিল, শঙ্খচিল, বাজ, টুনটুনি, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, চোরপাখি, চড়াই, ফিঙে, কাঠঠোকরা, টিট্টিভ, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, ভরত, খঞ্জন, ফুলকি, বসন্তবউরি, বাঁশপাতি, সোনাপাখি, মুনিয়া, বাবুই, আবাবিল, শ্যামা, নীল, ময়না, বটের, তিতির, বনমুরগী এরা তো ছিলই, অচেনা পাখি কত যে ছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। মানস সরোবর আর মেরুপ্রদেশ থেকে এসেছিল হাঁসের দল। হাঁসেদের পিঠে চড়ে চলেছিল পেঙ্গুইনরা, খঞ্জনরা ছিল সব শেষে।

সেই সেতু পার হয়ে তাঁরা এসে দেখলেন তাম্রপুরী সত্যিসত্যিই রজতপুরী হয়ে গেছে। রুপোর তৈরি ঘরবাড়ি ঝকঝক করছে সূর্যালোকে।

শ্রীধর দাঁড়িয়েছিল সেতুর এপারে। রাজপুত্রকে সে চুপি চুপি বললে, "ভাগ্যে বাগান করবার বুদ্ধি দিয়েছিলাম তাই তো এত সব হ'ল!"

"নিশ্চয়। যখন আমরা বাগান তৈরি করেছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে সাধারণ বাগান মায়া-কানন হয়ে উঠবে।"

শ্রীধর বললে, "ভাল ক'রে তলিয়ে দেখলে সব বাগানই মায়া-কানন। হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছে—"

"কি?"

"ওই দেখ না।"

রাজপুত্র দেখলেন রুপোর তৈরি রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের দু'পাশে শাঁখ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাঙা পরী আর সাদা পরী।

পরিচয়

"আমাকে চিনতে পারছ?"

"পারছি বই কি।"

"কি ক'রে পারলে, চেনবার তো কথা নয়!"

"বাঃ, আমি দেখেছি যে। একবার নয়, অনেকবার।"

"কি ক'রে দেখলে? আমি তো এখানকার নই। কোলকাতা থেকে আমাকে এনেছে এখানে। আমাকে ঠিক নয়, আমার মাকে। আজই ফুটেছি আমি। তুমি কি কোলকাতা গিয়েছিলে কখনও?"

"না। ওই যে ওই গাছে আমার বাসা।"

টুনটুনি উড়ে গিয়ে তার বাসাটির চারপাশে ঘুরে এল একবার। মালতী ফুল সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

টুনটুনি আবার এসে বসল তার কাছে। বলল, "তুমি যাই বল, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। কেমন?"

"এসো—"

ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে গেল সে।

তারপর এল হাওয়া।

"এই যে, ভাল আছ?"

"আছি। তুমি চেন নাকি আমাকে?"

"বা, চিনি না? চিরকাল তোমায় দোলাচ্ছি, চিরকাল তোমার সুরভি, তোমার পরাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—"

"কিন্তু আমি তো এখানকার লোক নই। ভাবছি, কি ক'রে চিনলে?"

"আমিই কি এখানকার লোক না কি! কাল রেঙুনে ছিলাম, আজ এখানে

এসেছি, তার আগে ছিলাম উড়িষ্যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই আমি। আমরা কারো নই, অথচ সকলের—"

হাওয়া তাকে দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"আমিও তোমাকে চিনি।"

যে আলো তাকে ঘিরে ছিল সে কথা ক'য়ে উঠল!

"তুমি কোলকাতার লোক কি?"

"আমি কোলকাতারও নই, ঢাকারও নই। আমি আকাশের। আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি মাটিতে তোমাকে ফোটাব বলে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের অন্য পরিচয় নেই।"

আলোর হাসি আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

নূতন স্বপ্ন জাগল মালতী ফুলের পাপড়িতে। হাওয়া আবার দোল দিয়ে গেল।

টুনটুনি পাখি আবার এসে বসল পাশের ডালটিতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট

একটা রঙীন স্বপ্ন যেন ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

রঙীন প্রজাপতি একটা। ঘর ছেড়ে বার হলাম।

ছুটলাম তার পিছু-পিছু। ওই যে করবী গাছের ডালটায় বসল, কিন্তু কাছে যেতে-না-যেতেই উড়ে গেল আবার। বোসেদের পাঁচিল-ঘেরা বাগানটায় ঢুকেছে, তুঁতগাছের ডালে বসে পাখা দুটি নাড়ছে আস্তে-আস্তে। বাগানের গেটটা পশ্চিম দিকে, অনেক ঘুরে যেতে হবে। তা হোক···ঘুরেই যাব।···চলতে লাগলাম।

কুরু-র-র-র···

কি পাখি ওটা? ফিকে সবুজ রং। বাঃ, কি সুন্দর দেখতে! কি নাম ওর? একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই পাখিটার নাম কি?" "কী জানি" বলে চলে গেল সে। খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম পাখিটার দিকে। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল। রাস্তার কোণের দিকে একটা ঝোপ ছিল, তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঝোপটার দিকে চেয়ে কিন্তু মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কি সুন্দর এক রকম লতা দিয়ে ঝোপটা আগাগোড়া ঢাকা! একেই লতা-বিতান বলে নাকি? চমৎকার লতাটি! ঘন সবুজ পাতা, এত ঘন যে প্রায় কালো মনে হচ্ছে! কিন্তু কালো নয়, সবুজের আভা ফুটে বেরুচ্ছে প্রতি পাতাটি থেকে! ছ-কোণা পাতাগুলো, ধারে-ধারে করাতের মতো কাটা-কাটা। গোছা-গোছা ফুল ধরেছে, ফুলও ভারি চমৎকার! কি নাম এ লতার কে জানে?

কালেক্টার সাহেবের কেরানী দ্রুতপদে আপিস যাচ্ছিলেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা, এ লতার নাম কি বলুন তো?"

"কোন্ লতার? ও, ওইটে? ওটা একটা জংলি লতা।"

দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। বুঝলাম, তিনিও ওর নাম জানেন না।

সত্যি, আমরা কত জিনিসই জানি না! কাল রাত্রে মশারি খাটাবার সময় মনে হচ্ছিল—পেরেক, দড়ি, মশারি এদের আবিষ্কর্তা কারা? এই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের নাম আমরা জানি না। চতুর্দিকে এত ফুল, ফল, লতা, গাছ দেখি—তাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নেই!

"কে রে ভূতো নাকি?"

দেখলাম আমাদের ক্লাসেরই গোবিন্দ।

গোবিন্দ এগিয়ে এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিলে।

"শুনেছিস, রামা কাল ফুটবল-ফিল্ডে মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"ওঃ! টেরটা পাইয়ে দিয়েছি বাছাধনকে কাল আমরা। আর কখনও গুণ্ডামি করতে আসবেন না আমাদের সঙ্গে। হাবুল-দা এইসা এক লাথি ঝেড়েছিল বাছাধনের পেটে যে সঙ্গে-সঙ্গে কাৎ—"

গোবিন্দ সোৎসাহে বর্ণনা করতে লাগল। গোবিন্দ ফুটবল খেলায় উৎসাহী। আমাদের পাশের গাঁয়ে যে স্কুল আছে, রামা সেই স্কুলে পড়ে। এই রামারই জন্যে আমরা কখনও তাদের ফুটবল খেলায় হারাতে পারি না। সে ক্রমাগত ফেল ক'রে-ক'রে কেবল ফুটবল খেলার জন্যে স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছে নাকি! স্কুলের মাস্টাররাও ছাড়তে চান না তাকে। রামার জোরে প্রত্যেক বছর 'কাপ' পাচ্ছে ওদের স্কুল। দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়! ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি। আমি যদিও ফুটবল খেলায় তাদৃশ উৎসাহী নই, তবু বিপক্ষ দলের এত বড় একটা বীরবাহু-পতনের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করতে হ'ল।

গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করতে-করতে মল্লিকপাড়ার মোড়টা পর্যন্ত চলে গেলাম। মোড়ে গিয়ে গোবিন্দ বললে—"ওহো, তোকে আসল খবরটা দিতে ভুলে গেছি। আমরা সবাই চাঁদা ক'রে হাবুল-দা'কে আজ খাওয়াচ্ছি। তোকেও দিতে হবে চার আনা। আমি বাজার থেকে মাংসটা আনতে যাচ্ছি। তুই যদি ভাই গঙ্গার ধার থেকে ইলিশ মাছটা এনে দিস্। তোদের বাড়ির কাছেই তো! ফনুতি মাসি রান্নার ভার নিয়েছে সব। গ্র্যাণ্ড হবে। এনে দিবি তো?"

"আচ্ছা।"

গোবিন্দ চলে গেল। আমিও ফিরছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল মোক্ষদা পিসির বাড়ির কোণটায় যে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটুকু আছে, তাতে বালি পড়ে আছে খানিকটা, আর সেই বালির উপর একটা বেড়াল মনের আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভারি মজা লাগল। দেখতে লাগলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে ভূতো নাকি?"

মোক্ষদা পিসির শীর্ণ মুখ দেখা গেল জানালায়। বিধবা মোক্ষদা পিসির কেউ নেই। চির রুগ্ন।

"হ্যাঁ আমি……"

"আমাকে একটু মিছরি এনে দিবি বাবা দোকান থেকে? কাল থেকে জ্বর। উঠতে পারিনি। এনে দে বাবা!"

মোক্ষদা পিসির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দোকানে গেলাম। দোকানে ভীষণ

ভিড়। 'কিউ' ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম একজনের পিছনে। লোকটি খালি গায়ে ছিল। তার পিঠে দেখলাম আশ্চর্য দ‌ুটি তিল। শিরদাঁড়ার ঠিক দ‌ু'পাশে, ঠিক সমান দ‌ূরে, যেন কম্পাস দিয়ে মেপে কেউ বসিয়ে দিয়েছে দ‌ুটিকে। ভারি আশ্চর্য লাগল! কেন এমন হয়, কি ক'রে হয় কে জানে?

ভিড়ের মধ্যে নানারকম কথা হচ্ছে। চালের দাম, কাপড়, গান্ধি, জহরলাল, স‌ুভাষ বোস, হিন্দ‌ু-মোসলেম দাঙ্গা, মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন, বন্যা, ট্রেন-কলিশন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা মেঘ ঠিক কুমিরের মতো দেখাচ্ছে। ঘণ্টা-দ‌ুই লাগল মিছরিটুকু কিনতে। মোক্ষদা পিসিকে মিছরি দিয়ে ফিরছি, ন্যাপলার সঙ্গে দেখা। ন্যাপলা বললে, "স্টেশনে যাবি না?"

"কেন, স্টেশনে কেন?"

"বাঃ শ‌ুনিসনি? শাহ নাওয়াজ পাস করবে যে আজ তিনটের ট্রেনে!"

জানতাম না তো! শাহ নাওয়াজকে দেখবার আগ্রহ ছিল। নেপালের সঙ্গে গেলাম স্টেশনে। বিপ‌ুল জনতা সমবেত হয়েছে। 'জয় হিন্দ' বলে চীৎকার করছে মাঝে-মাঝে। কত লোক, কত রকম লোক! কিন্তু তাদের দেখে, তাদের কথা শ‌ুনে মনে হ'ল না যে তারা ঠিক সেই আকুলতা নিয়ে এসেছে যা মান‌ুষকে স্বদেশপ্রেমিকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। মনে হ'ল এরা সব মজা দেখতে এসেছে। বিড়ি টানছে. হো-হো ক'রে হাসছে। হ‌ুজ‌ুগের দল। মনে হ'ল মান‌ুষ নয়, একরাশ ধ‌ুলো—যেদিকে হাওয়া বইছে, সেই দিকেই উড়ছে দল বেঁধে। বিরক্তি ধরে গেল। তব‌ু কিন্তু চলে আসতে পারলাম না। ট্রেনটা আস‌ুক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করায় ট্রেনটা এল। 'জয় হিন্দ' বলে চীৎকার ক'রে উঠল সবাই। কিন্ত‌ু আমি শাহ নাওয়াজকে দেখতে পেলাম না। আমার সামনে দ‌ুটো লম্বা লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের পিঠ এবং জামার ছিট দেখে ফিরে আসতে হ'ল।

গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছের আশায় বসে আছি। ডিঙিগ‌ুলো আসেনি এখনও। পশ্চিম দিগন্তে স‌ূর্য অস্ত যাচ্ছে, রঙের উৎসব পড়ে গেছে। কি স‌ুন্দর রঙ!

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। রঙীন প্রজাপতির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলাম, অথচ বসে আছি ইলিশ মাছের আশায়। প্রজাপতির কথা সমস্ত দিন মনেও পড়েনি।

চেহারা বদল

বহ‌ুকাল প‌ূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন চক্রবর্তী যে গ্রামে এসে প্র্যাক্‌টিস শ‌ুর‌ু করেছিলেন, সে-গ্রামে তখনও বিদেশী সভ্যতার পত্তন হয়নি ভাল ক'রে। গ্রামে রেল-স্টেশন হয়নি, ইংরেজী স্কুল হয়নি। লোকে চা খেতে শেখেনি। অ্যালোপ্যাথি-চিকিৎসার নামই শোনেনি। ডাক্তার পতিতপাবন এই হতচ্ছাড়া গ্রামে এসে বসেছিলেন, অর্থাভাবে। তাঁর এক পিসেমশাই এই অঞ্চলে দারোগা ছিলেন। তাঁরই আন‌ুকুল্যে

এবং উৎসাহে অতিশয় স-সঙ্কোচে এসেছিলেন তিনি ভাগ্যপরীক্ষা মানসে। টাকা থাকলে শহরে গিয়ে বসতেন, মুরুব্বি থাকলে চাকরি পেতেন, কিন্তু সে-সব কিছুই ছিল না তাঁর। অতি কষ্টে সস্তা জিনের কোট-প্যাণ্ট করিয়ে, কাঠের স্টেথস্কোপ কিনে (সেকালে কাঠের স্টেথস্কোপই প্রচলিত ছিল) এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছুরি-কাঁচিগুলি একটি অতি সাধারণ কাঠের বাক্সে সাজিয়ে খড়ের ছোট একটি ঘরে নিজের ডাক্তারি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন পতিতপাবন।

দারোগা পিসেমশায়ের উপদেশ অনুসারে কোট-প্যাণ্ট পরে স্থানীয় হাটে তিনি ঘোরা-ফেরা করতেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। সকলে সবিস্ময়ে সভয়ে চেয়ে দেখত এই নবীন চিকিৎসককে। চিকিৎসা করাবার বেলায় কিন্তু তারা ডাকত হয় হারু ওঝাকে, না হয় যোগেন মণ্ডলকে, না হয় হনুমান ত্রিবেদীকে। এই তিনজনই ও-অঞ্চলে নামজাদা কবিরাজ ছিল। কোট-প্যাণ্ট পরা এই আগন্তুকটির হাতে নিজেদের জীবন সমর্পণ করবার কথা ভাবতেই পারত না কেউ প্রথম-প্রথম। কিন্তু ভাবতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত একদিন। দারোগা পিসেমশাইয়ের জবরদস্তিতে নয়, পতিতপাবনের নিজেরই কৃতিত্বের জোরে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরছেন, হঠাৎ নজরে পড়ল, নির্জন প্রান্তরে কি একটা পড়ে রয়েছে যেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মানুষ একটা অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন, মরেনি। কিন্তু মর-মর। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, আশেপাশে কোনও লোক-জন নেই। তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন পতিতপাবন। নিজেই কাঁধে ক'রে তুলে নিয়ে এলেন তাকে নিজের কুঁড়েঘরে। তার গায়ে, কাপড়ে-চোপড়ে বমি আর বিষ্ঠার দুর্গন্ধ। নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন সব। গরম জল ক'রে সেঁক দিলেন তার হাতে-পায়ে। নিজের হাতে ওষুধ তৈরি ক'রে খাওয়ালেন, শুশ্রূষা করলেন সারা রাত জেগে। লোকটা বেঁচে গেল। তার হয়েছিল কলেরা। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে গরুর গাড়ি চেপে সে যাচ্ছিল এক বিয়ের নিমন্ত্রণে। পথে কলেরা হওয়াতে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

খবর রটতে বিলম্ব হ'ল না। কোট-প্যাণ্ট পরে মাসাধিক কাল হাটে ঘোরাঘুরি ক'রে যা হয়নি, ওই একটি ঘটনাতেই তা হ'য়ে গেল। পতিতপাবন যে সার্থকনামা ব্যক্তি, তা জেনে গেল সবাই। ভিড় ক'রে আসতে লাগল রোগীর দল তাঁর কাছে।

তবু কিন্তু মুশকিলে পড়লেন পতিতপাবন। সবাই এত বোকা, এমন সাধারণ-জ্ঞানশূন্য যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের চিকিৎসা করাই দায়। কথা বললে বোঝে না। অন্ধ-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সব।

একবার একটা রোগী দেখতে গেছেন। হয়েছে নিউমোনিয়া। রোগীর বাবা অর্থবান ব্যক্তি। সুতরাং হারু ওঝা, যোগেন মণ্ডল, হনুমান ত্রিবেদী—তিনজন কবিরাজকে ডেকেছেন তিনি। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিতপাবনের ডাক পড়েছে।

পতিতপাবন গিয়ে দেখলেন, তিন জন কবিরাজ তিনরকম সিদ্ধান্ত ক'রে বসে আছেন। হারু ওঝার মতে বায়ু প্রকুপিত হয়েছে, যোগেন মণ্ডলের ধারণা—আসল কারণ পিত্তাধিক্য, হনুমান ত্রিবেদী কফ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। পতিতপাবনকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই পতিতপাবন বুঝেছিলেন যে, এ-অঞ্চলে প্র্যাক্টিস করতে হ'লে

এই কবিরাজদের চটালে চলবে না। এদের হাতে রাখতে হবে। সাধারণ লোকের অগাধ বিশ্বাস এদের উপর। চিকিৎসা-ব্যাপারে এদের পরামর্শ অনুসারেই সবাই চলে। এমন কি, ডাক্তারি-চিকিৎসাও যখন করতে হয়, এরাই ডাক্তার ঠিক ক'রে দেয়। সুতরাং এদের প্রসন্ন রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথক-পৃথক ভাবে এদের প্রসন্ন রাখাটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী এই তিনজন প্রবীন কবিরাজকে একসঙ্গে কি ক'রে তুষ্ট করা সম্ভব? হয়েছে তো নিউমোনিয়া। এর কারণ বায়ু, পিত্ত, না কফ তা পতিতপাবনের জানা নেই। কোন্‌টাকে সমর্থন করবেন তিনি? একজনকে সমর্থন করলে বাকি দু'জন চটে যাবে। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন পতিতপাবন। অবশেষে অনেক ভেবে একটা উপায় মাথায় এল তাঁর।

বললেন, "ওঝাজি ঠিকই বলেছে। বায়ু প্রকুপিত হয়েই জ্বরটা আরম্ভ হয়েছিল।"

হারু ওঝার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

পতিতপাবন বললেন, "তারপর কিন্তু রুখে উঠল, পিত্ত। বায়ুর সঙ্গে লাগল তার লড়াই। পিত্ত জিনিসটা কিরকম বিশ্রী তা তো আপনারা জানেন—ভয়ানক তেতো। তেতোর চোটে তিতিবিরক্ত হ'য়ে বায়ুকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হ'ল শেষটা। পিত্ত জয়ী হ'ল—"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যোগেন মণ্ডলের চোখ। ঈষৎ গর্বভরে গোঁফে তা দিলেন তিনি।

পতিতপাবন বলে চললেন—"এদের প্রভুত্ব কিন্তু বেশী দিন থাকে না। পিত্তের প্রভাবও বরাবর রইল না। কফ মাথাচাড়া দিলে এবং পিত্তকে চেটে নিলে। এখন কফেরই প্রাধান্য চলছে—"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন হনুমান ত্রিবেদী আনন্দে হাততালি দিয়ে।

তিনজনের মান রক্ষা ক'রে শুরু করলেন পতিতপাবন চিকিৎসা। ভাল হয়ে গেল নিউমোনিয়া রোগী। পসার বাড়তে লাগল পতিতপাবনের।

কিন্তু ও-অঞ্চলের লোকগুলোই এমন বোকা যে বিপদে পড়তে হ'ত প্রায়ই।

একবার হয়েছে কি, একটা লোককে একশিশি ওষুধ দিয়ে তিনি বললেন—তিনঘণ্টা-অন্তর একদাগ করে খাওয়াবে।

লোকটা মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘণ্টা ঠিক করবে কি করে। তার তো ঘড়ি নেই। একমাত্র ঘড়ি আছে জমিদার-বাড়িতে। পতিতপাবন গিয়ে জমিদারকে অনুরোধ করাতে জমিদার বললেন—আচ্ছা, আমি তিনঘণ্টা-অন্তর লোক পাঠিয়ে সময় জানিয়ে দেব আপনার রোগীকে। জমিদার তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন ঠিক। অসুখ কিন্তু সারল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল বরং। আবার যেতে হ'ল পতিতপাবনকে। গিয়ে দেখেন, ওষুধ একফোঁটা খাওয়ান হয়নি! শিশিতে কাগজের যে দাগ কাটা ছিল, সেইগুলো জলে ভিজিয়ে তুলে কেটে-কেটে খাইয়েছে!

আর-একবার একটি রোগী বললে, আমার হজম হচ্ছে না, ভাল একটা ওষুধ দিন। পতিতপাবন বললেন, ওষুধ খাবার আগে খাবার নিয়ম ক'রে দেখুন। ভাত-রুটি ছেড়ে দিয়ে ফলটল খেয়ে থাকুন দু'চার দিন।

লোকটি চলে গেল। তারপর দিন তার ভাই ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে।

—"ডাক্তারবাবু আপনাকে যেতে হবে একবার।"

—"কেন?"

—"দাদার বড্ড পেট নামিয়েছে।"

—"কেন, কি হ'ল ?"

—"সে আপনি গিয়েই শুনবেন।"

অন্যদিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। যেতে হ'ল পতিতপাবনকে। গিয়ে দেখেন, রোগী শয্যাগত।

—"কি হে, কি হ'ল ?"

—"পেটটা একটু নরম হয়েছে।"

—"খাওয়ার অত্যাচার করেছ নিশ্চয়।"

—"আজ্ঞে না, ফলই খেয়েছিলাম।"

—"কি ফল ?"

—"তাল। বেশী নয়, গোটা-পাঁচেক।"

নির্বাক হয়ে রইলেন পতিতপাবন।

বার্লি কাকে বলে তাই জানত না তখন সে-দেশের লোক। বার্লি খাওয়াতে বলে এসেছেন একজনকে, ক্রমাগত 'বালি' খাইয়েছে, গঙ্গার চরের বালি। রোগী পেটের ব্যথায় মরবার যোগাড়।

দুই

তারপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হয়েছে।

পতিতপাবন ডাক্তারের বয়স ছিল পঁচিশ, এখন হয়েছে পঁচাত্তর। গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামে স্টেশন হয়েছে, 'বাস' হয়েছে, চায়ের দোকান হয়েছে। নিকটবর্তী শহরে সিনেমাও খুলেছে। পাশের বাড়ির রামু পোদ্দার রেডিও কিনেছে একটা ব্যাটারি-সেটের। গাঁক-গাঁক ক'রে বাজাচ্ছে দিনরাত। গ্রামে হাইস্কুল তো হয়েছেই, বালিকা বিদ্যালয়ও হয়েছে। প্রতি পাড়ায় চায়ের দোকান হয়েছে একটা ক'রে।

পতিতপাবনের কাছে লিক্‌লিকে একটি ছোকরা এসে বললে একদিন "আমার বুক্‌টা এগ্‌জামিন ক'রে দেখুন তো ডাক্তারবাবু। কাসিটা কিছুতে কমছে না···"

ছোকরাটির নাম সুলোল। দুলাল নয়, সুনীলও নয়। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁধ-কাটা গেঞ্জি। চোখে রঙিন চশমা। ঘাড় ছাঁটা। প্রথমে দেখলে মনে হয় গোঁফ কামানো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বোঝা যায়, ঠোঁটের উপর দু'টি অতি সূক্ষ্ম কালো রেখার মতো আছে। সযত্নে ক্ষুর দিয়ে করা হয়েছে। দ্বিধা-বিভক্ত কাছা-পায়ে কাবুলী-চপ্‌পল।

পতিতপাবন ভাল ক'রে বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর গলাটা দেখলেন। তারপর বললেন—"বুক ঠিক আছে। কাসিটা হচ্ছে গলার জন্যে।"

—"কি করব বলুন তো ডাক্তারবাবু। মেন্‌থল প্যাস্‌টিল খেয়েছি দু'শিশি। পেনিসিলিন লজেন্‌স বেরিয়েছে আজকাল, তাই ব্যবহার করব ?"

পতিতপাবন বললেন, "দরকার নেই ওসব।"

—"কি করব তাহ'লে ?"

—"বাড়িটা ছাড়ো।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপ্রসন্নমুখে চলে গেল সুলাল। দিনবিশেক পরে এল আবার। বগলে একটা কাগজের মোড়ক।

—"ডাক্তারবাবু কোলকাতা গেসলাম। সেখানে ডাক্তার ভট্চাজ আমার পিসতুতো দাদার শালা হন, তাঁকে দেখালাম। তাঁরই সাহায্যে বুকটা এক্স্-রে করলাম, গয়েরও পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা এইসব ওষুধ লিখে দিয়েছেন।"

পতিতপাবন দেখলেন, একগাদা পেটেণ্ট ওষুধের তালিকা লিখিয়ে এনেছে ছোকরা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ রোগীদের দিকে চেয়ে যেমন দমে যেতেন, সুলালের দিকে চেয়েও তেমনি দমে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল—যথা পূর্বং তথা পরং। বাহিরের চেহারাটা বদলেছে খালি।

মৃন্ময়

মৃন্ময়ের কিছুই ভালো লাগে না আজকাল। তার বয়স বেশী নয়, এই সবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে সে, কিন্তু এরই মধ্যে সে বুঝতে পেরেছে যে ঘরে বাইরে কোথাও যেন শান্তি নেই। খাওয়া-পরার কোনও অভাব নেই তাদের, কিন্তু বাবার মুখ সর্বদাই বিষণ্ন, মায়ের মুখে হাসি নেই। বাবা যা মাইনে পান তাতে সংসার-খরচ কোনক্রমে চলে। আজকাল বাড়িভাড়াও দিতে পারেন না প্রতিমাসে। বাড়িওলা প্রায়ই এসে তাগাদা দেয়। বাবা তাকে বলেছিলেন যে সে যদি ক্লাসে ফার্স্ট হ'তে পারে তাহলে তাকে ভালো একটা বাঁশী কিনে দেবেন। সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু বাবা তাকে বাঁশি কিনে দেননি এখনও। মৃন্ময় বুঝতে পারছে যে তাঁর হাতে টাকা নেই বলেই কিনে দিতে পারছেন না। টাকা থাকলে নিশ্চয়ই কিনে দিতেন। সে তাঁর বাঁশের বাঁশিতেই গৎ সাধছে তাই। তার বন্ধু কমলদের নাকি আরও দুরবস্থা। কে একজন বলছিল, তাদের দু'বেলা খাওয়াই নাকি জুটছে না আজকাল। তার বাবার যক্ষ্মা হয়েছে, ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, পুরো মাইনে পান না। মৃন্ময়ের খুব দুঃখ হয়, কিন্তু কি করবে সে। তার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে কমলদের দিতো। আহা, বড় কষ্ট বেচারাদের। কিন্তু, আর একটা কথাও তার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়। টাকা দিলেই কি কমল টাকা নিতো ? তাকে যদি কেউ এখন দয়া ক'রে একটা বাঁশী কিনে দেয়, সে কি নেবে ? কখ্খনো না। কমলদের বাড়ি সে রোজই যায়, কমলের বাবাকে বাঁশী শুনিয়ে আসে। তিনি তার বাঁশী শুনতে খুব ভালোবাসেন। তবু কিন্তু মৃন্ময়ের কিছু ভালো লাগে না। দেশের হাওয়ায় কেমন যেন একটা অশান্তির উত্তাপ সঞ্চারণ ক'রে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্র তো খোলবার উপায় নেই। সংবাদপত্রগুলো আজকাল দুঃসংবাদ পত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ডাস্টবিনে যেমন যত-রাজ্যের ময়লা এসে জমা হয়, এই খবরের কাগজগুলোতে তেমনি জমা হয়

দুনিয়ার যত দুঃসংবাদ। অথচ না পড়েও উপায় নেই। খেলার খবরগুলোর জন্যেও পড়তে হয়। খেলার মাঠেও কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল। ভদ্রতা কি উঠে গেল নাকি দেশ থেকে! সত্যি, ভারি কষ্ট হয় মৃন্ময়ের। বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা ক'রে আজকাল। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস কত গৌরবময়ই-না ছিল! এই সেদিনই তো নেতাজি···নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা ভেবে তার সমস্ত মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। সত্যিই কি মারা গেছেন তিনি? আর ফিরবেন না? হয়তো ফিরবেন না, ভারি কষ্ট হয় কিন্তু। মৃন্ময়ের ধারণা, তিনি যদি ফিরে আসেন সব ঠিক হ'য়ে যায় আবার। এই সব ঝগড়া, মারামারি, গণ্ডগোল, এই সব অভাব-অনটন, হাহাকার কিছু থাকে না তাহ'লে। সূর্য উঠলে অন্ধকার কি থাকে কখনও? সূর্য রোজ অস্ত যায়, রোজ আবার ওঠে। মহৎ লোক চলে গেলে আর ফেরে না কেন? সূর্য তো রোজ ফিরে আসে। দেশজোড়া এই অশান্তির মধ্যে কতকাল বাস করতে হবে এমন ক'রে? হিন্দু-মুসলমানের এই ঝগড়া কি মিটবে না কোনও কালে? কুকুরের মতো চিরকাল কি তারা এমনি ঝগড়াই ক'রে যাবে! সত্যি, থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দলে দলে হিন্দুরা এই যে দেশ ছেড়ে চলে আসছে—শিয়ালদ'তে গিয়ে একদিন দেখে এসেছে সে—শখ ক'রে নিশ্চয়ই আসেনি ওরা···কিন্তু, কেন ওদের এই শাস্তি···এর প্রতিকারই-বা কি!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে মৃন্ময়ের···এমন একটা কিছু, যাতে দেশের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়। রবিন্সন ক্রুশোর গল্প পড়েছে সে। ওইরকম অবস্থায় যদি পড়ে, সেও কি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। বিরাট একটা সমুদ্রের ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সে একা রয়েছে। একটুও ভয় করছে না তার।···জঙ্গলের ডাল-পালা ভেঙে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করেছে। একটি কাঠবিড়ালী।···স্বপ্ন কিন্ত ভেঙে যায় একটু পরে। কেই বা তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে! ম্যাট্রিকুলেশনটা যদি পাস করতে পারে (পাস অবশ্য করবেই সে, ভালোভাবেই করবে) তাহলে বাবা তাকে একটা আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন! কলেজে পড়াবার সামর্থ্য তাঁর নেই। সমুদ্র যাত্রা করা অদৃষ্টে নেই। পালিয়ে গিয়ে অনেকে জাহাজের খালাসী হয়ে সমুদ্র দেখে এসেছে, অনেক দুঃসাহসিক কাজও করেছে। কিন্তু, মা বাবা মণ্টুমণিকে ছেড়ে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তবে এটা সে জানে যে দরকার হলে সে রবিন্সন ক্রুশো হতে পারবে। শুধু রবিন্সন ক্রুশো কেন, রাণা প্রতাপ সিং, যতীন দাস, নেতাজি সব হতে পারে সে। যদি কোনওদিন সে সুযোগ পায় দেখিয়ে দেবে সকলকে যে বাঙালী এখনও অসাধ্যসাধন করতে পারে। ভাবতে ভাবতে, তার সমস্ত মন আবেগে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। মনে হয় সে পারবে, পারবে, ঠিক পারতেই হবে, করতেই হবে কিছু একটা। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছে না কিছু করবার। ঘরে বাইরে কেবল গ্লানি, গ্লানি আর গ্লানি। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা আর গবর্ণমেণ্টকে গালাগাল—এই হয়েছে এখন সকলের আলোচনার বিষয়। একটুও ভালো লাগে না মৃন্ময়ের; তার কেবলই মনে হয়—আহা, যদি একটা সুযোগ পেতাম, দেখিয়ে দিতাম সকলকে, কি ক'রে দেশের কাজ করতে হয়।

···হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেল সে।

রাস্তা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে তার সমবয়সী একটি ছেলে ফুটপাতের

একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে জামা নেই। মাথার চুল উস্কখ্বস্ক। হাতে বড়বড় নখ। দেখলে মনে হয় ভিখারী, কিন্তু ভিক্ষা করছে না তো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শ্বধ্ব একধারে। কি কর্বণ দ্বষ্টি চোখে! নিশ্চয় কিছ্ব হয়েছে বেচারার। ম্বন্ময় এগিয়ে গেল।

—"কোথায় বাড়ি তোমার ভাই?"

—"প্বর্ববঙ্গে।"

নিমেষের মধ্যে ম্বন্ময়ের মনে হলো, উদ্বাস্তু নয় তো!

—"তোমার বাবা, মা কোথা?"

—"বাপ্ মা ভাই ব্বইন কেউ নাই। সব কাইট্যা ফেল্সে।"

বলেই কেঁদে ফেললে ছেলেটি। ঝরঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো তার।

—"চলো, ওই পার্কে বসবে চলো।"

পার্কে বসে ম্বন্ময় তার ম্বখে সমস্ত শ্বনলে। এ রকম কাহিনী খবরের কাগজে সে আরও পড়েছে। ম্বসলমান গ্বণ্ডার দল এসে বাড়ি প্বড়িয়েছে, সবাইকে মেরে ফেলেছে। খালের ধারে জঙ্গলে ল্বকিয়ে থেকে এই ছেলেটি প্রাণে বেঁচেছে কোনক্রমে। জঙ্গলেই ল্বকিয়ে-ল্বকিয়ে থেকেছে অনেক দিন। রাত্রে ল্বকিয়ে ল্বকিয়ে হেঁটে-হেঁটে শেষ কালে এক স্টীমার ঘাটে উপস্থিত হয়েছে। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে চলে এসেছে এখানে। এখানে এক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে সেখানে খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

নিস্তব্ধ হ'য়ে কিছ্বক্ষণ বসে রইলো ম্বন্ময়। তার মনে হতে লাগলো, দেশের সমস্ত দ্বঃখ যেন ম্বর্তিমান হয়ে তার ম্বখের দিকে চেয়ে আছে প্রতিকারের প্রত্যাশায়।

—"আমাদের বাড়ি যাবে?"

ছেলেটি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালো যে, যাবে।

—"চলো।"

রাস্তায় অনেক কথাই ভেবে নিয়েছিল ম্বন্ময়।

বাড়ি গিয়ে মাকে বললে—"মা, এই ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, এ আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

—"ছেলেটি কে…"

সমস্ত ঘটনা খ্বলে বললে ম্বন্ময়।

—"আহা, বসো বাবা, বসো। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা ওকে মিন্ব।"

ছেলেটিকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে ফিরে এলো ম্বন্ময়।

—"আগে ওকে খেতে দাও। খাবার আছে কিছ্ব?"

—"তোর জন্যে যে র্বটি দ্ব'খানি রেখেছি, তাই আছে।"

"তাই দাও।"

র্বটি দিতে-দিতে মা বললেন—"ও থাকবে বলছিস, কতদিন থাকবে?"

—"বরাবর থাকুক না।"

মা চুপ ক'রে রইলেন। মায়ের মনের কথা ব্বঝতে দেরি হলো না ম্বন্ময়ের। রাস্তায় আসতে-আসতে তারও একথা মনে হয়েছে। তাদের নিজেদের সংসারই অতি কষ্টে চলছে, তার উপর আর-একজন হলো।

—"আমার খাবার আমি ওর সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে খাবো। এক বিছানায় পাশাপাশি শোবো। আমি যে চৌকিটায় শুই, তাতে তো অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকে। ও ঠিক হয়ে যাবে।"

—"আচ্ছা বেশ, সে-সব ভাবা যাবে এখন পরে। তুই খাবারটা দিয়ে আয় ওকে।"

সেদিন রাত্রে সেই ছেলেটির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে মৃন্ময়ের সারা বুক যে আনন্দে ভরে উঠলো, তেমন আনন্দ তার জীবনে কখনও হয়নি। এমন কি ভূপেনকে হারিয়ে যেদিন সে ফার্স্ট হয়েছিল, সেদিনও না। একটা জিনিস কেবল খুব খারাপ লাগছিল তার। মা তাকে অর্ধেক খাবার দেননি, সে রোজ যেমন খায়, সেদিনও তাকে তেমনি খেতে হয়েছিল। সে আপত্তি করাতে মা ধমকে উঠলেন। মা কি যে মনে করেন তাকে। সে কি আধপেটা খেয়ে থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে।

যদু

আমি খুব সংক্ষেপে যে ছেলেটির কথা আজ তোমাদের বলব সে অতি গরীবের ছেলে ছিল। যদিও সে বাপমায়ের একমাত্র সন্তান তবু সৌখীন কোন কিছু তার ভাগ্যে কখনও জোটেনি, এমনকি নাম পর্যন্তও নয়। তার নাম ছিল যদু। দেখতেও যে খুব সুশ্রী ছিল তা নয়, হাড়-পাঁজরা সার জীর্ণ বিশ্রী চেহারা, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য তার কোনও দিনই ভাল হতে পারেনি। হবে কি ক'রে, দুবেলা পেট ভরে খেতেই পেত না।

তার বাপ কালীমোহনবাবু ছোট ছেলেদের প্রাইভেট টিউশনি ক'রে মাসে গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন আর এই কটা টাকা রোজগার করবার জন্যে উদয়াস্ত খাটতে হত তাঁকে। পরের ছেলেদের পড়িয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ ক্লান্ত শরীরে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন নিজের ছেলেকে আর পড়াবার সামর্থ্য থাকত না তাঁর। কালীমোহনবাবু খুব বেশী লেখাপড়া করতে পারেন নি। গরীবের ছেলে ছিলেন, কোনক্রমে কায়ক্লেশে সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাটি পাস করতে পেরেছিলেন। অর্থাভাবে আর পড়া হয়নি।

যদুরা থাকত একটি স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে, তার একদিকে মিউনিসিপ্যালিটির একটা পচা নালা, আর একদিকে বড়লোক প্রতিবেশী হীরেন্দ্রবাবুদের গোটা-দুই খাটা পায়খানা। সামনে সরু একটি রাস্তা, আর রাস্তার উপরে দুনিয়ার যত জঞ্জাল জড়ো করা। কেবল পশ্চিম দিকটায় কাদের কপির ক্ষেত ছিল বলে সে দিকটা একটু ফাঁকা ছিল কেবল। এই বাড়িরও মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া। না দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ টাকা রোজগার করবার জন্যে শহরে থাকতেই হবে, আর শহরে থাকতে গেলেই এই ভাড়া টানতে হবে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর নিকানো থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নাবান্না সেলাই ফোঁড়াই সবই যদুর মাকে নিজের হাতে করতে হ'ত। ওরই মধ্যে যে-দিন একটু সময় পেতেন হীরেন্দ্রবাবুর গোয়াল থেকে গোবর সংগ্রহ ক'রে ঘুঁটে

দিতেন। এত ক'রেও তবু তিনি কুলুতে পারতেন না। কি ক'রে পারবেন, মাত্র তো কুড়ি পঁচিশ টাকা আয়, তার মধ্যে বাড়িভাড়া যেত পাঁচ টাকা, দেশে কালীমোহন বাবুর বুড়ো বাবা থাকতেন তাঁকে পাঠাতে হত পাঁচ টাকা। বাকী দশ পনরো টাকার মধ্যে তিনজনের খাওয়া-পরা খুঁটি-নাটি বাসা খরচ। এই খুঁটি-নাটি খরচের মধ্যে একটা প্রধান খরচ ছিল কালীমোহনবাবুর ওষুধ। একদিন ছেলে পড়িয়ে আসবার সময় রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন তিনি। সস্তায় হবে ব'লে পাড়ার একজন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথের কাছে গেলেন, কিন্তু তাঁর ওষুধে কোন ফল হল না। একজন এ্যালোপাথ ডাক্তারবাবু বিনা দক্ষিণায় তাঁকে একদিন দেখল বটে কিন্তু তিনি এমন একটি ওষুধ ফরমাস করলেন যার দাম চার টাকা চৌদ্দ আনা। নিয়মিত খেলে একশিশিতে কুড়ি পঁচিশ দিনের বেশী চলে না, এক শিশি খেয়ে বেশ ফল পেলেন কিন্তু তিনি। ডাক্তারবাবু বললেন আরও তিন চার শিশি খেতে হবে। দ্বিতীয় শিশি কিনতে কিছুদিন সবুর করতে হল। কিনলেন যখন তখন পুরোমাত্রায় খেতে আর সাহস হল না। এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে পেরে উঠবেন কি ক'রে তিনি। যে ওষুধটা কুড়ি পঁচিশ দিনে শেষ করা উচিত, সেটা খেতেন দু'মাস আড়াই মাস ধরে। যতটুকু উপকার হয়।

এই ভাবেই দিন তাদের কাটছিল। তাদের পাড়ার বড়লোক হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা দামী দামী জামা-কাপড় পরত, সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে খেলা করত, সেজেগুজে মোটরে চড়ে সিনেমা দেখতে যেত, যদু দূর থেকে চেয়ে দেখত আর ভাবত, ওদের অমন আর আমাদেরই বা এমন কেন। ছেলেমানুষ সে, তখনও বুঝত না যে টাকাকড়ি থাকলেই লোকে বড়লোক হয় না, যার বড় মন সে-ই বড়লোক। বাইরের ঐশ্বর্য নিয়ে যারা মত্ত থাকে প্রায়ই তাদের ছোট মন হয়, গরীবের ঘরেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। এদেশে অনেক লোকই দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, রোগে ভুগে ওষুধ পায় না, শীতকালে কাপড় পায় না বর্ষার জল গ্রীষ্মের রোদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এদেশে গরীব হওয়া খুব একটা লজ্জার কথা নয়, এ দেশই গরীবের দেশ। আমরা সবাই দরিদ্র। যারা মোটরে চড়ে সিনেমা দেখে বাইরে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় তারাও দীন দুঃখী। তাদের বাইরের মুখোশটা খুলে ভিতরের চেহারা দেখলে তবে সেটা বোঝা যায়। ছেলেমানুষ যদু অতশত কিছু বুঝত না, নিজেদের দৈন্য দেখে তার ভারী দুঃখ হ'ত কেবল।

যদু যখন একটু বড় হ'ল তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল সংসারে। যদুকে স্কুলে পাঠাতে হবে। তার মানেই খরচ বাড়বে। স্কুলের মাইনে, বই খাতা পেন্সিল, আরও নানা রকমের খরচ। এতদিন যদু বাড়িতেই নিজে যতটুকু পারত পড়াশুনা করত তার মায়ের সাহায্যে। রবিবার দিন তার বাবা একটু সাহায্য করতেন তাকে। কিন্তু একদিন কালীমোহনবাবু বললেন—"এইবার যদু স্কুলে ভর্তি হোক, বাড়িতে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে কেবল—"

রাত্রে শোবার সময় এই নিয়ে আলোচনা হ'ল।

—"আমি না হয় এ মাস থেকে ওষুধটা আর কিনবো না, কি বল?"

মা বললেন, "উপকার যখন হয়েছে তখন খাও আরও কিছুদিন। ছেলের স্কুলের পড়ার খরচ হয়েই যাবে কোন রকমে—"

"দেখি"—দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল কালীমোহনবাবুর।

ওরা মনে করেছিলেন যদু ঘুমিয়েছে, যদু কিন্তু ঘুমোয়নি, সব শুনছিল সে শুয়ে শুয়ে। তার মনে হচ্ছিল, ঠিক কি যে মনে হচ্ছিল, তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো শক্ত—অবর্ণনীয় একটা বেদনা তার সারা বুক জুড়ে টনটন করছিল বিষ-ফোড়ার মত।…এত দুঃখ কেন তাদের…

যদু স্কুলে ভর্তি হ'ল।

তার বাবা মা কোনক্রমে পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন। প্রধান খরচ স্কুলের মাইনে বই খাতা পেন্সিল কলম। কিছু বই কালীমোহনবাবু চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করতেও পেরেছিলেন। এমনিভাবে অতিশয় দীন আয়োজন নিয়ে যদু বিদ্যামন্দিরে ঢুকলো। বাণী মন্দিরে কিন্তু ধনী দরিদ্রের সমান বিচার, যে গুণী তার ললাটেই জয়টীকা। যদু প্রথম হ'য়ে ক্লাস প্রমোশন পেলে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম! পাশের বাড়ির হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা, যারা শৌখীন জামা-কাপড় পরে মোটরে চড়ে বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাদের প্রাইভেট টিউটাররা পড়িয়ে যেত, তাদের মধ্যে একজন যদুর সঙ্গে পড়ত, তার ঐশ্বর্যের জাঁকজমক সত্ত্বেও তাকে কিন্তু যদুর নিচেই আসন গ্রহণ করতে হ'ল সরস্বতীর দরবারে।

যদু মহা-উৎসাহে পড়াশোনা করতে লাগল। প্রতি বছরই সে ফার্স্ট হয়। সে ভুলে গেল যে সে গরীবের ছেলে, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আদর্শে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার মন। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা নিদারুণ আঘাত লাগল।

সেদিন শনিবার ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে যদু দেখল যে একটা ফেরিওয়ালা এসে তার মাকে সাধাসাধি করছে কাপড় কেনবার জন্যে। মা যদিও তাকে বার বার বলছেন যে কাপড় কিনবেন না তিনি, তবু সে ছাড়বে না। শেষটা বললে—"দেখুনই না মা ঠাকরুন, দেখতে আর ক্ষতি কি—"

খুলে বসল সে কাপড়ের মোট। নানা রকম চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সুন্দর সুন্দর পাড়ওলা কাপড়, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। যদুর মা একটু ঝুঁকে একখানি কাপড়ের জমি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম এখানার?"

"তিন টাকা মা—"

"তিন টাকা!"

যদুর মা উঠে দাঁড়ালেন, তিন টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কেনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব!

"না, আমি কিনব না, তুমি যাও—"

ফেরিওয়ালা চলে গেল। যদুর কিন্তু ভারি কষ্ট হ'ল। সে মাকে বলল—"নাও না মা কাপড়খানা—"

"অত টাকা কোথায় পাব বাবা—"

সত্যিইতো, যদু চুপ ক'রে রইল।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। তার কেবলি মনে হতে লাগল কি হবে লেখাপড়া ক'রে, কি হবে ফার্স্ট হ'য়ে, যদি সে মায়ের দুঃখ ঘোচাতে না পারে। সামান্য তিন টাকা দামের কাপড়, তাও তার মা কিনে পরতে পারে না পয়সার অভাবে। অথচ তার পড়ার জন্যে মাসে চার পাঁচ টাকা

খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি হবে এ-অবস্থায় পড়ে শ্নে। রাস্তায় ঘ্রতে ঘ্রতে সেই ফেরিওয়ালাটার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'য়ে গেল।

"তোমার দোকানটা কোন্খানে বল তো ?"

ফেরিওয়ালা বলে দিলে কোন্খানে তার দোকানটা।

সেদিন সন্ধ্যার সময়—কালীমোহনবাব্ তখনও পড়িয়ে ফেরেননি, যদ্র মা রান্নাঘরে ব্যস্ত—যদ্ চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল হাতে একটা প্ট্‌লি নিয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরল চোরের মতন, তার বগলে কাগজে মোড়া সেই শাড়িখানা। নিজের বইগ্লো প্রোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি ক'রে সেই টাকা দিয়ে সে শাড়ি কিনে এনেছে মায়ের জন্যে। কালীমোহনবাব্ তখনও ফেরেন নি, মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে ছিলেন।

"কোথা গেছলি তুই ?"

যদ্ কি বলবে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক জেরার পর মার কাছে তাকে সব কথা শেষে বলতে হ'ল। শ্নে মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রদীপের ম্লান আলোয় মা আর ছেলে পরস্পরের দিকে নির্বাক হ'য়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের পরনে সেলাই-করা তালি-দেওয়া অর্ধমলিন শাড়ি, ছেলে তার প্রাইজের বই বিক্রি ক'রে মায়ের জন্যে ভাল শাড়ি কিনে এনেছে…

এর পর যদ্ আর প্রাইজ পায়নি। কারণ আর সে পরীক্ষা দেবার স্যোগই পায়নি। কিছ্দিন পরে কালীমোহনবাব্ হঠাৎ মাথা ঘ্রে রাস্তায় ম্খ থ্বড়ে পড়ে মারা গেলেন। ওষ্ধ কেনা অনেক দিন আগেই বন্ধ করেছিলেন। কালীমোহনবাব্র যা হ'য়েছিল যদ্রও তাই হ'ল, অর্থাভাবে পড়াশ্না বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল।

পাঁচ টাকার বাড়ি ছেড়ে, দ্'টাকার একটি বাড়িতে উঠে গেলেন যদ্র মা। যদ্ চাকরি খ্ঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক খ্ঁজে কিছ্ না পেয়ে শেষে রিক্শা টানার কাজ জ্টল একটা। উপায় কি ? নইলে যে না-খেয়ে মরতে হয়। যদ্র মা একজনের বাড়িতে রাঁধ্নিগিরি করতে লাগলেন। যদ্ রিক্শা টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগ্ল—বিদ্যাসাগর, ভূদেব, ব্কারটি ওয়াশিংটনের।

এইখানেই গল্পটি শেষ ক'রে দিলে গল্পের দিক থেকে বোধহয় ভাল হয়, কিন্তু সবটা বলা হয় না। তোমাদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হবে, দেশের দ্ঃখ ঘোচাবে, তোমাদের জেনে রাখা দরকার দেশের সত্যিকার দ্ঃখ কোথায়।

যদ্র মত ভাল ছেলে আমাদের দেশে অনেক জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ভাগ্যবলে ছিটকে পড়ে দ্'চার জন হয়তো মাথা তুলতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে অধিকাংশই মরে যায়! খেতে পায় না, পরতে পায় না, কেউ কিছ্ সাহায্য করে না, এরা অসহায়ভাবে ল্প্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের এমনই দ্র্ভাগ্য যে, এমন রত্নকে আমরা অহরহ হেলায় হারাচ্ছি, এদের দিকে ফিরে তাকাই না পর্যন্ত। এই যে আমাদের দেশ-জোড়া দারিদ্র্য এর কারণ কি, এর প্রতিকারের উপায় কি—তোমরা এখন থেকে জানতে চেষ্টা কর, ভাবতে চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো তোমাদের কেউ কেউ সত্যিই দেশের দ্ঃখ ঘোচাতে পারবে। এই যদ্ই হয়তো একদিন কত বড় হতে পারতো, কিন্তু পারলে না। খোলার ঘরের কোণে যক্ষ্মায় জীর্ণ হয়ে শেষে তিলে তিলে মরতে হ'ল তাকে অকালে। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট শরীরে রিক্শা টানা সইল না।

রাজা

নিপুর মামা বিজয়বাবু এলাহাবাদে থাকেন। সম্প্রতি তিনি কোলকাতায় এসেছেন। গোয়াবাগানে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে, সেইখানে এসেই উঠেছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিপুদের বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে মামার বাড়িতে। মেয়েরা সকালে আগেই চলে গেছেন। কথা আছে, বাবা আপিস থেকে সোজা সেইখানেই চলে যাবেন। নিপুর ঠাকুরদা যাননি। তিনি সন্ধ্যাবেলায় রোজ ঠাকুরঘরে পুজো করেন, আফিং খান। আফিং খাওয়ার ঘণ্টা-দুই পরে তবে ভাত খেতে বসেন। কথা আছে, দশটা-নাগাদ মোটর এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। নিপু, মিনু আর জগুও যায়নি। সন্ধ্যাবেলা মাস্টারমশাই তাদের পড়াতে আসেন। পড়াশোনা সেরে তারা ঠাকুরদার সঙ্গে যাবে এই ঠিক হ'য়ে আছে।

মাস্টারমশাই কিন্তু এলেন না। অগত্যা তারা তখন লুডো নিয়ে বসলো তিনজনে। একঘেয়ে লুডো-খেলা মোটেই ভালো লাগছিল না কারো। কিন্তু কি করা যায়, সময় তো কাটাতে হবে। এমন সময় ঠাকুরদা বেরিয়ে এলেন পুজোর ঘর থেকে।

—"মিনু, এক গ্লাস জল এনে দাও তো দিদি। আফিংটা খেয়ে ফেলি।"

মিনু জল এনে দিলে। ঠাকুরদা আফিঙের বড়িটি টুপ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

মিনু বললে—"ঠাকুরদা, যতক্ষণ মোটর না আসে ততক্ষণ একটা গল্প বলুন না—"

নিপু মহা উৎসাহে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ। লুডো-খেলা একটুও ভালো লাগছে না।"

জগু জিতছিল, তার খেলা বন্ধ করতে ততটা ইচ্ছে ছিল না, তবু সেও রাজী হ'য়ে গেল। ঠাকুরদার মেজাজ যদি ঠিক থাকে, গল্প জমবে ভালো।

—"গল্প ?"···ঠাকুরদা পাকা গোঁফ-জোড়া চুমরে মিনুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "এখন পড়াশোনার সময়, গল্প কেন ?"

—"মাস্টারমশাই আসেন নি যে।"

—"ও, আচ্ছা বেশ, এসো তাহলে।"

তিনজনে এসে বসলো ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা বললেন, "আলোটা নিবিয়ে দাও।"

মিনু উঠে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর শুরু করলেন :

—"এক ছিল রাজা—"

—"কি-রকম রাজা ?" মিনু প্রশ্ন করলে।

—"রাজা যে রকম হয়—"

—"চেহারা কি-রকম বলুন।"

—"রাজার চেহারা যেমন, তেমনি। প্রাংশু মহাভুজ—"

—"তার মানে ?"

—"শাল গাছের মত লম্বা, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাত, ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফের গোছা।"

মিনু নাক সিঁটকে বললে—"ও তো দরোয়ানের চেহারা। ওরকম হোঁৎকা রাজা চাই না।"

—"ও বাবা, কি-রকম রাজা তাহলে চাই তোমার।"

—"বেশ ভদ্র-চেহারা হবে। গোঁফের গোছা-টোছা চলবে না।"

ঠাকুরদা জগুর দিকে ফিরে বললেন, "জগুর কি মত ?"

জগু বললে—"আমার মনে হয়, রাজা যখন পুরুষমানুষ, তখন গোঁফ থাকাটা কিছু অন্যায় নয়।"

—"বিমলদা কি পুরুষমানুষ নয় ? ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., টেনিস চ্যাম্পিয়ন।" —মিনু ফোঁস ক'রে উঠলো।

—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঝগড়া কোরো না। নিপুর মতটা কি শোনা যাক্।"

নিপু বললে—"আমার মনে হয়, রাজার শুধু গোঁফ নয়, গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। ঐতিহাসিক-রাজাদের ছবি মনে করো—শাজাহান, পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড, শিবাজী···"

—"আকবর, জাহাঙ্গীর, রাণাপ্রতাপ, মানসিংহ, এদের কিন্তু দাড়ি ছিল না, কেবল গোঁফ ছিল। গোঁফ-দাড়ি নেই এ-রকম রাজা কল্পনাও করা যায় না।"

মিনুর দিকে চেয়ে জগু টিপ্পনী করলে।

মিনু বললে—"কেন, অষ্টম এডওয়ার্ড ?"

জগু হটবার পাত্র নয়।

সে বললে—"অষ্টম এডওয়ার্ড ? ক'দিন সে রাজত্ব করেছিল, শুনি ? আমার বিশ্বাস, গোঁফ-দাড়ি কিছু ছিল না বলেই রাজ্যটি রাখতে পারলে না সে।"

মিনু বললে—"আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজা, পণ্ডিতজী ? তাঁর দেখ গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু নেই।"

জগু বললে—"বোকচন্দ্র, পণ্ডিতজী রাজা নয়, মন্ত্রী। রাজা বরং বলতে পারো, রাজেন্দ্রপ্রসাদকে, তাঁর গোঁফ আছে।"

নিপু এতক্ষণ কিছু বলেনি। জগু থামতেই সে পুনরায় তার মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলে ঃ

—"আমার মতে, রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। পশুদের রাজা সিংহ, তার পর্যন্ত গোঁফ-দাড়ি আছে। মানুষের রাজার থাকবে না ?"

"—বেশ, তোমরা তাহলে গুঁপো আর দেড়ে-রাজার গল্প শোনো বসে। আমি অ্যাল্জ্যাব্রার অঙ্ক কষি গিয়ে।" মিনু রেগে উঠে যাচ্ছিলো। ঠাকুরদা বললেন, "শোনো, শোনো, অত রাগ কিসের। গল্পটা শুনেই দেখ না শেষপর্যন্ত।"

—"আমার রাজার গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি আগে থেকে।"

—"বেশ, বেশ, তাই হবে।"

জগু বললে—"মিনু তাহলে একাই বসে গল্প শুনুক, আমরা চললুম। আয়রে নিপু, চল্ আমরা লুডোই খেলিগে।"

—"আঃ, তোরা চুপ ক'রে বোস দিকি, গল্পটা শোনই-না শেষ-পর্যন্ত।"

নিপু বললে—"রাজার কিন্তু গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা চাই।"

—"বেশ-বেশ, তাই থাকবে। চুপ ক'রে বোস আগে।"

আবার তিনজনে বসলো তারা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ঠাকুরদা শুরু করলেন ঃ

—"এক ছিল রাজা। রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল—"

নিপু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো—"বাঃ।"

জগু বললে—"দুই-ই ? অত্যন্ত সেকেলে রাজা তাহলে।"

মিনু ঠাকুরদাকে শাসিয়ে বললে—"আচ্ছা, দেখবো, এবার কে তোমার আফিঙের কৌটো খুঁজে দেয়।"

ঠাকুরদা মুখে কিছু বললেন না কিন্তু মিনুর গায়ে ছোট্ট একটি চিমটি কেটে যা জানালেন, তার অর্থ—শোন্ না শেষপর্যন্ত, আগে থাকতেই ছট্‌ফট করছিস কেন ?

নিপু বললে—"তারপর ?"

ঠাকুরদা বললেন—"তুমিই বলো তোমার রাজা কি করবে। শিকার করবে, না ব্যবসা করবে, না অনাথাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করবে ?"

নিপু বললে—"শিকার। স্পোর্টস্‌ম্যান না হলে আর রাজা ?"

ঠাকুরদা শুরু করলেন আবার ঃ

—"এক ছিল রাজা। তাঁর গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল। একদিন সকালে উঠে গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁর মনটা কেমন হু-হু ক'রে উঠলো। মনে হতে লাগলো, কি যেন করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। রাজা বিচলিত-চিত্তে অন্দরমহলে গিয়ে বললেন, রাণী, আমার কি যেন করবার ছিল একটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না, কি করি বলো তো ?' রাণী বললেন, 'আমার শুক-পাখীকে জিজ্ঞেস করো, সে উপায় বলে দেবে।' রাণীর ছিল একটি অদ্ভুত ধরনের শুক-পাখী। গায়ে ময়ূরকণ্ঠী রং, ঠোঁট যেন প্রবাল দিয়ে তৈরি, চোখ দুটিতে জ্বলছে চুনি। ল্যাজটি বেশ বড় ; শুধু বড় নয়, ল্যাজের প্রত্যেকটি পালকে রামধনুর সাতটি রং ঝলমল করছে। মনে হচ্ছে যেন ময়ূরকণ্ঠী পাহাড় থেকে রামধনু-রঙের ঝরণা নেবেছে। রাণীর মর্মর-মহলে সোনার দাঁড়ে দুলছিল সেই পাখী। রাজা গেলেন তার কাছে। গিয়ে বললেন, 'শুক-পাখী, একটু আগে গোঁফে হাত দিয়ে আমার মনে হলো, কি যেন একটা করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। মনটা কেমন হু হু করছে, কি করি বলো দেখি ?' শুক-পাখী বললে, 'দাড়িতে হাত বোলাও, তাহলেই মনে পড়বে।' রাজা তখন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, শিকারে বেরুতে হবে। রাজা দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। এসেই মন্ত্রীকে হুকুম করলেন, 'মন্ত্রিন, আমি শিকারে বেরুবো। সব ব্যবস্থা করো।'···ঠাকুরদা চুপ করলেন।

জগু বললে—"নিতান্ত সেকেলে ধরনের রাজা দেখছি।"

—"তোমার একেলে রাজা কি করতেন, শুনি।"

—"প্রথমতঃ একেলে রাজার দাড়ি থাকতো না, দ্বিতীয়তঃ শিকার করবার জন্যে তাঁর মন হু-হু করতো না। একেলে রাজা প্লেনে চড়ে চলে যেতেন কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন করবার জন্যে, কিংবা—"

—"খুব হয়েছে, থাম্।"

নিপু থামিয়ে দিলে জগুকে।

—"তারপর ?"···মিনু জিগ্যেস করলে। গল্পটা তার ভালো লাগছিল।

—"তাঁর হাতীশালা থেকে বেরুলো হাতী, ঘোড়াশালা থেকে বেরুলো ঘোড়া। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ তোপ পড়তে লাগলো। বড় বড় পালোয়ানেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাজার সঙ্গে শিকারে যাবে বলে। রাজা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীরভাবে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে জলদগম্ভীর-স্বরে মন্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'মন্ত্রিন্, এসব থামিয়ে দাও। আমি বীর, আমি একা শিকারে যাবো। আমার পঞ্চলক্ষণ-কালো ঘোড়াটিকে আনতে বলো কেবল। তার উপর সওয়ার হয়ে আমি একাই বেরুবো। চোলপুর জঙ্গলে ভীষণ একটা বাঘ এসেছে শুনছি। আমি একাই তাকে মারবো।'

পঞ্চলক্ষণ কালো ঘোড়ায় রাজা একাই বেরিয়ে গেলেন। অন্দরমহলে শুক-পক্ষী রাণীকে ডেকে বললেন—'রাণী, রাজা আর ফিরবে না। এইবার তুমি আমার পিঠে চড়ে বোসো। আমি তোমাকে পরজন্মে নিয়ে যাবো। সেইখানেই রাজার সঙ্গে আবার দেখা হবে তোমার। আমি দেহ বাড়াচ্ছি, তুমি একটু ছোট হও।'

শুক-পক্ষী দেখতে দেখতে বিরাট গরুড়-পক্ষী হ'য়ে গেল, আর রাণী হ'য়ে গেলেন ছোট্ট একটি বেণী-দোলানো কিশোরী। অনেকটা আমাদের মিনুর মতো—"

—"ধেৎ!" মিনু ছোট্ট একটি চাপড় মারলে ঠাকুরদাকে।

—"তারপর ?" নিপুর সত্যিই এবার ভালো লাগছিল গল্পটা। জগুরও লাগছিল, যদিও সে চুপ করে ছিল।

—"রাণী শুক-পক্ষীর পিঠে চড়ে সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।"

—"রাজার কি হলো ?"

—"রাজা পঞ্চলক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ ক'রে ছুটে চলেছিলেন চোল-জঙ্গলের উদ্দেশে। হাওয়াতে ফুরফুর ক'রে তাঁর দাড়ি উড়ছিল, আর উড়ছিল শিরস্ত্রাণের পালকটি। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছিলেন তিনি। সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে চোল-জঙ্গলের কাছে এলেন যখন তিনি, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে চোল-জঙ্গলের চেহারা দেখে, রাজার মত বীরের বুকটাও কেঁপে উঠলো। আকাশ পর্যন্ত ঠাসা জঙ্গল, কোথাও একটু ফাঁক নেই, মনে হচ্ছে, অন্ধকারের একটা বিরাট পাহাড় যেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা। তারপর পঞ্চলক্ষণকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'পঞ্চলক্ষণ, এই ভয়ংকর চোল-জঙ্গলে ঢুকতে তোমার ভয় করবে না তো ?"

পঞ্চলক্ষণ উত্তর দিলে—'আপনার যদি ভয় না করে, আমারও করবে না।'

—'ঢোকা কি উচিত ?'

—'আজ না-হয় কাল আমাদের ঢুকতেই হবে, কারণ, আমাদের পরজন্ম অপেক্ষা ক'রে আছে ওই অন্ধকারের ভিতরে।'

—'তাহলে বিলম্ব ক'রে লাভ কি ?'

—'কোনো লাভ নেই।'

—'চলো তাহলে।'

ঘাড় বেঁকিয়ে টগবগ-টগবগ করতে করতে ঢুকে পড়লো পঞ্চলক্ষণ চোল-জঙ্গলের ভিতর। গভীর অরণ্য, ছোট-ছোট ঝোপে-ঝাড়ে বারবার গতি রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত অস্ফুট শব্দে শিউরে উঠছে অন্ধকার, পঞ্চলক্ষণ কিন্তু চলেছে নির্ভয়ে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলবার পর আলো দেখা গেল একটু। পঞ্চলক্ষণ এগিয়ে চললো সেই দিকে। ঝোপঝাড় ভেদ ক'রে শেষে গিয়ে হাজির হলো ফাঁকা জায়গায়, দেখলে, সেখানে দাউদাউ ক'রে মশাল জ্বলছে একটা। দাঁড়াতেই চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে গর্জন হলো—হালুম! তারপরই একলম্ফে বেরিয়ে এলো এক হাফ-প্যাণ্ট-পরা বিরাট বাঘ! এসেই পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা দিয়ে গোঁফ চুমরে, রাজাকে সম্বোধন ক'রে বাঘ বললে—'তুমি চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে এসেছো?'

রাজা বললেন—'হ্যাঁ।'

—'মারো আমাকে। এই আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছি।'

বাঘ পিছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে সতি-সত্যি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজার মনে হলো, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি তাঁর তূণ থেকে সবচেয়ে মারাত্মক তীরটি বার ক'রে ছুঁড়লেন। ঠিক বুকের মাঝখানে লাগলোও গিয়ে তীরটি, কিন্তু হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘের কিচ্ছু হলো না। হা-হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠলো সে। তারপর থাবা দিয়ে তীরটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে বুক থেকে, মনে হলো যেন ছোট একটা মাছি তাড়িয়ে দিলে। রাজা আবার একটা তীর ছুঁড়লেন, আবার সেই ব্যাপার। ফের একটা ছুঁড়লেন, ফের সেই কাণ্ড! রাজা তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঘের কিছু হচ্ছে না। বাঘ প্রত্যেকবারই হা-হা ক'রে হাসছে, আর থাবা দিয়ে তীর ঝেড়ে ফেলছে।

শেষকালে রাজার সব তীর ফুরিয়ে গেল।

হাফ-প্যাণ্ট পরা বাঘ আবার অট্টহাস্য ক'রে উঠলো ঃ

—তোমার তীর ফুরিয়ে গেল, রাজা—এইবার তলোয়ার বার করো। আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—'

রাজা রাগে গরগর করছিল। তাঁর মনে হচ্ছিলো, যে-কামার তীরগুলো বানিয়েছে, সে তীরে শান দেয়নি ভাল ক'রে। এবার ফিরে গিয়ে তাকে শূলে চড়াতে হবে। তলোয়ারটার উপর কিন্তু তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। এক পারসী ফেরিওলার কাছ থেকে নিজে পছন্দ ক'রে তিনি কিনেছিলেন তলোয়ারটা। ক্ষুরধার তলোয়ার। খাপ থেকে সড়াৎ ক'রে সেটা বার ক'রে পঞ্চলক্ষণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন রাজা।

হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘ ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল। রাজার মুখের দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বলল—'চালাও তোমার তলোয়ার। যত জোরে পারো কোপ মারো।'

রাজা মারলেন কোপ।

তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাজা নির্বাক নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঘ আবার হা হা ক'রে হেসে উঠলো। তারপর রাজার দিকে ফিরে বলল—'রাজা, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমার এ বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সামনে আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। দোষ তোমার অস্ত্রের নয়।'

—'কিসের তবে?'

—'তোমার দাড়ির।'

—'দাড়ির ?'

—'হ্যাঁ, দাড়ির। যতক্ষণ তোমার দাড়ি আছে, ততক্ষণ তুমি আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। মহর্ষি জগুর শিষ্য আমি। তিনি তপস্যাবলে জেনেছিলেন যে দাড়িওলা প্রায়ই বাজে মার্কা হয়, তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, দাড়িওলা কোনও রাজা যদি তোমাকে মারতে আসে তাহলে তুমি নির্ভয়ে গিয়ে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারো, সে তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

জগু নিপুর কানে ফিসফিস ক'রে বললে—"ঠাকুরদার আফিঙে নেশাটি বেশ জমে এসেছে এবার।"

মিনু রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সে বললে—"তারপর ?"

ঠাকুরদা অর্ধ-নিমীলিত নয়নে বলতে লাগলেন ঃ "হাফ-প্যাণ্ট-পরা বাঘের মুখে এই কথা শুনে রাজা তো অবাক্ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি জিগ্যেস করলেন—'মহর্ষি জগু তো একজন মহাজ্ঞানী লোক। তুমি বাঘ হয়ে কি ক'রে তাঁর শিষ্য হলে ?' বাঘ বললে—'আমি বাঘ নই, আমি মানুষ। খাকি হ্যাফ-প্যাণ্ট পরে আমি চুরি ক'রে বেড়াতাম। মহর্ষি জগু তাই রেগে একদিন অভিশাপ দিয়ে আমাকে বাঘ ক'রে দিয়েছিলেন। আমি বাঘ হ'য়ে গেলাম, কিন্তু আমার খাকি হাফ-প্যাণ্টটা কিছুতেই খুললো না। সুতরাং বাঘেরাও আমাকে একঘরে করলে। বললে—প্যাণ্ট-পরা বাঘকে আমরা সমাজে স্থান দেবো না। তখন মহর্ষি জগুকে একদিন গিয়ে মিনতি ক'রে বললাম—প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন এবার। আবার মানুষ ক'রে দিন। এই হাফ-প্যাণ্টের জন্যে বাঘেরাও আমাকে সমাজে নিচ্ছে না। মহর্ষি জগু তখন বললেন, যদি কোনোদিন কোনো দেড়ে-রাজা চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে আসে, তাহলে তার সামনে তুমি গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম—যদি সে আমাকে মেরে ফেলে ? মহর্ষি বললেন—দেড়ে-রাজারা অতিশয় বাজে-মার্কা রাজা হয়, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু যদি কখনও এমন কোনও রাজা আসে, যার গোঁফ আছে অথচ দাড়ি নেই, সেই রাজার যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে আমার আশ্রমে নিয়ে এসো। তাঁকে দিয়ে আমার একটু কাজ করিয়ে নিতে হবে।'

রাজা প্রশ্ন করলেন—'মহর্ষি জগুর আশ্রম এখান থেকে কত দূরে ?'

—'কাছেই।'

রাজা একটু ইতস্তত করছিলেন যে সত্য কথাটা প্রকাশ ক'রে বলবেন কি না।

পঞ্চলক্ষণ বললে—'মহারাজ, সত্যকথা প্রকাশ ক'রে বলুন।'

রাজা তখন টান মেরে দাড়িটা খুলে ফেলে বললেন, 'দেখ, এ দাড়ি আমার নিজের দাড়ি নয়। আমার গুরুদেব মহর্ষি নিপুর আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পড়ে থাকতে হয়। রাখবার মতো দাড়ি আমার হয়নি, কিন্তু মহর্ষি নিপুর ধারণা, দাড়ি না থাকলে রাজাকে মানাবে না, তাই তাঁরই আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে থাকতে হয়েছে।'

বাঘ বললে—'মহারাজ, তাহলে এইবার আমাকে পদধূলি দিন, আমি আবার মানুষ হই।'

রাজা জুতো-মোজা খুলে মাটিতে পা ঘষে পায়ে খানিকটা ধুলো লাগিয়ে নিলেন,

(রাজার পায়ে ধুলো থাকবে কি ক'রে), তারপর সেই ধুলো বাঘের মাথায় দিতেই বাঘ মানুষ হয়ে গেল। ছোট বেঁটে কালো কুচকুচে চেহারার একটি মানুষ।

সে সবিনয়ে বললে—'আমার নাম রংলাল। চলুন, এইবার আপনাকে মহর্ষি জগুর আশ্রমে নিয়ে যাই।'

নিপু মুচকি-মুচকি হাসছিল, এইবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

—"সত্যি দাদু, তোমার আফিঙের নেশাটা আজ জমেছে ভালো।"

মিনু বললে—"আঃ, চুপ কর্ না। তারপর কি হলো দাদু?"

ঠাকুরদা বললেন, "মহর্ষি জগুর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। মহর্ষি জগু তখন ক্রশওয়ার্ড পাজল নিয়ে তন্ময় হ'য়ে বসেছিলেন। রংলালের মুখে সব কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মতোই একজন লোক আমি খুঁজছিলাম। কোরিয়াতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়েছে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে। তাদের শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে যে, দেখ বাছারা, দুই আর দুই যোগ করলে চারই হয়, পাঁচ কিংবা ছয় কখনও হয় না। এই কথাটি মেনে নিয়ে তোমরা শান্ত হও।' রাজা বললেন, 'কোরিয়ায় যাবো কি ক'রে?' মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরে ঢুকে ছোট্ট একটি রেডিও নিয়ে এলেন। বাইরের বারান্দায় একটা গামলায় টগবগ ক'রে জল ফুটছিল। মহর্ষি রেডিওটি সেই ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে বললেন—'এই রেডিও সিদ্ধ জল একটু খেলেই তুমি যে-কোনও ভাষায় কথা কইতে পারবে।' তারপর তিনি রাজার মাথায় ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে রাজার চেহারা গেল বদলে। দেখতে-দেখতে তিনি ছিপছিপে একটি যুবক হয়ে গেলেন। কুচকুচে কালো গোঁফ, চমৎকার টানা-চোখ, কোঁকড়ানো চুল। ঠিক অনেকটা মিনুর বিমলদার মতো—"

—"বাজে কথা বলবেন না, বিমলদার গোঁফ নেই।"

ফোঁস ক'রে উঠলো মিনু—"তারপর কি হলো, বলুন।"

—"তারপর, মহর্ষি জগু পঞ্চলক্ষণের কপালেও একটি চন্দনের টিপ দিলেন। পঞ্চলক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল একটি ছোট্ট এরোপ্লেন। মহর্ষি তখন বললেন, 'এই যে রংলালকে দেখছো, এ একজন ভালো পাইলট। কিন্তু গত যুদ্ধে গিয়ে নানারকম কুসঙ্গে পড়ে লোকটা গুলি খেতে শিখলো। ফলে—কিছুদিন পরে চাকরি গেল। গুলির পয়সা জোটে না, লোকের পকেট মেরে বেড়াতে লাগলো শেষটা। মানে, ছিঁচকে চোর হ'য়ে দাঁড়ালো একটি। একদিন দেখি, আমার গাড়ুটা নিয়ে পালাচ্ছে। রেগে আমি ওকে বাঘ ক'রে দিলুম। তারপর যা-যা হয়েছে তা তো তুমি জানোই। রংলালের পথ-ঘাট সব জানা আছে, সে তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে কোরিয়ায় পৌঁছে দেবে ঠিক। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে রওনা হ'য়ে পড়ো তুমি।'

প্লেন আকাশে উড়লো। উড়ছে তো উড়ছেই। কত দিন, কত রাত্রি যে পার হ'য়ে গেল তার ঠিক নেই। মাথার উপর আকাশ কখনও নক্ষত্র-ভরা, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও মেঘে-ছাওয়া, কখনও রোদে উজ্জ্বল—আসছে আর চলে যাচ্ছে। আর পায়ের নীচে পৃথিবীরও রূপ বদলাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে—নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, গ্রাম, নগর, শস্য-শ্যামল মাঠ, কত যে এলো আর গেল। গরর্র্ গরর্র্র্ উড়ে চলেছে প্লেন, যে প্লেন একটু আগে ছিল পঞ্চলক্ষণ ঘোড়া।

হঠাৎ রংলাল প্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। রাজা বললেন, 'প্লেনটা ঘোরালে যে?'

রংলাল কিছু না বলে হাসিমুখে রাজার দিকে চাইলে কেবল একবার। রাজা আর কিছু বললেন না, তাঁর মনে হলো, কোরিয়া যাবার রাস্তাই বুঝি এইটে।

খানিকক্ষণ পরে রংলাল বললে—'ওই যে নীল আকাশের গায়ে কালো মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ। কালো মেঘ একটা।'

—'মেঘ নয়, পাহাড়, আফিঙের পাহাড়।'

—'তাই নাকি?'

—'ওখান থেকে এক-চাঙড় আফিং তুলে নেবো ভাবছি। কোরিয়ায় ডামাডোল এখন, আফিং পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখাই ভালো।'

বোঁ-বোঁ ক'রে প্লেন উড়ে চললো আফিঙের পাহাড়ের দিকে। কাছাকাছি আসতেই রাজা দেখতে পেলেন, কালো পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা কার্পেটের মতো কি যেন বিছানো রয়েছে।

রংলাল বললে—'আফিঙের ফুল ফুটেছে। এই পাহাড়ের চারদিক ঘিরে আছে আফিঙের বন। বারো মাস, তিরিশ দিন ফুল ফোটে। মায়াবিনী রাজকন্যার রাজত্ব কিনা এটা। আমি টুক্ ক'রে নেবে, চট্ ক'রে নিয়ে আসি খানিকটা আফিং, তারপর একেবারে সোজা পাড়ি দেবো কোরিয়ার দিকে।'

আফিঙের বনের পাশে নামলো প্লেন। রংলাল প্লেন থেকে নেবে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রাজাও নাবলেন। নেবেই কিন্তু রাজা অপূর্ব একটা গন্ধ পেলেন। চারদিকের বাতাস সেই গন্ধে যেন ভারী হ'য়ে রয়েছে। অদ্ভুত সে গন্ধ, চমৎকার। রাজা আচ্ছন্নের মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো, কি সুন্দর! কি অপূর্ব! ক্রমশঃ, তাঁর ঘুম পেতে লাগলো। ভাবলেন, প্লেনের ভিতর ঢুকেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ঠেস দিয়ে। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, প্লেন নেই, প্রজাপতি হয়ে সেটা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিঙের ফুলে-ফুলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন-নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হলো। আফিঙের ফুলগুলো একটা যেন আর-একটার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো, দেখতে-দেখতে সমস্ত ফুলগুলো এক হ'য়ে গেল, আর তার থেকে বেরিয়ে এলো এক রাঙা পরী, তার হাতে একটি বাঁশী। সে রাজাকে এসে বললে—রাজা, এই বাঁশী নাও, আর বাজাতে বাজাতে চলো আমাদের রাজকন্যার কাছে। রাজা জিগ্যেস করলেন—কে সেই রাজকন্যা? পরী বললে—মায়াবিনী রাজকন্যা, নাম তাঁর—মীনাবতী। চলো তার কাছে। রাজা বললেন, বেশ, চলো। পরীর সঙ্গে সঙ্গে রাজা চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটা পুকুর দেখা গেল। পুকুরের ধারে এসে পরী বললে—রাজা, এইবার একটি কাজ করতে হবে। এই নাও 'সেফ্‌টি রেজার'। ওই পুকুরের আয়নার সাহায্যে তোমার গোঁফটি কামিয়ে ফেল। মীনাবতী রাজকন্যা গোঁফ পছন্দ করেন না।

পুকুরের পাড়ে ব'সে পুকুরের স্বচ্ছ জলে রাজা নিজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সেফ্‌টি রেজার দিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলতে দেরি হলো না।

তারপর রাজা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চললেন মীনাবতী রাজকন্যার উদ্দেশে।

মিনু বললে, "ধ্যেৎ!"

এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

জগু বললে, "ঐ বোধহয় আমাদের নিতে মোটর এলো।" মোটর থেকে নাবলেন মিনুর বাবা। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন, "আপিস থেকে একটা ট্যাক্সি ক'রে সোজা এইখানেই আগে চলে এলাম, ভাবলাম, তোমাকে সুখবরটা দিয়ে যাই। বিমলের সঙ্গে মিনুর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। ওদের মত হয়েছে, বিমলের বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, একটু আগে আপিসেই পেলাম টেলিগ্রামটা—"

মিনু উঠে একছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

নবাব সাহেব

নবাব সাহেবকে তিনবার দেখেছিলাম। একবার সামনা-সামনি; আর দু'বার মনে মনে। সামনা-সামনিও বেশীক্ষণ দেখিনি, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। সেই গল্পটাই আমি বলি।

আমি সেখানে ডাক্তারি করতাম। একদিন খবর পেলাম, কয়েকজন বড়লোক মিলে নবাব সাহেবকে চা খাওয়াবেন ঠিক করেছেন। তাঁকে সঙ্গ দান করবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হবে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন থাকব। যিনি আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, আপনার পরিবার কবে আসবেন?"

"আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে।"

"তাহলে নবাব সাহেবের খানা তৈরি করবার জন্যে বাড়িটা যদি ব্যবহার করতে দেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের কারও বাড়িতে এত ফাঁকা জায়গা নেই, তাছাড়া যা শুনছি—"

এই বলে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

"কি শুনছেন?"

"আমাদের মতো সাধারণ কোন লোককে চা খাওয়ালে এত হাঙ্গামা কিছুই করতে হ'ত না। কিন্তু নবাব সাহেবের কথা আলাদা। খানা রাঁধবার জন্য তাঁর নিজের লোকজন আসবে। তিনজন সাধারণ বাবুর্চি, একজন হেড বাবুর্চি। তাঁরা এসে যা যা চাই ফরমাশ করবেন, একদিন আগে এসে রাঁধবার জায়গা, উনুন-টুনুন ঠিক ক'রে যাবেন। তারপর যেদিন খাওয়ানো হবে সেইদিন ভোর থেকে এসে রাঁধবেন। অনেক ঝঞ্ঝাট মশাই। আপনার বাড়িটা বড়ও আছে, ফাঁকাও আছে, তাই বলছি আপনার বাড়িটা যদি দেন—"

বাড়ির ভিতর এত হাঙ্গামা করবার ইচ্ছে আমারও হচ্ছিল না, কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বলতে হল—"বেশ তো, আমার আপত্তি কি। আচ্ছা, নবাব সাহেবকে আপনারা হঠাৎ চা খাওয়াচ্ছেন কেন বুঝলাম না।"

ভদ্রলোক ভুরু দুটো কপালের উপর তুলে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ।

"নবাব সাহেবকে চা খাওয়াতে পারা একটা সৌভাগ্য তা জানেন? উনি কারও বাড়িতে কখনও খেতে যান না, আমরা গত চার বছর ধরে অনুরোধ করছি ওঁকে। এবারে কি জানি কেন রাজী হয়েছেন—"

আমি চুপ ক'রে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি খুব—"

"উনি আমাদের একজন মস্ত বড় খাতক।"

"তার মানে?"

"আমরা হাজার হাজার টাকা ধার দিই ওঁকে। যখনই দরকার হয় আমাদের খবর দেন, আমরা গিয়ে টাকা পোঁছে দিয়ে আসি।"

এবার আমি অবাক্ হলাম। চিরকাল জানি, যে টাকা ধার নেয় সে-ই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকে যে টাকা ধার দেয় তার কাছে। এ যে দেখছি উল্‌টো ব্যাপার!

"উনি অনেক টাকা ধার করেন বুঝি?"

"অনেক!"

"শোধও করেন ঠিক ঠিক?"

"করেন, কিন্তু ঠিক ঠিক নয়। আমরা ওঁর কাছ থেকে কখনও কোনও হ্যাণ্ডনোট নিই না! এমনি টাকা দিই। তারপর যখন শুনি ওঁর হাতে টাকা আছে তখন একদিন গিয়ে কুর্ণিশ ক'রে বলি যে অমুক দিন আপনার হুকুমে এত টাকা আপনার খিদমতের (সেবার) জন্য দিয়েছিলাম, এখন যদি সেটা পাই তাহলে বড় উপকার হয়।

সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়ে দেন। যত টাকা চাইব তৎক্ষণাৎ তত টাকাই পেয়ে যাব। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যদি দশ হাজার টাকা চাই তা-ও পাব। কখনও জিগ্যেস পর্যন্ত করবেন না। সত্যিকার নবাব উনি, বুঝলেন?"

চুপ ক'রে রইলাম, কি আর বলব! লোকটিকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম একটু।

নবাব সাহেবের কথা শুনেছিলাম আমিও, কিন্তু দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। ডাক্তার হিসাবে সে অঞ্চলে সেই সবে গেছি।

"কবে আসবেন উনি?"

"দিন চারেক পরে। মানে, আগামী বুধবার বেলা পাঁচটায়। ওঁর বাবুর্চিরা কাল আসবে।"

যথাসময়ে বাবুর্চিরা এল। বাবুর্চিদের দেখে আমার চক্ষুস্থির। আসল নবাব সাহেব কি রকম হবেন জানি না, কিন্তু এঁরা দেখলাম প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। একজনের দাড়িতে মেহেদী লাগানো, একজনের পায়ে মখমলের জুতো, আদ্দির পাঞ্জাবির উপর মখমলের বান্‌ডি পরে আছেন একজন; আর একজনের আঙুলে যে আঙটিটা রয়েছে, মনে হ'ল তা আসল হীরের। যিনি হেড বাবুর্চি তিনি পড়ে এসেছেন, নিখুঁত সাহেবী পোশাক, কথা বলছেন নিখুঁত ইংরেজীতে। শুনলাম ইনি বিলেত-ফেরত। মোগলাই, পাঠানী, ইংরেজী, ফরাসী, ইটালিয়ান, গোয়ানিজ, জার্মানী, জাপানী, চীনা—নানারকম রান্না জানেন। বেতন পান পাঁচ শ' টাকা।

আমি তো দেখে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেককে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তাঁরাও আমাকে সম্ভ্রমসহকারে আদাব করলেন। যিনি হেড বাবুর্চি

তিনিই বসলেন চেয়ারে, বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন। যে বড়লোকেরা নবাব সাহেবকে খাওয়াবেন তাঁদের মধ্যেও একজন এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। হেড বাবুর্চি তাঁকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "নবাব সাহেবকে কি খাওয়াবেন আপনারা ?"

"চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু শুধু চা কি নবাব সাহেবকে দেওয়া যায় ? ওর সঙ্গে কিছু পোলাও, মাংস, আর আপনি যা যা ভাল মনে করেন তাই থাকবে। আমরা ফিরপোতে পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, জ্যাম জেলির অর্ডার দিয়েছি। কিছু প্লেট, আর চায়ের বাসনপত্র নিয়ে সেখান থেকে লোকও আসবে একজন। চায়ের আর বাসনপত্রের ভার তারা নিয়েছে—"

হেড বাবুর্চি বললেন, "কিন্তু তারা সোনার বাসনপত্র আনতে পারবে কি ? নবাব সাহেবকে যখন খাওয়াচ্ছেন, তখন—"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন।

"ক'জন লোককে খাওয়াচ্ছেন আপনারা ?"

"জন দশেক।"

"মোটে জন দশেক ? তাহলে আমিই সোনার প্লেট আর বাসন নিয়ে আসব।"

"ফিরপোকে মানা ক'রে দেব ?"

"আসুক তারা। চায়ের কাপ-টাপগুলো দরকার হবে। এইবার আমাকে একটা কাগজ দিন তো। ফর্দ ক'রে ফেলি একটা।"

আমি একটা চিঠি লেখবার প্যাড এগিয়ে দিলাম। হেড বাবুর্চি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "দশজনকে খাওয়াচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

হেড্ বাবুর্চি মিনিট খানেক চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হয় চায়ের সঙ্গে বেশী কিছু ক'রে দরকার নেই। দু'রকম পোলাও হোক, সফেদ আর জরদা। আর কাবাব হোক চার রকমের। চায়ের সঙ্গে 'কারী' সুবিধে হবে না। আমি সেই অনুসারেই ফর্দ করেছি। কিছু নিমকি, কচুরি, সিঙাড়াও রাখতে পারেন। এখানে ভাল ঘি পাওয়া যাবে কি ? যদি না যায় তাহলে আমাকেই সেটা আনতে হবে, ভাল ময়দাও আমি দিতে পারি আমার বাবুর্চিখানা থেকে। নবাব সাহেবের জন্য কাশ্মীরী মেয়েরা নিজের হাতে তৈরি ক'রে পাঠায়। ময়দা আসে পাঞ্জাব থেকে—"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, ঘি আর ময়দা আপনি আনবেন, দাম যা লাগে দেব।"

"দাম ? আমরা মুদী নই বাবু সাহেব!"

হেড বাবুর্চির মুখে সম্ভ্রমপূর্ণ বিনীত হাসি ফুটে উঠল একটা।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, "মাফ করবেন আমাকে।"

হেড বাবুর্চি বললেন, "যে সব জিনিসের ফর্দ ক'রে দিচ্ছি আপনারা সেইগুলো যোগাড় ক'রে রাখবেন। পরশু সকালে, মানে মঙ্গলবার সকালে আমি আবার আসব। কাল গোটা দুই চাকর চাই, তারা উঠোনটাকে পরিষ্কার করুক ; রাজমিস্ত্রীও চাই একজন, উনুন তৈরি করবে। রমজান আলী, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে উনুন তৈরি করাবে—"

"জি হুজুর।"

হীরের আংটি পরা রমজান আলী সেলাম ক'রে গ্রহণ করলে তাঁর হুকুম।

তারপর তিনি গফুর খাঁকে হুকুম করলেন, "তুমি বাবুর্চিখানা সাজাবে। ফুলের টব, ফুলদানি, গলিচা, কুর্সি যা যা তোমার দরকার বাবুসাহেবকে বলে দাও, ইনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

গফুর খাঁ আদাব ক'রে সেই ভদ্রলোককে বললেন; "কুড়ি-বাইশটা ফুলের টব, একটা ভালো ফুলদানি, একটা গালিচা আর একটা আরাম-কুর্সি চাই। আরাম-কুর্সির দুপাশে রাখবার জন্য দুটো ছোট টেবিলও দরকার। একটা আতরদান চাই, সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্য একটা ছাই-দানও চাই। আর একটা ভাল চাঁদোয়া—"

আমি একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

রান্নার জায়গা সাজাবার জন্য এত সরঞ্জাম চাই না কি!

জিজ্ঞাসা করলাম, "যেখানে রান্না হবে সেখানে এত সব জিনিস লাগবে?"

হেড্ বাবুর্চি নিখুঁত ইংরেজিতে উত্তর দিলেন মৃদু হেসে—"নিশ্চয়। বাবুর্চিদের মেজাজ যদি ভালো না থাকে, চারদিকে আবহাওয়া যদি আনন্দপূর্ণ না হয়, তাহলে রান্না ভাল হবে কি ক'রে? যেখানে নবাব সাহেবের জন্য খানা তৈরি হবে, সেখানে পরিবেশটা ভাল করতে হবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

সেই ধনী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন বেশ।

"এবার ফর্দটা ক'রে ফেলি। দশজন লোক খাওয়াবেন তো?"

"হ্যাঁ, দশজন।"

হেড্ বাবুর্চি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি গিয়েই বাড়ি থেকে ফর্দ পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই। এখানে করলে হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে কিছু। একটু পরেই আমার লোক এসে ফর্দ দিয়ে যাবে। আমি এখন উঠি। ফর্দটা পেয়ে আপনি জিনিসগুলি আনিয়ে রেখে দেবেন। আবিদ মিঞা, তুমি কাল এসে নবাব সাহেব যে ঘরে খাবেন, সেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলো। ঝাড়লণ্ঠন আছে তো?"

ধনী ভদ্রলোক বললেন, 'আছে। ক'টা লাগবে?"

"যদি বড় হল্ হয় তাহলে দশ-বারোটা লাগবে।"

"আচ্ছা। তা সে যোগাড় হয়ে যাবে।"

তৃতীয় বাবুর্চি আবিদ মিঞা সেলাম ক'রে সরে দাঁড়াল। হেড বাবুর্চি উঠে যথারীতি সকলকে আদাব ক'রে বিদায় নিলেন। বাকী তিনজনও তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে গেল। বলে গেল কাল সকালে আবার আসবে। সেই ধনী ব্যক্তিটি পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপাল, মুখ, ঘাড় ভাল ক'রে মুছলেন, তারপর বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম শ'-দুই টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যে রকম আঁচ পাচ্ছি আরও বেশী লাগবে। লাগবেই তো, নবাব সাহেবকে খাওয়ানো কি সোজা কথা! আচ্ছা, আমিও এখন উঠি। ফর্দটা যদি এখানে দিয়ে যায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আচ্ছা।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে আমার হাতেই ফর্দ'টি দিয়ে গেল। ফর্দ দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। সন্দেহ হ'ল লোকটা পাগল নয় তো! আমরা মাত্র দশজন খাব, আর ফর্দ দিয়েছে—সাতটা খাসির (প্রত্যেকটির ওজন ৭ থেকে ১০ সেরের মধ্যে হওয়া চাই), সফেদ পোলাওয়ের জন্য সরু আলো চাল (তুলসী মঞ্জরী বা কাটারি ভোগ) আধমণ, জরদা পোলাওয়ের জন্য ভাল পেশোয়ারী চাল আধমণ। তাছাড়া পোলাওয়ের মশলা কুড়ি রকম, প্রত্যেকটি পাঁচ সের ক'রে, জাফরান কেবল দু' সের। পেঁয়াজ দশ সের, রসুন দশ সের, আদা পাঁচ সের—কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রত্যেকটি পাঁচ সের! অবাক কাণ্ড! যাই হোক, ফর্দ সেই ভদ্রলোকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। যাঁরা নবাব সাহেবকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁরাই ঠিক করুন কি করবেন। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব! যথাসময়ে গিয়ে খেয়ে আসব আর দেখে আসব নবাব সাহেবকে। ফর্দ পাঠিয়ে দিলাম। তারপর রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রমজান আলী, গফুর খাঁ আর আবিদ মিঞা এসে হাজির হ'ল। একজন রাজমিস্ত্রি আর দুটো কুলীও এল। দেখলাম কিছু ইট আর সিমেণ্টও এসেছে। আমার বাড়ির পিছন দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে আমি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম বেলা দুটো নাগাদ। ফিরে দেখি জায়গাটার চেহারাই বদলে দিয়েছে তারা! চেঁছে-ছুলে জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে, পাকা উনুন তৈরি করেছে চমৎকার, ফুলের টব সাজিয়ে দিয়েছে চারদিকে, সুন্দর চাঁদোয়া টাঙিয়েছে একটা, চাঁদোয়ায় চমৎকার কাজ করা, চাঁদোয়ার বাঁশগুলো পর্যন্ত জরি-বসানো শালু দিয়ে মোড়া। কাছেই দেখলাম একটা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারা আর গোটা দুই তেপায়া রয়েছে! ফুলদানী, আতরদান, ছাইদানও এসে গেছে। একটা গালিচাও পাট করা রয়েছে দেখলাম।

রমজান আলী সসম্ভ্রমে আমাকে বললে, "গালিচা, তেপায়া, চেয়ার বুধবার সকালে কাজে লাগবে হুজুর! আতরদান, ফুলদানী আর ছাইদানও তখনই দরকার হবে। এখন এগুলো আপনার একটা ঘরে রাখিয়ে দিচ্ছি—"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এগুলো দিয়ে কি হবে?"

"নুর মহম্মদ সাহেব, মানে, হেড বাবুর্চি সাহেব, বসবেন। গালিচা পেতে তার উপর আরাম-কুর্সি'টা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সি'টা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সি'র দু'পাশে তেপায়া দুটো থাকবে। একটাতে থাকবে আতরদান, ফুলদানী আর একটাতে ছাইদান।"

কি কাণ্ড! কিছু না বলে জিনিসগুলো ঘরের ভিতর রাখিয়ে দিলাম। তার পরদিন ফর্দ অনুযায়ী অন্যান্য জিনিসপত্রও এসে পড়ল। সাতটা পুষ্ট খাসী ব্যা ব্যা করতে লাগল আমার বাড়ির সামনে। চাল মশলা সব এসে পড়ল। একটু পরে কাশ্মীরী ঘি আর পাঞ্জাবী ময়দা নিয়ে নুর মহম্মদ সাহেব স্বয়ং এসে গেলেন। সেই ধনী ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দেখলাম।

এইবার আর একবার আশ্চর্য হবার পালা। নুর মহম্মদ সাহেব ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি খাসীকে দেখতে লাগলেন ভাল ক'রে। তারপর আবিদ মিঞাকে একটা খাসীর কোমর ধরে তুলতে বললেন। আবিদ মিঞা তুলে ধরলে।

তিনি খাসীটির সর্বাঙ্গ ভাল ক'রে দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এই খাসীটাই থাক। বাকীগুলো ফেরত দিন। এরও সব মাংসটা লাগবে না। আমি এর থেকেই বেছে বেছে সের তিনেক মাংস বের ক'রে নেব..."

তারপর রমজান আলীর দিকে ফিরে তিনি বললেন—"এইবার তোমরা তিনজন লেগে পড়। দু'রকম চাল, দু'সের ক'রে চাই। কিন্তু প্রত্যেকটি চালের দানা হওয়া চাই গোটা এবং পাকা বেশী ক'রে চাল আনিয়েছি ওই জন্যেই। তোমরা দু'জনে মিলে বেছে ফেল। তারপর মশলাও বাছতে হবে, প্রত্যেক রকম মশলা এক পোয়া ক'রে হলেই হবে। কিন্তু সেটা বাছাই মশলা হওয়া চাই। লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ এগুলো খুব সাবধানে বাছবে, একটিও বাজে দানা যেন না থাকে। মেওয়াগুলোও ভাল ক'রে বেছে নাও; কিসমিস, পেস্তা এসবের মধ্যে অনেক বাজে জিনিস মেশানো থাকে। প্রত্যেকটি দানা বেশ পাকা আর পুষ্ট হওয়া চাই, পচা যেন একটি না থাকে—"

"জি হুজুর।"

সেলাম ক'রে রমজান আলী চালের ঝুড়িটির দিকে এগিয়ে গেল। হেড বাবুর্চি হুকুম দিয়ে চলে গেলেন সেদিন। যাবার আগে বলে গেলেন, এরা চাল আর মশলা আজ বেছে ধুয়ে রাখবে, তিনি কাল সকালে আসবেন। উনি বলে যাবার পর এরা তিনজনে কাজে লেগে পড়ল এবং রাত নটা পর্যন্ত মেহনত ক'রে কাজ শেষ ক'রে ফেললে সব। অধিকাংশ চাল, মশলা আর মেওয়া ফেরত গেল। নিখুঁত জিনিসগুলি রইল কেবল।

পরদিন ভোরে নূর মহম্মদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর হুকুমমতো রমজান, গফুর আর আবিদই সব করতে লাগল। তিনি গালিচার উপর ইজিচেয়ারে বসে খুব দামী সিগারেট খেতে খেতে হুকুম দিতে লাগলেন শুধু। রান্নার গন্ধে ভরপুর হ'য়ে উঠল চতুর্দিক। পোলাও রান্নার সময় নূর মহম্মদ সাহেবকে একটু শারীরিক মেহনত করতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। পোলাওয়ের চালে মশলা ঘি মেখে আর তাতে আখনির জল মাপ মতো দিয়ে হাঁড়ি দুটোর মুখ একেবারে ময়দার আটা দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। নূর মহম্মদ সাহেব মাঝে মাঝে উঠে হাঁড়ির গায়ে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনছিলেন হাঁড়ির ভিতরকার অবস্থা কি, আঁচ কমাতে হবে, না বাড়াতে হবে। ডাক্তাররা যেমন রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে নানারকম শব্দ থেকে বুঝতে পারেন বুকের অবস্থা কি রকম, নূর মহম্মদ সাহেবও তেমনি ফুটন্ত পোলাওয়ের আওয়াজ থেকে ঠিক করছিলেন, পোলাও হ'তে কত দেরি আছে! আমি তো কাণ্ড দেখে 'থ' হ'য়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচটার সময় নবাব সাহেব মোটর থেকে নামলেন এসে। পরিষ্কার ধপধপে সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি আর 'চুস্ত' পায়জামা পরে এসেছিলেন। মাথায় ছিল একটি সাদা মুসলমানী টুপি। তাঁকে দেখে আমার একটি উপমা হঠাৎ মনে হয়েছিল, মানুষ নয় যেন চকচকে তলোয়ার একখানা! নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি। আমাদের প্রত্যেককে আদাব ক'রে চেয়ারে এসে বসলেন। যাঁরা তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেককেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কিছু-না-কিছু বললেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হেসে তিনি শুনলেন, কখনও বা মাথা নাড়লেন একটু।

খাওয়ার জিনিস সোনার থালায় আসতে লাগল একে একে। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর চা এল। নবাব সাহেব চায়ের পেয়ালাটা কেবল তুলে নিলেন, এবং দু'চার চুমুক চা খেলেন খালি। কোন খাবার স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। আধ কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সবিনয়ে বললেন, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

সকলকে আদাব ক'রে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দুই

নবাব সাহেবের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাই অন্য সূত্রে। এক গরীব পানওয়ালার ছেলের অসুখের চিকিৎসা করেছিলাম। পানওয়ালা গরীব বলে পুরো 'ফি' দিতে পারেনি আমাকে। তার ভাঙা কুঁড়েঘর আর পানের দোকানটি মাত্র সম্বল। ওষুধ কিনতেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারী। মাস কয়েক পরে সে আবার আমাকে ডাকলে একদিন। এবার তার স্ত্রী অসুখে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম, এবার তার অবস্থা ফিরেছে, দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছে একটি। এবারও সে আমাকে কম 'ফি' দিতে এল।

আমি বললাম, "এখন তো তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। পাকা বাড়ি করেছ—"

সে বলল, "ডাক্তারবাবু, আমার অবস্থা তেমনি আছে। ও বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন নবাব সাহেব।"

"নবাব সাহেব?"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। আমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার দোকানের সামনে তাঁর মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে যায় একদিন। তাঁর ড্রাইভার যখন চাকা বদলাচ্ছিল তখন আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম একটু। নবাব সাহেবকে কুর্নিশও করেছিলাম। নবাব সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইখানে তুমি থাক?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, হুজুর। এই আমার বাড়ি।"

তিনি আমার ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর চলে গেলেন। পরদিন সকালে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "নবাব সাহেব তোমাকে একটা পাকা বাড়ি করিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।" সেই দিনই কাজ শুরু হ'য়ে গেল এবং দেখতে দেখতে আমার কুঁড়েঘরের জায়গায় ওই দোতলা বাড়ি উঠল।

নবাব সাহেবকে আমি যেন দেখতে পেলাম। ধপধপে ফরসা চেহারা, নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি···।

তিন

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি নবাব সাহেব মারা গেছেন। অসুখে ভুগে নয়, সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। অনেকে বলছেন ইচ্ছে ক'রে লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি যে উইল ক'রে গেছেন তা অদ্ভুত। তাতে লেখা আছে, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি গরীবদের উপকারের জন্য দান ক'রে দিলাম। আমার কাছে আর এক কপর্দকও রইল না, বাকী জীবনটা কি ক'রে কাটাব!"

সেদিন পুরী গিয়েছিলাম। পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হ'ল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন নবাব সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম! নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, সেই নীল চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি!

দুগ্ধ-সাগর

খোকনের বয়স যখন দেড় বছর ছিল তখন সে পাগল ক'রে তুলতো বাড়িসুদ্ধ সকলকে। এটা ধরছে, ওটা ভাঙছে, বালতির জলে গিয়ে হাত ডোবাচ্ছে, উলটে দিচ্ছে দুধের বাটি, উলটে দিচ্ছে দাদুর কল্‌কে, উনুনের ধারে গিয়ে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে টানাটানি করছে। কেউ কিছু বললেই হয় কেঁদে-কেটে অনর্থ করছে, না হয় তর্জনী আস্ফালন ক'রে শাসন করছে—'তোপ্'! যতক্ষণ জেগে থাকত ততক্ষণ তাকে কেন্দ্র ক'রে 'ধর ধর' 'গেল গেল' লেগেই থাকত একটা।

খোকনের অবশ্য এসব কিছুই মনে নেই। সে এখন আর খোকনই নেই। সে এখন অমলেন্দু নন্দী। নূতন চেহারা হয়েছে তার। বয়স সতরো বছর, আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য 'কম্‌পিট্' করতে পারেনি। খুব ভাল নম্বর পেয়েছে কেমিস্ট্রিতে আর অঙ্কে। ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালটা খারাপ না হ'য়ে গেলে ঠিক 'কম্‌পিট্' করতো। নামের আগে যদিও 'শ্রী' লেখে না (লেখাটা আজকাল ফ্যাশন নয় নাকি) কিন্তু ওর চেহারায়, ওর পোশাক-পরিচ্ছদে, ওর মার্জিত হাব-ভাবে, বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে শ্রী যেন উপচে পড়ছে। সত্যই দেখবার মত চেহারা। যেমন রং, তেমনি মুখের গড়ন, খুব রোগাও নয়, খুব মোটাও নয়। চোখ, দাঁত, নখ পর্যন্ত নিখুঁত একেবারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে। জামা কাপড় গেঞ্জি ধপধপ করছে সর্বদা। নিজের জামা-কাপড় সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন সে। ময়লা জামা-কাপড় পরতে তো পারেই না, ছুঁতে পর্যন্ত পারে না। তার আটটা গেঞ্জি, চারটে গামছা, বারোটা রুমাল, সব সময় পরিষ্কার। নিজেই সাবান দেয়। হস্টেলের বন্ধুরা বলে—ছুঁচিবাই হয়েছে। তা না হ'লে প্রতিদিন বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাদর বদলাবার মানে হয় কোনও! অমলেন্দু কিন্তু বদলাত। তার

ধোপার খরচ, সাবানের খরচ, জলখাবারের খরচের চেয়ে বেশী ছিল। কিছুতেই সে ময়লা জিনিস ব্যবহার করতে পারত না।

এই পরিষ্কার-বাতিকের মূলে ছিল কিন্তু ছেলেবেলার একটা ঘটনা। ছেলেবেলার কোন কথাই তার মনে নেই কেবল এইটি ছাড়া। ঘটনাটা এমনভাবে তার মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল যে, তার প্রভাব কাটাতে পারেনি সে এখনও।

ঘটনাটা বিশেষ কিছু নয়। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়—একটি চড়, তা-ও মায়ের হাতের।

আর একটু খুলে না বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না তোমাদের কাছে।

খোকনের সেদিন জন্মদিন। খোকনকে ঘিরে একটা সাড়া পড়ে গেছে সেদিন বাড়িতে। তার জন্যে কেনা হয়েছে ঝকঝকে নূতন বাসন, কার্পেটের নূতন আসন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার নানা আয়োজন হয়েছে। দিদিমা নিজে পায়েস রাঁধতে বসেছেন। সাজ-সজ্জার আয়োজনও কম হয়নি। উপহার এসেছে একটি গাদা। খেলনা, পুতুল, বাঁশী প্রভৃতি তো কেনাই হয়েছে, তাছাড়া দিদিমা করিয়ে দিয়েছেন দামী গরদের পাঞ্জাবি, মাসীর ফরমাশে করানো হয়েছে ছোট ছোট শান্তিপুরী ধুতি-চাদর, তাতে আসল জরি-বসানো টুকটুকে লাল পাড়, মামা দিয়েছে জরির কাজ-করা লাল মখমলের ছোট্ট নাগরা একজোড়া, দাদু দিয়েছেন সিল্কের গোলাপী ছাতা আর রুপো দিয়ে বাঁধানো ছোট্ট একটি লাঠি; বাবা ছোট্ট সোনার আংটি দিয়েছেন তাতে ছোট্ট একটি হীরে-বসানো, মা দিয়েছে হার। দেড় বছরের ছোট্ট খোকন রাজা হ'য়ে গেছে সেদিন যেন।

মাসী সকাল থেকে ব্যস্ত খোকনকে সাজাতে। ভালো সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার গরম জলে স্নান করানো হ'ল প্রথমে, তারপর ফুলেল তেল মাথায় দিয়ে মাথাটায় আর একবার জল-হাত বুলিয়ে তেড়ি বাগিয়ে দেওয়া হ'ল। সরু কাজলের রেখা আঁকা হ'ল চোখের কোলে। তারপর কপালে গালে শুরু হ'ল চন্দনের কারুকার্য।

বলা বাহুল্য, এত কাণ্ড সহজে হ'ল না, মাসীর দ্বারা হ'ল না। খোকনের বালক ভৃত্য কয়লা, বড় বোন মান্তি আর ছোট মাসী পারুলকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ল। একদণ্ড কি স্থির হয়ে বসে ছেলে! কেউ ধরলে হাত, কেউ ধরলে পা, কেউ মাথা। বাবা মাঝে মাঝে গর্জন ক'রে ধমকাতে লাগলেন, দিদিমা মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে খোশামোদ করতে লাগলেন, "একটিবার চুপটি ক'রে ব'স দাদু, এক্ষুণি হ'য়ে যাবে!" সে এক কাণ্ড! অনেক কষ্টে সাজ-গোজ যদি শেষ হ'ল, কান্না আর থামে না।

দিদিমা বললেন, "কয়লা, তুই ওকে একটু বাইরে নিয়ে যা দিকিন। এখুনি ভুলে যাবে।"

কয়লা খোকনকে বাইরে নিয়ে গেল। পাশেই ছিল মল্লিকদের বাড়ি, আর সেখানে ছিল কয়লার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ঝমরু, মল্লিক মশায়ের চাকর। সে শুধু বন্ধু নয়, গুরুও। কয়লাকে বিড়ি খেতে শিখিয়েছে, সিনেমার গানও শেখায় মাঝে মাঝে। ডাক দিতেই ঝমরু বেরিয়ে এল। বললে, "খোকাকে বারান্দায় ছেড়ে দে না, বেশ খেলা করবে। সেই গানটা রপ্‌তো হয়েছে অনেকটা, শুনবি?"

খোকনকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে কয়লা আর ঝমরু একটু সরে গিয়ে বারান্দায় পা দুলিয়ে বসল। বিড়ি বেরুল, দেশলাই বেরুল। জমে উঠল বেশ।

বারান্দায় নেমেই খোকনের কান্না থেমে গিয়েছিল। অত্যন্ত লোভনীয় একটি বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার। বারান্দার কোণে একটি হুঁকো ঠেসান রয়েছে, একটা কল্‌কেও রয়েছে তার মাথায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে কয়লার দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দেখলে কয়লা আর ঝমরু দুজনেই তার দিকে পিছনে ফিরে বারান্দায় পা দুলিয়ে গান করছে। আপাতত ওদিক থেকে বাধার কোন সম্ভাবনা নেই।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে হুঁকোটির দিকে। মনের আনন্দে গালে, কপালে, গরদের পাঞ্জাবিতে, শান্তিপুরী ধুতিতে, কয়লা আর ছাই মেখে হুঁকোর জলে মখমলের জুতোটিকে ভিজিয়ে যখন সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়েছে তখন হঠাৎ কয়লার হুঁশ হ'ল।

"এ কি, ছি—ছি—ছি—এ কি করলে—"

কিন্তু তখন আর চারা ছিল না।

ফল যা হ'ল তা নিদারুণ।

মা রেগে ঠাস ক'রে চড় মারলেন, কাপড়-জামা খুলে ফেললেন, আবার স্নান করালেন, আবার কাজল পরালেন। কপালে আবার চন্দনের আল্‌পনা কাটা হ'ল। জামা-কাপড় জুতো সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দেওয়া হ'ল উঠোনে, যতক্ষণ না শুকোল ততক্ষণ আনাহারে থাকতে হ'ল তাকে। কয়লা চাকরটা বাবার কাছে মার খেয়ে সরে পড়ল। এক হৈ-হৈ কাণ্ড।

সেইদিন থেকে ময়লা, বিশেষ ক'রে কয়লার সম্বন্ধে বিশেষ রকম সচেতন হয়ে উঠল সে। কালো রঙের জিনিসের উপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেল তার। কালো ছিটের জামা পরত না, কালো পাড়ের কাপড় পরত না, এমন কি কালো কালিও ব্যবহার করত না লেখবার সময়। বেগুনি আর সবুজ এই দুই রংয়ের কালি ব্যবহার করত ফাউণ্টেন পেনে। নিজের কালো চুল, কালো ভুরু আর চোখের কালো তারা বদলানো সম্ভব নয় বলে ছেলেবেলায় তার ক্ষোভও ছিল। যখন পাঠশালায় পড়ে তখন দাদুর সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিল এ বিষয়ে। খোকন দাদুকে বলেছিল, "দাদু, তোমার চুল আর ভুরু দেখে হিংসে হয়।"

"কেন ?"

"কেমন চমৎকার ধপধপে সাদা! আমার চুল আর ভুরু বিশ্রী। কুচকুচে কালো, সাবান দিলেও সাদা হয় না। তোমার কি ক'রে সাদা হ'ল বল না।"

দাদু হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"বল না কি ক'রে চুল ভুরু সাদা হ'ল তোমার ?"

দিন দুই আগে দাদু তাকে দুধ-সাগরের গল্পটা বলেছিলেন। হেসে বললেন, "দুধ-সাগরে স্নান ক'রে। সেখানে সব কালো সাদা হয়।"

"দুধ-সাগরে স্নান করেছ তুমি! কোথা আছে দুধ সাগর ? আমি ভেবেছিলাম গল্প বুঝি।"

"বড় হ'লে বুঝতে পারবে কোথায় দুধ-সাগর আছে আর তাতে ডুব দিলে কি ক'রে কালো সাদা হ'য়ে যায়।"

"তোমার চোখের তারা তো সাদা হয়নি।"

"ভাল ক'রে ডুব দিতে পারিনি আমি। তুমি হয়তো পারবে।"

এই দুধ-সাগরের স্বপ্নটাও খোকনের কল্পনায় বাসা বেঁধে ছিল অনেক দিন। তারপর হারিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। সেটা নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করল হঠাৎ একদিন। তখন সে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পড়ছে···।

দুই

সকালে পড়তে বসেছে এমন সময় পুরাতন ভৃত্য কয়লা এসে হাজির। খোকনদের বাড়ির চাকরি যাবার পর সে কোলকাতায় চলে এসেছিল একটা ফ্যাক্টারিতে কাজ পেয়ে। খোকনের খবর কিন্তু সে রাখত বরাবর। খোকন যখন ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছিল, তখন কয়লা এসে দেখা ক'রে বকশিশ নিয়ে গিয়েছিল। তারপর খোকন যখন আই-এস-সি পড়বার জন্যে কোলকাতায় হস্টেলে থাকতে লাগল, তখন প্রায়ই এসে দেখা ক'রে যেত কয়লা। খোকনের পুরোনো জামা, কাপড়, গামছা, গেঞ্জি তারই পাওনা ছিল। খোকনকে নিজের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল সে একদিন। তার বাড়ি গিয়ে কিন্তু খোকনের খারাপ লেগেছিল খুব। কি নোংরা বস্তি, কি নোংরা ঘরদোর! কয়লার বউ কি রোগা! পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাথার চুল রুক্ষ, দাঁত অপরিষ্কার, চোখে পিঁচুটি। তার ছেলেটাও জীর্ণ-শীর্ণ। উঠোনের একধারে কয়লা আর ঘুঁটে গাদা করা ছিল, তার উপরে বসে খেলা করছে ছেলেটা! আপাদমস্তক ঘিনঘিন ক'রে উঠেছিল খোকনের। আর সে কয়লার বাড়ি যায়নি, কয়লাই আসত মাঝে মাঝে।

"কয়লা, এত সকালে তুই এলি যে আজ?"

"কাল আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজা হয়েছিল, তারই 'পরসাদ' তোর জন্যে এনেছি।"

শালপাতা-ঢাকা দেওয়া মাটির খুরিটি টেবিলের উপর রাখলে সে ঠুক ক'রে। খোকন আড়চোখে চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। কিছু বললে না।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না যেন।"

"ও আমি খাব না?"

"খাবি না! কেন খাবি না?"

"ভারি নোংরা তোরা।"

"আমরা নোংরা হতে পারি, ভগবান তো নোংরা নয়। তার 'পরসাদ' কোখোনও নোংরা হ'তে পারে?"

"ভগবান তোর বাড়িতে এসেছিল?"

"জরুর।"

"দেখেছিস নিজের চোখে?"

"নিজের চোখে আর ক'টা জিনিস দেখতে পাই হামি। গির্জার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে তা-ও আজকাল দেখতে পাই না আর।"

"বোয়ে গেছে ভগবানের তোর বাড়িতে আসতে!"

চক্ষ্ বিস্ফারিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কয়লা।

"লিখাপড়া শিখে এই বুঝি বিদ্যে হচ্ছে তোর?"

খোকন কোন না উত্তর দিয়ে ক্লাসের নোটগুলো টুকতে লাগল।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না, ঠাকুরের পরসাদ ফেলতে নেই। আমার কাজে যাবার সময় হ'ল, আমি চললাম।"

কয়লা চলে গেল। খোকন ঈষৎ দ্রুকুঞ্চিত ক'রে নোট টুকতে লাগল। মেসের ছোঁড়া চাকরটা এল তারপর।

"এটা নিয়ে যা।"

"কি এতে?"

"কয়লা সত্যনারায়ণের প্রসাদ এনেছিল। খারাপ হ'য়ে গেছে বোধহয়, দেখ তো—"

চাকরটা শুঁকে দেখলে।

"না, খারাপ তো হয়নি।"

"তবে তুই খেয়ে ফেল।"

প্রসাদটা নিয়ে চলে গেল সে। খোকন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে সে প্রসাদটা। মহানন্দে খাচ্ছে। খোকন অবাক্ হ'য়ে গেল। কষ্টও হ'ল তার। মনে হ'ল দেশটা হু-হু ক'রে কোথায় নেবে যাচ্ছে। কয়লায় গাদার উপর উপবিষ্ট কয়লার ছেলেটার ছবি ভেসে উঠল মনে।

একটু পরে নতুন-কেনা কেমিস্ট্রির বইয়ের পাতা উল্টে কিন্তু ভুরু কুঁচকে গেল তার। বলে কি! আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসের ভিতরই কয়লা আছে! শুধু উনুনের ভিতর বা কলকের উপরেই নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসের ভিতরই লুকিয়ে আছে কয়লা। পেট্রোলে, রবারে, কাগজে, তুলোয়, কাপড়ে, ভিনিগারে, এমন কি এসেন্সেও। ডিমে, মাংসে, দুধে, ভাতে, আলুতে কয়লা, ওষুধে কয়লা—অ্যাস্পিরিন, কুইনিন, ইথার, ফর্মালিন, লাইজল্—সকলের মধ্যে কয়লা! সম্প্রতি ফোটো তোলবার শখ হয়েছে তার। দেখলে কয়লা না থাকলে ক্যামেরা তৈরি হ'ত না, ফোটো ডেভালাপ করা যেত না। সমস্ত রংয়ের মূলে কয়লা। সমস্ত সভ্যতাটাই যেন কয়লাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে! কয়লার ছেলের ছবিটা আবার ফুটে উঠল মনে।

তিন

রাত্রে ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত এবং প্রকাণ্ড। মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার আলোয় তার সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। চমৎকার আব্ছা নীল আলো! আলোটা যেন চুপি চুপি কথা বলছে—আয়, আয়, আয়। হঠাৎ কোণ থেকে একটা কালো ভূত বেরিয়ে এল। প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দু'দিকে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। কুচকুচে কালো রং।

কাছে যখন এল তখন ভয়ে শিউরে উঠল খোকন। ভূতটার গলা, মাথা, হাত, পা কিচ্ছু নেই। মনে হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড কালো পাঞ্জাবি দু'দিকে হাত বাড়িয়ে শূন্যে ঝুলে আছে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর হা হা ক'রে হেসে উঠল সেটা। পরমুহূর্তেই তার শেলফের উপর থেকে খিলখিল ক'রে হেসে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কালো একটা ব্যাঙ্। লাফিয়ে পড়ল কালো পাঞ্জাবিটার উপর আর তার সর্বাঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না গান ধরে দিলে সঙ্গে সঙ্গে—

যে চাঁদের আমি আলো
তাহারও ভিতরে আছে যে অনেক কালো।
অনেক দুঃখ অনেক মরণ
ফেলেছে সেথায় করাল চরণ
তাই বলে মোরে বাস না কি তুমি ভালো।

তারপর রিমঝিম রিমঝিম ক'রে কি একটা বাজনা বাজতে লাগল। মনে হ'ল সেতার বাজছে অনেক দূরে। তারপর সেটা রূপান্তরিত হল ঝরণার ঝরঝর সঙ্গীতে।

মনে হ'ল সে-ও গান গাইছে ঃ

আমার জলে ভাসছে কত ময়লা
শ্যাওলা, ধুলো, পাতার কুচি
সবাই তারা কয়লা।
তাই ব'লে কি আমার জলে নাইবি না
তেষ্টা পেলে জল খেতে কি চাইবি না
ভাল ক'রে দেখ না চেয়ে
ওরে ও সতৃষ্ণ
সবার মাঝে লুকিয়ে আছেন
বংশীধারী কৃষ্ণ।

তাদের বাড়িতে ঠাকুরঘরে যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন তিনিই যেন মূর্ত হলেন চোখের সামনে। কুচকুচে কালো নিকষ-পাথরে তৈরি, মুখে বাঁশি। খোকনের মনে হ'ল, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন যেন! সে হাসির আলোয় আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরটা ভ'রে উঠল। খোকন দেখলে কালো পাঞ্জাবি সাদা হ'য়ে গেছে।

বলছে, "চিনতে পারছ না, আমি যে তোমার সিল্কের পাঞ্জাবি। আজ সকালেই তো পড়লে, সিল্কের ভিতরও কয়লা আছে—"

কালো ব্যাঙ্টাও আর কালো নেই, ব্যাঙ্ও নেই। হয়ে গেছে সাদা সাবান। হাসছে আর বলছে, "আমি ময়লা সাফ করি বটে, কিন্তু ভুলো না আমার ভিতরও কয়লা আছে—"

কানের কাছে ফিসফিস ক'রে কে বললে, "অনেক আগেই তো পড়েছ, আমিও কয়লা—"

ডান হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে, আংটির হীরেটা কথা বলছে!

ঘুম ভেঙ্গে গেল খোকনের।

উঠে বসল সে।

চার

তার পরদিন সে কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। খুলে বললে সব। শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

বললেন, 'খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছ তুমি। আরও যখন বড় হবে, আরও যখন পড়বে তখন বুঝবে যে বাইরের জগতে নানা জিনিসের যে নানারূপ আমরা দেখি, তা আসলে একই শক্তির নানা রূপ। বিদেশী বিজ্ঞানীরা এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'এনার্জি" (Energy)। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হয়তো একেই বলেছিলেন ব্রহ্ম! এই শক্তিই নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে বাইরের বিশ্বে। লোহাকে লোহার রূপ দিয়েছে যে শক্তি, সোনাকে সোনার রূপও দিয়েছে সেই শক্তি। লোহার ভিতর শক্তি একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে লোহা লোহা, আর সোনার ভিতর সেই একই শক্তি অন্যরকম একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে সোনা সোনা। আসলে লোহা আর সোনা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। কালো সাদাও রংয়ের খেলা খালি। সূর্যালোকের সাতটা রংই যে সব জিনিস বাইবে ফিরিয়ে দেয় তারাই সাদা, অর্থাৎ সাতটা রঙের সম্মিলনই সাদা। যেসব জিনিস লাল রং ফিরিয়ে দেয় তারা লাল, যে নীল ফিরিয়ে দেয় সে নীল। আর সাতটা রংয়ের সবগুলোকেই যে-সব জিনিস নিজেদের ভিতর টেনে নেয় তাদেরই কালো দেখায়। রঙের যেখানে সম্পূর্ণ অভাব সেখানেই কালো—"

"শ্রীকৃষ্ণের রং কালো কেন তাহলে?"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "যেখানে অভাব সেইখানেই তো ভগবান থাকবেন।"

"ও, তাই বুঝি—"

খোকন খানিকটা বুঝলে, খানিকটা বুঝতে পারলে না। কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হ'ল তার। একদিন কয়লার বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল সে। তার বউয়ের হাতের তৈরি রুটি চেয়ে খেলে। তার নোংরা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে। গা ঘিনঘিন করছিল, কিন্তু তবু নিলে।

পাঁচ

পুজোর ছুটিতে খোকন যখন বাড়ি গেল, সবাই অবাক্ হ'ল তাকে দেখে। ছিমছাম বাবুটি তো আর নেই সে। একটু যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজব শহর কোলকাতা থেকে কি আজব খবর এনেছ, শোনাও।"

"একটা খবর এনেছি।"

"কি?"

"দুখ-সাগর কোথায় আছে।"

"বল, বল শুনি—"
"পরে বলব।"
মুচকি হেসে চলে গেল সে

যা হয়

চার বছরের অভি কারও চাকর নয়। সে অনেক বায়না ক'রে অনেক রকম দুষ্টুমি ক'রে তবে দুধটুকু খেল। তারপর জামা-পায়জামা পরবার সময়ও অনেক খোশামোদ করতে হ'ল তাকে। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে, অনেকবার আদর ক'বে অনেক রকম লোভ দেখিয়ে তবে পরানো হ'ল তাকে জামা-পায়জামা। তারপর ঠাকুমা তার চুল আঁচড়ে দিলেন, তাতেও ঘোর আপত্তি। কিছুতেই সে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হ'তে দেবে না। যা করবে নিজে করবে। সাজ-গোজ যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন সে নিজের কাঠের ঘোড়াটার উপর চড়ে বসে বলতে লাগল, হেট্ হেট্, চল, চল। আপিসের লেট হ'য়ে যায় যে।

সবাই হাসতে লাগলো।

অভির বাবা চাকুরে। সে সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। তাড়াহুড়ো ক'রে স্নান সেরে নিলে কোনক্রমে। তারপর গপাগপ ক'রে তপ্ত ভাত ডাল তরকারী গিলতে লাগলো। কোনক্রমে খেয়ে উঠেই কোট প্যাণ্ট টাই পরতে লাগলো আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গী ক'রে। আর অভির মাকে অকারণে ধমকাতে লাগল এটা দাও ওটা দাও বলে। তারপর চীৎকার ক'রে চাকরকে বলল—রাম সিংকে তাড়াতাড়ি মোটরটা স্টার্ট করতে বল। আপিসে লেট হ'য়ে যাবে আজ দেখছি—।

হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেল।

কেউ হাসলো না।

কল্পনা সুখ

"ওগো শুনছ?"
"কি—"
"আমার নতুন স্যুটটা দর্জি দিয়ে যায়নি?"
"না। তিনবার লোক পাঠিয়েছিলাম।"
স্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়েই উত্তর দিচ্ছিলেন। কণ্ঠে বিরক্তির আভাস।
"মহা মুশকিল হ'ল তো। কি পরে যাব এখন—"
"ওই পুরোনোটা পরেই যাও না, কেউ বুঝতে পারবে না।..."
"বরাবরই তো তাই যাচ্ছি, এবার ভেবেছিলাম নতুন পরে যাব। দর্জি দিলে না কেন?"

"জানি না। শুনলাম সে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেছে। আমরা নাকি তাদের ন্যায্য মজুরি দিই না—"

স্ত্রী পাশ ফিরে শুলেন।

"আমার গেঞ্জিটা কই—"

"দেখ না, আলনাতেই আছে।"

"মাটি করেছে। কোটের সামনের দুটো বোতাম যে নেই দেখছি। বোতাম আছে বাড়িতে?"

স্ত্রী নিরুত্তর।

"ওগো শুনছ?"

"আঃ, তোমার জ্বালায় আর পারি না। সমস্ত রাত কাল ঘুম হয়নি—"

গজ গজ করতে করতে উঠলেন ভদ্রমহিলা। একটা কৌটো থেকে বোতাম বার করলেন, ছুঁচ সুতোও বার করলেন।

"ও-কি, দু'রঙের দুটো বার করলে যে—"

"এক রঙের দুটো নেই। দাও—"

"বিশ্রী দেখাবে না?"

"ও, কেউ বুঝতে পারবে না। দাও—, দাও না শিগগির—"

দিতে হ'ল।

"চা করবে না?"

"কাল রাত্রে থারমসে রেখে দিয়েছি খানিকটা। ভেবেছিলাম আজ ভোরে উঠব না। কিন্তু তোমার জ্বালায় তা কি আর হবার জো আছে—"

"পাঁচটা পনরো হ'ল, দাও-দাও শিগগির দাও—"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, দশটা হাত তো নয়—"

অবশেষে বোতাম বসানো হ'ল। সূর্যদেব পুরোনো স্যুট পরে বাসি 'চা' খেয়ে মেষরাশিতে এসে উদিত হলেন।

সংজ্ঞা দেবী আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পাখী

"এই, তোমার নাচ বন্ধ কর—"

সিংহ সগর্জনে আদেশ করলেন ময়ূরকে। কিন্তু ময়ূর নাচতেই লাগল, মনে হ'ল যেন পশুরাজের আদেশ শুনতেই পায়নি।

"বন্ধ কর তোমার নাচ। আমার রাজকার্যের বিঘ্ন হচ্ছে—"

ময়ূর নাচতে লাগল। কাছেই ময়ূরী রয়েছে, থামবে কি ক'রে।

"বন্ধ কর।"

ময়ূর শোনে না।

সিংহের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

"বন্ধ কর—বন্ধ কর—বন্ধ কর—"

ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিংহ এক লম্ফ দিয়ে তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে গিয়ে বসল একটা উঁচু গাছের ডালে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে। সেই দিকে উড়ে গেল তারা। সেখানে চমৎকার উপত্যকা ছিল একটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন সবুজ মেঘ নেমেছে যেন। ময়ূর আবার নাচ শুরু করল। ময়ূরী ঘুরতে লাগল আশে পাশে।

সিংহের আত্মসম্মানে কিন্তু আঘাত লেগেছিল ভয়ানক। মন্ত্রী ব্যাঘ্রকে ডেকে তিনি বললেন, "আমি রাজা, কিন্তু আমার কথা ওই সামান্য ময়ূর গ্রাহ্যই করল না। এতে ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কর—"

"নিশ্চয় করব। ওই ময়ূরে জাতটাই বড় খারাপ। আমি যখন শিকার করতে বেরুই, চীৎকার ক'রে ক'রে সব প্রাণীদের সাবধান ক'রে দেয়। রাজন, আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন এর ব্যবস্থা করব আমি।"

দুই

দিন দুই পরে এক শৃগাল এসে ময়ূরকে নমস্কার করল। ময়ূর মাঠে চরছিল, শৃগালকে দেখে সে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল।

শৃগাল সবিনয়ে বলল, "আপনি গুণী লোক, আপনার গুণের সমাদর করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আমার বাসায় যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার গৃহিণীর সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। কাক আমাদের চিকিৎসক। সে বললে ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখাতে পার তা হলে উনি সেরে উঠবেন।"

ময়ূর কেকারবে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শৃগাল মহাশয়, আপনাকে এই বনের কে না চেনে? আপনার গৃহিণী অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু আপনি একটা কথা বোধহয় জানেন না, আমি নাচি কেবল আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্য। অন্য কোন কারণে আমি নাচতে পারি না, আমার নাচ আসেই না।"

শৃগাল ফিরে গেল। তার গর্তের কাছে যে জঙ্গলটি ছিল সেই জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে বসেছিল বাঘ সিংহ দু'জনেই। তারা ভেবেছিল ময়ূর যখন শৃগালের গর্তের সামনে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে নাচবে, তখন তারা লাফিয়ে পড়বে তার উপরে। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র বিফল হ'য়ে গেল।

তিন

তার পরদিন গেল একটা সাপ।

সাপ ময়ূরের খাদ্য। তাকে দেখেই ময়ূর উদ্যত-চঞ্চু-নখর হ'য়ে তেড়ে গেল। কিন্তু সাপটি ছিল ক্ষিপ্রগতি। সে ঘাসের ভিতর দিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল। সোনার হরিণের পিছু পিছু রামচন্দ্র যেমন ছুটেছিলেন, সাপের পিছু পিছু তেমনি ক'রে ছুটতে লাগল ময়ূর। একটা বনের ধার দিয়ে একাগ্র মনে সে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল ময়ূরের উপর। কিন্তু ধরতে পারল না ময়ূরকে। ময়ূর নিমেষের মধ্যে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। তারপর সিংহকে সম্বোধন ক'রে বলল—"মহারাজ, আপনার এ রকম দুর্ব্যবহারের কারণ কি বলুন—"

"তুমি আমাকে অপমান করেছ—"

"আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে আমি নেচে থাকি। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তা হলে তো আমি নাচার। আপনি সিংহিনীকে ভোলাবার জন্য যখন কেশর ফুলিয়ে, ল্যাজ নেড়ে, গর গর গরর্ শব্দ করেন—তখন তো আমি অপমানিত বোধ করি না।"

"আমি তোমাকে নাচতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মানা শোননি, তোমার রাজার আদেশ তুমি অমান্য করেছ, সে জন্যই আমি অপমানিত বোধ করছি—"

"কিন্তু মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি পশুদের রাজা। আমি পশু নই, পাখী—"

সিংহ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাহলে তুমি ভিন্ন দেশের প্রাণী আমার দেশে এসে রয়েছ? তোমার পাসপোর্ট কই, ভিসা কই?"

ময়ূর তার পাখা দুটি নেড়ে দেখাল।

তারপর বলল, "মহারাজ, আমাদের আপনি তাড়াতে পারবেন না। আমরা থাকবই। জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করবার বিধিদত্ত অধিকার আমাদের আছে। এ কথা ভুলবেন না। আর একটা কথাও আপনাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। আপনি আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব।"

"সামান্য একটা পাখী, তুমি প্রতিশোধ নেবে? হা হা হা—"

সিংহের অট্টহাস্যে বনস্থল প্রকম্পিত হ'তে লাগল।

চার

কয়েকদিন পরে।

সিংহ একটি মেষশাবককে মেরে খাওয়ার যোগাড় করছে, এমন সময় আকাশ থেকে

নেমে এল একটা প্রকাণ্ড ঝড়, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবককে। সিংহ সবিস্ময়ে দেখলে বিরাট এক ঈগল পক্ষ-বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে রয়েছে—আকাশ-পটে। তার পায়ের নখর থেকে ঝুলছে মেষশাবক।

ঈগল বলল, "পশুরাজ সিংহ, তোমরা স্থলচর জীব। অতিশয় সীমাবদ্ধ তোমাদের শক্তি। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমার একজন প্রজাকে অপমান ক'রে তুমি সমস্ত পক্ষীজাতিকে অপমান করেছ। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। এই নাও তোমার খাবার—"

শূন্য থেকে মেষশাবকটা ধপাস্‌ ক'রে এসে পড়ল বিস্মিত সিংহের সম্মুখে। সিংহ নির্বাক হ'য়ে বসে রইল।

ফুলদানীর একটি ফুল

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, ট্রেনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি, মনে মনে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে আছি, ফুলদানীর কথা মনেও ছিল না, এমন সময় হঠাৎ কার্তিক এসে ঢুকল। হাতে তার ফুলদানী।

'এই যে বৌদি যাচ্ছেন তাহলে, একেবারে রেডি—'

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, 'ফুলদানীটা কিনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আপনি সেদিন আমাদের ফুলদানীটা দেখে বললেন না, যে আমিও যাবার সময় এই রকম একটা কিনে নিয়ে যাব। আমি জগুর কাছে খবর পেয়েছি আপনি কিনতে পারেন নি, কিনতে পারতেনও না, যা ভিড়, তাই আমি বেরিয়ে কিনে ফেললাম। আয়োডিন আছে ?'

'আছে। কেন, আয়োডিন নিয়ে কি করবেন—'

'হাতীবাগানে যা ভিড়। পা-টা মাড়িয়ে দিলে একজন।'

'জুতো খুলুন দেখি—' জুতো খুলল কার্তিক।

'ইস, আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে। কী দরকার ছিল আপনার ভিড়ে গিয়ে ফুলদানী কেনবার। এঃ, কাপড়টাও ছিঁড়েছেন দেখছি—'

কার্তিক হে হে ক'রে হাসতে লাগল।

'ফুলদানীটা কোথায় নেবেন ? বাক্সের মধ্যে ?'

'না, বাক্স তো শাড়ি কাপড়ে ঠাসা ?'

'তাহলে—'

'ওই বালতিটার মধ্যে নিতে হবে। ওতেও তো জিনিসপত্র ভর্তি একেবারে।'

'আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।'

বালতির মধ্যে নানা রকম খুঁটিনাটি বিচিত্র আকারের জিনিস। গৃহিনী সমস্ত দুপুর চেষ্টা ক'রে নানা কৌশলে ভরেছেন সেগুলি বালতিতে।

'আপনি আবার ওসব বার করবেন ? তার চেয়ে দিন, হাতে করেই নিয়ে যাব ওটা।'

তারপরই সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল।

'এই তো খালি নতুন কমোডটা যাচ্ছে। ওর ভিতর কাপড় মুড়ে বসিয়ে দেওয়া যাক—'

'সেই ভালো।'

কার্তিকই একটা কাপড় দিয়ে মুড়ে কমোডের প্যানে ভালভাবে বসিয়ে দিলে সেটা। তারই দায় যেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাগানে নানারকম গোলাপ ফুল ফুটেছে। লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে, বাদামি। রংয়ের হাট বসে গেছে যেন। নতুন ফুলদানী আমার মেয়ে মহা উৎসাহে সাজাতে বসল।

বললাম, 'খাবার ঘরের টেবিলে রেখে আয়। আমি আসছি—'

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে বসে ফুলদানীর দিকে চেয়ে আমি কিন্তু ভয় খেয়ে গেলাম। চোখে আমার হেমারেজ হ'ল না কি? হওয়া বিচিত্র নয়, আমি ডায়াবিটিক লোক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও মানা মানি না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফুলগুলোর দিকে। ফুলগুলোর মাঝখানে কালো মতন ওটা কি? কাউকে কিছু বললাম না। সোজা চলে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। সে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললে, 'না, চোখ ত আপনার ঠিক আছে।'

'তবে কালো মতো ওটা কি দেখলাম?'

'চশমায় ময়লা ছিল বোধহয়।'

বাড়ি ফিরে এসে চশমাটা ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে আবার দেখলাম। কিছু পরিবর্তন হয়নি। গোলাপফুলগুলোর মাঝখানে ঠিক সেইরকম একটা কালো জিনিস রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ সেই কালো জিনিসটা নড়ে উঠল। আরে, এ যে কার্তিক। সেই টাক, সেই কালো রং, সেই টেবো গাল, আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে!

তার ওই কালো মুখখানা হঠাৎ গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর মনে হ'ল।

দুইটি চিঠি

ভাই নবদ্বীপচন্দ্র,

আশা করি মঙ্গল-মতো আছো। অনেক দিন তোমার খবর পাই নাই। আমিও অবশ্য খবর লইবার চেষ্টা করি নাই। আমাদের আর খবর কি আছে বলো। এখন খবর মানে, পারের খবর। সে খবর তো জানাই আছে, আর যেটুকু অজানা, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা যখন জানিব তখন কাহাকেও জানাইতে পারিব না। বয়স পঁচাত্তর হইল। পারঘাটাতেই তো বসিয়া আছি। কিন্তু নৌকা আসে কই? চোখে ভাল দেখিতে পাই না। ছানি কাটাইয়াও সুবিধা হয় নাই। একটু ঝাপসাভাব থাকিয়াই গিয়াছে। খাওয়া হজম হয় না। দাঁত নাই। দিনে গলা-গলা ভাতে-ভাত

আর রাত্রে খান চারেক সরুচাকলি খাই। অনেকে পাঁউরুটি দুধে ভিজাইয়া খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁউরুটির গন্ধটা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না ভাই। খই দুধ খাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও পেটে বায়ু জন্মে। সরুচাকলিটা আমার বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি এখনও আগের মতো মাংস খাও? আমার তো মাছ মাংস ছুঁইবার উপায় নাই। সর্বাঙ্গে বাত। বিশেষত ডান হাঁটুটায় এত ব্যথা যে লাঠি ছাড়া চলিতে পারি না। তোমার শরীর কেমন আছে? এখনও কি তুমি কবিতা লেখো? সব খবর দিও।

দিবার মতো একটা খবর অবশ্য আমার আছে এবং সেইটে বলিবার জন্যেই এতক্ষণ ভণিতা করিলাম। আমি আবার দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছি। মেয়েটি খুব গরীবের মেয়ে। পিতৃমাতৃহীনা হইয়া একেবারে অনাথিনী হইয়া পড়িয়াছিল। ভাই বোন নাই। এক জমিদারের ছেলে তাহার উপর কু-নজর দিয়াছিল। আমি তাহার দাদামশায়ের বন্ধু বলিয়া সে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় লয়। আশ্রিতার মতোই থাকিত। কিন্তু পাড়ার লোকের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাইয়াছে।

আমার ছেলেমেয়েরাও কড়া-কড়া চিঠি লিখিতে লাগিল। মেয়েটির অবস্থা যাহা হইল তাহা বর্ণনাতীত। শেষটা তাহাকে বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। তাহার সমস্যারও সমাধান হইল, আমারও। আমারও সমস্যা অনেক। বৃদ্ধদেরই জীবন সমস্যা-সঙ্কুল, বিশেষত যদি তাঁহারা বিপত্নীক হন।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার শরীর নানাভাবে অপটু হইয়াছে। এ বয়সে সেবার দরকার। কিন্তু সেবা করে কে! ছেলেরা নিজের নিজের বউ লইয়া কর্মস্থলে থাকে। থাকাই উচিত। মেয়েরাও নিজেদের ঘর করিতেছে। সেটাও কাম্য। সুতরাং আমি একা পড়িয়া গিয়াছি। চাকর রাখিয়া সেবা ক্রয় করা যায় অবশ্য। কিন্তু মূল্য এত অধিক যে আমার পেন্সনে কুলায় না। চব্বিশ ঘণ্টা আমার নিকট হামে-হাল হাজির থাকিবে এরকম একটি সমর্থ চাকরের খরচ মাসে প্রায় একশত টাকা। আমি মাত্র দেড়শত টাকা পেন্সন পাই। চাকর রাখিলে অনাহারে থাকিতে হইবে। একটি বুড়ী চাকরানী রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহারই সেবার দরকার, সে আমাকে সেবা করিবে কিরূপে। কমবয়সী চাকরানী রাখিবার উপায় নাই, পাড়ার গার্জেনরা আছেন। এই মেয়েটি আসিয়া আমার বেশ সেবা-যত্ন করিতেছিল, কিন্তু ওই গার্জেনদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই শেষে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

মেয়েটি বেশ নেটিপেটি, আমার খুব সেবা করে। নাম যদিও কালী, কিন্তু দেখিতে বেশ ফরসা, ঠোঁটের উপর ছোট্ট তিল থাকাতে আরও সুন্দর দেখায়। তাছাড়া চোখে সরু করিয়া কাজল পরে বলিয়া রূপ আরও খুলিয়াছে।

আমার ছেলেরা আমাকে তাহাদের কাছে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই বিস্তৃত-পরিসর বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া তাহাদের কোয়ার্টারের পায়রা-খোপে যাইতে ইচ্ছা করে না। আমার বউমারা কেউ খারাপ লোক নন, কিন্তু আমার প্রস্রাবের বোতল পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহাদের যে কুঞ্চিত-নাসা মুখভাব দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের ওসব নোংরা কাজ করিতে দিতে ভদ্রতায় বাধে। সর্বদাই যেন তাঁহাদের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমি নিজেও এসব করিতে পারি না, অসমর্থ

হইয়া পড়িয়াছি। আমার গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিবার জন্যও একজন লোক দরকার। প্রত্যহ ঘসিয়া ঘসিয়া সর্বাঙ্গে গরম তেল মালিশ না করিয়া দিলে শরীর ভাল থাকে না। রাত্রে সরুচাকলিই চাই। কে এসব করিয়া দিবে বলো?

কালীদাসী হাসিমুখে সব করিতেছে। সমস্যার সমাধান হইয়াছে। চার্লি চ্যাপলিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীরাও বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। ছেলেরা যদি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইত তাহা হইলে ভালো চাকর রাখিতাম, বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই কুলায় না, আমাকে পাঠাইবে কি করিয়া। মাঝে মাঝে আমার কাছেই তাহারা টাকা চায়।

তুমি বলিবে কালীদাসীর মতো একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। এক হিসাবে তাহা সত্য বটে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কি সকলের প্রতি সুবিচার করা চলে? আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শাস্ত্রেই এ-কথা বলে; মাছ-মাংস, দুধ, শাক-পাতা, ডালভাত যাহাই খাও, অপর প্রাণীকে পীড়ন করিয়া, বঞ্চিত করিয়া অথবা বধ করিয়া খাইতে হইবে। অর্থ দিয়া যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব তাহা অবশ্য আমি করিব। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সব কালীদাসীকেই লিখিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কালীদাসী যদি আবার বিবাহ করিতে চায় তাহাও সে করিতে পারিবে, এ কথাও লিখিয়া দিয়া যাইব। দেশের আইনও এখন তাহার স্বপক্ষে থাকিবে।

তুমি বাল্যবন্ধু বলিয়া অনেক কথাই তোমাকে লিখিলাম। বিবাহ করিয়াছি বলিয়া সমস্বরে সকলেই যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতেছে। আশা করি তোমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইব।

তুমি এখন কোথায় আছ জানি না। তোমার পুরাতন ঠিকানাতেই পত্রখানা পাঠাইতেছি। যেখানেই থাকো আশা করি ইহা তোমার নিকট পৌঁছিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার বাল্যবন্ধু
রসিকলাল

বন্ধু,

কল্য তোমার পত্র ঘুরি দিগ্বিদিক
ঠিকানায় অবশেষে পৌঁছিয়াছে ঠিক।
আমারও সমস্যা ছিল তোমারি সমান
হোটেলে আশ্রয় ল'য়ে করিয়াছি তাহা সমাধান।
আমারও গৃহিণী গত,
চারি পুত্র সংসারে বিরত।
বৃদ্ধের জরার ভার
হাসিমুখে বহিবার
তাহাদেরও কারও সাধ্য নাই,
কলিকালে যযাতিরে কোথা পাব ভাই।
মোরও কণ্ঠে দুলাইতে মালা
হাজির হইয়াছিল কয়েকটি বালা।

কিন্তু ভাই
পারি নাই।
কণ্ঠটিরে সামালিয়া, চাপি বক্ষে মেলে
আশ্রয় লয়েছি এসে বিদেশী হোটেলে।

তুমি যে দিয়েছ যুক্তি, ঠিক তাহা, সারালো জোরালো,
কিন্তু ভাই মোর চিত্তে বহু পূর্বে যে বালিকা
জ্বেলেছিল আলো,
আজও তার শিখা,
চেয়ে আছে মোর পানে মেলি তার দৃষ্টি অনিমিখা
উজ্জ্বল অম্লান,
দ্বিতীয় শিখার আর নাই সেথা স্থান।

তবু যেন শান্তি নাই, মাঝে মাঝে কি যে হয় মনে
বসন্তে শরতে শীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ নর্তনে
চলন্ত মেঘের মুখে কী যে বার্তা পাই অভিনব
উড়ন্ত পাখির কণ্ঠ কী যে শুনি কেমনে তা কব।

যেমন আজিকে ধর
চতুর্দিকে বর্ষা ঝর ঝর
বিব্রত বসিয়া আছি অভিভূত অনির্দিষ্ট প্রেমে
শিরো'পরে পাংখা ঘোরে তবু, সখা, উঠিয়াছি ঘেমে।

দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে ভাদ্র আর্দ্র-বাসা
চোখে মুখে সর্ব-অঙ্গে ভাষা
কৃষ্ণ-আঁখি-তারকায় চমকিছে বিজলী নির্দয়
গুরু গুরু গুরু গুরু করিতেছে মেঘ, না, হৃদয়!
ভেক কলরব ও কি? কেকার ক্রেংকার?
অথবা এ আর্তনাদ নিষ্পিষ্ট অবচেতনার?
কহিতে পারি না ঠিক তাহা
ব্যাকুল পাপিয়া কণ্ঠে ভেসে আসে—কাঁহা, পিউ কাঁহা!
মনে হয় যাই অভিসারে
খুঁজি তারে এ জীবনে পাইনি যাহারে
চলে যাই চিরন্তন পথ চিনে চিনে
কিন্তু হায় পায়ে বাত, শুগার ইউরিনে!
লজ্জা পাই, দুঃখ পাই, ভেবে সারা হই
হেনকালে শুনিলাম—মাভৈঃ মাভৈঃ।

কালী আমারেও ভাই দেখাল সরণী
(নয় তব তিল-ঠোঁটী কাজল-নয়নী)
কালীর দোয়াত মোর,—সে আমারে ডাক দিয়া কহে
"ডুব দাও এই কালীদহে,
কামনা নাগের শিরে দাঁড়াইয়া আপনা পাসরি
কবি তুমি, বাজাও বাঁশরী।"
কবিতায় পত্র তাই লিখিনু নির্ভয়
বাঁশরী বাজিল কি না তুমি তাহা করিও নির্ণয়।
কবিতার সারমর্ম এই
কালী পূজা ভিন্ন জেনো বাঙালীর অন্য গতি নেই!
সে কালী মানবী কভু, লজ্জাবতী, ঘোমটা-টানা, কোমল-রসনা
কভু তিনি লোল-জিহ্বা, খড়্গ-হস্ত দেবী দিগ্বসনা।
কখনও দোয়াতে তিনি যাদুকরী কালী,
কলমের মুখে বসি করেন ঘটকালি,
মিলাইয়া দেন নিত্য কবি ও রসিকে।
নিখিলের মর্মবাণী কাব্যে যান লিখে।

ইতি
তোমার বাল্যবন্ধু
নবদ্বীপচন্দ্র

সতী

"ওটা কার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন? চমৎকার চেহারা তো! আপনার মা?"

"না, আমার কেউ নয়। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর ছবি।"

"বন্ধুর স্ত্রীর ছবি আপনি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?"

"ও ছবি দুর্লভ ব'লে!"

"কি রকম—"

"তাহ'লে সব খুলে বলতে হয়। আজকাল সতীর কদর নেই। যত কদর অসতীদের। কাগজে পত্রিকায় সমাজে তাদেরই জয়জয়কার। জীবনে ওই একটি সতী দেখেছিলাম, তাই ছবিটি যোগাড় ক'রে রেখেছি। রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করি।"

"প্রণাম করেন?"

"প্রণাম করি। ওই একটি প্রণামই সত্য প্রণাম হয়। তাছাড়া যে-সব প্রণাম রোজ ডাইনে-বাঁয়ে করতে হয় সে-সব মৌক প্রণাম, স্বার্থের জন্যে বা ভদ্রতার খাতিরে। মা বাবাকে অবশ্য সত্যি প্রণাম করতুম, কিন্তু তাঁরা তো অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন।

তাঁদের ছবিও নেই, সেকালে ছবি তোলার তত রেওয়াজও ছিল না। তাঁদের আলেখ্য তাই চোখের সামনে নেই। তবে ভাগ্যবলে ওই পুণ্যবতীর ছবিটি পেয়েছি।"

ভবতোষবাবু আবার প্রণাম করলেন ছবিটিকে।

তাঁর বেয়াই ত্রিদিববাবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ছবিটির দিকে। তারপর বললেন, "চেহারাটা খুবই অসাধারণ সত্যি—। ইনি যে সতী ছিলেন তা আপনি জানলেন কি ক'রে—"

"আপনি যে সন্দেহ-প্রকাশ করছেন সেজন্য আমি রাগ করছি না। ওরকম রূপসী যে সতী থাকতে পারে এ বিশ্বাসই আমাদের চলে গেছে। আজকাল সমাজে অসতীদের আমরা মেনে নিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন সতী হওয়াটা একটা কুসংস্কার। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা এ-কথাও প্রচার করেন, স্ত্রীলোক মাত্রকেই কেনা যায়। তারতম্যটা শুধু দামের। হে হে হে হে—"

গড়গড়ায় টান দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগলেন ভবতোষবাবু। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে চুপ ক'রে গেলেন ভুরু কুঁচকে।

"ওদের দোষ নেই। ওরা দেখছে যারা কবি সাহিত্যিক তাদেরও টাকার জুতো মেরে কেনা যায়, তারাও মঞ্চে দাড়িয়ে 'হাঁ' কে 'না' ব'লে বক্তৃতা দেয়। ওরা দেখছে যে, টাকা দিয়ে অমুকানন্দ তমুকানন্দকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়, ওরা দেখছে যে টাকার মহিমায় বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থী হ'য়ে যান, দক্ষিণপন্থীর বামপন্থী হ'তে আটকায় না; ওরা দেখছে, ঘরের বউ প্রায়-উলঙ্গ হ'য়ে সিনেমায় নাচছে টাকার লোভে, ওদের দোষ কি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে—"

গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হাঁটু দোলাতে লাগলেন ভবতোষ। ত্রিদিববাবু আগে দক্ষিণপন্থী ছিলেন, এখন বামপন্থী হয়েছেন, তাছাড়া তিনি মেয়ের বাবা, প্রতিবাদ করতে পারলেন না, ভিজা বিড়ালের মতো চাইতে লাগলেন কেবল।

ভবতোষবাবু বললেন, "আর একটা মস্ত কথা আছে এর ভিতর। সবাই ইচ্ছে করলে সতী হ'তে পারে না। সবাই কি ভক্ত হতে পারে? আমরা জগন্নাথদেবের ওই রকম মূর্তি দেখে কি তাঁকে পরম করুণাময় ভগবান বলে মনে করতে পারি, চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন পেরেছিলেন? আমরা সবাই কলম দিয়ে কাগজের উপর লিখি, কিন্তু সবাই কি আমরা লেখক? আমরা বই পেলেই পড়ি, কিন্তু সবাই কি পাঠক হ'তে পেরেছি? মন সেইভাবে তৈরি হওয়া চাই, সকলের তা হয় না। নিজের অন্তরে ঐশ্বর্য থাকা চাই, সেই ঐশ্বর্য বাইরে আরোপ করবার শক্তি থাকা চাই, তবে ওসব হয়। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের যে গুরুগম্ভীর ভীষণ মূর্তি আছে, শ্রীচৈতন্য কিন্তু ওর মধ্যেই মদনমোহন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ছিল তাকেই তিনি বাইরে দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—মূর্তিতে ছিল না, ছিল তাঁর মনে, তাঁর চোখের মণিতে। সতীরাও তাই, স্বামীরা যেমনই হোক, তার মধ্যে তাঁরা দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন। স্বামীর মধ্যে দেবত্ব নাই, দেবত্ব আছে ওই সতীর মনে। সেরকম মন আর কই, আজকাল তো চোখে পড়ে না। এখন স্ত্রীরা স্বামীর রূপ চায়, ধন চায়, খ্যাতি চায়, মর্যাদা চায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চায়—তবেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তা-ও হয়তো করেন না। যে স্বামীর রূপ নেই, ধন নেই, খ্যাতি নেই, চরিত্র নেই—এরকম স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করতে পারে এরকম স্ত্রীলোক ওই একটি ছাড়া আর দেখিনি।"

আবার খানিকক্ষণ ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন ভবতোষ। আবার প্রণাম করলেন। ত্রিদিববাবু একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একটু উসখুস ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেরকম বলছেন সে রকম সতী আজকাল আর কই। আমাদের রজনীবাবুর স্ত্রীকে খুব সতীসাধ্বী ব'লে জানতাম, কিন্তু শেষকালে সে-ও একটা ছোঁড়া অ্যাক্টারের সঙ্গে জুটে গেল, সিফিলিসও হ'ল—"

"হ্যাঁ, ঘরে-ঘরেই তো আজকাল ওই ব্যাপার। সেইজন্যেই ওই ছবিটির এত দাম। শুনবেন ওঁর কথা?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, নিশ্চয় শুনব।"

"আপত্তি কিছুই নেই। দেবীর গুণকীর্তন করলে পুণ্যই হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আমি নাম-ধাম গোপন করেই বলছি। আমার বন্ধুর অন্য নাম ছিল, আমি তাকে কেষ্ট ব'লে পরিচয় দিচ্ছি আপনার কাছে। কেষ্ট আমার বাল্যবন্ধু ছিল। স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম একসঙ্গে। ওর মাকে আমি মাসীমা বলতাম। কেষ্টও আমার মাকে মাসীমা বলত। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও প্রাণের সম্পর্ক খুব গভীর ছিল। রক্তের সম্পর্ক ছিল না বলেই বোধহয় প্রাণের সম্পর্কটা এত গভীর হয়েছিল। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনরা প্রায়ই শত্রু হয়। আমি আই-এ পাশ ক'রে আর পড়লাম না, বাবা বললেন, আর পড়ে সময় নষ্ট করছ কেন, দোকানে এসে বোসো, নিজের ব্যবসা দেখে-শুনে নাও। কেষ্ট গরীবের ছেলে ছিল, সে এম. এ. পাশ ক'রে একজায়গায় চাকরি করতে লাগল। কেষ্ট দেখতে ভালো ছিল না। বেঁটে, কালো, রোগা। মাইনে পেত পঁচাত্তর টাকা। তবু তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল অনেক। আমি তার সঙ্গে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতাম। অনেক মেয়ে দেখার পর এঁকে দেখলাম। একেবারে যেন দেবীমূর্তি, লক্ষ্মী প্রতিমা। অপছন্দর প্রশ্নই উঠল না, দেনা-পাওনাতেও আটকালো না, বিয়ে হ'য়ে গেল। আমি ওর বন্ধু, আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু আনন্দ না হ'য়ে হিংসে হ'ল। আমার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমার বউও দেখতে নেহাত খারাপ ছিল না, বেঁচে থাকলে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পেতেন। কিন্তু এ-দেবী প্রতিমার কাছে তার রূপ ম্লান হ'য়ে গেল আমার চোখে। আমি বাইরে যদিও দেঁতো-হাসি হাসতে লাগলাম কিন্তু মনে মনে আমার ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল। কিন্তু মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হ'ল, উপায় কি। এইভাবে কাটল কিছুদিন। কেষ্টর বাড়িতে আমার অবাধ গতি ছিল। রোজ যেতাম। কেষ্টর বউ চা জলখাবার পান দেবার জন্যে আমার সামনে বেরুতও। কিন্তু তার মুখ কখনও দেখতে পাইনি। আলতা-রাঙা পা দুটিই দেখতাম কেবল। বন্ধুর বউ, সুতরাং হাসি-ঠাট্টাও করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনরকম সাড়া পাইনি কোনদিন। ঘোমটা-টানা সেই নীরব মূর্তি আজও আমি দেখতে পাই চোখের সামনে। কেষ্ট তার বউকে ভালোবাসত খুব। অমন বউকে ভালো না বাসাটাই আশ্চর্য। আমিও ভালোবাসতুম। যাকে বলে—লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট—তাই হয়েছিল। মনে মনে দুরভিসন্ধিও ছিল কিছু। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা যখন আমার হাতে এলো তখন আমার ব্যাঙ্কে পঁচিশ লক্ষ টাকা মজুত। মাথা তখন গগনচুম্বী হয়েছে। ধারণা হয়েছে, টাকার জোরে সব করতে পারি। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী মারা গেল বিনয়কে রেখে। তখন দড়ি-ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো আমি ঘুরে

বেড়াতে লাগলাম চতুর্দিকে। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, অনেক সুন্দরী ধনী-কন্যা এসেছিল, অনেক লেখাপড়াজানা কালচার্ড মেয়ে এসেছিল এই প্রৌঢ় কুদর্শন লোকটার গলায় মালা দেবে বলে। কিন্তু আমি কাউকে আমোল দিইনি। মনের অন্তরীক্ষে দেবীর মত দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টর বউ। আমি তার হাতে একটা মালাও কল্পনা করেছিলাম। ওই ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের অঙ্ক আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল—"

চুপ করলেন ভবতোষবাবু। ভৃত্য আর-এক কলকে তামাক দিয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলেন গড়গড়ায়। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। মনে হ'ল অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, "কেষ্টর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা বরাবরই অব্যাহত ছিল। আমার মনে যে এ দুরভিসন্ধি আছে তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। আমি যেতাম বটে, কিন্তু কেষ্টর বউ পারতপক্ষে আমার সামনে আসত না। কি রকম ক'রে সে যেন বুঝতে পেরেছিল আমি নব-রূপী রাবণ একটি। মেয়েরা এটা বুঝতে পারে। যেসব মেয়ে খারাপ হয় তারা রাবণটির সামনে শাড়ির এবং দেহের বাহার ফলিয়ে ঘুর-ঘুর করে, আর যারা ভালো হয় তারা দূরে সরে থাকে। আমার মধ্যে যে একটা লোলুপ 'রাবণ' আছে, কেষ্টর বউ সেটা টের পেয়েছিল। রাবণ বীর ছিল, জোর ক'রে সীতাহরণ করেছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ভীতু। আড়ালে-আবডালে যেন ফাঁক খুঁজছিলাম। কিন্তু ফাঁক পাচ্ছিলাম না। ওদের দাম্পত্য-প্রণয় ছিল একেবারে রেক্তার গাঁথুনিতে গাঁথা। ছুঁচ প্রবেশের উপায় ছিল না। আমি ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফাল হ'য়ে বেরুব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঢোকবারই রাস্তা ছিল না। কেষ্টর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। কেষ্টর বউ কেষ্টকে নিয়েই দিনরাত থাকত। নিজে হাতে তার কাপড় জামা কাচত, নিজে হাতে তার জন্যে রান্না করত, নিজে তাকে সাবান মাখিয়ে চান করাত, নিজে তার চিবুক ধরে মাথার চুল আঁচড়ে দিত, নিজে পাখা নিয়ে ব'সে থাকত তার খাবার সময়। দুপুরে কেষ্ট যখন আপিসে চ'লে যেত তখনও সে কেষ্টরই সেবা করত। হয় তার জামায় বোতাম লাগাচ্ছে, নয় তার কাপড়ের কোথায় খোঁচ লেগেছে সেটা সেলাই করছে, নয় তার জন্যে মোজা বা সোয়েটার বুনছে। কেষ্ট যেসব খাবার ভালবাসত তা-ও তৈরি করত দুপুরে ব'সে। আমসত্ত্ব দিত, বড়ি দিত, আচার তৈরি করত, মোরব্বা তৈরি করত। একেবারে নিশ্ছিদ্র ব্যাপার। কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের উপায় ছিল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটাবার পর ভগবান একদিন সুযোগ দিলেন আমাকে। সুযোগটা এই—কেষ্টর পদস্খলন হ'ল। খবর পেলাম যে রামবাগানে এক মাগীর ওখানে যাতায়াত করছে। প্রাণে একটু আশা হ'ল। একদিন রাত দশটার সময় কেষ্টর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেষ্ট তখনও ফেরেনি, তার বউ জানালার গরাদ ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। দেখে চলে এলাম। তারপর তাদের দাইকে হাত করলাম। তার কাজ হ'ল, কেষ্টর সঙ্গে বউয়ের সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে তার খবর রাখা। দাইটি বেশ ঘাঘি, আড়ি পাততে ওস্তাদ। সে রোজ এসে খবর দিত—কই বাবু, কিছু তো বুঝতে পারি না। আগে যেমন ছিল, এখনও তো তেমনি আছে। তারপর একদিন এসে বললে—আজ ওরা ঘরে অনেকক্ষণ খিল দিয়ে ছিল। আমি বাইরে থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি। বাবু হাউ হাউ ক'রে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আমাকে তুমি

ক্ষমা করো। আমি বিপথে গেছি। আর কখনও যাবো না, আমাকে ক্ষমা করো। আমি জিগ্যেস করলুম, কেষ্টর বউ কি বললে? না, কিছু বললেন না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, তাই তো, এ কি হ'ল। একটিবার শুধু বললেন। তার পরদিন ঝিটা আবার এলো। বললে, আর বিশেষ কিছু হয়নি, মা খালি মাঝে মাঝে বলছেন, তাই তো, একি হ'ল! একা একা আপনমনেই এ-কথা বলেন। আমার মনে হ'ল এই সুযোগ। আমি দাইয়ের মারফত একটা চিঠি পাঠালাম সাহস ক'রে। তাতে শুধু লিখলাম—ওই পাপিষ্ঠের কাছে তুমি আর থেকো না। আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে রাজরাজেশ্বরী ক'রে রেখে দেবো! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—

"আমি মহাপাপী, তাই আমার স্বামী বিপথে গেছেন। তাই আপনি (যাঁকে আমি এতকাল দাদার মতো শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি) আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারলেন। দোষ আপনাদের কারও নয়, দোষ আমার মধ্যেই আছে নিশ্চয়। তাই এসব ঘটছে। আমি আপনাদের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো।" তারপর দিনই আপিং খেলে। কেষ্ট মনে করলে, তারই পদস্খলনের কথা শুনে এই কাণ্ড ঘটল বুঝি। কিন্তু আমি জানতাম আসল কারণ কি। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্র ক'রে বাঁচিয়ে তুললাম তাকে, তারপর থেকে আর তাদের বাড়ি যাইনি। যাবার সাহস হয়নি। এ ঘটনার পর কেষ্ট কিন্তু ভেঙে পড়ল। খেতো না, কথা কইত না, বিমর্ষ হ'য়ে বসে থাকত খালি। দিনকতক পরে শয্যা নিলে। দিনরাত কাঁদত খালি। চোখের জলের ধারায় তার নাকের দু'পাশ হেজে গেল। ডাক্তার এসে বললেন, মানসিক ব্যাধি। কেষ্টর বউ দিবারাত্রি তার মাথার শিয়রে বসে সেবা করত। ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—সবরকম চিকিৎসাই হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেষ্ট বাঁচল না। কেষ্টকে যখন আমরা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তখন কেষ্টর বউ তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল—না, না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বলেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তার। এক চিতায় দু'জনকে পোড়ানো হ'ল—"

ভবতোষবাবু নির্নিমেষে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন আর একবার।

নেপথ্যে

তিনু সেদিন স্টেশন থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরল। চাপা উত্তেজনা, কারণ কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন, কিন্তু জনকয়েককে ত বলতেই হবে। বিশেষত মণিকে। একটা মালাও তো গাঁথতে হবে অন্তত, তাদের বাগানেই ফুল আছে। বাজারের কেনা মালা তাঁকে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া কাকে কাকে খবরটা বলতে হবে সে-ও একটা সমস্যা। যাকে বাদ দেওয়া যাবে সে-ই চটে যাবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবেই। এত

বড় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া শক্ত। তাছাড়া আর একটা কথা, মেয়েদের কাউকে খবর দেওয়া হবে কিনা। তার বোন অঞ্জলি, কিম্বা মণির বোন মুকুলকে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়, তাদের পেটে কথা থাকবে কি! অঞ্জলিটা যা বক্তিয়ার খিলিজি। শুধু যে তার পেটে কথা থাকে না তা নয়, কথা বাড়িয়ে বলে। বেড়াল দেখলে বলে বাঘ দেখেছি। মুকুলটাও প্রায় তাই। মণির সঙ্গে পরামর্শ না করলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল মণির বাড়ির উদ্দেশে। মণির বাড়িতে গিয়ে দেখল মণি নেই। এই আশঙ্কাই করেছিল সে। মণি ক্লাসের ভালো ছেলে, প্রায় প্রতি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তাই মাস্টাররা তাকে ভালোবাসেন সবাই। থার্ড মাস্টার আর ফোর্থ মাস্টার তাকে বিনা পয়সায় পড়ান। তাই সে কোনদিন থার্ড মাস্টার, কোনদিন ফোর্থ মাস্টারের বাড়ি যায়। থার্ড মাস্টার তাকে অঙ্ক পড়ান, ফোর্থ মাস্টার ইংরেজী।

দেখা হ'ল মণির বোন মুকুলের সঙ্গে।

"দাদা তো বাড়িতে নেই। থার্ড মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেছে। কেন, এসময় কি দরকার?"

মুকুলের বয়স বছর এগারো। একটু ফাজিল গোছের।

"সিনেমার টিকিট যোগাড় করেছ বুঝি।"

মুচকি হেসে বলল সে।

এ কথার জবাব না দিয়ে তিনু বলল—"তুই একটা বেলফুলের মালা গেঁথে দিতে পারিস?"

"কেন। বেলফুলের মালা নিয়ে কি করবে এখন! বিয়ে নাকি?"

"বিয়ে নয়, অন্য দরকার আছে।"

"কি দরকার?"

"তুই পারবি কি না বল না।"

"পারব। কিন্তু মালা নিয়ে কি করবে তা বলতে হবে।"

"আচ্ছা, সে যখন মালা নেব তখন বলব। তুই গেঁথে রাখিস তাহলে, আমি ঘুরে আসছি।"

"কতক্ষণ পরে আসবে?"

"ঘণ্টাখানেক পরে। আমি যাচ্ছি এখন মণির কাছে। আমরা দু'জনেই আসব এক ঘণ্টা পরে। মালা গেঁথে রাখিস, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

একটু দূরে এগিয়ে গেছে, এমন সময় মুকুলের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তিনু দা—শুনে যা-ও।"

"কি—"

"তুমি মাকে বলে যাও, তা না হলে মা আমাকে সন্ধের পর গাছ থেকে ফুল তুলতে দেবে না।"

"কেন, সন্ধের পর গাছ থেকে ফুল তুললে কি হয়?"

"গাছের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কষ্ট হয়।"

মুচকি হেসে মুকুল ছুটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল তিনু। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

মুকুলের মা ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন, বাজার-থেকে-আনা জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনু।

"কাকীমা মুকুলকে বলুন না, বেলফুলের একটা মালা গেঁথে দিক। আপনাদের বাগানে তো প্রচুর বেলফুল।"

"এত রাত্রে মালা নিয়ে কি করবে বাবা?"

"ভীষণ দরকার।"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। তাঁর মনে হ'ল 'ভীষণ' কথাটার মানেটা বদলে দিয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। মুকুলের মা মূর্খ নন, বেথুন থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু বি-এ পাশ করলে কি হবে, মনটি একেবারে সেকেলে।

"কি এমন ভীষণ দরকার হ'ল এখন?"

"তা কাল বলব। যাঁর জন্যে মালা দরকার আজ তিনি কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছেন।"

চুপ ক'রে রইলেন মুকুলের মা।

তারপর বললেন, "কিন্তু রাত্রে যে ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা! রাত্রে গাছেরা ঘুমোয়—"

"রাত্রে আমরাও ঘুমোই, কিন্তু খুব দরকার হ'লে কি আমাদের আপনি জাগাবেন না?"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। মনে মনে বললেন, ছেলেটা বরাবরই জেদী। মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি।

এর ঠিক পরেই কিন্তু তিনু যা করলে তাতে কাবু হয়ে পড়তে হ'ল মুকুলের মাকে।

তিনু আবদার-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, "ওসব কিছু শুনব না কাকীমা। মালা একটা চাইই আজ রাত্রে। না পেলে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে আমাদের। কাল সব কথা বলব আপনাকে।"

"তবে বলে যা মুকুলকে গেঁথে রাখুক একটা। এত জ্বালাস তোরা!"

দুই

থার্ড মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই তিনু দেখতে পেল থার্ড মাস্টার মশাই মণিকে পড়াচ্ছেন। মণি পেন্সিল হাতে ক'রে একটা খাতার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ব'সে আছে। তিনুর মনে হ'ল খুব সম্ভব শক্ত কোনও অঙ্ক দিয়েছেন। থার্ড মাস্টারমশাইও ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মণির দিকে। পরিবেশটা খুব অনুকূল মনে হ'ল না তিনুর। এ অবস্থায় ও ঘরে ঢোকা আর বাঘের মুখে পড়া একই জিনিস। হয়তো তাকেও দেখলে বসিয়ে দেবেন অঙ্ক কষতে। বলবেন, "মণি এটা পারছে না, দেখ দিকি তুমি পার কিনা।" মণি যে অঙ্ক পারছে না তা সে নিশ্চয়ই পারবে না,

মাঝ থেকে সময় নষ্ট হ'য়ে যাবে খানিকটা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় খেলে গেল, থার্ড মাস্টারমশাইকেও ব্যাপারটা বললে কেমন হয়। নূতন ইন্‌সপেকটারের ভাইপো সম্প্রতি বি-এ. বি-টি পাশ করেছে, তাকে তিনি বসাতে চান থার্ড মাস্টারের জায়গায়। তাই আজকাল তিনি নানা রকমে থার্ড মাস্টারের খুঁত ধরছেন। গতবার এসে তিনি থার্ড মাস্টারকে অপমানই ক'রে গেছেন ক্লাসের সামনে। থার্ড মাস্টারমশাই এই অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ ক'রে ওপরওলার কাছে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। তাঁর দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত আসেনি। সব নাকি মুখ শোঁকাশুঁকি আছে। ওপরওলারা নাকি সব অবাঙালী, বাঙালীর কোন নালিশই শুনতে চান না। মাস্টারমশাই ওঁকে যদি সব কথা খুলে বলেন তাহলে হয়তো উনি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। তিনু তার নিজের বাবার কথাটাও বলবে ভেবেছে। কিছুতেই তাঁকে প্রমোশন দিচ্ছে না। তাঁর নীচের লোকেরা কেউ মিনিস্টারের আত্মীয়, কেউ শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট, কেউ বড়বাবুর ভাগনে বলে প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বাবার চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে না। ওঁকে বললে উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। আর উনি বললে কি না হ'তে পারে।

হঠাৎ থার্ড মাস্টারমশাই চোখ তুলে বারান্দার দিকে চাইলেন।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?"

"আজ্ঞে, আমি তিনু।"

তিনু এসে ভিতরে ঢুকল।

"ও তুমি। এমন সময় হঠাৎ কি দরকার ?"

"আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার।"

"আমার সঙ্গে ? প্রাইভেটলি ? কি কথা—"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল তিনু। তার প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এইবার বুঝি মাস্টার মশাই ধমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু মাস্টারমশাই তা করলেন না, খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা, বল, শুনি কি তোমার প্রাইভেট কথা।"

সব শুনে থার্ড মাস্টারমশাইও অবাক হ'য়ে গেলেন। এ যে অবিশ্বাস্য, অথচ একথা বিশ্বাস করবার জন্যে তাঁরও সারা হৃদয় যে উন্মুখ হয়ে আছে।

"তুমি ঠিক দেখেছ ?"

"ঠিক দেখেছি সার। আমার একটুও ভুল হয়নি।"

"স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ব'সে আছেন ? এখানে নিয়ে এলে না কেন ?

"তিনি যে কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন খুব জরুরি দরকারে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। রাত্রি দুটোয় তাঁর গাড়ি। আপনি একবার চলুন সার—"

থার্ড মাস্টারমশাই চুপ ক'রে রইলেন।

"তিনি কি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি—"

তাঁর কথা শেষ করতে দিলে না তিনু।

"না, তিনি স্বীকার করেন নি যদিও, কিন্তু অস্বীকারও করেন নি। মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইলেন। আমার ভুল হয়নি সার। তিনি আর একটা কথাও বলেছেন, খুব যেন জানাজানি না হয়—"

থার্ড মাস্টারমশাই ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন,

"বেশ আর কাউকে বোলো না। তুমি, আমি আর মণি স্টেশনে যাব। একটা মালা যোগাড় ক'রে ফেল—"

"মালা গাঁথতে দিয়েছি সার।"

"বেশ, একটা নাগাদ বেরুব বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।"

সোৎসাহে তিনু বাড়ি ফিরে গেল।

তিন

স্টেশনের কাছেই এক মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের চূড়ার উপর দপদপ ক'রে জ্বলছিল একটা বড় নক্ষত্র। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গগনস্পর্শী ললাটে যেন পরানো হয়েছে এক রহস্যময় অদৃশ্য মুকুট আর সেই মুকুটের মধ্যমণি যেন ওই নক্ষত্র।

তিনু, মণি আর থার্ড মাস্টারমশাই যখন স্টেশনে এসে পেঁছিল তখন ঠিক একটা বেজেছে। মণির হাতে একটি মালা। মুকুল সত্যিই বেশ চমৎকার ক'রে গেঁথে দিয়েছিল মালাটি। তিনুর হাতে একটি কাগজ। স্টেশনে কোনও লোক নেই বিশেষ। মফস্বলের স্টেশনে লোক থাকেও না বিশেষ এত রাত্রে। স্টেশনের বাবুরা শুধু জেগে কাজ করছেন নিজেদের আপিসে। গোটা কয়েক কুলি একধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনু, মণি আর মাস্টারমশাই এগিয়ে গেল ওয়েটিং রুমের দিকে। ওয়েটিং রুমেই তাঁর থাকবার কথা, তিনুকে সেই কথাই বলেছিলেন তিনি। তিনু ওয়েটিং রুমে উঁকি দিয়ে দেখল। প্রথমে দেখতে পেল না কাউকে। চেয়ার বেঞ্চি সব খালি। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল কোণের দিকে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে মুড়ে কে শুয়ে আছে। তিনু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। এই যে তিনি। থার্ড মাস্টারও অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই তো।

ভদ্রলোক উঠে বসেছিলেন, তিনি তিনুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "ও, তুমি এসে গেছ বুঝি। বস, বস। তারপর ওটা কি?"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তিনু বললে, "ওটা ফুলের মালা, আপনার জন্যই এনেছি।"

মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিনু তাঁকে পরিয়ে দিলে সেটি। তারপর প্রণাম করলে। মণিও করলে, থার্ড মাস্টারমশাইও করলেন। ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার করলেন কেবল, আর কিছু বললেন না।

তিনু তখন তার অভিনন্দনপত্রখানা খুলে পড়তে লাগল।

"হে নেতাজী, হে ভারতবরেণ্য বাংলাদেশের সুসন্তান, আজ যে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আপনার দেখা পাব তা আমাদের সুদূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। আপনি যে এখনও জীবিত আছেন, একথা আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, আমরাও করতাম। আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কৃতার্থ হলাম।

আজ বাংলাদেশের বড় দুর্দিন। স্বাধীনতা দেবার ছুতোয় ইংরেজ বাংলাদেশকে

আবার দ্বিখণ্ডিত ক'রে চলে গেছে। অসংখ্য বাঙালী পথে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন বাঙালীর হাহাকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ, কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতার সিংহাসনে আজ সমাসীন তাঁদের কানে এ হাহাকার প্রবেশ করে না। উপরন্তু তাঁদের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে বাঙালীরা যেন দেশের কেউ নয়, বাঙালীরা যেন স্বাধীনতার জন্য কিছু করেনি, যা করেছে সব অবাঙালীরা। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান নেই, অন্যায়ভাবে অত্যাচার ক'রে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আমার বাবা কখনও ঘুষ নিতেন না, এই জন্যই তাঁর প্রোমোশন হয় না। প্রোমোশন হয়েছে মিনিস্টারের এক ভাইপোর। ওপরওলাদের ইচ্ছে কর্মচারীরা সব ঘুষ নিক এবং টাকাটা সবাই মিলে ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া হোক। আমার বাবা তা করতে রাজী হননি বলে তাঁর উপর সবাই চটা। সর্বত্রই এই।

রাষ্ট্রভাষার নামে জোর ক'রে হিন্দী আমাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমাদের স্কুলে নতুন যে অবাঙালী হেডমাস্টার এসেছেন, তিনি বাড়িতে তাসের আড্ডা বসিয়ে জুয়ো খেলেন,আমাদের থার্ড মাস্টারমশাই সে আড্ডায় যান না বলে হেডমাস্টার তাঁর উপর অপ্রসন্ন। নানা ছুতোয় ওঁর নামে অভিযোগ করেন ওপরওলার কাছে। বাংলাদেশে যে-সব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতেও বাঙালীরা চাকরি পায় না, সেখানেও অবাঙালীদের প্রতাপ। স্বাধীনতার নামে যে জিনিস দেশে চালু হয়েছে, তা বাঙালীদের পক্ষে নির্যাতনের নামান্তর। এ সময় আপনি এমনভাবে আত্মগোপন ক'রে আছেন কেন ? ভাস্কর-দীপ্তিতে আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনাকে পুরোভাগে রেখে আবার আমরা জয়-যাত্রায় অগ্রসর হই।

যে অখণ্ড অম্লান পক্ষপাতহীন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে বাঙলার ছেলেমেয়েরা দলে দলে আত্মহুতি দিয়েছিল, সে স্বাধীনতা আমরা পাইনি। আমাদের ঠকিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে, একদল চতুর লোক ক্ষমতা হস্তগত করেছে। আদর্শবাদী বাঙালীদের তারা নিষ্পিষ্ট ক'রে মেরে ফেলতে চায়, এ বিষয়ে তারা ইংরেজদের চেয়েও নিষ্ঠুর। হে নেতাজী, আপনি আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনি এখুনি আমাদের অনুমতি দিন আমরা দামামা বাজিয়ে প্রচার করি আপনার আবির্ভাবের কথা, আসমুদ্র-হিমাচল আবার জেগে উঠুক নব স্বাধীনতার নব আন্দোলনে। হে নেতাজী, আপনি আমাদের অনুমতি দিন—"

তিনুর গলা কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। সে থেমে গেল। অভিনন্দনপত্রে আর একটু লেখা ছিল, কিন্তু সে আর সেটুকু পড়তে পারল না।

তিনি বিনিষ্টচিত্তে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "এটা কি তুমি নিজে লিখেছ ?"

"আমি খানিকটা লিখেছিলাম, তারপর মাস্টারমশাই বাকিটা লিখে দিয়েছেন।"

থার্ড মাস্টারমশাই বললেন, "গোড়ার দিকটা ওর লেখা, শেষের দিকটা আমার।"

তিনি তিনুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যা লিখেছ, তা ঠিক। স্বাধীনতার নামে দেশে নানারকম অনাচার অবিচার চলছে এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমরা একদিকটা মাত্র দেখছ, এর আর একটা দিকও আছে।"

"কি সেটা আমাদের বলে দিন।"

"তোমরা নিজেদের দোষের কথা কিছু বলনি। বলনি যে তোমরা দুর্বল বলেই নানারকম মারাত্মক রোগের বীজাণু তোমাদের আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি জীবনী-

শক্তিতে বলীয়ান হ'তে, কেউ তোমাদের কিছু করতে পারত না। তোমরা অবিচার অত্যাচারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছ, প্রতিবাদ নেই, একতা নেই, গুণীকে শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, তোমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান থাকতে চাও, একজন নেতাকে মুখ বুজে অনুসরণ করবার মতো ধৈর্যও তোমাদের নেই, মনোবৃত্তিও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। এরকম অবস্থায় দুর্দশা তো হবেই। তোমরা আগে মানুষের মতো মানুষ হও, বিদ্যায় চরিত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ কর, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

একটু থেমে বললেন, "আমাকে তোমরা এখন তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে বলছ। যদি আত্মপ্রকাশ করি তাহলে এর একটিমাত্র ফলই হবে, দলাদলি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম তখন আমাকে কেন্দ্র ক'রে যে কি কুৎসিত দলাদলি হয়েছিল তা তোমরা যখন বড় হয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়বে তখন বুঝতে পারবে। তাই আমি এখন তোমাদের মধ্যে আসতে ইতস্তত করছি, বুঝতে পারছি আমার আদর্শকে রূপ দেবার মতো যথেষ্ট লোক নেই দেশে, তোমরা যেদিন বড় হ'য়ে উপযুক্ত হ'য়ে আমাকে ডাক দেবে, সেই দিনই আমি আসব তোমাদের কাছে। তোমরা নিজেদের তৈরি কর। সেইটেই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। ট্রেনের আর বেশী সময় নেই। আজ তাহলে তোমরা এস। তোমরা সত্যি সত্যি যেদিন বড় হবে সেদিন তোমাদের মহত্ত্বের আকর্ষণেই আবার আসব তোমাদের কাছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে এইবার একা একটু কথা বলব, তোমরা দু'জন বাইরে যাও।"

তিনু আর মণি বাইরে চলে গেল।

তখন তিনি থার্ড মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি নেতাজী নই। আমি সামান্য লোক। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। অনেকেই আমাকে নেতাজী বলে ভুল করে। বয়স্ক লোকেরা যখন করে তখন আমি তাদের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিই। কিন্তু কিশোর ছেলেরা যখন নেতাজী বলে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন আমি আর তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আপনার ছাত্র দুটিকে যা বললাম তাদের তাই বলি। আপনিও যেন তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবেন না। নেতাজীকে ফিরে পাবার আশায় তারা নিজেদের ভাল ক'রে গড়ে তুলুক। আর আপনারা তাদের সে গঠনে সহায়তা করুন।"

থার্ড মাস্টারমশাই নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল।

"আমার ট্রেন এসে গেল। আমি চলি—"

নিজের ছোট পুঁটলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বেরুবার আগে মাথায় একটা টুপি পরলেন আর মুখের নিচের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তাঁর মুখটা কেউ না দেখতে পায়।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীঅধর আইচ যে বাড়ির দ্বিতলের ফ্লাটে তখন থাকিতেন সে বাড়িটি অতিশয় জীর্ণ। তাঁহার লোহার দোকানটি বড়বাজারে ছিল। আইচ মহাশয়ের আর্থিক সঙ্গতির

সহিত বাড়িটি খাপ খায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গীতে ঘর লইয়া থাকিতে পারিতেন। পিতার বিপুল সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এখন তিনি যে ঘরটিতে থাকেন তাহার দরজা-জানলা পর্যন্ত ভালো বন্ধ করা যায় না। অধর আইচ এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন তাহার কারণ মিস বোস। মিস বোস টেলিফোনে কাজ করেন।

একদা একটি সদ্য-মুক্ত সিনেমা চিত্রের এলাহি কাণ্ডকারখানার মধ্যে মিস বোসের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। মিস বোস স্বল্প মূল্যের টিকিট কিনিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় অধর আইচ হুড়মুড় করিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন।

"সরি, কিছু মনে করবেন না। আজ বড্ড রাশ্—! বেরিয়ে আসুন ভিড় থেকে—"

উভয়ে বাহির হইয়া আসিলে আইচ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিকিট কিনতে পেরেছেন—"

"না—হাইয়ার ক্লাসের টিকিট ছাড়া সব টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে শুনছি—"

"আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি টিকিট কিনে আনছি।"

"আমার টাকাও নিয়ে যান তাহলে—"

"আচ্ছা সে হবে এখন। আগে দেখি টিকিট পাই কি না।"

অধর আইচ চলিয়া গেলেন এবং একটু পরে দুইখানি উচ্চ মূল্যের টিকিট কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, "চলুন এবার।"

"পেয়েছেন টিকিট ?"

"পেয়েছি। আসুন—"

ভালো গদি-আঁটা চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে সিনেমা দেখিলেন। মাথার উপর পাখা ঘুরিতে লাগিল।

সেই সময়ই অধর আইচ কায়দা করিয়া মিস বোসের বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া অবশেষে তিনি সেই ঠিকানাতেই উঠিয়া গেলেন। নোনাধরা নড়বড়ে বাড়িটা দেখিয়া প্রথমটা একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল, ওই বাড়িতেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

শ্রীধর আইচ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, শ্রীমতী যূথিকা বসু ক্রিশ্চান। কিন্তু প্রেমের দেবতার অফিসে যে-সব হিসাব রাখা হয় ধর্মের হিসাব তাহার মধ্যে নাই। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে, নেপথ্যে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাহস কাহারও হইল না। আইচ মহাশয়ের সহিত মিস বোসের দেখা রোজই হইত। কিন্তু প্রত্যহই তিনি সে সুযোগ মামুলি কুশল প্রশ্ন করিয়া, প্রসঙ্গ তুলিয়া অথবা রাজনৈতিক কথা বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। যে কথাটি হীরকের মতো মনের অন্ধকারে জ্বলিতেছিল তাহা কিছুতেই তিনি মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। মিস বোসেরও ঠিক ওই অবস্থা।

দুই

একদিন কিন্তু বরফ ফাটিল এক অদ্ভুত উপায়ে।

অধর আইচ অধীর হইয়া অবশেষে ঠিক করিলেন যে পত্রযোগেই মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। ফিকে নীল রঙের একটি কাগজে তিনি নিম্নলিখিত পত্রটি ফাঁদিলেন—

সুচরিতাসু,

ভগবানের অসীম কৃপায় কিছুদিন পূর্বে আপনার সহিত সিনেমায় দেখা হইয়াছিল। আপনাকে দেখিবামাত্র মনে হইয়াছিল, এই তো সেই যাহাকে এতকাল ধরিয়া খুঁজিতেছি, যাহার আশায় এতদিন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি···

এই পর্যন্ত লিখিয়াই আইচ মহাশয়ের মনে হইল কাজটা ঠিক হইতেছে না। প্যাড হইতে কাগজটি ছিঁড়িয়া গুলি পাকাইয়া সেটি ঘরের কোণে ফেলিয়া দিলেন।

পরদিন আবার তাঁহার মনে হইল, না, লিখিয়াই ফেলি। বিবাহের প্রস্তাব করিব ইহাতে লজ্জার কি আছে। আগের দিন কি লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার জন্য কাগজের পাকানো গুলিটি ঘরের কোণে খুঁজিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন নীল কাগজের গুলি নাই, গোলাপী কাগজের একটি গুলি রহিয়াছে। গোলাপী রঙের কাগজ তো তিনি ব্যবহার করেন না। গুলিটি তুলিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অধরবাবু, আপনাকে যে কথা আজ বলতে যাচ্ছি তা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। লজ্জার মাথা খেয়ে তবু বলছি। সেদিন সিনেমায় আপনি আমার টিকিট কিনে দিলেন, দাম নিলেন না, তারপর আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িতে উঠে এসে অসীম কষ্টভোগ করছেন, আমার সামান্য উপকার করবার জন্য আপনি সর্বদাই ব্যস্ত। এ সবের অর্থ কি তা আমি বুঝি। মেয়েরা এসব কথা বুঝতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা কি আপনি বুঝতে পারেন নি? সেটা কি আমাকে খুলে বলতে হবে? বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু বড্ড লজ্জা করছে যে—

চিঠি এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

তিন

পরদিন তিনি বড়বাজারে তাঁহার লোহার দোকানে গিয়া প্রধান কর্মচারীকে একটি আদেশ দিলেন।

"ইঁদুর-ধরা কল আর বিক্রি কোরো না। আর চেনা-শোনা কাছাকাছি দোকানে যত ইঁদুর-ধরা কল আছে—সব কিনে গুদোমে পুরে ফেল।"

কর্মচারী প্রশ্ন করলেন, "দাম চড়বে না কি—"

"না। ইঁদুর ধরা কল আর বিক্রি করব না। কাউকে বিক্রি করতে দেবও না। বাজারে যত কল আছে কিনে ফেল—"

"যে আজ্ঞে।"

তাহার পর তিনি ফোন করিলেন তাঁহার হিন্দু বন্ধু হরিপ্রসাদকে।

"হ্যালো, হরি? হরি কথা বলছ? ভাই, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। গণেশ পুজোটা তোমাকে করতে হবে। শুধু তাই নয়, সমারোহ সহকারে করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেব। ঠাকুরের জন্য কুমোরটুলিতে এখুনি অর্ডারটা দিয়ে দাও। ইঁদুরটি যেন বেশ বড় এবং ভাল ক'রে করে। হ্যাঁ হে ইঁদুরটি। ওই ইঁদুরের দৌলতেই আমাদের বিয়ে হচ্ছে। ইঁদুরই আমার চিঠি ও'র কাছে এবং ও'র চিঠি আমার কাছে নিয়ে এসেছে। হা, হা, হা, ঠিক বলেছ, এখন মেঘদূতের যুগ চলে গেছে, এখন মুষিকদূতের যুগ। আমার ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন উনি। আর বাড়িটায় প্রচুর ইঁদুর। গণেশ পুজোটি ভাল ক'রে করবার ব্যবস্থা কোরো। আমিই করতে পারতুম, কিন্তু আমি ব্রাহ্ম, উনি ক্রিশ্চান। একটু দৃষ্টিকটু হবে না? তাই তোমার বেনামীতে করতে চাই। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা জিনিস আছে। ঠাকুরের অর্ডারটা এখুনি দিয়ে দাও। শ' দুই টাকা আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। না, না, সে কি কথা, টাকা নিতে হবে বই কি! আচ্ছা, আচ্ছা—"

স্বরূপ

থার্ড ক্লাস কামরায় অসম্ভব ভিড় সেদিন। অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, কারণ আমি একটা বেঞ্চির এককোণে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনে কোন সৌভাগ্যই অবিমিশ্র হয় না, গোলাপ ফুলেও কাঁটা থাকে। আমার পাশেই যে লোকটি বসেছিল তার সান্নিধ্য বিষবৎ মনে হচ্ছিল। মাথা ভরতি বড় বড় চুল, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো হলদে, চোখের কোণে পিঁচুটি। সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের একটা ভ্যাপসা গন্ধও ছাড়ছিল। পরনের জামা-কাপড় বেশ ময়লা। অত্যন্ত নোংরা লোকটা। এর উপর আর এক বিপদ, ক্রমাগত ঢুলছিল সে। ঢুলে ঢুলে আমার দিকে ঢলে পড়ছিল। মাথা ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল দু-একবার। কামরায় জায়গা থাকলে অন্য জায়গায় সরে যেতুম। কিন্তু সরবার উপায় ছিল না। নিরুপায় হ'য়ে বসে রইলুম। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি! হঠাৎ একটা উপায় মিলে গেল অবশেষে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এতক্ষণ লোকটাকে জানোয়ার, অসভ্য মনে হচ্ছিল, মনে মনে তাকে জীবন্ত আস্তাকুঁড়ের সঙ্গে উপমিত করছিলুম। কিন্তু তার মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার পরই সব বদলে গেল। মনে হ'ল লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত, বোধহয় গরীবও খুব। বয়সও হয়েছে, কারণ দাড়ির অনেক চুল পাকা, চুলও কাঁচাপাকা। চোখে মুখে কেমন একটা অসহায় অবসন্ন ভাব। হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বুড়ো বয়সে আপিঙ ধরেছিলেন, সন্ধ্যার সময় এমনি ঢুলতেন বসে বসে। মা খুব বকতেন তাঁকে।

কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদ বেরুত না কখনও, অপরাধীর মতো চুপ ক'রে থাকতেন। মাঝে মাঝে শঙ্কিত মৃদু হাসি হাসতেন অপ্রতিভের মতো।

"শুনছেন?"

"কি।"

"আপনি এক কাজ করুন। আমার কাঁধের উপর মাথাটা রেখে ঘুমোন।"

"অমন সুন্দর জামাটা মাটি হয়ে যাবে যে আমার মাথার তেল লেগে।"

"তা যাক। আপনি ঘুমিয়ে নিন খানিকক্ষণ।"

বেশী অনুরোধ করতে হ'ল না, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমোল সে। ইতিমধ্যে যাত্রীও নেমে গেল অনেক, একটা বেঞ্চ প্রায় খালিই হয়ে গেল। ইঞ্জিনের একটা হ্যাঁচকা টানেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

"অনেকক্ষণ ঘুমুলুম। কষ্ট হয়নি তো।"

"না, তেমন আর কি।"

"এইবার তুমি শুয়ে পড়। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। আমার বড় ছেলের বয়সী তুমি। কত বয়স হয়েছে তোমার?"

"কুড়ি বছর—"

"আমার বিনুর বয়সও কুড়ি বছর হবে। তুমি এবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড় ওই বেঞ্চিটাতে। আমি তোমার জিনিসপত্রগুলো পাহারা দিচ্ছি। কোনগুলো তোমার জিনিস?"

"ওই ট্রাঙ্কটা। আর কিছু নেই।"

"বেশ আমি পাহারা দিচ্ছি ওটা। তুমি শোও।"

আমারও ঘুম পাচ্ছিল বেশ। শুয়ে পড়লাম সামনের বেঞ্চিটায়। আমার ঘুম খুব গাঢ়, তাই সাধারণতঃ আমি ঘুমুই না ট্রেনে। কিন্তু লোকটির উপর কেমন বিশ্বাস হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা বড় স্টেশনের গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। সামনেই দেখি একটা খাবারওলা খাবার ফেরি করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিছু লুচি, তরকারি আর মিষ্টি কিনলাম। ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। ট্রেনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে।

কামরায় তখন আর কোনও লোক নেই।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে বললে, "বেশীক্ষণ তো ঘুমুলে না। আমার উপর বিশ্বাস হ'ল না বুঝি!"

খাবার একটু বেশী ক'রেই কিনেছিলাম। অর্ধেকটা তাঁকে দিয়ে বললুম— "খান—"

"আমার জন্যেও কিনেছ না কি?"—তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে হেসে বললে— "ভালই করেছ। খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমারও।"

অভদ্রের মতো গাঁউ গাঁউ ক'রে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে গেল সব।

"আর একটু নেবেন?"

"না। ওটা তুমি খাও।"

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর মুখ হাত ধুয়ে বসলাম দুজনে মুখোমুখি।

"কোথা থেকে আসছ?"

"হাজারিবাগ থেকে।"

"কি কর সেখানে?"

"কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

তখন আমিও পরিচয় নিতে অগ্রসর হলাম।

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"হাজারিবাগ থেকেই। আমারও ছুটি হয়েছে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

"আপনি কি ওখানে চাকরি করেন?"

"না। আমি জেলে ছিলাম। কাল ছাড়া পেয়েছি।"

হঠাৎ মনে হ'ল কোনও দেশ-নেতা বোধহয়। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও অশোভন আচরণ ক'রে ফেলেছি ভেবে মনে মনে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম একটু।

"জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন? জেলে গিয়েছিলেন কেন?"

"চুরি ক'রে। আমি চোর।"

"চোর?"

হতভম্ববৎ বসে রইলাম তার দিকে চেয়ে। পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে গভীর গহ্বরে পতন হ'লে মনের যে অবস্থা হয়, আমারও তাই হ'ল। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম কেবল।

"হ্যাঁ, আমি চোর। ওই আমার পেশা। সবশুদ্ধ তিনবার এই নিয়ে আমার জেল হয়েছে। ছাড়া পেয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিই, তার পর চুরি করি, আবার জেল খাটি। এই আমার জীবন।"

"চুরি করেন কেন?"

"প্রথমবার সঙ্গদোষে পড়ে করেছিলাম। মেয়ের বিয়ের জন্য টাকারও দরকার পড়েছিল কিছু। হাজার বিশেক টাকা চুরি করেছিলুম। আমার বখরায় পাঁচ হাজার পড়েছিল। মেয়ের বিয়েটা দিতে পেরেছিলুম। দু'বছর জেল হয়েছিল এজন্যে। জেলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর চুরি করব না। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখলুম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা শক্ত। আমি দাগী হ'য়ে গেছি, ভদ্রলোকের সমাজ আমাকে এক-ঘরে করেছে। কেউ কাজ দেয় না, কথা বলে না পর্যন্ত। এ রকম বেকার এক-ঘরে হ'য়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে। সুতরাং আবার চুরি করতে হ'ল। চুরি ক'রে যা পেলুম পরিবারের হাতে দিয়ে জেলে চলে এলুম। বাইরেও খেটে খেতে হয়, জেলেও তাই। বসিয়ে কেউ খেতে দেয় না। জেলখাটার সুবিধেও আছে অনেক। চাকরির জন্যে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে হয় না। সেখানে বাঁধা কাজ রোজ করতে হয়। নানা রকম কাজ শেখাও যায়। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অসুখ হ'লে ডাক্তার আসে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। পাকা ঘরে শুতে পাই। আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থাও আছে, নাচ গান থিয়েটার সব হয়। আর ভালভাবে থাকলে জেলারবাবুরা বেশ ভালো ব্যবহার করেন। জেলে কোনও কষ্ট হয় না। তাছাড়া বাইরে থাকবার উপায় তো নেই, একবার পা পিছলে গেলে সমাজ আর ক্ষমা করে না। স্পষ্ট ক'রে মুখে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, তুমি চোর, তফাতে থাক।"

একটানা বলে গেল লোকটা। মনে হ'ল যেন মুখস্থ বলে গেল। আমি নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। একটি কথাও বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। যদিও সে নিজের সম্বন্ধে যা যা বললে এতক্ষণ, তাতে তার প্রতি আমার ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু ঘৃণা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল লোকটা চোর! চোর! কতক্ষণ এমনভাবে বসে থাকবে আমার সামনে!

"তুমি আমাকে তোমার খাবারের ভাগ দিলে, আমারও তোমাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, তুমি আমার বিনুর বয়সী। জেল থেকে বেরুবার সময় কয়েকটা টাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিটের পয়সাটি রেখে বাকি পয়সার মদ খেয়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক বারই আমি মদ খাই, তখন তো জানতাম না যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে রাখতুম।"

করুণ মর্মান্তিক একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

চুপ ক'রে রইলাম। কি আর বলব। সে-ও ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটে চলেছে, আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে নীরবে বসে আছি।

"একটা উপকার কিন্তু তোমার করতে পারি"—হঠাৎ বলে উঠল সে—"আমি যা যা বলছি তা যদি কর তাহলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে না কখনও। আমি পাকা চোর হ'য়ে গেছি তো, এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেবার অধিকার আমার হয়েছে।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

"বলব?"

"বলুন।"

"আমি অবশ্য সিঁধেল চোর। সিঁধেল চোরদের কথাই বলব। আমরা যে বাড়িতে সিঁধ দিই সে বাড়িটি দশ-পনরো দিন আগে থেকে ওয়াচ করি। বাড়ির আলো কখন নেবে, বাড়িতে রাত বারোটার পর লোকের যাওয়া-আসা আছে কি না, অনেক বাড়িতে নাইট-ডিউটির লোক থাকে কি না। তার পর লক্ষ্য করি সে-বাড়িতে কুকুর আছে কি না, থাকলে কি রকম কুকুর আছে, খাবার দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যায় কি না। কুকুর থাকলে আমরা প্রায় তার সঙ্গে দিনের বেলাই ভাব করতে চেষ্টা করি খাবার দিয়ে দিয়ে। তিন-চার দিন খাবার খাওয়ালেই ভাব হয়ে যায়। তার পর দেখি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে বাড়িতে এলার্ম ঘড়ি বাজে কি না। অনেক বাড়িতে লেখকরা বা পড়ুয়ারা রাত দুপুরে উঠে পড়াশোনা করে। সে-সব বাড়িতে সিঁধ দেওয়া অসম্ভব। তারপর আর একটা জিনিসও দেখতে হয় আমাদের। যদি দেখি গেরস্ত খুব সাবধানী লোক, শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিক দেখে দেখে বেড়াচ্ছে তাহলে সে বাড়িতেও আমরা পারতপক্ষে যাই না। সুতরাং তুমি এই কটি জিনিস রোজ কোরো। নম্বর ওয়ান—শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিকটা দেখে তবে শুয়ো। নম্বর টু—এলার্ম ঘড়িতে রাত একটার সময় এলার্ম দিয়ে শুয়ো। নম্বর তিন—যদি কুকুর থাকে তাহলে তাকে বেঁধে রেখো, আর নিজের হাতে খেতে দিও। কিছুতেই বাইরে ছেড়ে দিও না তাকে। কেবল শুতে যাবার আগে খুলে দিও। মনে থাকবে তো?"

"থাকবে—"

একটু পরেই একটা স্টেশনে এসে ট্রেন থামল।

"এই স্টেশনে নামব আমি। আচ্ছা চলি।"

মাস খানেক পরে। তখনও গ্রীষ্মের ছ‌ুটি শেষ হয়নি। রাত্রে শ‌ুয়ে ঘ‌ুম‌ুচ্ছি। হঠাৎ ঘ‌ুম ভেঙে গেল। দেখি আমার ম‌ুখে টর্চের আলো পড়েছে। তড়াক ক'রে উঠে বসে বেড স‌ুইচটা টিপল‌ুম। দেখি সেই লোকটা। ফিসফিস ক'রে বললে, "আরে, এ তোমার বাড়ি না কি! তাতো জানত‌ুম না। আর ত‌ুমিতো আমার একটি কথাও শোননি দেখছি। মিছিমিছি সিঁধ কেটে হয়রান হলাম। চেঁচামেচি কোরো না। চলল‌ুম—"

নিমেষে অন্তর্ধান করল। হতভম্ব হ'য়ে বসে রইলাম আমি। তারপর উঠে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কেটেছে আমারই ঘরের দেওয়ালে। বাবা মা উপরে ঘ‌ুম‌ুচ্ছিলেন, তাঁদের আর জাগালাম না। কারণ দেখলাম ঘরের একটি জিনিসও চুরি যায়নি।

দিন সাতেক পরে একটি লোক এসে একখানি চিঠি দিয়ে চলে গেল। চিঠির মধ্যে দেখি দ‌ুটো দশ টাকার নোট রয়েছে। আর ছোট্ট একটা চিঠি—"দেওয়ালের ফ‌ুটোটা সারিয়ে নিও। অন্য জায়গায় বেশ কিছ‌ু হাতিয়েছি। ইতি—স্বর‌ূপ।"

মাস খানেক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। ট্রেনেই। তখন তার হাতে হাতকড়ি, সঙ্গে কনেস্টবল। আমাকে দেখে ম‌ুচকি হাসল।

"টাকা পেয়েছিলে?"

"একজন স্বর‌ূপ কুড়ি টাকা পাঠিয়েছিল।"

"আমার নামই স্বর‌ূপ।"

বিবস্ত্রা বাণী

"এই রোকো—"

ট্যাক্সি-ওলা থেমে গেল, নেমে গেল শ্যামল ভদ্র। ফুটপাথের ধারে ডাস্টবিনের কাছে যে ভিখারিনীটা পিছ‌ু-ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে গিয়ে একট‌ু ঝ‌ুঁকে ম‌ুখটা দেখল তার। তারপর আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে নয়।

ভিখারিনী নাকিস‌ুরে বলল, "একটা পয়সা দাও না বাব‌ু। দ‌ু'দিন খাইনি।"

শ্যামল ট্যাক্সিতে ফিরে এসে টাকার থলিতে হাত ঢুকিয়ে দ‌ুটো টাকা বার ক'রে দিয়ে এল তাকে। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল মেয়েটা। সত্যিই অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। দ‌ু'টাকা ভিক্ষে এর আগে সে কখনও পায়নি।

"সিধা চল—"

এগিয়ে চলল ট্যাক্সি।

"এ-ও সে নয়—আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বললে শ্যামল।

এই নিয়ে সবস‌ুদ্ধ কুড়িটি ভিখারিনী দেখা হ'ল।

আমি বললাম, "তাকে আর পাবি না।"

"পেতেই হবে, সমস্ত কোলকাতা শহর আমি তোলপাড় ক'রে ফেলব।" উদ্‌ভ্রান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। পাগলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ভেবে আমি চুপ ক'রে রইলাম। শিল্পীরা পাগলই। তার ওপর মদ খেয়েছে।

"এই রোকো—"

আবার গাড়ি দাঁড়াল। আবার নেমে গেল শ্যামল। একটা গলির মোড়ে দু'-তিনটে ভিখারিনী জটলা করছিল। দু'টো বুড়ী, আর একটা কমবয়সী, সেটার কোলে আবার শিশু একটা। শ্যামল প্রত্যেকটির মুখ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল, আবার মাথা নেড়ে ফিরে এল গাড়ির ভিতর। তারপর এক মুঠো টাকা দিয়ে এল ওদের! থলিতে কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছে কে জানে!

"সিধা চল—"

সকাল থেকেই এইভাবে চলছে। হু হু ক'রে মিটার উঠছে, শ্যামলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন সে তো রাজা। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা বিক্রি ক'রে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে সে। কালই পেয়েছে।

সকাল থেকেই এই কাণ্ড।

এর পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে একটু। বছর দুই আগেকার ঘটনা। হঠাৎ কার কাছে যেন খবর পেলাম শ্যামল কলকাতায় এসেছে। সে কলকাতার বাইরে থাকে। ছবি আঁকাই তার নেশা এবং পেশা। নেশাটা যতটা জমেছিল পেশাটা ততটা জমেনি। শিল্পী শ্যামল ভদ্রের নাম তখন খুব বেশি লোকে জানত না। কিন্তু আমি বরাবরই তার গুণগ্রাহী ছিলাম। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম বাইরের ঘরটার চারিদিকে নিজের আঁকা ছবি টাঙিয়ে বসে আছে। আর মদ খাচ্ছে।

"কি রে এসেছিস, খবর দিসনি?"

"কাল তোর বাড়ি যাব। পিসিমা কেমন আছেন?"

"ভালই আছেন।"

"তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসব কাল।"

"খুব খুশি হবেন পিসিমা। কিন্তু ভুলে যেও না যেন।"

"না, ভুলব না।"

"আমি কাল দু'-চারজনকে নিমন্ত্রণও করি তা হ'লে।"

"ওসব ঝামেলা আবার করছ কেন?"

"ঝামেলা কিছুই নয়। অনেকে তোর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। ওই কথা রইল তা হ'লে—"

"বেশ।"

চ'লে এলাম।

তার পরদিন আশা করেছিলাম সে আটটা-ন'টা নাগাদ এসে পড়বে। কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত যখন এল না, তখন চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম একটু। ট্যাক্সি নিয়ে নিজেই গেলাম আবার তার বাড়িতে। গিয়ে দেখি তন্ময় হ'য়ে ছবি আঁকছে একটা।

আমাকে দেখেই হেসে বলল, "চল যাচ্ছি এবার। দেরি হয়ে গেছে, না?"

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। একটা চটি পায়ে দিয়ে বললে—"চল—"

"স্নান করেছিস?"

"কাল করব।"

কিছুদূর এসেছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, "ওহো, বড় ভুল হয়ে গেল তো।"

"কি?"

"হুইস্কির বোতলটা আনলাম না। হাতে এখন পয়সার বড় টানাটানি, তা না হ'লে রাস্তা থেকেই কিনে নিতাম এক বোতল। চল, নিয়ে আসি, ওটা পিসিমাকে লুকিয়ে দু'-এক ঢোঁক খেতে হবে। ও জিনিস পেটে না পড়লে কিছুই জমবে না।"

ঘোরাতে হ'ল ট্যাক্সি। একটু পরে মদের বোতল নিয়ে ফিরছি, এমন সময় আবার শ্যামল ব'লে উঠল—"এই রোকো—"

ট্যাক্সি থামল।

"আবার কি—"

"দাঁড়া ওইটেকে একটু দেখে আসি।"

টপ্ ক'রে নেমে গেল ট্যাক্সি থেকে। একটু দূরে ফুটপাথের ধারে একটা ডাস্টবিন ছিল, তার ভিতর থেকে এক ছিন্নবসনা প্রায়-উলঙ্গিনী ভিখারিনী কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল। শ্যামল গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘুরে ঘুরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে লাগল তাকে। অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম আমি, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বোধহয় এসে গেছেন এতক্ষণ। আমিও নেমে গেলাম।

"কি দেখছিস অত ক'রে?"

"ছবি।"

ভিখারিনী মেয়েটা একটু সলজ্জভাবে চাইছিল শ্যামলের দিকে। তার স্বভাবতই মনে হচ্ছিল তার প্রায়-উলঙ্গিনী চেহারাই বোধহয় আকৃষ্ট করেছে শ্যামলকে। ছেঁড়া আঁচলটা গায়ে টেনে দিয়ে করুণকণ্ঠে সে বললে—"একটা কাপড় দাও না আমাকে রাজাবাবু। পরবার কাপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে। অনেককে চেয়েছি, কেউ দেয় না।"

শ্যামল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে তাকে দিয়ে দিলে, তারপর গম্ভীরভাবে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

বললাম, "এই বলছিলি হাতে পয়সা নেই, আর ওই ভিখিরী মেয়েটাকে দশ টাকা দিয়ে দিলি?"

"ও আমাকে কত দিয়েছে জানিস? অন্তত হাজার টাকা—"

বস্তুত, তার পাঁচগুণ দিয়েছে সে। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। একটি প্রায়-উলঙ্গিনী মেয়ে ঝুঁকে একটা ডাস্টবিন ঘাঁটছে—এই হ'ল ছবির বিষয়। সেই মেয়েটার ছবি। অপূর্ব হয়েছে ছবিখানা। কাল রাত্রে ছবির পুরো দামটা পাওয়া মাত্রই কিন্তু ক্ষেপে গেছে শ্যামল।

আজ সকালে এসে আমাকে বলছে, "চল, সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজে বার করি। এ টাকার অর্ধেক তাকে আমি দিয়ে দেব—"

আমি অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাগলকে নিরস্ত করা শক্ত।

সকাল থেকে ঘুরছি।

"আচ্ছা, ছবিখানার নাম 'বিবস্ত্রা বাণী' দিলি কেন"—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

"চমৎকার সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম একটা। শ্লোকটা মনে নেই, কিন্তু ভাবটা মনে আছে। এক রাজার সভায় বহু গুণী-মানী লোক সমবেত হয়েছিলেন একবার। কেউ রাজার স্তুতিগান করছিলেন, কেউ-বা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কেউ নিবেদন করছিলেন নিজের দুঃখ, কেউ কবিত শোনাচ্ছিলেন। রাজা মন দিয়ে শুনছিলেন সকলের কথা এবং পুরস্কৃত করছিলেন সকলকে। সভা শেষ হ'য়ে গেলে রাজা লক্ষ্য করলেন, সভার শেষ প্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে যে ব্রাহ্মণটি বসেছিলেন তিনি কিছু না ব'লেই উঠে যাচ্ছেন। রাজা তাঁকে ডাকলেন। বললেন, 'আপনি কেন এসেছিলেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজ-দর্শন ক'রে পুণ্যসঞ্চয় করতে।' রাজা প্রশ্ন করলেন, 'সবাই এত কবিতা, বক্তৃতা শোনাল, আপনি তো কিছুই বললেন না, আপনার কি বলবার কিছুই নেই?' ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে উত্তর দিলেন—'মহারাজ, দারিদ্র্যের অনলে আমার অন্তরবাসিনী বাণীর বসন দগ্ধ হ'য়ে গেছে। তিনি বিবস্ত্রা, তাই রাজসভায় তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি।' রাজা তার দারিদ্র্য মোচন করেছিলেন—"

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামল বলল, "সেদিন ফুটপাথে ডাস্টবিনের ধারে এই বিবস্ত্রা বাণীকেই মূর্তিমতী দেখেছিলাম আমি। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে—"

সমস্ত দিন ঘুরেও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। শ্যামলের ট্যাক্সিভাড়া লেগেছিল প্রায় দু'শো টাকা। আর ভিখারীদের বিলিয়েছিল সে পাঁচশো টাকা।

যে ধনীর সন্তানটি ছবিখানি কিনেছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম একদিন, ছবিখানি আর-একবার ভাল ক'রে দেখব ব'লে। শ্যামলের বন্ধু শুনে তিনি নিজেই বেরিয়ে এলেন এবং খুব খাতির ক'রে বসালেন আমাকে। দেখলাম ঘাড়ের চুল ক্ষুর দিয়ে চাঁচা, বাটারফ্লাই গোঁফ, চোখের কোলে কালি। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নিচেই মনে হ'ল। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর ড্রয়িংরুমে। সেইখানে ছবিখানাও টাঙানো ছিল।

আমাকে বললেন, "সার্থক তুলি ধরেছেন আপনার বন্ধু। মেয়েটার যৌবন কি দারুণভাবে ফুটিয়েছেন দেখুন দিকি—"

লোলুপভাবে চেয়ে রইলেন তিনি ভিখারিনীটির অনাবৃত দেহ-মহিমার দিকে।

আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

বুড়ীটা

"একঠো পয়সা দে নি বাবু—"

এই তাহার ভিক্ষা চাহিবার ভাষা। আমার কাছে রোজ আসে। হাতে একটা শুকনো ডাল, তাহার সাহায্যেই পথ হাঁটে। ভিখারিনী বুড়ীকে কে আর লাঠি কিনিয়া

দিবে? শুকনো গাছের ডালটা কোথাও বোধহয় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরনের কাপড়খানি শতচ্ছিন্ন, বহুবার সেলাই-করা আর খুব পাতলা। একটু গোলাপী-রঙের আভা আছে। এককালে বোধহয় কোনও বিলাসিনীর দেহ-শোভা বর্ধন করিয়াছিল। বুড়ীর গায়ে কিন্তু অত্যন্ত বেমানান। বেচারার শীত পর্যন্ত নিবারিত হয় না।

আমার কাছে প্রায় রোজই আসে বুড়ী। আর আসিয়া একটি ওই প্রার্থনাই জানায়—"এক্‌ঠো পয়সা দে নি বাবু—"। তাহাকে রোজ একটি করিয়া পয়সা দিই। মনে মনে তাহার একটা নামও রাখিয়াছি—পি. পি.—পার্মানেন্ট পাওনাদার।

যখন আমার ক্লিনিকে লোকের ভিড় থাকে, তখন তাহাকে আসিবামাত্র একটা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিই। যখন কেহ থাকে না তখন মাঝে মাঝে তাহার সহিত আলাপ করি। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে ভিক্ষাবৃত্তি কেন অবলম্বন করিয়াছে। বলিল, "ছেলে বউ আর খাইতে দেয় না, আশ্রয় দেয় না, তাড়াইয়া দিয়াছে। যতদিন গতর খাটাইয়া রোজগার করিয়াছিলাম, খাইতে থাকিতে দিত। এখন আর দেয় না। তাহার কম্পিত বাম হাতটি কপালে ঠেকাইয়া বলিয়াছিল—"সভই কপার ছে বাবু—।"

আর একদিন পয়সাটি দিবার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আর কি চাস বুড়ী—"

উত্তর দিয়াছিল, "মরণ!"

এ রকম দার্শনিক উত্তর আশা করি নাই। তাহার জরা-বিধ্বস্ত মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সত্যই একটা আর্ত আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার একদিন একা বসিয়া আছি। বুড়ী আসিয়া তাহার প্রাত্যহিক নিবেদনটি জানাইল। দেখিলাম, চোখ উঠিয়াছে। ভালো করিয়া চাহিতে পারিতেছে না। চোখের দুই কোণে পিঁচুটি। একটু ঔষধ দিয়া দিলাম।

"আঁখো মে কি ভেলে বুঢ়িয়া?"

"ঠান্‌ঢা লাগি গেল্‌ছে বাবু। একঠো কাপড়া দে নি। বড়্‌ডি জাড়।"

"য়ঁহা কাপড়া কাঁহা ছে, ঘরো পর যা, মিলতৈ।"

বুড়ী বলিল, সে আমার ঘর চেনে না, আমি যেন দয়া করিয়া একখানা কাপড় তাহার জন্য লইয়া আসি। প্রতিশ্রুতি দিলাম—আসিব। ভাবিলাম, ভালই হইবে, আমি মোটা খদ্দর পরি, শীতে বুড়ী একটু আরাম পাইবে। পরদিন বুড়ী যথারীতি আসিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম। খদ্দর আনিতে মনে ছিল না। পরদিনও ভুলিলাম, তাহার পরদিনও। নিজের বিস্মৃতির জন্য তৃতীয় দিন সত্যই অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তখন আমার মোটর ড্রাইভারকে বলিলাম সে যেন আমাকে মনে করাইয়া দেয়। সেও উপর্যুপরি ভুলিতে লাগিল। তৃতীয় দিনের পর বুড়ীটা আর কিন্তু কাপড়ের কথা বলে নাই। কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইলেই কাপড়ের কথাটা মনে পড়িত। অবশেষে ড্রাইভারের একদিন বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। গৃহিণীও বেশ মোটা একটি খদ্দরের কাপড় তাহার জন্য বাহির করিয়া দিলেন। ড্রাইভার সেটি আমার ক্লিনিকের একটা তাকে পাট করিয়া রাখিয়া দিল, বুড়ী আসিলেই তাহাকে দিবে।

বুড়ী কিন্তু আর আসিল না। সে যে আর আসিতেছে না ইহাও প্রথম দুই তিন দিন লক্ষ্য করি নাই, কয়দিন রোগীর বেশ ভিড় ছিল। তাকের কোণে কাপড়টা দেখিয়া হঠাৎ একদিন মনে হইল, তাই তো, বুড়ীটা তো আর আসিতেছে না।

আরও দিন দশেক কাটিল, ব‍ুড়ী আসিল না। শেষে ব‍ুড়ীর কথা আর মনেও পড়িত না। ভিড়ের সময়ে মনে পড়িত না বটে, কিন্তু একা থাকিলে মাঝে মাঝে মনে হইত ব‍ুড়ীর কি হইল। কিন্তু উপয‍ুর্পরি কয়েকদিন একা থাকিবার স‍ুযোগ পাইলাম না। নিজের কাজকর্ম তো ছিলই, তাহার উপর শহরে একটা চাঞ্চল্যও জাগিয়াছিল। সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন, মাঠে বক্তৃতা দিবেন। চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল।

যেদিন পণ্ডিত নেহের‍ুর বক্তৃতা দেবার কথা, সেদিন আমাকে একটা দ‍ূরের গ্রামে কলে যাইতে হইয়াছিল। খ‍ুব ভোরে গিয়াছিলাম, যাহাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি শ‍ুনিতে পারি। কিন্তু রোগী দেখিতে এবং তাহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেশ একট‍ু দেরি হইয়া গেল। আশঙ্কা হইতে লাগিল পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি বোধহয় আর শোনা হইল না। রোগীর বাড়ির লোকেরা বলিল, মাঠামাঠি একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে গেলে ঠিক সময়ে নাকি পেঁছিতে পারিব। সে রাস্তাতে মোটরও চলিবে। স‍ুতরাং সেই মাঠামাঠি রাস্তাই ধরিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটা শোনা হইল না। একটা গ্রামের কাছে ড্রাইভার সজোরে ব্রেক্ কষিয়া গাড়িটা থামাইয়া দিল। পথের উপরই একটা মড়া, তাহাকে ঘিরিয়া শকুনি আর কাক। তাহার চোখ-ম‍ুখ ছিঁড়িয়া খাইয়াছে, চেনা যায় না। সম্প‍ূর্ণ উলঙ্গ। গাছের শ‍ুক্‌নো ডালটা পাশে পড়িয়া আছে। তখনই মনে হইল—এ তো সেই ব‍ুড়ীটা! গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার শকুনি তাড়াইতে লাগিল, আমি হাঁটিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। খোঁজ করিতে করিতে অবশেষে আমারই চেনা একজন লোক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ম‍ুখে শ‍ুনিলাম, শীতেই কাল রাত্রে ব‍ুড়ী মারা গিয়াছে। তাহার গায়ে একেবারে কাপড় ছিল না।

"ব‍ুড়ী কি এইখানেই থাকত?"

"না, আগে তো দেখিনি কখনও।"

আর একজন লোক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ব‍ুড়ী দ‍ুই দিন আগে এই গ্রামে আসিয়াছিল। কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল তাহার ছেলে এই গ্রামে আছে। কিন্তু খবরটি ভুল। লাট্ট‍ুলাল বলিয়া কেহ এ গ্রামে নাই।" বলিলাম, "একটা মান‍ুষকে শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তোমরা একটা ব্যবস্থা করতে পার নি?"

লোক দ‍ুইটি অপ্রতিভ হইল।

তাহার পর বলিল, "দাহ করতে অন্তত দশটা টাকা খরচ হবে। কে দেবে ডাক্তারবাব‍ু টাকা। যা দ‍ুরবস্থা আমাদের আজকাল। অনেকের দ‍ুবেলা অন্নই জোটে না। কার কাছে চাঁদা চাইব বল‍ুন—"

"বেশ, তোমরা ব্যবস্থা কর, আমিই টাকা দেব।"

কুড়িটা টাকা দিলাম। লোকটা বলিল, "এতে তো একদল কীর্তনীয়াও হয়ে যাবে। শাল‍ুও হবে।" তাহাই হইল। কীর্তন করিতে করিতে গ্রামের লোকেরা ব‍ুড়ীকে শাল‍ু ঢাকা দিয়া মহাসমারোহে গঙ্গার ধারে লইয়া গেল।

ফিরিয়া শ‍ুনিলাম বক্তৃতায় নেহের‍ুজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জন-সাধারণের উন্নতির জন্য তাঁহার গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ করিতেছেন। বক্তৃতা দিয়া বিমানযোগে পাটনা চলিয়া

গিয়াছেন, সেখানে আর একটি বক্তৃতা দিবেন। তাহার পরদিন কাগজে তাঁহার বক্তৃতাটাই পড়িতেছিলাম।

"একঠো পয়সা দে নি বাবু—" চমকাইয়া দেখিলাম দ্বারপ্রান্তে সেই বুড়ীটা দাঁড়াইয়া আছে। হাতে সেই শুকনো ডালটা।

"কি বুঢ়িয়া আভিতক্ জিন্দী হ্যায় ?"

"মরণ কাঁহা আবৈছে বাবু।"

"তোরা কাপড়া রাখ্লো ছে। লে যা। কাঁহা ছেলে এত্না দিন—"

"পয়ের মে কাঁটি গড়ি গেল্ছেলো। থোড়া দাবাই দে নি—"

পায়ে পেরেক ফুটিয়াছিল তাই আসিতে পারে নাই। একটু টিঞ্চার আয়োডিন্ লাগাইয়া দিলাম। তাহার প্রাত্যহিক পাওনা পয়সাটিও দিলাম। বুড়ী ছেঁড়া খদ্দরটা গায়ে দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। অনুভব করিলাম সেদিন আমার ভুল হইয়াছিল। শুকনো-ডাল হাতে বুড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে।

তিমির-সেতু

গোপাল সেন সেকেলে সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ছিলেন। বলিষ্ঠগঠন, স্বল্পভাষী, দুঃসাহসী ব্যক্তিটিকে অনেকে ভয় করত, অনেকে শ্রদ্ধাও করত। তখন ইংরেজদের আমল, জেলার সিভিল সার্জন প্রায় সাহেবরাই হতেন। গোপাল সেন সাহেব সিভিল সার্জনদের স্নেহভাজন ছিলেন। এর কারণ ভাল খেলোয়াড় এবং ভাল শিকারীও ছিলেন তিনি। ফুটবল হকি দুটোই চমৎকার খেলতেন। আর শিকারে এমন হাত পাকিয়েছিলেন যে, বড় বড় শিকারীরাও খাতির করতেন তাঁকে। বাঘ, ভালুক, হরিণ, হাতী এমন কি বাইসনও মেরেছেন তিনি এবং অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। তাই সাহেবরা তাঁকে খাতির করতেন খুব। আর একটা কারণও ছিল। যে-সব ডিস্পেন্-সারিতে গেলে বেশী পসার হবার সম্ভাবনা, সে-সব ডিস্পেন্সারিতে যাওয়ার জন্য সব ডাক্তারই উৎসুক হতেন, এজন্য পৈরবী করতেও কসুর করতেন না; কিন্তু ডাক্তার গোপাল সেন এর ব্যতিক্রম ছিলেন। উপরওয়ালাদের কখনও খোসামদ করতেন না তিনি, বরং তাঁদের বলতেন যেখানে কেউ যেতে চায় না সেখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। তাই বাজে ডিস্পেন্সারিতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁকে। শিকার করেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজও করতেন। যে-সব জন্তু-জানোয়ার শিকার করতেন তিনি, তা বাঘ হরিণ শেয়াল খরগোশ যা-ই হোক, তাদের চোখের উপর অপারেশন করতেন। তাদের চোখের লেন্স নিখুঁতভাবে বার করবার চেষ্টা করতেন। এই ক'রে ক'রে তাঁর ছানি কাটবার অদ্ভুত দক্ষতা হয়েছিল একটা। যে ডিস্পেন্সারিতেই থাকতেন, সেখানে গরীব লোকদের ছানি কেটে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন। শিকার ক'রে আর ছানি কেটেই বেশিরভাগ সময় কাটত তাঁর। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় মফঃস্বলের এক ডিস্পেন্সারিতে বদলি হয়ে এলেন তিনি। গুণী লোক, দেখতে দেখতে প্র্যাক্টিস জমে উঠল তার। বিশেষ ক'রে ছানি-

কাটায় এবং অন্যান্য সার্জিক্যাল অপারেশনে খুব খ্যাতি হ'ল। দলে দলে রোগী জুটতে লাগল হাসপাতালে। হাসপাতালে ষোলটি বিছানা ছিল, সবগুলিই প্রায় ছানির রোগীতে ভর্তি হ'য়ে গেল। এমন সময় সিভিল সার্জন এলেন হঠাৎ একদিন। সাহেব নন, পাঞ্জাবী। নাম ক্যাপ্টেন সরদার সিং। মিলিটারিতে ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে সিভিল-সার্জন হ'য়ে এসেছেন। সার্জারির 'স' জানেন না, কিন্তু অপারেশন করার সখ খুব। হাসপাতালের বে-ওয়ারিশ গরিব রোগীদের উপর ছুরি চালিয়ে হাত পাকাবার ইচ্ছা। গোপাল সেনের হাসপাতালে এসে ক্যাপ্টেন সিং যুগপৎ বিস্মিত এবং ঈর্ষান্বিত হলেন। করেছে কি লোকটা। সামান্য একজন সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন হ'য়ে এতগুলো ছানি কেটেছে। একটা হার্নিয়া-কেসও রয়েছে দেখলেন।

তিনি উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আপনি খুবই অন্যায় কাজ করছেন ডক্টর সেন। এসব মেজর অপারেশন মফঃস্বল হাসপাতালে করা ঠিক নয়, সবরকম ব্যবস্থা এখানে নেই, কেস্ খারাপ হ'য়ে যেতে পারে—"

"এখনও পর্যন্ত ত হয়নি। আপনি আমার রেকর্ড দেখুন—"

চটে গেলেন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন।

"আই অর্ডার য়ু নট টু ডু ইট। মেজর অপাবেশন করবেন না আর!"

নির্বিকার গোপাল সেন বললেন, "আপনার অর্ডারটা লিখে দিন তাহলে।"

ক্যাপ্টেন সাহেব অর্ডার লিখে দিলেন, তারপর বললেন, "মেজর অপারেশনের কেশ যত আসবে, সদরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

এ কথাটাও লিখে দিলেন তিনি।

গোপাল সেন তখনও বিয়ে করেননি। তিনি নিজের কোয়ার্টারটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত ক'রে ফেললেন। দশটি রোগী রাখবার জায়গা হ'য়ে গেল সেখানে। যারা তাঁর কাছে ছাড়া অন্য জায়গায় অপারেশন করাতে রাজী হ'ল না, তাদের তিনি নিজের কোয়ার্টারে রেখে অপারেশন করতে লাগলেন। আর বাকী রোগীদের তিনি পাঠাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হাসপাতালের সেক্রেটারির ছেলে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তার হাঁটুতে খুব চোট লাগল। হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেল, জোড়ও খুলে গেল হাঁটুর। ডাক্তার সেন বললেন, "আমি ফার্স্ট এড্ দিয়ে দিচ্ছি, ওকে সদরে নিয়ে যান—"

সেক্রেটারি বললেন, "সদরে কেন! আপনিই যা করবার করুন।"

"সিভিল সার্জনের হুকুম অনুসারে আমি করতে পারি না। এই দেখুন তাঁর অর্ডার।"

অর্ডারটা দেখালেন।

তারপর বললেন, "আমার কোয়ার্টারের সব বেড ভর্তি। তাছাড়া, সদরে যাওয়াই ভাল। এখানে ওসব কেসে হাত দেওয়া রিস্কি।"

সদরে গিয়ে মারা গেল ছেলেটি। সেক্রেটারি মর্মান্তিক চটে গেলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের উপর। পয়সা-ওলা লোক ছিলেন তিনি, দিলেন এক মকদ্দমা ঠুকে। গোপাল সেন গুটি কয়েক ছানির রোগীও পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। পাঁচজন অন্ধ হ'য়ে ফিরে এল। ষষ্ঠটি ফিরলই না। মেনিন্জাইটিস হ'য়ে মরে গেল সে। সেক্রেটারি

এদের দিয়েও মকদ্দমা রুজু করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের নামে। তাছাড়া, ওপর-ওলার কাছে বহু লোকের সই-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড দরখাস্তও গেল। তার সংক্ষিপ্ত মর্ম—সিং সবাইকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে, ওকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক। তদন্ত করবার জন্যে আই. জি. এলেন। খাঁটি সাহেব তিনি। প্রথমেই ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে গেলেন। সব শুনলেন, সিভিল সার্জনের অর্ডারটাও দেখলেন। সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন সিংও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। আই. জি. গোপাল সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাহলে ছানি-কাটা ছেড়ে দিয়েছ?"

"না। আমার প্রাইভেট কেসগুলো আমি আমার বাড়িতেই করি। সেখানেই দশটা বেড করেছি আমি।"

"কই, চল ত দেখি।"

আই. জি. গোপাল সেনের কেসগুলো দেখলেন।

তারপর ক্যাপ্টেন সিংয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার যদি কখনও ছানি হয়, আমি কাকে দিয়ে অপারেশন করাব জান? তোমাকে দিয়ে নয়, ডাক্তার সেনকে দিয়ে। কেমন চমৎকার অপারেশন করেছে দেখ দিকি—"

ডাক্তার সেনের মধ্যস্থতায় মকদ্দমাগুলো মিটে গেল।

আই. জি. অর্ডার দিয়ে গেলেন যে ডাক্তার সেন যে-কোন অপারেশন হাসপাতালে করতে পারবেন। ক্যাপ্টেন সরদার সিং বদলি হ'য়ে গেলেন।

বছর পাঁচেক পরে দুটি পুরু-কাচের চশমা-পরা লোক এসে হাজির হ'ল ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে। ছাপরা জেলা থেকে এসেছে, ক্যাপ্টেন সিংয়ের চিঠি নিয়ে।

ক্যাপ্টেন সিং লিখেছেন, "তোমাদের চক্রান্তে আমি বদলি হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু ছানি-কাটা বন্ধ করিনি। অনেক ছানি কেটেছি তারপর, অন্তত হাজারখানেক হবে, তার মধ্যে শতকরা নব্বইজন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। এই দুজনকে পাঠালুম তোমার কাছে, দেখলেই বুঝতে পারবে, কী ধরনের কাজ করছি। আশা করি, ভাল আছ। ইতি—"

গোপাল সেন পরীক্ষা ক'রে দেখলেন দুটি রোগীকে। অপারেশন সত্যিই ভাল করেছে। কিন্তু রোগী দুটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে মনোভাব নিহিত আছে, তা অস্পষ্ট রইল না তাঁর কাছে। মনে মনে তিনি শুধু বললেন, ব্যাটা চাষা!

ক্যাপ্টেন সিং কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁর অপারেশন-করা ছানি-রোগী পাঠিয়ে দিতেন ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে।

গোপাল সেনের মনে হ'ত তাঁকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই লোকটা এভাবে রোগীর পর রোগী পাঠিয়ে যাচ্ছে। কিছু করবার উপায় ছিল না। একটা নীরব ক্রোধ ঘনীভূত হচ্ছিল কেবল তাঁর মনে।

এইভাবে আরও দশ পনর বছর কেটে গেল। ক্যাপ্টেন সিংয়ের রোগী আসাও বন্ধ হ'য়ে গেল ক্রমশ। ডাক্তার সেন চাকরি থেকে অবসর নিলেন। ক্রমে তাঁর চোখেও ছানি পড়তে লাগল। তাঁর বন্ধুরা বললেন, "চলুন আপনাকে কলকাতা নিয়ে যাই।"

ডাক্তার সেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "না, কলকাতা যাব না। সেখানে ভদ্দরলোক নেই। আমার বাল্যবন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম, সে-ও ডাক্তার, চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। টাকার গরমে সেখানে ভদ্রতা-বোধ পর্যন্ত লোপ পায়। যাব না সেখানে।

আর ক'টা দিনই বা বাঁচব, না-ই বা দেখতে পেলাম। আমার ওই মধ্ চাকরটা যদি টিকে থাকে, চোখের দৃষ্টি না থাকলেও চলবে—"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "একটি লোকের নাগাল পেলে তাকে দিয়ে কাটাতাম, কিন্তু সে যে এখন কোথায় আছে তা তো জানি না। বছর দুই আগে রিটায়ার করেছে—"

"কে—"

"ক্যাপ্টেন সিং।"

আরও বছরখানেক কেটেছে।

একদিন সকালে মধু এসে ডাক্তার সেনকে বলল, "একটি রোগী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

"বল, দেখা হবে না।"

"বলেছি, কিন্তু সে ছাড়ছে না। আপনি একবার দেখা করুন।"

মধুর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন গোপাল সেন।

"গুড্ মর্নিং ডক্টর সেন—"

"গুড্ মর্নিং, কে আপনি ?"

"চিনতে পারছেন না ? আমি ক্যাপ্টেন সিং। আমার চোখে ছানি হয়েছে—আমি আপনাকে দিয়ে কাটাতে চাই। প্লীজ ডু ইট।"

"আমার চোখেও যে ছানি—। আমিও আপনাকে দিয়ে কাটাব ভাবছিলাম।"

"ও— !"

ক্যাপ্টেন সিং অন্ধ দৃষ্টি মেলে ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁদের মনে হ'ল এক অদৃশ্য তিমির-সেতু পার হ'য়ে দুজনে দুজনের কাছে এসে পড়লেন যেন।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশে পাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ী পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়ীকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না ? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে !"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।

অসম্ভব। ট্রেন বেশীক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইণ্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন।

"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা ?"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেমে যাব। বেশীক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতা জোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আকারের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালী রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহার সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইঁহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়-মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছুই শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিখিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন ? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিনীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিনী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!"

সিগারেট টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই-টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘঁ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরয়োজাসে—"

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লঙ্কা গোছের এক ছোকরা। সে ভঙ্গীভরে বলিল, "দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!"

"পায় লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।"

"ও দেখি, যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি।"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলীটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি কিরপা করকে থোড়া হাট্কে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ্ গ্যয়ে?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট্ লেগেছে—"

"আপ কাঁহা যাইয়ে গা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চঢ়া দেঙ্গে।"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আর-একজন একখানি ইংরেজী বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা আগেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

"শিভ্যলরি আমাদের দেশেও ছিল। নার্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজী মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি! মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যল্রি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ কথা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যলরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।"

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে ?"

"কোন ভিখিরী-টিকিরী বোধহয়।"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না।"

দেখা গেল, ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, তোমাকেই দিলাম।"

বৃদ্ধা তবু কোন কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালী নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।

"পয়সা উঠা লেও। তুম্‌হী কো দিয়া।"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদেরই মত একজন প্যাসেঞ্জার।"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম।"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।"

পরমুহূর্তেই সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিত হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই ঃ

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন ?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশী দিলুম।"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না।"

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি ত তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

বলো মা তারা

সেকেলে লম্বা থার্ড ক্লাস কামরা, প্রচুর জায়গা। ভিড় একেবারেই নেই। কামরার একধারে বসিয়া আছেন প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী সুলোচনা এবং তাঁহাদের কন্যা উমা। উমার বয়স ষোল কি ছাব্বিশ তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বা চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। গালের হাড় দুটি একটু বেশী উঁচু। তবু মোটের উপর দেখিতে মন্দ নয়। দেখিতে আরও হয়তো ভালো হইত যদি মুখে আর একটু সজীবতার ছাপ থাকিত। মুখের ভাবটি বড় ম্রিয়মাণ। প্রকাশবাবু বেঁটে বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। কালো রং। গোঁফ দাড়ি কামানো। মুখটি চতুষ্কোণ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। মুখভাব উপর্যুপরি সাত-গোল-খাওয়া-ফুটবল-টিমের ক্যাপ্টেনের মতো মরীয়া। সাতটি কন্যার পিতা তিনি। উমা তৃতীয় কন্যা। তাহাকেই দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি-পরা সুলোচনা, মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া সসংকোচে বসিয়া আছেন একধারে। সাতটি কন্যা প্রসব করিয়া চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন যেন। মুখের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের নিচে ফোলাফোলা ভাব এবং কোণে জরার চিহ্ন। মাথার সামনের দিকটা টাক। টাকেরই উপর খানিকটা সিঁদুর থ্যাবড়ানো। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় তিনি স্থবিরা। প্রকাশবাবুর স্ত্রী বলিয়া মনেই হয় না, মনে হয় তাঁহার দিদি বুঝি। তাঁহার মুখের আত্মসমাহিত ভাবটি কিন্তু মুগ্ধ করে। তিনি যেন অদৃষ্টের উপরই হোক বা ভগবানের উপরই হোক সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা হইবে তাহাই মানিয়া লইবেন।

কামরার অপর প্রান্তে কোণের দিক ঘেঁষিয়া আর একটি মেয়ে বসিয়াছিল। ইহারও বয়স কত তাহা বলা শক্ত, তবে বুড়ী নয়। ত্রিশের কাছাকাছিই হইবে। এই মেয়েটিও রোগা, কালো। কিন্তু চোখেমুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও বেশ একটু ছিমছাম ভাব। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্ট-ওয়াচ। অলংকারের বাহুল্য নাই, কানে ফুল, হাতে একগাছা করিয়া চুড়ি। পাশে যে ভ্যানিটি ব্যাগটি রহিয়াছে তাহাও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে।

মেয়েটি নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া বই পড়িতেছে একটি। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে প্রকাশবাবুদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সাধারণ মেয়ে হইলে হয়তো আলাপ করিত। কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করা আধুনিক কায়দা নয়, আর মঞ্জুশ্রী তেমন মিশুক প্রকৃতির মেয়েও নয়। অপরের সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল অবশ্য আছে, কিন্তু অযাচিতভাবে আলাপ করিয়া তাহা সে চরিতার্থ করিতে চায় না। আড়চোখে চাহিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া যতটা জানা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে সে। তাহার উপরই কল্পনার রং চড়ায় একটু-আধটু।

দুই

প্রকাশবাবু সহসা বেঞ্চির উপর চাপ-টালি খাইয়া বসিলেন এবং বাম জানুটি নাচাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন, "যাই বল, লোকটা ছোটলোক। অত ক'রে যেতে লিখলুম, কানই দিলে না সে কথায়।"

সুলোচনা বলিলেন, "ছুটি নেই, কি করবে বল।"

"রোববারেও ছুটি নেই? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

"ছেলের ঠাকুমাও না কি দেখতে চায়। বুড়োমানুষ কি অতদূরে যেতে পারে?"

"বুড়ো মানুষ কেদারবদরি যেতে পারে, আর এই পাঁচ ছ ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারে না? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখে একটু হাসির ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

"গরজ তো তোমাদেরই। তুমি মেয়ের বাপ একথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"তোমার বাবাও মেয়ের বাপ ছিল। কিন্তু তাঁকে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে টেনে আনিনি। তোমার বাপের বাড়ি ধাপধাড়া গোবিন্দপুর খুরশিদ্‌গঞ্জেই গিয়েছিলাম আমরা। জাত হিসাবে সত্যিই অত্যন্ত নেবে গেছি আমরা। হু হু ক'রে নেবে যাচ্ছি, ছি, ছি, ছি, ছি—"

পুনরায় জানু নাচাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ উমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রঙের শাড়ি এনেছিস?"

"মা বললে লাইট্ গোলাপীটা আনতে। সেইটেই এনেছি।"

"তাহলেই হয়েছে! সেদিন যে সবুজ শাড়িটা কেনা হ'ল সেইটে আনলে না কেন—"

"ডীপ ডগমগে রঙের শাড়ি কি তোমার কালো মেয়েকে মানায়? আমার ও শাড়িটা কেনবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সবুজ রং দেখলে তো তোমার আর জ্ঞান থাকে না। বাড়ির দরজা জানলা সব সবুজ রং করিয়েছ, পর্দা বেড্-কভার সব সবুজ, ফুলদানী সবুজ, কুশনের ছিটগুলো সবুজ। হাঁড়িকুঁড়ি তাওয়া খুন্তিগুলো সবুজ রঙের পাওয়া যায় না তাই ওগুলো—"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখভাব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বামীর দোষ-কীর্তনের সুযোগ পাইলে কোন সতী স্ত্রী হর্ষোৎফুল্ল না হন!

প্রকাশবাবু জানলা দিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। পূর্বে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত "উঃ, কি কুক্ষণে যে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম,"—এখন আর হয় না। কোন খঞ্জ যদি আচমকা কোন গর্তে পড়িয়া যায় তখন গর্তটা হইতে কোনরকমে উঠিবার জন্য যেমন তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, প্রকাশচন্দ্রেরও তাহাই করিতেছিল। গর্তে কেন পড়িলাম, পড়া উচিত ছিল কি না, এসব প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখন অবান্তর।

একটু পরে তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কে জানে ওয়েটিং রুমটা খালি পাওয়া যাবে কি না। ভিড় হলেই তো মুশকিল।

অবশ্য বারোটার পর ওখানে আর গাড়ি নেই পাঁচটার আগে। ওদের সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলেছি। আচ্ছা, ওরা এলে ওদের সম্বর্ধনা করা যাবে কি ক'রে ? বাজার থেকে কিছ‌ু খাবার নেওয়া যাবে, কি বল ?"

স‌ুলোচনা বলিলেন, "আমি ঘর থেকে কিছ‌ু সন্দেশ আর নিমকি ক'রে এনেছি। ওসব যেন কিনো না, ভাল রসগোল্লা পাও তো তাই কিনো—"

"খাবে কিসে—"

"আমি প্লেট গ্লাস সব এনেছি—"

স‌ুলোচনা স‌ুগৃহিণী এবং এক একটু চাপা স্বভাবের। এসব যে করিয়াছেন তাহা স্বামীকে জানিতে দেন নাই।

প্রকাশবাব‌ু প‌ুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

"উঃ মেয়ে ঘাড়ে ক'রে দেখাতে আসা, তা-ও আবার ওয়েটিং র‌ুমে। প‌ূর্বজন্মে কত পাপই যে করেছিলাম।"

প‌ুনরায় জান‌ু আন্দোলিত হইতে লাগিল।

উমা আর সহ্য করিতে পারিল না।

"আমি তো তোমাকে বলেছিলাম বাবা, আমাকে পড়াও, কিন্তু তুমি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে। আমাদের সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই কলেজে পড়ে এখন। চাকরি ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবে!"

"হ‌ুঃ, পড়াও বললেই কি পড়ানো যায়। খরচ কত। আর পড়ালেই কি নিস্তার আছে? ওই যে আমাদের হালদার, মেয়েকে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছিল, একটি কাঁড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে হ'ল শেষপর্যন্ত।"

তিন

ট্রেন যথাসময়ে স্টেশনে আসিয়া পেঁ‌ৗছিল। প্রকাশবাব‌ু সপরিবারে গিয়া ওয়েটিং র‌ুমটি দখল করিয়া বসিলেন। ওয়েটিং র‌ুমে ভাগ্যক্রমে আর কোন যাত্রী ছিল না। বেশ প্রকাণ্ড ঘর। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি আয়না বাথর‌ুম সব আছে। প্রায় সব ঘরটাই দখল করিয়া বসিলেন তাঁহারা।

একটু পরে সেই মেয়েটি আসিলেন, ইঁহাদের সহযাত্রিণী, যিনি কামরায় অপর প্রান্তে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। প্রকাশবাব‌ু বিরক্তম‌ুখে ভ্র‌ূ-কুঞ্চিত করিয়া ইহাদের দিকে চাহিলেন, ভাবটা, এ আবার কি আপদ জ‌ুটল। আপদ কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি এইবার ঠিকঠাক হয়ে নাও। আমি রিক‌্শ ডাকি। মাইল দেড়েক যেতে হবে। সাড়ে তিনটের সময় টাইম দিয়েছে—"

তিনি রিক‌্শ ডাকিতে গেলেন, মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঠিকঠাক্ হইতে লাগিল। অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া ম‌ুখে ঘাড়ে গলায় মাখিল, ক্রীমও লাগাইল একটু, ঠোঁটে একটু লিপষ্টিকও ঘষিয়া লইল। তাহার পর

সাধারণ ব্রোচটি খুলিয়া শৌখিন গোছের একটি ব্রোচ কাঁধের পাশটিতে লাগাইয়া লইল। ঘাড় ফিরাইয়া নিজের মুখখানিই নানাভাবে দেখিল। তাহার পর ছোট একটি আতরের শিশি বাহির করিয়া কাপড়ে জামার শিশির ছিপিটা ঘষিল। চিরুনি বাহির করিয়া মাথার চুলটাও ঠিক করিয়া লইল একটু।

দ্বারপ্রান্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার। "কই হ'ল, চল এবার—"

"চলুন।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে সুলোচনা বলিলেন, "এই মেয়েটাই আমাদের গাড়িতে ছিল না?"

প্রকাশ বলিলেন, "হ্যাঁ—"

"তখন তো এ বুড়োটাকে দেখিনি।"

"না। অন্য গাড়িতে ছিল বোধহয়।"

"কোথা গেল ওরা?"

"কে জানে। তোমার মেয়েকেও সাজাও এবার। ওদের আসবার সময় হ'ল। গা টা যা ধোবার এই সময় ধুয়ে নে, কোন লোক এসে গেলে মুশকিল হবে—"

উমা সাবান তোয়ালে লইয়া বাথরুমে ঢুকিল।

চার

ঘণ্টা তিনেক পরে।

পাত্র-পক্ষ হইতে আসিয়াছিলেন পাত্রের ঠাকুমা, বৌদিদি, বড় বোন এবং ছোট ভাই। হাতের লেখা কেমন, গান গাহিতে জানে কিনা, সেতার এস্রাজ শিখিয়াছে কিনা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া, একটি সিনেমার গান শুনিয়া, প্রায় টাকা পাঁচেকের মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করিয়া যখন তাঁহারা উঠিলেন, তখন প্রকাশবাবুও ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদের পিছু-পিছু গেলেন কিছুদূর। আসল কথাটি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন না, তখন প্রকাশবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

"কেমন লাগল আপনাদের? মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?"

"পরে জানাব আপনাকে।"

প্রকাশবাবু বুঝিলেন পছন্দ হয় নাই।

যাইতে যাইতে বৌদিদি বলিলেন, "এর আগে যে মেয়েটি দেখেছি সে এর চেয়ে ঢের ফরসা, নাক চোখ মুখও ভালো—"

ছোট ভাই মন্তব্য করিলেন, "ফিগারও বেশ টল—"

প্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়া উমাকে বলিতেছিলেন, "চল এবার তোকে স্কুলেই ভর্তি ক'রে দি—"

পাঁচ

একটু পরে তাঁহাদের সহযাত্রিণী মঞ্জুশ্রীও ফিরিলেন। সঙ্গে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মেয়েটির মুখ শুষ্ক।

"আপনি কি ক'রে বুঝলেন যে, আমার হয়নি—"

"কন্‌ফিডেনশাল ক্লার্ক হরিবাবু চুপি চুপি বললেন আমাকে। জ্যোৎস্না রায় মেয়েটিকে নিয়েছেন ডি. এম.।"

"জ্যোৎস্না রায় তো বি-এ পাশ নয় শুনলাম।"

"না। আই-এ পাশ।"

"ওর স্পীড্ কি আমার চেয়ে বেশী?"

"না। কিছু কম। কিন্তু মেয়েটি বেশ স্মার্ট যে। দেখতেও ভালো। ফরসা রং, টল ফিগার—"

মঞ্জুশ্রী শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রৌঢ় আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি, কোথাও না কোথাও লেগে যাবেই। ক্রমাগত দরখাস্ত ক'রে যাও। আচ্ছা চললুম।"

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। মঞ্জুশ্রীর দুই চোখ সহসা জলে ভরিয়া গেল। এই চেহারার জন্য তাহার আর এক জায়গাতেও হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আপিসে একজন লেডি স্টেনোর প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মঞ্জুশ্রী বোস দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আজ ইন্টারভিউ ছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহার পিতৃবন্ধু। ওই আপিসেই কাজ করেন।

ছয়

প্ল্যাটফর্মের একধারে বসিয়া একটি অন্ধ ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল—

—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা—"

অদ্ভুত গল্প

জীবন-পথে যুক্তি-চালিত হ'য়ে চলাটাই আমরা গৌরবের মনে করি। কিন্তু এই চালক যুক্তির চেহারাটা সব মানুষের একরকম নয়। অনেক সময় তা এত বিভিন্ন যে, ঠিক করা কঠিন হয় কোন্‌টা যুক্তি আর কোন্‌টা অযুক্তি। খদ্দরপরা অনেকে যুক্তিযুক্ত

মনে করেন, আবার আর একদল লোক আছেন যাঁরা খদ্দর না-পরাটাই জীবনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ লোকেরই এই ধরনের যুক্তিযুক্ত জীবন-নীতি আছে। কেউ জুতো পরেন, কেউ বা পরেন না, কারো মতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হওয়াই গৌরবজনক, কারো মত আবার ঠিক উলটো। তাঁরা বলেন, পয়সা না থাকলে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে, কিন্তু যদি যথেষ্ট পয়সা হাতে থাকে তাহলে তৃতীয় শ্রেণীতে কষ্ট ক'রে যাবার দরকার কি।

আমি যে নগেন চৌধুরীর গল্পটা আজ আপনাদের বলছি তাঁরও এই ধরনের একটা জীবন-নীতি ছিল। তিনি ছিলেন ঘোর মাংসাশী এবং উঁচুদরের শিকারী। আর দুটো ব্যাপারকেই তিনি জীবনের নীতি (ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রিন্সিপ্ল্') হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাংস, বিশেষ ক'রে পাখীর মাংস, যে খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ খাদ্য এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে অপরকে বোঝাতেও চেষ্টা করতেন। বিদ্বান লোক ছিলেন। ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, খাদ্য-তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব প্রভৃতি নানারকম তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন তিনি তাঁর এই নীতির সমর্থন-কল্পে। আর বিজ্ঞান জিনিসটা এমনই অদ্ভুত জিনিস যে, খুঁজলে যে-কোনও মতের স্বপক্ষে কিছু-না-কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। আফিং খাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি আছে, মদ খাওয়ার স্বপক্ষেও আছে। ব্রহ্মচর্যের স্বপক্ষে যেমন জোরালো যুক্তি আছে, বহুবিবাহের স্বপক্ষেও তেমনি আছে। পাখীর মাংস খাওয়ার সমর্থনেও অনেক যুক্তি দেখাতেন নগেনবাবু। শিকার করাটাও যে অবসর বিনোদনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় এ বিষয়ে নিজে তো তিনি নিঃসংশয় ছিলেনই অপরকেও নিঃসংশয় করবার চেষ্টা করতেন। বলতেন—"একঘেয়ে জীবনের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শে এলে যে মনের চেহারা বদলে যায় এ কথা তো সবাই জানেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, বন্দুক ঘাড়ে ক'রে বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শ লাভ করবার বিশেষ শিক্ষা যদি কেউ পান তা হ'লে তিনি যে বিশেষ রকম একটা আনন্দ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে ব্যাধ-জীবন আমরা যাপন করেছি সেই জীবনের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সাহস-ধৈর্য একাগ্রতা-সাবধানতার স্বাদ যদি পেতে চান, বন্দুক ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে পড়ুন। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপনিষদ পড়ে যে সুখ পান সেই সুখ পাবেন।"

নগেন চৌধুরীর এ ধরনের বক্তৃতা অনেক শুনেছি। তাঁর এ বিশেষ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিনি কখনও। কারণ তিনি এই নীতি মানতেন বলে আমাদের মতো কুঁড়ে বৈঠকখানা-বিহারীরা নি-খরচায় বুনো-হাঁস প্রভৃতির রসাস্বাদন ক'রে ধন্য হতাম মাঝে মাঝে। ওসব হাঁস শিকার ক'রে আনবার সামর্থ্য তো আমাদের ছিলই না, কিনে খাবারও উপায় ছিল না, কারণ বাজারে কুম্-ডাক, মিউস, পিন্-টেল প্রভৃতি সুলভ নয়। আর নগেন চৌধুরী যখন শিকারে বেরুতেন তখন গাড়ি গাড়ি হাঁস মেরে আনতেন। বিতরণও করতেন অকৃপণভাবে।

এইভাবে বেশ চলছিল। কিন্তু চিরকাল একভাবে চলে না। সর্বনাশা প্লেগ এসে দেখা দিল শহরে। সাতদিনের মধ্যে নগেন চৌধুরীর স্ত্রী, দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে মারা গেল। নগেন চৌধুরী বাড়ি ছিলেন না, শিকার করবার জন্য তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর বছর খানেক কেটেছে। একদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় বসে খবরের

কাগজের মাধ্যমে পর-চর্চা আর পর-নিন্দা করছি, এমন সময় নগেন চৌধ্বরী প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে একটি চাকরের মাথায় স্বদৃশ্য একটি বাক্স। মনে হ'ল চন্দনকাঠের ওপর হাতীর দাঁতের কাজ-করা।

"আসবন। বাক্সে কি আছে—"

"হাঁস।"

"মরা হাঁস ?"

"হ্যাঁ।"

"অমন চমৎকার বাক্সে ক'রে মরা হাঁস এনেছেন !"

"আগে সব শ্বনবন। ওটা ওই কোণে রেখে দে—"

চাকর বাক্স রেখে চলে গেল।

নগেন চৌধ্বরী বললেন, "পরশ্ব রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। একটা অচেনা দেশে যেন একা একা ঘ্বরে বেড়াচ্ছি পায়ে হে'টে। হাঁটতে হাঁটতে এক মাঠের ধারে এসে পড়লাম। দেখলাম মাঠের মাঝখানে একটা বাড়ি রয়েছে, মানে বাড়ির দেয়ালগ্বলো রয়েছে, চাল বা ছাদ নেই। কাছে গিয়ে দেখি আমার বাল্যবন্ধ্ব হরিচরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি হে হরিচরণ এখানে কেন—'

'এখানেই তো আমার বাড়ি। হঠাৎ আগ্বন লেগে বাড়িটা প্বড়ে গেছে ভাই। এবার ভাবছি পাকা করিয়ে নেব—'

'তোমার পরিবার ছেলে-মেয়েরা কোথায়—'

'ওই যে। সব হাঁস ক'রে রেখে দিয়েছি। ওই গাছটায় থাকে। বাড়ি তৈরী হ'লে আবার মানবষ ক'রে নেব—। এ বিদ্যেটা শিখেছি।'

পাশেই যে আমগাছটা ছিল তার ডালে দেখি, পাঁচটি হাঁস বসে আছে। দ্ব'টি সাদা, দ্ব'টি কালো, আর একটি বড় রাজহাঁস,—ঘ্বমটা ভেঙে গেল। হরিচরণ বহ্বদিন প্বর্বে মারা গেছে। তার কথা ভাবিও নি, হঠাৎ এ স্বপ্ন দেখবার মানে কি ব্বঝতে পারলাম না।

আজ সকালে শিকারে বেরিয়েছিলাম। একটা গাছে হরিয়াল বসে ছিল একঝাঁক। ফায়ার করলাম, হরিয়ালগ্বলো উড়ে গেল। এগিয়ে দেখি গাছতলায় পাঁচটি মরা হাঁস পড়ে আছে। দ্বটি সাদা, দ্বটি কালো আর একটি বড় রাজহাঁস। ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। আমারও তো ঘরে আগ্বন লেগেছিল, দ্বই ছেলে, দ্বই মেয়ে আর স্ত্রী মরে গেছে—তারাই কি—? আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্ব'জন ফরসা আর দ্বজন কালো ছিল। আর আশ্চর্য বড় রাজহাঁসটার মবখের ভাবটা যেন আমার স্ত্রীর মবখের মতো। আপনি তো দেখেছেন ওদের, হাঁসগ্বলো দেখবন তো। ওগ্বলোকে স্টাফ্ করিয়ে ঘরে রেখে দেব। নিজেই ওগ্বলো নিয়ে কানপ্বর যাব ভাবছি। আপনার তো একটা ভালো ফার্মের ঠিকানা জানা ছিল।"

"হ্যাঁ, লেখা আছে ঠিকানাটা—"

"দিন তো। আমি নিজেই যাব। হাঁসগ্বলো দেখবন আগে—"

সসম্ভ্রমে বাক্সটা খ্বলে হাঁসগ্বলো আমার বড় টেবিলটার উপর সারি সারি রাখলেন।

আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম।

নগেন চৌধুরীর জীবন-নীতি বদলে গেছে। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়েছেন, শিকারও করতে যান না।

ছবি

প্রকাশবাবুর জীবনের বর্তমান ধারা অনেকটা এই রকম। সকালে সাতটার সময় ওঠেন, উঠিয়া মুখ ধুইয়া চা পান করিতে করিতে খবরের কাগজটা পড়েন। খবরের কাগজে সাধারণতঃ দুঃসংবাদ থাকে। প্রতিটি দুঃসংবাদ পড়িয়া তিনি যে-সব মন্তব্য করেন, তাহার একটিও শ্রুতিসুখকর নহে। দেশের নেতা, উপনেতা, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া ধনী-শ্রমিক সকলেই যে চোর, চোর না হইলে যে এদেশে বড়লোক হইবার উপায় নাই, যথেষ্ট টাকা থাকিলে যে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করিয়া ফেলা যায়, বস্তুতঃ টাকাই যে বর্তমান যুগের একমাত্র উপাস্য দেবতা—তাঁহার মন্তব্যগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

অন্তত, তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক পুত্র ছবি তাহাই বোঝে। সে-ও বাবার সহিত এক টেবিলে বসিয়া চা-পান করে। মা-ও যে সব আলোচনা করেন তাহাও উন্নত ধরনের কিছু নহে। প্রথমতঃ তিনি বাজারে কি কি কিনিতে হইবে তাহারই একটা ফর্দ দাখিল করেন। চাল ডাল তরিতরকারি মশলা, যখন যেদিন যেমন প্রয়োজন, তাহারই ফর্দ। প্রকাশবাবু তাহা হইতে কিছু কিছু কমাইবার চেষ্টা করেন, তর্ক হয়, তর্ক শেষটা কলহে পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, মৃন্ময়ী (ছবির মা) যে সব প্রস্তাব স্বামীর নিকট পেশ করেন সেগুলি আরও ব্যয়সাধ্য। অর্থাৎ সিনেমা, শাড়ি বা গহনার ব্যাপার। প্রতিদিনই অবশ্য এসব আলোচনা হয় না ; কিন্তু মাঝে মাঝে হয় এবং যখন হয় তখন যে কাণ্ড হয় তাহা শোভনতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। প্রকাশবাবুর ধারণা ওগুলি অনাবশ্যক ব্যয়, মৃন্ময়ীর মতে একটুও অনাবশ্যক নয়, সংসারে থাকিতে গেলে সিনেমাও দেখিতে হয়, ভালো শাড়িও পরিতে হয়, গহনাও কিনিতে হয়। তাহা না হইলে মান থাকে না। প্রকাশবাবু ইহার প্রত্যুত্তর দেন। মৃন্ময়ীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহা প্রকাশবাবুর আত্মসম্মানকে আঘাত করে। তিনি টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন—"আমি পাব কোথা। চুরি ক'রব, না ডাকাতি ক'রব—!"

ছবি বুঝিতে পারে মূল কারণ অর্থ। বাবার যদি প্রচুর অর্থ থাকিত, তাহা হইলে এসব সমস্যাই থাকিত না! কি মজা হইত! কিন্তু মজা হইবে না, কারণ বাবা সামান্য কেরানী!

তবু মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাও হয়, শাড়ি গয়নাও কেনা হয়।

ছবি দেখে স্কুলে বড় লোকের ছেলেরা দামী জামা জুতা পরিয়া আসে। কাহারও হাতে রিস্টওয়াচ, কেহ ফাউণ্টেন পেন কিনিয়াছে, কেহ রঙীন চশমা পরিয়া আসিয়াছে।

মাকে আসিয়া বলে—"মা, আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন কিনে দাও না। পেন্সিলে ভালো লেখা যায় না—"

মা বলেন—"আমি কি কিনে দেবার মালিক। বাবাকে বল—"

বাবাকে বলিতে সাহস হয় না। তবু সাহস করিয়া একদিন বলিল। বাবা কিনিয়া দিলেন না, ধমক দিলেন।

একদিন সে শুনিতে পাইল বাবা বলিতেছেন—"উঃ ভাগ্য বটে যতীনবাবুর। লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে—"

মৃন্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই নাকি! কি ক'রে?"

"চুরি! আবার কি ক'রে? চুরি না করলে কি টাকা হয়?"

দিনকতক পরে ছবি সবিস্ময়ে দেখিল, ওই চোর যতীনবাবুকেই বাবা একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সসম্ভ্রমে খাতির করিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার ছেলে সুধীরের সহিত তাহার দিদির বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। সুধীর রূপে বা গুণে এমন কিছু ভালো নয়, কিন্তু ছবির ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সুধীরের বাবা বড় লোক, লাখ লাখ টাকা রোজগার করিতেছেন, তাই তাহাকে জামাই করিবার জন্য বাবার এত আগ্রহ। বিবাহ অবশ্য হইল না, কারণ যতীনবাবুর পুত্র আরও বড় ঘরে বধূ-নির্বাচনের সুযোগ পাইল।

আর একদিন ছবি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া গেল, বাবা মায়ের জন্য একছড়া দামী সোনার হার আনিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এই অসাধ্যসাধন করিলেন তাহা তিনি গোপনও করিলেন না।

বলিলেন, "জগুবাবুকে অনেক টাকার পারমিট পাইয়ে দিয়েছি আপিসে তদ্বির ক'রে। তিনি কিনে দিয়েছেন। আরও দেবেন। আর একটা পারমিট যদি পাইয়ে দিতে পারি, তপুর বিয়ের খরচটা উঠে আসবে—"

বাড়িতে যে-সব আলোচনা হয় তাহা হয় বাবার অফিস লইয়া, কিংবা পাড়া-পড়শীদের নিন্দা। ইহার বাহিরে যে-সব আলোচনা হয় তাহার বিষয় সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী, কিংবা দেশের নেতাগণ। প্রকাশবাবুর মতে দেশের একটি নেতাও সৎ নহেন, সকলেই চোর।

ছবি ক্লাস প্রমোশন পাইল না।

ইহা শুনিয়া বাবা মন্তব্য করিলেন, "অতগুলো পয়সা নষ্ট করলে তো? পরীক্ষায় খারাপ করেছ আগে বললেই পারতে। তোমাদের হেডমাস্টারের ছেলে আমাদের আপিসে আমার আণ্ডারেই কাজ করে। তার উপর একটু চাপ দিলেই তার বাবা বাপ বাপ ক'রে প্রমোশন দিয়ে দিত তোমাকে—"

ছবি চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা সে আড়াল হইতে শুনিতে পাইল—"আরে লেখাপড়া শিখে হবে কি! গণ্ডা গণ্ডা এম-এ, বি-এ ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে-গলিতে—।" —বাবা মাকে বলিতেছেন।

এই ভাবেই চলিতেছে।

দুই

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাজার হইতে ফিরিতেছি রাস্তার মাঝখানে দেখি বিরাট ভিড় জমিয়াছে একটা দোকানের সামনে। ভিড়ের ভিতর একটা ছেলে আর্তনাদ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠে তর্জন গর্জন করিতেছে আর একজন। তর্জন গর্জন শুধু নয়, প্রহারও চলিতেছে বুঝিতে পারিলাম। কৌতূহল হইল, ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম একটি ভোজপুরী দরোয়ান তাহার মহিষ-চর্ম-নির্মিত জুতা দিয়া ছবিকে প্রহার করিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে, একে মারছ কেন—"

বিহারী দোকানদারটি আমার পূর্বপরিচিত।

বলিল, "হুজুর, এ বাঙালী লৌণ্ডা (ছোঁড়া) চোর। আমাদের শো কেস থেকে দেখুন এতগুলো জিনিস চুরি করেছে—"

দেখিলাম, ফাউণ্টেন পেন, রিস্টওয়াচ, রঙীন চশমা এবং আরও দুই একটা শৌখিন জিনিস একধারে জড়ো করা রহিয়াছে।

"কি ক'রে চুরি করেছে এতগুলো জিনিস—"

"আমাদের শো কেসের কাছে রোজই এসে ঘুরে ঘুরে দেখে। আমরা ভাবতাম এমনি দেখছে দেখুক। আজ হঠাৎ নজরে পড়ল একটা শো কেস থেকে কি যেন একটা তুলে কাপড়ের ভিতর কোমরের নীচে ঢুকিয়ে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, ও বাবা, শুধু একটা জিনিস নয়, অনেক জিনিস সরিয়েছে। করেছে কি জানেন? একটা ইল্যাস্‌টিক্‌-ওলা হাফপ্যাণ্ট পরেছে কাপড়ের নিচে। আর হাফপ্যাণ্টের পা দুটো দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে দিয়েছে নিজের উরুর সঙ্গে। ইল্যাস্‌টিক্‌ গলিয়ে প্যাণ্টের ভিতর যা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তা আর নিচে পড়ে যাচ্ছে না, পড়বার উপায় নেই। শালার বুদ্ধি দেখুন কি রকম!"

বুদ্ধি দেখিয়া আমিও অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

"কার ছেলে জানেন?"

আমি জানিতাম, কিন্তু স্বীকার করিতে লজ্জা হইল। ছবিও চোখের ইশারায় যেন আমাকে বারণ করিল তাহার পরিচয়টা যেন না দিই।

বলিলাম, "না, আমি চিনি না—"

"কার ছেলে তুমি? বাপের নাম কি?"

"শিশিরবাবু।"

"কোন্‌ শিশিরবাবু?"

"শিশির গুপ্ত—"

"এস. পি. শিশির গুপ্ত?"

অকম্পিত কণ্ঠে ছবি বলিল, "হ্যাঁ—"

আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। ছোকরা বলে কি!

এইবার দোকানদার ঘাবড়াইয়া গেল। এস.-পি.র ছেলেকে এমনভাবে প্রহার করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়িয়া যাইবে না তো! বলিল, "এ কথা আগে বললেই পারতে। আমি এমনিই তোমাকে দিয়ে দিতাম জিনিসগুলো, চুরি করতে গেলে কেন! নাও, নিয়ে যাও এগুলো—"

অম্লান বদনে ছবি জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। কে বলে বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি নাই।

তিন

আড্ডায় গিয়া শুনিতে পাইলাম, "আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে মশাই—" ভাদুড়ী মহাশয় বলিতেছেন!

আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল ছেলের বাপ-মায়েরা আজকাল যাহা হইয়াছেন, ছেলেরাও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু কিছু বলিলাম না। জমাটি আড্ডায় রসভঙ্গ করিয়া কি হইবে!

আর এক দিক

"রক্তটা কী রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু—"

"ভাল নয়। হিমোগ্লোবিন বড্ড কম। আর. বি. সি. ডব্লিউ বি. সি.-ও কম।"

"তাহ'লে, কী করব—"

"কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দুটো খাবার, আর একটা ইনজেকশনের—"

"রক্ত পরীক্ষার জন্য কত দিতে হবে?"

"আপনার কাছে কিছু নেব না। ইনজেকশনটা কিনে আনুন, আমি দিয়ে দেব, ফি দিতে হবে না।"

"রক্তে কী দোষ বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"রক্তটা পাতলা হয়ে গেছে আর কি। যে-সব জিনিস যে পরিমাণে থাকা উচিত, তা নেই।"

"ও তাই নাকি! রক্ত পাতলা হয়ে যাবার কারণ কি?"

"অনেক কারণ থাকতে পারে। এক কথায় বলা যায় কি চট ক'রে? এখন যা বললুম, তাই করুন।"

"আমার বুক ধড়ফড়টা ওই জন্যেই তাহ'লে?

"হ্যাঁ। তাই ত মনে হচ্ছে।"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"ওষুধগুলোর দাম কি রকম পড়বে বলতে পারেন—"

"ঠিক বলতে পারব না, আমার ত ওষুধের দোকান নেই। দেখুন না খোঁজ ক'রে।"

"আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।"

অতুল রায় আমাদেরই পাড়ার লোক। বয়স হইয়াছে, কিছুদিন পরেই রিটায়ার করিতে হইবে। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় ছেলেটির বয়স আঠার বৎসর। উপর্যুপরি দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে।

অতুলবাবু বলেন, "ছেলের দোষ নেই মশাই। স্কুলে আজকাল পড়াশোনা কিছু হয় না। প্রত্যেকটি মাস্টার টিউশনি ক'রে বেড়ায়, স্কুলে এসে ঘুম মারে। তার উপর পড়ানো হয় হিন্দীতে। ওরা অর্ধেক বুঝতেই পারে না। তা ছাড়া বাঙালী ছেলে বলে প্রত্যেক বিহারী মাস্টারের বিষদৃষ্টি তার উপর। সুযোগ পেলেই কম নম্বর দিয়ে দেয়। যে দু-একজন বাঙালী মাস্টার আছেন, তাঁরা ভরসা ক'রে বাঙালী ছেলে-দের দিকে ভাল ক'রে নজর দিতে পারেন না, পাছে বিহারী মনিবরা চটে যান। এ অবস্থায় ছেলে কখনও পাস করতে পারে? ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছে এই যথেষ্ট।"

তাহার পর একটু থামিয়া অতুলবাবু বলিয়াছিলেন, "সিংজীকে তেল দিচ্ছি রোজ। তিনি ভরসা দিয়েছেন, ম্যাট্রিকটা পাস করলে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি যা করতে বলছেন, তা করব কিনা এখনও ঠিক করতে পারিনি—"

"কি করতে বলছেন তিনি?"

"বলছেন, আপনার ছেলের নাম বদলে দিন অ্যাফিডেবিট ক'রে। কানন কুমার বদলে খুবলাল ক'রে দিন। রায় উপাধি ঠিক আছে। অনেক বিহারী ভুঁইহারদের উপাধি 'রায়' হয়। কায়স্থও রায় আছে। সিংজী বললেন, বাঙালী নাম দেখলে উপর থেকে কেটে দেবে। কি করব তাই ভাবছি। ওর ঠাকুমা অনেক শখ ক'রে নামটা রেখেছিলেন—"

অতুলবাবুর প্রথম সন্তান কন্যা, ডাকনাম রিনি। তাহার দূরসম্পর্কের এক মাসী শান্তিনিকেতনে পড়িতেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্ভুল সুর এবং নানারকম নাচের নিখুঁত মুদ্রা, পদবিন্যাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া বায়ু-পরিবর্তনমানসে অতুলবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেনও। সেই সময় রিনি নাচ-গানে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। ভাগ্যিস লইয়াছিল, তাই সে এখন মাসে পঁচাত্তর টাকা রোজগার করিয়া বৃদ্ধ বাবার সংসারভার লাঘব করিতেছে। তাহার মাসী তাহাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার চর্চা সে ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে অনেকের খোশামোদ করিয়া এখন বেশ নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে নেকনজরে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই সুপারিশের জোরে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে নাচ-গানের শিক্ষয়িত্রী হইয়া বহাল হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নেকনজর যাহাতে আরও কৃপাকোমল হয়, সেজন্য তাহাকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অতুলবাবু নিজে গিয়া পেঁছাইয়া দিয়া আসেন।

তাঁহার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহই সুস্থ নয়। নানারকম ব্যাধি লাগিয়াই

আছে। আমি পাড়ার ডাক্তার, বিনা পয়সাতেই দেখি। তবু মাঝে মাঝে খবর পাই, তিনি আমার ঔষধ না খাওয়াইয়া হোমিওপ্যাথি করিতেছেন। তাঁহার নিজেরই ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে, দুই-একখানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাংলা বইও আছে। অনেক সময় নিজেই চিকিৎসা চালান। নিজের বুক-ধড়ফড়ানির চিকিৎসা নিজেই করিতেছিলেন, কিন্তু হালে পানি না পাইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন।

বৈকালবেলা অতুলবাবু আবার দেখা দিলেন।

"আপনি যে প্রেসক্রপশান লিখে দিয়েছেন, তার দাম কত জানেন? দু শিশি ট্যাবলেটের দাম সাড়ে ন টাকা। আর ইনজেকশনের দাম প্রতিটি অ্যামপুল আড়াই টাকা। আপনি ছটা ইনজেকশন দিতে চাইছেন। তার মানে পনর টাকা। পনের আর সাড়ে নয়ে সাড়ে চব্বিশ টাকা। সাত দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এ চিকিৎসা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। যাহার ঔষধ কিনিবারই সামর্থ নাই, তাহার চিকিৎসা করিব কি করিয়া?

"হাসপাতালে চেষ্টা ক'রে দেখুন না, যদি পান—"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার। হাসপাতাল গরিবদের জন্য নয়, হোমরা-চোমরা অফিসারদের জন্যে। ভাল ভাল দামী ওষুধ বিনা পয়সায় ওঁরাই পান। গরিবদের কাছে ঘুষ চায়। বিনা পয়সায় কিছু হয় না ওখানে। কোন্‌খানেই বা হয়! ওই যে গভর্ণমেন্ট পোলট্রি খুলেছে, ওর একটি ডিম, কি একটা মুরগী কি বাইরের লোকের পাবার উপায় আছে? সব ওই অফিসারদের পেটে যাচ্ছে—"

অতুলবাবু যখন কথা বলেন, তখন একটানা খানিকটা বলিয়া যান, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া নির্নিমেষে মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাহাই করিলেন।

বলিলাম, "তাহ'লে খাওয়াটা একটু ভাল করুন। দুধ, মাছ—"

"বাজারে চুনো মাছের সের কত ক'রে জানেন? পাকা মাছের দিকে ত চাওয়াই যায় না। দুধ টাকায় পাঁচ পো, মাংস আড়াই টাকা তিন টাকা সের। আলু এগার আনা, পটল আট আনা, ধুঁদুল আট আনা, সেদিন একটা ছোট্ট লাউ কিনতে গেলুম, দাম বললে আট আনা। ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম। খাওয়া ভাল করব কি ক'রে? কনট্রোল দোকানগুলোতে গমও পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। সব ব্ল্যাক মার্কেটে। অথচ রোজই একটা ক'রে মিনিস্টার এরোপ্লেনে উড়ে এসে বক্তৃতা মেরে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসক কে জানেন? মরণ। তাঁকে 'কল'ও দিচ্ছি রোজ, কিন্তু আসছেন কই—"

আবার তিনি তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা চললুম। থ্যাংক ইউ—"

'থ্যাংক ইউ'টা দিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না।

দিন সাতেক পরে একটি নূতন সমস্যায় জড়িত হইতে হইল। ভাষা-সমস্যা। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ জারি করিয়াছেন, এইবার সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হইবে। মাতৃভাষা চলিবে না। রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সংবিধানবিরোধী এ কি

কাণ্ড! এই সেদিনই ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ হায়দরাবাদে বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া কাহারও উপর হিন্দী চাপানো হইবে না। অথচ তাঁহার নিজের প্রদেশই তাঁহার কথা অমান্য করিতেছে! কিছুতেই ইহা সহ্য করা হইবে না। দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। তাহার পর একটি হুজুগে ছোকরাকে ধরিয়া বলিলাম, "বাঙালীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এস। তারপর মুসলমানদের বাড়িতে যেতে হবে—এই খাতাটাও নাও, কিছু কিছু চাঁদাও আদায় কর।"

ছোকরা বলিল, "আচ্ছা।"

বলিয়া কিন্তু সে কুণ্ঠিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আমার সাইকেলটার পিছনের চাকাটা একটু জখম হয়েছে। ভাবছি হেঁটে পারব কি—"

"পিছনের চাকা সারিয়ে নাও এক্ষুণি।"

যুবকটি আরও কুণ্ঠিত হইল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হাতে এখন পয়সা নেই ডাক্তারবাবু। চার পাঁচ টাকা লেগে যাবে—"

রোক চড়িয়া গিয়াছিল।

তুমি সারিয়ে নাও। যা লাগে আমিই দেব।"

যুবক দরখাস্ত লইয়া সোৎসাহে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার একটু পরেই অতুলবাবুর গলা শোনা গেল।

"ডাক্তারবাবু, এই দেখুন—"

দেখিলাম, তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাজারের থলেটি আমাকে তুলিয়া দেখাইতেছেন। থলির ভিতর হইতে একগোছা লাল শাকের পাতা দেখা যাইতেছে। কি দেখাইতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

"কি দেখাচ্ছেন? আসুন না—"

অতুলবাবু রাস্তা পার হইয়া আমার ক্লিনিকে ঢুকিলেন।

"লাল শাক মশাই। জিতেনবাবু বলছিলেন, এ খেলেও নাকি হিমোগ্লোবিন বাড়ে। এ-ও চার আনা সের—"

অতুলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন।

বলিলাম, "শুনুন, একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। সই ক'রে দেবেন তাতে। আর পারেন ত কিছু চাঁদাও দেবেন।"

"কি ব্যাপার?"

"দেখবেন, দরখাস্ততেই লেখা আছে সব।"

দিন তিনেক পরে অতুলবাবু পুনরায় দেখা দিলেন।

"আপনার দরখাস্তে সই করিনি ডাক্তারবাবু। আমাদের মাতৃভাষার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে, তা আমি জানি। কিন্তু সই করতে পারলাম না। ওপরওলাকে চটাবার সাহস নেই। সিংজী ঘোর হিন্দীওলা। ওঁর সুনজরে থাকলে রিটায়ার করবার পর এক্সটেনশনও পেতে পারি। এ-সব দরখাস্তে সই করলে আমার আখের মাটি হ'য়ে যাবে। আপনার বাংলা দেশ আর বাংলা আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? কোন বাঙালী কোন বাঙালীকে সাহায্য করবে? কেউ করবে না। সুতরাং

যারা আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে, তাদের মন রেখে চলতে হবে। আগে ইংরেজদের সেলাম করতুম, এখন এদের করি। বাঁচতে হবে ত আগে, তারপর ভাষা।"

তাহার পর তিনি কোমরের গেঁজে হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যমত চাঁদা আমি কিছু দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন আমার নামটা যেন খাতায় লিখবেন না। যদি কিছু লিখতে চান, এক্স ওয়াই জেড লিখে দেবেন।"

সিকিটি টেবিলের উপর রাখিয়া অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর খানিক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা, চললুম। যাই হোক, আপনি যে এসব করছেন, এটা খুবই ভাল কথা। থ্যাংক ইউ।"

অতুলবাবু চলিয়া গেলেন।

বাংলার বাহিরে যে সব নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের জীবন-সমস্যার আর একটা দিক সহসা যেন দেখিতে পাইলাম।

দমিয়া গেলাম একটু। সই করেন নাই বলিয়া অতুলবাবুর উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

মেঘলা দিনে

মোটরে চলেছি। মোটরেই আজকাল সর্বদা থাকি। বাড়ি আছে একটা কিন্তু বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। বাড়ি মানে সিমেন্ট ইঁট লোহা কাঠের জগদ্দল সমন্বয় একটা। বাড়িকে যারা গৃহ ক'রে তোলে, তারা আসেনি আমার কাছে এ জন্মে। একজন এসেছিল। সে কিন্তু আমার বাড়িতে আসেনি। বাড়ির বাইরে থেকেই সে আমার জীবন মধুর ক'রে তুলেছিল। সে-ও আমার নাগালের বাইরে চ'লে গেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াই। জানি পাব না, তবু খুঁজি। খোঁজাটা নেশার মত হ'য়ে গেছে। ওইটেই জীবনের উদ্দেশ্য হ'য়ে গেছে আজকাল। এ বিশ্বাস হ'য়ে গেছে, পাব তাকে কোথাও না কোথাও। কোনও অচেনা শহরের গলির মোড়ে কিংবা কোনও পথের বাঁকে কিংবা কোনও বনের ধারে বা পাহাড়ের ঝরনা তলায় কিংবা আর কোথাও। যেখানে মনে হয় তাকে পাব, সেখানেই অপেক্ষা করি, দিনের পর দিন, অনেক সময় মাসের পর মাস। কিন্তু পাইনি। আশা ছাড়িনি কিন্তু। যতবার ব্যর্থকাম হয়েছি, ততবারই বিশ্বাস যেন বেড়ে গেছে, মনে হয়েছে পদ্ম আসবে, একবার অন্তত আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

একবার মনে হয়েছিল এই এলো বুঝি। শরতের সোনালী রোদে ঝলমল করছে নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শ্যাম-শোভায় আভাসিত হয়েছে যৌবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী, দূরে অনেক দূরে, কোথায় যেন শানাই বাজছে আগমনী সুরে। সেদিন আকাশে বাতাসে সঙ্গীতে কল্পনাই সর্বত্রই আমন্ত্রণের আগ্রহ মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, এ-আগ্রহ সে কি উপেক্ষা করতে পারবে? কিন্তু করেছিল। আসেনি।

আর একদিনের কথা। সেদিন প‌ূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার পাথারে আত্মহারা হ'য়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গার ধারা। যে ম‌ৃদ‌ু কলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তা জ্যোৎস্নার, না গঙ্গার, তা বোঝবার উপায় ছিল না। জ্যোৎস্নার পাথারে যে কলধ্বনি হ'তে পারে না, একথাও মনে হচ্ছিল না তখন। মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনও কিছ‌ু অসম্ভব বলে মনে করাই অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে। আকাশের চাঁদ যদি নেমে এসে আলাপ করত আমার সঙ্গে, একটুও আশ্চর্য হত‌ুম না। হয়তো এক পেগ হ‌ুইস্কি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করতাম তাকে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল। র‌ুপালী-আলোয়-মাখা স্বপ্ন, শ‌ুভ্র কোমল মেঘমণ্ডিত স্বপ্ন। সেদিন যে হ‌ুইস্কি চুম‌ুকে চুম‌ুকে পান করেছিলাম—যা রোজই করি—তা মনে হচ্ছিল যেন অম‌ৃত। হঠাৎ সেদিন নত‌ুন ক'রে মনে পড়ল, আমার জন্যে হ‌ুইস্কি আনতে গিয়েই পদ্ম আর ফেরেনি। তাকে মানা করেছিল‌ুম যেতে। কিন্ত‌ু সে শ‌ুনলে না। হ‌ুইস্কি না হ'লে আমার সন্ধ্যা যে বন্ধ্যা হ'য়ে যায়, একথা তার চেয়ে আর বেশী কে জানত? আমার হ‌ুইস্কির বোতলটা হাত থেকে অসাবধানে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে বলল‌ুম, ভালই হয়েছে, বিনা স‌ুরায় স‌ুরলোকে পেঁছিতে পারা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা হোক আজ। কিন্তু সে শ‌ুনল না। হ‌ুইস্কি আনতে চলে গেল। পায়ে হেঁটে গেল। মোটরটা সেদিন বিগড়েছিল। চাকরকে দিয়েও আনাতে পারত, কিন্তু আমার কোনও কাজ চাকরকে দিয়ে করিয়ে তৃপ্ত হ'ত না তার। সেদিনও এমনি প‌ূর্ণিমা ছিল, এমনি জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করেছিল প্রকৃতি। কিন্তু সে যে সেই গেল আর ফেরেনি। আশা করছিল‌ুম, কোনও জ্যোৎস্না রাত্রেই হয়তো সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল মধ্যরাত্রে, চাঁপার গন্ধ মদির থেকে মদিরতর হ'ল, রজনীগন্ধার গন্ধ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল ভোরের হাওয়ায়। পদ্ম এল না।

আর একদিনের কথা।

পাহাড়ের পাশে ঘন বনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আমার গাড়ি। হেমন্তের প্রসন্ন প্রভাত। শিশিরবিন্দ‌ুর সমারোহ চতুর্দিকে। প্রতিটি শিশিরবিন্দ‌ু থেকে ছিটকে বের‌ুচ্ছে স‌ূর্যের আলো। মনে হচ্ছে, অসংখ্য মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন কেউ। বন্য কুক্কুটের তীক্ষ্ন কণ্ঠ আহ্বান করছে কুক্কুরটিকে। অচেনা নাম-না জানা ফুলের তীব্র গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরপ‌ুর। আমার মদিরাচ্ছন্ন চেতনা সহসা সজাগ হ'য়ে উঠল কেন, জানি না। কেমন যেন দ‌ৃঢ়বিশ্বাস হ'ল সে নিশ্চয় আসবে আজ। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে তুললাম প্রত্যাশার দ‌ুর্গ। তার মধ্যে বসে রইলাম একাগ্র হ'য়ে, কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙল। একটা তীক্ষ্ন তীব্র চীৎকারে স্তব্ধতা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। সমস্ত দিন এই নির্জন বনের ধারে কেটে গেল, মনে হ'ল যেন কয়েকটা ম‌ুহ‌ূর্ত।

ড্রাইভার স‌ুরপৎ সিং কাছেই রান্না করছিল। তার দিকে সপ্রশ্ন দ‌ৃষ্টিতে চাইতেই সে বললে, "ময়‌ুর ডাকছে হ‌ুজ‌ুর। বোধহয় বাঘ বের‌ুবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এখান থেকে শহরের দিকে চলে যাওয়াই ভালো।"

বললাম, "যাব না। এইখানেই থাকব সমস্ত রাত। বন্দ‌ুক দ‌ুটো লোড ক'রে রাখ।"

সমস্ত রাত বসে রইলাম সেই নির্জন বনের ধারে। একাধিকবার বাঘের গর্জন

শোনা গেল। মনে হলো যেন আমারই অন্তরের ক্ষোভ গর্জন করছে এই গভীর জঙ্গলে। বাঘ কাছে এল না। সে-ও এলো না। সকাল বেলা অন্য জায়গায় চলে গেলাম।

সে এল অবশেষে, এক মেঘলা দিনে। ঘড়ি অনুসারে সেটা দিন বটে, কিন্তু আসলে রাত্রিই নেবেছিল সেদিন দিনকে আচ্ছন্ন ক'রে। অমন ঘন কালো মেঘ আমি আর কখনও দেখিনি। মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না। মনে হচ্ছিল, একরাশ ঘন কালো চুল যেন দিগদিগন্ত আবৃত ক'রে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। মনে হচ্ছিল ওই নিবিড় কুন্তলের অন্তরালে হয়তো কারও মুখও লুকিয়ে আছে, কিন্তু সে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন থেকে ঘনতর হ'তে লাগল। এত ঘন যে, কাছের জিনিসও আর দেখা যায় না। আমার অত বড় মোটরটাও হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। আমি আর মোটরের ভিতর বসে থাকতে পারলাম না। দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মোটরের কপাটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সুরপৎ ছিল না, হুইস্কি আনতে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলাম। আমার মোটরটা দাঁড়িয়েছিল যমুনার ধারে। নিস্তরঙ্গ যমুনাকে দেখে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, কেন ওর নাম কালিন্দী হয়েছে। মনে হচ্ছিল, সে-ও যেন গভীর বিরহে স্থির হ'য়ে গেছে, আশার সমীরে আর তরঙ্গ তোলে না, কালো হ'য়ে গেছে তার নীল রং। বাইরে এসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম যমুনারই দিকে। তারপর ঘট ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার মোটরের খোলা দরজার পাশে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ পদ্ম। যদিও তখন ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়েছিল, তবু আমার ভুল হয়নি। স্পষ্ট দেখলাম, পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হুইস্কির বোতল। তারপর ধীরে ধীরে সে মোটরের ভিতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা উঠল। আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল, আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, আমার পা দুটো মাটিতে পুঁতে গেছে। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে যে তুমুল ঝড় উঠেছে তা যেন স্পর্শও করছে না আমাকে। যমুনার স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তরঙ্গে। তারপর আমি ছুটে গেলাম মোটরের দিকে সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়ের বেগই ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে। মোটরের দিকে, এসে মুখ থুবড় পড়ে গেলাম। তারপর কি হয়েছে মনে নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখি, সুরপৎ আমাকে তুলছে। ঝড় থেমে গেছে। মোটরে ঢুকে দেখলাম পদ্ম নেই, কেউ নেই। মোটরের সিটের উপর বোতল রয়েছে একটা।

সুরপৎকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পেয়েছ দেখছি। কত দাম নিলে—"

সুরপৎ বললে, "পেলাম না হুজুর। সব দোকান বন্ধ।"

সীট থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে দেখলাম—হুইস্কি নয়। বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'খাঁটি পদ্মমধু'।

পদ্মার পুরো নাম পদ্মাবতী কি পদ্মলোচনা, তা আমি বলব না। একটা কথা বলব, তার মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আমার জন্য হুইস্কি আনতে গিয়ে একটা লরীর তলায় চাপা পড়েছিল সে। সেদিন কিন্তু এসেছিল সে সেই মেঘলা দিনের অন্ধকারে। ইঙ্গিতময় অনুরোধ অবহেলা করিনি। মদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন মধুই খাই। পদ্মমধু।

বেহুলা

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিণী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে নয়, কমবয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কি যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতিহিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর চোখে মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই। রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্পশিশু যেন জড়াজড়ি ক'রে ফণা তুলে আছে। অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি। তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় হাসিটা যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে একজিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা ক'রে দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার ক'রে তলার ঘা টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চুলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হ'ল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধহয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে গেল।

চার-পাঁচদিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি, রাস্তাটা খুব খারাপ, আশে পাশে ঝোপ-ঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়েঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হ'ল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিলে।

বললাম, "ওই ভাঙা ঘরে থাক কি ক'রে?"

কোন উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমন স্থির হ'য়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা?"

চুপ ক'রে রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। ভাবটা—আমার সম্বন্ধে এত কৌতুহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ ক'রে থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা?"

"আমদাবাদের কাছে।"

"কোন্ জেলা?"

"পুর্ণিয়া?"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে?"

"রোজ লাগাই।"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি।"

চুপ ক'রে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভাল ক'রে দেখব। ঠিক সিঁদুর পরবার জায়গায় একজিমা হ'ল কী ক'রে? আশ্চর্য ত! চুলকেছিল নাকি? রক্ত পড়ছে।"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হ'ল রক্তটাই সিন্দুরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হ'ল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধহয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসঙ্কোচে দখল করেছে। যদিও মেয়েটির চোখে মুখে একটা বিরুদ্ধভাব সজাগ হ'য়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কি? জেলে না কি?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে।"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসেনি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি! খুব জ্বর হয়েছে। মাথায় ঘা-টা দগদগে হ'য়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা ক'রে দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফাণ্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনাবার টাকা নেই।"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে দুটি ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমিও ছিলাম সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছানাপত্র কিছু নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলি শুধু ঝুলছে চাল থেকে।"

"আর কিছু নেই?"

"না।"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা

করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হ'য়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধহয় বাঁচাবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কি ক'রে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয়, সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে।

মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারিনি। বিষদাঁত উঠেছে ওর।"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়েনি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়িনি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না।"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হ'ল। সাপটারও হ'ল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

স্নেহ-প্রসঙ্গ

তখনও মোটর কিনিনি, রিক্‌শা চড়েই যাতায়াত করতাম বাড়ি থেকে। হেঁটে যেতে পারতুম, কিন্তু শরীরে কুলোত না। তাই রিক্‌শার ব্যবস্থা করেছিলাম।

ভদ্রলোক তখন মুচকি হেসে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, "বুঝেছি, এইজন্যেই আপনার ভুঁড়ি হয়েছে—। একসারসাইজ করাটা খুব দরকার।"

"খুব। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন। আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকুন।"

"কেন বলুন তো?"

"রাস্তায় যেসব মোটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তাদের দু' একজনকে ডাকুন।"

"ডাকব? এখানে?"

"ক্ষতি কি। ডেকেই দেখুন না—"

"আসবে?"

"আসতেও পারে দু' একজন।"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত ক'রে শেষকালে আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসলেন। একটু পরেই ব্রজবিহারীকে দেখা গেল। বেশ মোটা লোক, হন হন ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। ভদ্রলোক ব্রজবিহারীকে চিনতেন না, আমি চিনতুম।

"শুনুন —"

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ও, ডাক্তারবাবু, নমস্কার।"

এগিয়ে এসে ঢুকল আমার ক্লিনীকে।

"কি বলছেন।"

"আমি বলছি না কিছু। উনি জানতে চাইছেন তুমি পায়ে হেঁটেই বরাবর চলাফেরা কর, না রিক্শা চড়।"

"রিক্শা চড়বার পয়সা কই। নিদেন পক্ষে দু'আনা পয়সা চাই রিক্শা চড়তে হ'লে। কিন্তু দু' আনা বাজে খরচ করবার সামর্থ্যও যে আমার নেই, তা আপনার তো জানা উচিত ডাক্তারবাবু।"

ব্রজবিহারী সত্যিই গরীব ছা-পোষা গৃহস্থ। একশ টাকা মাইনে পায়। ছেলেমেয়ে আটটি। বউ চিররুগ্ন। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা।

তারপর ব্রজবিহারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, "হঠাৎ একথা জানতে চাইছেন কেন উনি?"

বললুম, "উনি একটা থিওরি খাড়া করেছেন যে, যারা রিক্শা চড়ে তারা মোটা হ'য়ে যায়, আর যারা হাঁটে তাদের এক্সারসাইজ হয় বলে মোটা হয় না। এই কথা হচ্ছিল এমন সময় তুমি এসে পড়লে, তোমাকে রোগা বলা যায় না।"

"রোগা মোটেই নয়, বেশ মোটা লোক আমি। কারণটা কি জানেন? হাঁটি বলে খুব ক্ষিদে পায়, ভাত খেয়ে পেট ভরাতে হয়, প্রায় আধ সের চালের ভাত খাই, ফ্যানটাও ফেলি না। তাই বোধহয় মুটিয়ে যাচ্ছি, না? আপনি তো ডাক্তার মানুষ, আপনি তো সবই বোঝেন, আপনাকে আমি আর বলব কি। আচ্ছা চলি।"

কপালের ঘামটা আঙুল দিয়ে চেঁছে ফেলে ব্রজবিহারী চলে গেল।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললুম, "দেখলেন তো, আপনার থিয়োরি টিকল না। এক্সারসাইজ করলে সব সময়ে ভুঁড়ি কমে না, বড় বড় পালোয়ানদের মধ্যেও অনেকের বেশ ভুঁড় আছে। কোন একটা নিয়মে সব মানুষকে ফেলা শক্ত। তবে একটা নিয়ম অনেক সময় খাটে—"

"কি নিয়ম ?"

"হাতীর বাচ্চা সাধারণতঃ টিকটিকির মতো রোগা হয় না। অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যায় ছেলেরা শেষ পর্যন্ত বাপ-মায়ের মতোই হয়। আমার বাবাকে তো আপনি দেখেছেন, আড়াই মন ওজন ছিল তাঁর। আমার ঠাকুরদাও বেশ স্থূলকায় লম্বা চওড়া লোক ছিলেন। তাই আমি আর আমার ভাইরা সবাই মোটাসোটা।"

"তা না হয় হ'ল। কিন্তু প্রায় বছর চল্লিশ আগে যখন আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন তো আপনি বেশ রোগা ছিলেন।"

ভদ্রলোক প্রথমেই এসে আমাকে বলেছিলেন যে, আমি তাঁকে চিনতে পারছি কি না। অকপটে স্বীকার করেছিলাম, পারছি না। তখন তিনি আমার বাবার কথা তুললেন, বাড়ির অন্যান্য লোকদের কথাও বললেন। বুঝলাম ১৯১৮ সালের কোনো সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন সত্যিই আমি রোগা ছিলুম।

"আপনি যখন গিয়েছিলেন তার কিছুদিন আগেই আমি ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগেছিলাম। তাই হয়তো রোগা দেখেছিলেন।"

"তা হবে। আজ কিন্তু সত্যিই আপনার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেছি। এখন আপনার ওজন কত ?"

"চোদ্দ স্টোন।"

"হাইট্ ?"

"পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।"

"হাইট্ অনুসারে বেশী ওজন আপনার। কিছু কমানো দরকার। আপনি ডাক্তার, আপনাকে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।"

তারপর একটু হেসে তিনি আসল কথাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন বোধহয়, এমন সময় বাধা পড়ল, লাখপতিয়া এসে হাজির হ'ল। তার মাথায় প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড এক পিতলের হাঁড়ি। তার পরনের শাড়িখানি লাল আর হলুদ রঙের এক বিচিত্র লীলা, আঁটসাঁট ক'রে পরা, আঁচলটি কোমরে জড়ানো। দুহাতে কাঁসার চুড়ি, পায়ে কাঁসার মল। বলিষ্ঠা। প্রৌঢ়া আহিরিণী গোয়ালিনী লাখপতিয়া। গলার স্বরটিও কন্‌কনে ; কাঁসার বাসনে আঘাত লাগলে যে ঝঙ্কার ওঠে, সে ঝঙ্কার ওর গলায়। ভাষাটি মধুমাখা।

এসেই বললে, "বাবুয়া, ঘি কব চাহিঁ ?"

"কাল—"

"আচ্ছা।"

চলে গেল।

ভদ্রলোককে বললাম, "আমার মেদ বহুলতার আর একটা কারণ মনে পড়ছে। তার সঙ্গেও কিন্তু রিক্‌শা জড়িত।"

"কি রকম ?"

"অনেক দিন আগেকার কথা। থাক···শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না—"

"না, না বিশ্বাস করব না কেন ?"

"পৃথিবীতে এখনও যে খাঁটি জিনিস আছে একথা বিশ্বাস ক'রে না কেউ। ও কথা

গেছে। আজ পয়সা আদায় না ক'রে কিছুতে ছাড়বে না সে। মারতে মারতে ওর 'ধোৎনা' চুর ক'রে দেবে।

জিগ্যেস করলুম, "কত পাবে ওর কাছ থেকে ?"

সে আহীর ভাষায় জবাব দিলে, "টাকায় পাঁচ পোয়া করে দুধ বেচি আমি। কিন্তু ওকে টাকায় দেড় সের ক'রে দেব বলেছিলুম। তাই দেব। ও বারো সের দুধ খেয়েছে। আট টাকা পাওনা আমার।"

বললাম, "আচ্ছা, আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও তুমি।"

"তুমি দেবে ? তুমি দেবে কেন ? দিলে ওর কাছ থেকে আর আদায় করতে পারবে না। বড় বদমাস ছে—"

"আমি ওর রিক্শা চড়ে রোজ যাই। আমি ভাড়া থেকে কেটে নেব।"

টাকাটা ঝকসুর কাছ থেকে আদায় করেছিলাম কি না সে কথা এ গল্পের পক্ষে অবান্তর হ'ত যদি না সেই গয়লানী একদিন এসে আমাকে প্রণাম ক'রে আমার সামনে ছোট একটি ঘটি নামিয়ে রাখত।

"খুব ভাল ঘি ডাক্তারবাবু, খেয়ে দেখবেন। আপনার জন্যে এনেছি।"

"আমার তো ঘিয়ের দরকার নেই এখন।"

লাখপতিয়া প্রথমে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল, তারপর ধমকের সুরে বলল, "আমি কি তোমার কাছে দাম চাইছি না কি। খেয়ে দেখো এমন খাঁটি ঘি এ তল্লাটে পাবে না।

"আমাকে বিনা পয়সায় ঘি দিচ্ছ কেন ?"

মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বললে, "এইসেই—"

বুঝলাম আমার প্রতিও ওর স্নেহ সঞ্চার হয়েছে।

বললাম, "ঘি নিতে পারি, কিন্তু দাম নিতে হবে, এমনি নেব না।"

"বেশ দামই দিও। তোমার পয়সা আছে দাম দেবে বই কি" কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর। দাম দিয়ে ঘিটুকু নিয়ে নিলুম। ওরকম ভাল ঘি বহুদিন খাইনি। সেই থেকে লাখপতিয়া বরাবর আমাকে ঘি খাওয়াচ্ছে। আমার ভুঁড়ির এ-ও একটা কারণ।"

পরমুহূর্তেই লাখপতিয়া এসে প্রবেশ করল আবার।

"আমি বাবু, কাল আসতে পারব না, আমার বেটি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে, তোমার ঘি আজই দিয়ে গেলুম।'

চকচকে মাজা একটি ঘটিতে এক ঘটি ঘি দিয়ে লাখপতিয়া চলে গেল। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে ঘর ভরে উঠল।

ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম, "আপনার কি কোন কাজ আছে আমার কাছে ? না, এমনিই দেখা করতে এসেছিলেন ?"

তিনি বললেন, "অ্যাণ্টি ফ্যাট ট্যাবলেট বলে একরকম ট্যাবলেট বেরিয়েছে জার্মানী থেকে। চর্বি কমাবে। আমি তার এজেন্সি নিয়েছি। আপনাকে কিছু স্যাম্পল দিয়ে যাচ্ছি, ব্যবহার ক'রে দেখবেন।"

"আপনার ট্যাবলেট কি লাখপতিয়ার ঘিকে ঠেকাতে পারবে ? কারণ ওর ঘি আমাকে খেতেই হবে। না খাইয়ে ও ছাড়বে না।"

লাখপতিয়া আবার এল। খনখনে গলায় বলল, "বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ঘি এক সের এক ছটাক আছে। তুমি একসেরের দামই দিও।"

আত্মহত্যা

চন্দ্রমাধব আশ্চর্য লোক। সে ঘোর শীতে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, আবার ঘোর গ্রীষ্মে গরম জামা পরতেও তার আপত্তি নেই। উচ্ছে দিয়ে মাংস খেতে এবং হার্ড পেন্সিলে লিখতে ভালবাসে। কথা খুব কম বলে। প্রায়ই গম্ভীর হ'য়ে থাকে। যখন হাসে তখনও নীরবে হাসে, হাসলে টেবো গাল দুটি ফুলে ওঠে, চোখ বুজে যায়। সুপুষ্ট গোঁফের প্রান্ত দু'টি ভুরুর কোণে গিয়ে খোঁচা মারে। আশ্চর্য ওর গোঁফ জোড়া। ওরকম গোঁফ কারো দেখিনি। এক জোড়া জীবন্ত ফিঙে পাখী যেন ওর ওপরের ঠোঁটে মুখোমুখি বসে আছে। যখন চন্দ্রমাধব রেগে যায় তখন যুগল ফিঙে পাখীর দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ দুটি খাড়া হ'য়ে উঠে কাঁপতে থাকে। সুক্ষ্ম পাকানো গোঁফের প্রান্ত অনেক দেখেছি কিন্তু এমন দ্বিধাবিভক্ত ব্যঞ্জন-ভরা ভাযাময় গুম্ফপ্রান্ত আর কারও দেখিনি। অদ্ভুত ওর গোঁফ। ওর মনের ভাব ও গোঁফ দিয়েই প্রকাশ করত। যখন কারো সঙ্গে ওর অমিল হত তখন গোঁফের ডগা দুটি নড়ে নড়ে যেন বলত না, না, না।

একদিন সকালে এসে হাজির। দেখলাম গোঁফের ডগা দুটি ঝুলে পড়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। সম্ভবত আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নও ফুটে উঠেছিল একটা। চন্দ্রমাধব পকেট থেকে একটি টাকা বার ক'রে বললে, "এক টাকার জিলিপি আনিয়ে খা—"

"কেন, হঠাৎ ?"

"মা মারা গেছেন। তিনি জিলিপি খেতে এবং জিলিপি খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।"

আমার কাছ থেকে আর কয়েকজন বন্ধুর খবর নিয়ে গেল তারা কোলকাতায় আছে কি না। শুনলাম প্রত্যেককে গিয়ে জিলিপি খাইয়েছে।

আর একদিন দেখি তার গোঁফের ফিঙে দুটি যেন উন্মনা, উড়ু উড়ু করছে। 'মেকি কি' 'মেকি কি' বলে ডেকে উঠল বুঝি।

"কি ব্যাপার চন্দ্রমাধব—"

চন্দ্রমাধব কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর হাসল। চোখ বুজে গেল, গোঁফের আলুলায়িত পুচ্ছ গিয়ে মিলল ঘন ভ্রূর সঙ্গে।

প্রায় চুপিচুপি বললে, "প্রেমে পড়েছি—"

"সে কি! কার সঙ্গে ?"

"রমলার।"

মাসখানেক কেটে গেছে তারপর।

একদিন ঘরে ফিরে দেখি আমার বিছানায় আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে কে যেন ঘুমোচ্ছে।

"কে—"

মুখের ঢাকা খুলতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলাম। চন্দ্রমাধব। কিন্তু গোঁফ নেই। পরিষ্কার কামানো।

"এ কি করলি!"

"রমলার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

একই বারান্দায়

আমার ডিসপেন্সারির সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দা আছে। তার উপরে দিনে ধুলো জমে, রাত্রে কুলি আর রিক্‌শাওলারা শোয়। গভীর রাত্রে সেখানে মাঝে মাঝে জুয়ারও আড্ডা বসে শুনেছি। একদিন ডিসপেন্সারিতে বসে আছি এমন সময় সেই বারান্দায় আর একরকম সম্ভাবনা আভাষিত হ'ল হঠাৎ।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে এসে ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করল এবং নমস্কার ক'রে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোগী নয়, সাহায্যপ্রার্থী। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গের ভাষায় সসংকোচে বললে, "বড় দুরবস্থায় পড়েছি। কিছু সাহায্য চাই।" এর আগে এরকম সাহায্য আরও অনেক করেছি। দু' এক টাকা দিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমার মনে এক উদ্ভট প্রেরণা এল।

বললাম, "সামান্য দু' এক টাকা নিয়ে কি আপনার অভাব মিটবে? এরকম ভিক্ষে করেই বা চলবে কতদিন?"

"আমাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিন কোথাও।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছি।"

"ম্যাট্রিক পাশ ছেলের তো কোথাও ভাল চাকরি জুটবে না। তার চেয়ে তুমি ছোটখাটো দোকান কর না কোথাও।"

"ক্যাপিট্যাল কে দেবে আমাকে!"

"বেশী ক্যাপিটাল দিয়ে কি হবে। খুব কম ক্যাপিটাল নিয়ে আরম্ভ কর কিছু, দোকানদারি করবার অভিজ্ঞতাটা হোক আগে। তারপর বেশী ক্যাপিট্যাল নিয়ে বড় কিছু করবার যোগ্যতা হবে।"

"কি করব বলুন—"

"আমার এই ডিসপেন্সারির সামনে দিয়ে এই বড় রাস্তা চলে গেছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে। তুমি কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি দেশলাই নিয়েই বসে যাও না। অনেক ছেলেমেয়েও রোজ স্কুলে যায় এদিক দিয়ে, খাতা, পেন্সিল, কালির বড়ি—এসবও কিছু কিছু রাখতে পার। আমার এই চওড়া বারান্দা রয়েছে, এরই ওপর বসে যাও কাল থেকে—"

"ওসব জিনিস কেনবারও টাকা নেই আমার কাছে।"

"আচ্ছা আমি দিচ্ছি তোমায় দশটা টাকা।"

দশটা টাকা দিলাম। টাকা নিয়ে সে জিনিসপত্রও কিনে আনল। একটা মাদুর

দিলাম, সেটা বারান্দায় বিছিয়ে হর্ষকুমার দোকান সাজিয়ে বসল। লজেন্সও এনেছিল কিছু। তাই ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল। প্রথম মুশকিল হ'ল ভাষা নিয়ে। হর্ষকুমারের ভাষা বিহারী ছেলেমেয়েরা বোঝে না, তাদের ভাষা হর্ষকুমার বুঝতে পারে না। তারপর লক্ষ্য করলাম হর্ষকুমারের কথা বলবার ধরনটাও মোলায়েম নয়, মুখভাবও স্নিগ্ধ নয়। সে সকলের সঙ্গে যেন খেঁকিয়ে কথা বলছে। যদিও সে মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে এবং তার পুঁজি মাত্র দশ টাকা, কিন্তু তার হাবভাব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর মতো। সম্ভ্রমাত্মক হিন্দী 'আপ' শব্দটা তার জানা ছিল না। কোন্ ছেলে তাই তার দোকানে এসে জিনিসে হাত দিলেই সে মাতৃভাষায় খিঁচিয়ে উঠত—"এই ছ্যামড়া, ও কি করস।" তার ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেগুলো প্রথম প্রথম হাসত খুব। তারপর ছেলেদের যা স্বভাব ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে তাকে। নামই বার ক'রে ফেললে তার একটা—করসবাবু। 'এ করসবাবু' 'এ করসবাবু' বলে রোজ এসে চীৎকার করত তারা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি শুদ্ধ অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লুম। বিক্রি অবশ্য হ'ত কিছু-কিছু রোজই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হর্ষকুমার দোকান টিকিয়ে রাখতে পারল না। একদিন এসে বলল আমাকে যে দেশে তার জমিদারি ছিল, সে জমিদারের ছেলে, এরকম উঞ্ছবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। পরদিনই আমার বারান্দা থেকে উঠে গেল। দিন কয়েক পরে আমার দশটা টাকাও ফেরত দিয়ে গেল। এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল—এই আমার মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু যবনিকাপাত হ'ল মাস তিনেক পরে। হর্ষকুমার আর একদিন এসেছিল। একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছিল। মাথায় ঢেউ-খেলানো তেড়ি, কব্জিতে রিস্টওয়াচ, পরনে হাওয়াই কোট আর ছিটের প্যান্ট। বললে—চাকরি পেয়েছি একটা। জিজ্ঞাসা করলাম মাইনে কত। বললে, পঁয়তাল্লিশ টাকা। পরে আরও বাড়বে। দেখলাম এইতেই সে খুব খুশী।

উক্ত ঘটনার মাস ছয়েক পরে একদিন আর একটি সৌম্যদর্শন যুবক হাজির হ'ল আমার বারান্দায়। এ-ও উদ্বাস্তু। পাঞ্জাব থেকে এসেছে। তার সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে সবিনয়ে নমস্কার ক'রে এগিয়ে এল। হিন্দী ভাষায় জানাল তার একটি প্রার্থনা আছে আমার কাছে।

"কি প্রার্থনা ?"

সে বললে যে, আমার বারান্দায় সে ছোটখাটো একটা চায়ের দোকান করতে চায়। সে গরীব উদ্বাস্তু, মাসে পাঁচ টাকার বেশী 'কেরায়া' (ভাড়া) দিতে পারবে না। আমি যদি মেহেরবানি করি তাহলে বড়ই উপকৃত হয় সে।

তাকে বললাম, "বেশ দোকান কর। ভাড়া দিতে হবে না।"

কৃতার্থ হয়ে গেল সে যেন।

পরের দিনই যজ্ঞদত্ত তার দোকান ফেঁদে ফেললে। তার সম্বল একটা তোলা কয়লার উনান, কিছু পিরিচ পেয়ালা, এক বালতি জল, কিছু চা, দুধ আর চিনি। উনুনটা বাইরে থেকেই ধরিয়ে আনত। ধোঁয়ার জন্য আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

উপরন্তু আমার নানারকম সুবিধা ক'রে দিয়েছিল সে। আমাকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। রোজ সকালে এসেই আমার ডিসপেন্সারি

ঘরটি ঝাড়ু দিত, টেবিল চেয়ার ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কারভাবে জল ভরে আনত। একদিন বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনার জুতোয় অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি, যদি হুকুম করেন কালি বুরুশ ক'রে দিই।" নিজের জুতোর দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি।

বললাম, "থাক। তোমাকে করতে হবে না। ভুটুয়া ক'রে দেবে'খন।"

"আমি দিচ্ছি হুজুর। ভুটুয়ার চেয়ে আমি অনেক ভাল পারব। আপনি দেখুন—"

জোর ক'রে আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল। আর সত্যিই এমন চমৎকার বুরুশ ক'রে দিলে যে, তাক লেগে গেল আমার। কোন মুচিও বোধহয় এমন চমৎকার ক'রে করতে পারত না।

আমি খুব খুশী হলাম তার উপর। শুধু আমি নয়, আমার গৃহিণীও হলেন। কারণ গৃহিণীর প্রধান সমস্যা ছিল সকাল বেলার বাজার। আমার ডিসপেন্সারির চাকর ভুটুয়া ডিসপেন্সারির কাজকর্ম সেরে তবে বাজার করতে যেত। যজ্ঞদত্ত তার কাজের ভার নেওয়াতে সে সকাল সকাল ছুটি পেত, বাজারও পেঁছিত ঠিক সময়ে। যজ্ঞদত্তের দোকানও বেশ জেঁকে উঠল।

তার ভদ্র ব্যবহারে আর সুন্দর চেহারায় সবাই আকৃষ্ট হ'ত তার দোকানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেয়ে যেত অনেকে। ক্রমশ সে বিস্কুট আর কেকও আমদানি করলে। বেশ চলতে লাগল দোকান।

দিনকতক পরে রাস্তার ওপারে একটি ঘর খালি হল। যজ্ঞদত্ত তার দোকান উঠিয়ে নিয়ে গেল সেখানে। টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজাল দোকানটিকে। তারপর একদিন দেখলাম চপ কাটলেটও ভাজা হচ্ছে সেখানে।

যজ্ঞদত্ত দোকান অন্য জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে যেমন ছিল, তখনও তেমনি রইল। আমার ডিসপেন্সারি ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার টেবিল ঝাড়া, কুঁজোয় জল ভরা এবং মাঝে মাঝে জুতো বুরুশ করা—ঠিক আগের মতোই চলতে লাগল। যজ্ঞদত্ত আমার নির্ভরযোগ্য আপনজন হয়ে উঠল ক্রমশ।

একদিন সে এসে একখানি চিঠি আমাকে দিলে। বললে, "আমি ইংরেজী পড়তে পারি না, চিঠিটাতে কি আছে মেহেরবানি ক'রে পড়ে দিন।" দেখলাম চিঠিখানা দিল্লী থেকে এসেছে। তাতে যা লেখা আছে, তা পড়ে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে গেলাম আমি। লেখা আছে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে এবং তার অংশের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সরকারের কাছে জমা করা হয়েছে। যজ্ঞদত্ত যেন আইন অনুসারে সে টাকাটা নেবার ব্যবস্থা করে। যজ্ঞদত্তকে চিঠির মর্ম বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সম্পত্তি ছিল তোমার?"

"জমিদারি ছিল হুজুর। জুয়েলারির কারবার ছিল। হাতি বাঁধা থাকত আমাদের দুয়ারে—"

ইচ্ছে হ'ল যজ্ঞদত্তকে প্রণাম করি একটা। কিন্তু তা আর পারলাম না।

বিনতা দস্তিদার

শ্রীবিরূপাক্ষ ভৌমিক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বৎসর। তাঁর বন্ধু—একমাত্র বন্ধু—ত্রিপুরা সেন বলেন তিনি প্রেমে পড়ে বিনতাকে বিয়ে করেছিলেন। ত্রিপুরা সেন মানা করা সত্ত্বেও করেছিলেন—প্রেমে পড়লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের আলাপ প্রায় বছর দশেকের। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল ক্রমশ। প্রথম আলাপ হয়েছিল কারণ দু'জনেরই পেশা ছিল এক, দু'জনেই ইন্‌শিওরেন্সের দালাল। অন্তরঙ্গতা হবার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল—দু'জনেই বেশ অশ্লীলতাপ্রিয় ছিলেন। দু'জনের কাছেই পর্নোগ্রাফির অনেক বই ছিল এবং দু'জনেই মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধরনের আলোচনা করতেন তা ভদ্রলোকের পক্ষে অশ্রাব্য। এই প্রবৃত্তিই তাঁদের বন্ধুত্বকে নিবিড়তর করেছিল। বিরূপাক্ষবাবু বিপত্নীক এবং ত্রিপুরাবাবু অবিবাহিত, সেজন্য আরও জমেছিল অন্তরঙ্গতাটা। ভালবাসার ভাগীদার ছিল না কেউ। এক বাড়িতে বাস করতেন দু'জনে। এক গলিতে দোতলার উপর ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি দুটি শোবার ঘর, তাছাড়া একটি বসবার ঘর এবং রান্নাঘর। দ'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পর্নোগ্রাফি পড়া ছাড়া দুজনের অবসর বিনোদনের আর একটি উপায় ছিল। সন্ধ্যার পর দুজনে যখন মিলিত হতেন তখন আলোচনা করতেন কার চোখে সেদিন কি রকম মেয়ে পড়েছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাব-ভাবের বর্ণনায় মশগুল হ'য়ে যেতেন তাঁরা।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন ত্রিপুরা এসে বললেন, "বুকে ছুরি মেরে দিয়েছে দাদা আজ। একেবারে ঘায়েল হয়ে গেছি!"

উৎসুক বিরূপাক্ষ বললেন, "কি রকম? কে মারল বুকে ছুরি—"

"বিনতা দস্তিদার!"

"সে আবার কে—"

"আমাদেরই কম্পানির একটি এজেন্ট। আজই বাহাল হয়েছে। আপিসে এসেছিল আজ। তুমি তো গেলে না, গেলে দেখতে পেতে কি মাল একটি। চোখের চাউনি যেন চাকু ছুরি। ঘ্যাঁচ ক'রে বুকে বসে যায়।"

লালায়িত হয়ে উঠলেন বিরূপাক্ষ।

"ওফ্ বড্ড মিস করেছি তো।

"মিস করনি। আবার সে আসবে কাল। সে তোমাকে চেনে বোধহয়। তোমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে বলেছি কাল তুমি আপিসে আসবে।"

"আমাকে চেনে? বিনতা দস্তিদার? মনে পড়ছে না তো। বয়স কত হবে—"

"কুড়ির নীচেই। অর্ধস্ফুট গোলাপ—"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের যখন দেখা হ'ল তখন একটা জিনিস দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তার মুখের নিচের দিকটা ওড়না দিয়ে ঢাকা। থুতনিও ভাল ক'রে দেখা যায়

না। মনে হয় যেন কোনও বোরখা-পরা মেয়ে মুখের উপরার্ধটা খুলে দিয়েছে। আলাপ হবার পরই বিরূপাক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনার পোশাকের একটু নতুন রকমের বৈচিত্র্য আছে দেখছি। এদেশে হিন্দু মেয়েদের এরকমটা প্রায় দেখা যায় না—।"

বিনতা উত্তর দিয়েছিল, "না, এদেশের পোশাক নয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে এই রকম পোশাক অনেক মেয়ে পরত। খু-উ-ব ভাল লাগত আমার। সেই জন্যে যখনই বাইরে বেরুই এই পোশাক পরি! দেখতে ভালো নয়?"

"চমৎকার।"

…বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বিলম্ব হয়নি। বিরূপাক্ষকে সেজন্য বেশী চেষ্টাও করতে হয়নি। বিনতাই বিরূপাক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে বেশী উৎসুক এই কথা মনে হয়েছিল ত্রিপুরা সেনের। বিনতাই হোটেলে নিমন্ত্রণ করত বারবার তাকে। সিনেমার টিকিট কিনে আনত তার জন্যে। তাকে একলা ডেকে নিয়ে যেত ইডেন গার্ডেনে, চিড়িয়াখানায়, হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে উধাও হয়ে যেত দু'জনে মাঠের দিকে। বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন বিরূপাক্ষ, লোলুপ হ'য়ে উঠলেন ত্রিপুরা সেন। স্বাভাবিক নিয়মে ত্রিপুরা সেনের ঈর্ষাও হ'তে লাগল খুব। কিন্তু চতুর লোক ছিলেন ত্রিপুরা, মনের ভাব গোপন করার দক্ষতাও ছিল তাঁর। তিনি যে ঈর্ষাক্লিষ্ট বা লোলুপ, এটা ঘুণাক্ষরে জানতে দিলেন না বিরূপাক্ষকে। মাঝে মাঝে কেবল ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "কি ভায়া, গাঁথতে পারলে?"

বিরূপাক্ষ বলতেন, "আমারই গলায় বঁড়শি আটকে গেছে। ছটফট করছি।"

"থুতনির সামনের পরদা নেবেছে?"

"না। সেটা ও সহজে নাবাবে না।"

"কেন?"

"নাবাবে না তার খুশি।"

দিন কয়েক পরে বিরূপাক্ষ একদিন বললেন, "এইবার বোধহয় যবনিকা পতন হবে মনে হচ্ছে।"

"কি রকম—"

"ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বলছে বিয়ের পর ও থুতনির পরদা সরিয়ে ফেলবে। ফুলশয্যার রাত্রেই ফেলবে বলছে।"

"একটা অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করবে? সেটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে?"

"হবে না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে আমার চাইই। ওর কালো চোখের চাউনি পাগল করেছে আমাকে। ও স্পষ্ট বলে দিয়েছে বিয়ে না করলে ও ধরা দেবে না।"

"কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। মূল্যের ইতরবিশেষ হ'তে পারে কিন্তু কেনা যায়। এ লাইনে চেষ্টা ক'রে দেখ না।"

"দেখেছি। বিনতাও বিক্রীত হতে রাজী, কিন্তু তার মূল্য ওই—বিবাহ করতে হবে।"

বিনতার সঙ্গে বির‌ুপাক্ষ ভৌমিকের বিবাহ হয়েছিল অনতিবিলম্বে। ঠিক তার পরের ঘটনাটা খবরের কাগজে অনেকে হয়তো পড়েছেন। ফুলশয্যার রাত্রেই বির‌ুপাক্ষ ভৌমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার ঘোষালের মতে হার্টফেল ক'রে মারা গিয়েছিলেন ভৌমিকমশাই। কাগজে এর বেশী খবর আর বেরোয়নি।

ত্রিপ‌ুরা সেন তাঁর ডায়েরিতে কিন্ত‌ু এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর।

তিনি লিখছেন—"বির‌ুপাক্ষবাব‌ুর ফুলশয্যার রাত্রে আমি আড়ি পেতে ছিলাম, তির্যকভাবে আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। ইংরাজীতে যাকে বলে Vicarious pleasure. ঠিক আমার পাশের ঘরেই ফুলশয্যা হয়েছিল, আমাকে খ‌ুব অস‌ুবিধা ভোগ করতে হয়নি এজন্য। একটা জানলার ফুটো দিয়ে আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। বিনতা শেষ পর্যন্ত তার গলার সামনে সেই নীল ওড়না টাঙিয়ে রেখেছিল। বিয়ে হয়েছিল তিন আইন অন‌ুসারে। স‌ুতরাং সে ওড়না সরাবার প্রয়োজন হয়নি। বিনতা যখন ফুলশয্যার খাটে উঠল তখনও তার গলার সামনে নীল-ওড়না। বির‌ুপাক্ষ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। একটু অধীরকণ্ঠে বলল—"এইবার ওটা সরিয়ে দাও না বিনতা।" "এই যে দিচ্ছি"—বলে বিনতা ওড়নাটা খ‌ুলে ফেলে দিয়ে এমন গ্রীবাভঙ্গি ক'রে বসে রইল যে আমি চমকে গেলাম। আমার মনে হ'ল ঠিক যেন একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। অনেক সাপের গলায় কালো কালো ডোরা থাকে। বিনতার গলাতেও ছিল। চার-পাঁচটা ঘন-কালো রেখা। হঠাৎ মনে হয় চামড়ার নিচে ব‌ুঝি রক্ত জমে আছে। চীৎকার ক'রে উঠল বির‌ুপাক্ষ—"কে, কে, কে তুমি? তুমি কি—?" খিলখিল ক'রে হেসে উঠল বিনতা। তারপর একেবারে অন্যরকম কণ্ঠে জবাব দিল—'হ্যাঁ, আমি সেই।" আর্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে গেল বির‌ুপাক্ষবাব‌ু। বিনতা বিছানা থেকে নেবে এসে ঘরের খিল খ‌ুলল। খ‌ুলেই আমাকে দেখতে পেল সে। সহজকণ্ঠে বলল—"ডাক্তার ঘোষালকে একবার খবর দিন তো। উনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন।" ডাক্তার ঘোষাল এসে ভৌমিকমশাইকে আর জীবিত দেখেননি। বিনতা ঠিক তারপরই চলে গেল। ঠিক যেন উপে গেল। শবান‌ুগমনও সে করেনি। আশ্চর্য মেয়ে—"

বির‌ুপাক্ষবাব‌ুর মৃত্যুর এক বছর পরে সি. আই. ডি. বিভাগের একটি কর্মচারী একদিন বির‌ুপাক্ষবাব‌ুদের অফিসে এলেন। তিনি একটি ফোটো ত্রিপ‌ুরা সেনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এই চেহারার কোনও লোক কি আপনাদের আপিসে কাজ করেন?" ত্রিপ‌ুরা সেন অনেকক্ষণ ভ্র‌ুকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ফোটোটার দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ পারলেন। বির‌ুপাক্ষবাব‌ুর ফোটো, কিন্তু অনেকদিন আগের, সম্ভবত তাঁর যৌবনকালের।

বললেন, "বির‌ুপাক্ষবাব‌ুর ফোটো মনে হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, তিনি ওই ছদ্মনামেই আপনাদের আপিসে কাজ করেন শ‌ুনেছি। তিনি কোথায়?"

"তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন।"

"ও।"

"তাঁকে কেন খ‌ুঁজছেন?"

"তিনি একজন ফেরারি আসামী। প্রায় একুশ বছর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন—"

"বলেন কি—!"

ত্রিপুরা সেনের চোখের সামনে বিনতার গলার কাল দাগগুলো সহসা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বোবা

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূর-সম্পর্কীয় পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সব রকম কাজ করতে পারে সে। সব রকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হ'য়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশঘণ্টার চাকরানী পাওয়া শক্ত হ'ত তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। ঠোঁটনাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এছাড়া তার আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে। শুধু গ্রহণ করেনি, নূতন রূপ, নূতন রং আরোপ করেছে তাতে।

খুব ভোরে ওঠে সে। ভোর চারটের সময়। উঠেই দেখতে পায় পূব আকাশে দপ দপ ক'রে জ্বলছে শুকতারা। পরিচিত বন্ধুকে দেখলে মুখে যেমন মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, তেমনি হাসি ফুটে ওঠে মিনুর মুখেও। মিনু মনে মনে বলে—সই ঠিকসময়ে উঠেছ দেখছি। বৈজ্ঞানিকের চোখে শুকতারা বিরাট বিশাল বাষ্পমণ্ডিত প্রকাণ্ড গ্রহ, কবির চোখে নিশাবসানের আলোক দূত, কিন্তু মিনুর চোখে সে সই। মিনুর বিশ্বাস সে-ও তার মতো কয়লা ভাঙতে উঠেছে ভোর বেলায়, আকাশবাসী তার কোন পিসেমশায়ের গৃহস্থালিতে উনুন ধরাবার জন্যে। আকাশের পিসেমশায়ও হয়তো ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে তার নিজের পিসেমশায়ের মতো। শুকতারার আশেপাশে কালো মেঘের টুকরো যখন দেখতে পায়, তখন ভাবে ওই যে কয়লা। কি বিচ্ছিরি ক'রে ছড়িয়ে রেখেছে আজ। মাঝে মাঝে এমন নুংরুট্টি হয় ও। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে। তারপর নিজে যায় সে কয়লা ভাঙতে। কয়লাগুলো ওর শত্রু। শত্রুর উপর হাতুড়ি চালিয়ে ভারি তৃপ্তি হয় ওর। হাতুড়িটার নাম রেখেছে গদাই, আর যে পাথরটার উপর রেখে কয়লা ভাঙে তার নাম দিয়েছে শানু। শানের সঙ্গে মিল আছে বলে বোধহয়। কয়লা-গাদার কাছে গিয়ে রোজ সে ওদের মনে মনে ডাকে—ও গদাই, ও শানু, ওঠ এবার, রাত যে পুইয়ে গেছে। সই এসে কয়লা ভাঙছে। তোমরাও ওঠ। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে সে অস্পষ্ট হিসহিস শব্দ করে একটা। মনের ঝাল মিটিয়ে শত্রুর মাথা ভাঙছে যেন। কয়লা ভেঙে তারপর যায় সে ঘুঁটের কাছে। ঘুঁটে তার কাছে ঘুঁটে নয়, তরকারি। উনুনের নাম রাক্ষসী। উনুন রাক্ষসী কেরোসিন তেল-দেওয়া ঘুঁটের

তরকারি দিয়ে শত্রুদের মানে কয়লাদের, খাবে। আঁচটা যখন গনগন ক'রে ধরে ওঠে তখন ভারি আনন্দ হয় মিনুর। জ্বলন্ত কয়লাগুলোকে তার মনে হয় রক্তাক্ত মাংস, আর আগুনের লাল আভাকে মনে হয় রাক্ষসীর তৃপ্তি। বিস্ফারিত-নয়নে সে চেয়ে থাকে। তারপর ছুটে চলে যায় উঠোনে; আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সেখানে উষার লাল আভা ফুটেছে কি না। উষার লাল আভা যেদিন ভাল ক'রে ফোটে, সেদিন সে ভাবে সইয়ের উনুনে চমৎকার আঁচ এসেছে। যেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন ভাবে, ছাই পরিষ্কার করেনি, তাই আঁচ ওঠেনি আজ। এই ভাবে নিজের একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেছে সে মনে মনে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের মিল নেই। সে জগতে তার শত্রু মিত্র সব আছে। আগেই বলেছি কয়লা তার শত্রু। তার আর একদল শত্রু আছে, বোলতা ভীমরুল। একবার কামড়েছিল তাকে। সে যন্ত্রণা সে ভোলেনি। প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না। দুপুরে যখন পিসিমা ঘুমোয় তখন সে ঘুরে বেড়ায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর গামছায় একটা প্রকাণ্ড গেরো বেঁধে। বোলতা বা ভীমরুল দেখতে পেলেই সোঁ ক'রে গামছাটা ঘুরিয়ে মারে। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় মাটিতে। অনেক সময় মরে যায়, অনেক সময় মরে না। না মরলে ঝাঁটা-পেটা ক'রে মারে তাকে। আর হিসহিস শব্দ করে। বোলতা বা ভীমরুল মেরে সে খেতে দেয় পিঁপড়েদের। পিঁপড়েরা তার বন্ধু। মরা বোলতাটাকে নিয়ে যাবার জন্যে শত শত পিঁপড়ে ভিড় ক'রে আসে। তারা কেমন ক'রে খবর পায় কে জানে। বোলতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় যখন তারা, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মিনু। কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে। এটা তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি।···পিঁপড়েরা ছাড়া আরও অনেক বন্ধু আছে তার। রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু। তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা। ঘটিটার নাম পুঁটি। ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুবড়ে গেল। মিনুর সে কি কান্না! তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয়। গেলাস চারটের নাম হারু, বারু, তারু আর কারু। চারটে গেলাসই একরকম। কিন্তু মিনুর চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে। গেলাসগুলোকে যখন মাজে বা ধোয় তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে। মিটসেফ-টা ওর শত্রু। ওটার নাম দিয়েছে গপগপা। গপগপ ক'রে সব জিনিস পেটে পুরে নেয়। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মীটসেফের চকচকে তালাটার দিকে, আর মনে মনে বলে—আ মর, মুখপোড়া সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে। মিনুর আর একটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে। যখন অবসর পায় টুক ক'রে চলে যায় ছাতে। ছাত থেকে একটা বড় কাঁটাল গাছ দেখা যায়। কাঁটাল গাছের মাথার দিক থেকে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে। সেই ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু। মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে। এর কারণ আছে। তার জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবাকে সে দেখেনি। অনেকদিন আগে তার মাসিমা তার কানের কাছে চীৎকার ক'রে একটা বিস্ময়কর খবর বলেছিল তাকে। তার বাবা নাকি বিদেশ গেছে, অনেক দূর বিদেশ, মিনু বড় হ'লে তার কাছে ফিরে আসবে, হয়তো তার কোলেই আসবে। মিনু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা ভাল ক'রে। একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হ'য়ে ছিল—বাবা ফিরে

আসবে। কবে আসবে? মিনু কত বড় হলে আসবে? কথাটা মাঝে মাঝে ভাবত সে। এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সে সেদিনও ছাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল পাশের বাড়ির টুনুর বাবা এল বিদেশ থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে তার নজরে পড়ল ওই সরু ডালটায় একটা হলদে পাখিও এসে বসল। সেইদিন থেকে তার বদ্ধ ধারণা হ'য়ে গেছে ওই সরু ডালে যেদিন হলদে পাখি এসে আবার বসবে, সেইদিনই তার বাবা আসবে বিদেশ থেকে। তাই ফাঁক পেলেই সে ছাতে উঠে কাঁঠাল গাছের ওই সরু ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। হলদে পাখি কিন্তু আর এসে বসে না। তবু রোজ একবার ছাতে ওঠে মিনু। এটা তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে একটা। ছাতে উঠে উঠে আর একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। রাস্তার কালো কুকুরটার পায়ের থাবার উপরে ঘা হয়েছিল একটা, মিনু দেখত কুকুরটা রোজ সেটাকে চাটে। নিবিষ্ট মনে চেটে যায় খালি। তারপর মিনু সবিস্ময়ে একদিন লক্ষ্য করল ঘা-টা সেরে গেছে। কেবল চেটে চেটে ঘা-টাকে সারিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। অবাক হয়ে গেল মিনু। তার মনে হ'ল ঘা-টা বোধহয় আমসত্ত্বের মতো। তাই চাটতে পেরেছে। তাক লেগে গেল ওর ডাক্তারি দেখে। আর একটা জিনিসও বসে গেল ওর মনে—ঘা নিশ্চয় আমসত্ত্ব, তা না হ'লে চাটতে পারে কেউ?······দিন কয়েক পরে পিসিমার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছেঁচে গেল শিল পড়ে। পিসেমশাই কি একটা ওষুধ দিলেন। বোধহয় হোমিওপ্যাথিক। বললেন, সাতদিন পরে আর এক দাগ দেবেন। এই সাতদিনে ঘা কিন্তু খুব বেড়ে গেল। যন্ত্রণায় পিসিমার চোখে জল পড়তে লাগল। পাড়ার হারু ডাক্তার সকালে এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পিসিমা ঘুমুচ্ছেন, পায়ের পটিটা আলগা হ'য়ে সরে গেছে, ঘা-টা দেখা যাচ্ছে। মিনুর মনে হল আমসত্ত্ব, আমসত্ত্বের মতোই তো কালচে দেখতে। তার ইচ্ছে হ'ল চেটে দিই একটু, হয়তো সেরে যাবে, কুকুরটা তো চেটে চেটেই সারিয়েছে ঘা-টা। মিনু জিব বার ক'রে চেটে দিলে ঘা-টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল পিসিমার, আঁৎকে চীৎকার ক'রে উঠলেন তিনি—কি করলি পোড়ামুখী। পাখাটা ছুড়ে মারলেন তিনি মিনুকে। মিনু পালিয়ে গেল। লুকিয়ে রইল সমস্ত দিন। সেইদিনই রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। কাউকে কিছু বললে না। মনে হ'ল জ্বর হওয়াটাও বুঝি অপরাধ একটা।····· ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, রোজ যেমন কয়লা ভাঙতে যায় সেদিনও তেমনি গেল, সেদিনও চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ ক'রে জ্বলছে। মনে মনে বলল—সই এসেছিস। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই ভাই। তুই ভাল আছিস তো? উনুনে আঁচ দিয়ে কিন্তু সে আর জল ভরতে পারলে না সেদিন। শরীরটা বড্ড বেশী খারাপ হতে লাগল। আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কেমন যেন ঘোর-ঘোর মনে হতে লাগল।······চাটবার পর থেকে পিসিমার ঘা-টাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। মিনু টের পায়নি, কারণ পিসিমার কাছে আর সে ঘেঁষেনি। এ-ও জানত না যে পিসেমশায় পাশের গাঁয়ে তাঁর শালাকে খবর পাঠিয়েছিলেন পিসিমাকে দেখে যাবার জন্য। পাশের গাঁয়ে পিসিমার যে ভাই আছে একথাও মিনু জানত না। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে মিনু জ্বরের ঘোরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। জ্বরের ঘোরেই হঠাৎ তার মনে হ'ল একটা দরকারী কাজ করা হয়নি কিন্তু। আস্তে আস্তে উঠল সে বিছানা থেকে, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছাতের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছাতে। কেউ

দেখতে পেল না। পিসিমা পিসেমশাই তখনও ঘুমুচ্ছেন। ছাতে উঠেই চোখে পড়ল লালে লাল হয়ে গেছে পূর্বাকাশ। বাঃ চমৎকার আঁচ উঠেছে তো সইয়ের। একটু হাসল সে। তারপর চাইল সেই সরু ডালটার দিকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। একটা হলদে পাখি এসে বসেছে! তাহলে তো বাবা নিশ্চয় এসেছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ছাতে যদিও পা টলছিল তবু সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। এসেই দেখতে পেল বাইরের বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল, তার মুখ থেকে কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরুতে লাগল। ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন ভদ্রলোক। :সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই বেরিয়ে এলেন কপাট খুলে।

"কে এই মেয়েটা আমার পায়ে মুখ ঘষছে এমন করে!"

"তোমার পায়েও মুখ ঘষছে! তোমার দিদির পায়ে কাল কামড়ে দিয়েছে ও! পাগল হ'য়ে গেছে বোধহয়।"

চুলের ঝুটি ধরে হিড় হিড় করে সরিয়ে দিলেন তিনি মিনুকে।

সাতদিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হ'ল মিনুর। তার সমস্ত মুখ ঘা-য়ে ভরে গিয়েছিল। সেপ্টিসিমিয়া হয়েছিল, ডাক্তাররা বললেন। সমস্তক্ষণই সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে ছিল। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে জ্ঞান হ'ল কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলে দেখল সামনে একটা খোলা জানলা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দপদপ ক'রে জ্বলছে শুকতারাটা। মুখে মৃদু হাসি ফুটল মিনুর। মনে মনে বলল—সই এবার তোর কাছে যাচ্ছি।

কে জানে শুকতারার দেশের লোকেরা বোবা মিনুর মনের কথা বুঝতে পেরেছে কি না।

ভিখু দি গ্রেট

ভিখু লেখাপড়া শেখেনি। সভ্যতার যে সব বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা সম্ভ্রমের চোখে দেখি তা-ও তার ছিল না। মাথার চুল রুক্ষ, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ময়লা কাপড়। পেটে অন্ন নেই। কিন্তু তবু মুখে একটি সদাপ্রসন্ন হাসি। আমার চাকর হ'য়ে বহাল হয়েছিল সে। তার কাজ ছিল বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় কাচা—এই সব। পারত না ভালো ক'রে। আমি নটার সময় আপিস চলে যেতাম, ফিরতাম সন্ধ্যার পর। ফিরে এসেই শুনতে পেতাম গৃহিণীর নানা রঙের নালিশ। ভিখু এটা পারেনি, ওটা করেনি, পেয়ালা ভেঙেছে, বাজারে গিয়ে পয়সা হারিয়েছে, কাজকর্মে অত্যন্ত 'মাটো,'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভিখু এসবের কোন প্রতিবাদ করত না, মৃদু হেসে একটু অপ্রস্তুতমুখে দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনত, কিছু বলত না নিজে থেকে। জিজ্ঞাসা করলে বলত—মাইজি যা বলছেন তা ঠিকই। আমি এসব কাজ ভাল ক'রে করতে পারি না। আমি 'ক্ষেতি-গিরস্তি'র কাজ বরাবর করেছি, তাই করতে পারি। এসব আমার তেমন আসে না। 'ক্ষেতি-গিরস্তি' মানে, চাষবাস। জিগ্যেস করলাম কি

বিয়ের পর গীটার শেখা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি এখানে বদলি হ'য়ে আসার পর আবার হঠাৎ একদিন সমুদিত হলেন ছায়ালু। এ শহরে তিনি নাকি লাইফ্ ইন-সিওরেন্সের দালালি করতে এসেছেন। শহরের একপ্রান্তে একটা মেসে থাকতেন। সিসির সান্নিধ্য লাভ করবার জন্যে যোগাড়-যন্ত্র ক'রে ঠিক আমার পাশের বাড়িতে উঠে এসেছেন। সেটাও একটা মেস। সুতরাং আমার বাড়িতে গীটারবাদ্যের চর্চা আবার প্রবল হ'য়ে উঠেছে ইদানীং। এর মধ্যে বাসন মাজা বা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। সংস্কৃতি বাদ দিয়ে বাঙালীর বাঁচা তো অসম্ভব। সুতরাং চাকরের চেষ্টায় আমাকে উঠতে হ'ল। উঠে বাইরে এসেই দেখি ভিখু উঠোনের একপ্রান্তে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পনর ষোল বছরের একটি মেয়ে।

ভিখু হাত কচলে সবিনয়ে বললে, "হুজুর, আমি আপনাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারছি না, আমার কাজ মাইজির একটুও 'পসন্দ' হয় না। তাই আমি আমার বদলে আমার বউকে নিয়ে এসেছি। সে চৌকা-বরতনের কাজ (রান্না-বাসনের কাজ) ভাল জানে। ঘর ঝাড়ু দেবে, কাপড়ও কাচবে। ও আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজের। ওকে যদি আপনারা রাখেন তাহলে ও আপনাদের খুশী করতে পারবে।"

ভিখুর বউ দেখলাম ঘাড় নীচু ক'রে আছে, মুচকি মুচকি হাসছে। ছায়ালুও আমার পিছু-পিছু বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন, "ওই আপাতত থাক, আজকের প্রব্লেমটা তো মিটুক!"

ভিখুকে জিগ্যেস করলাম, "তুই কি করবি?"

"একটা ফেরি-ওলার কাজ পেয়েছি, হুজুর।"

ভিখুর বউ সিমিয়া থেকে গেল। সিসি বেরিয়ে এসে তাকে তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গীটার নিয়ে চলে গেল নতুন একটা গৎ শিখতে। আমিও একটু পরে আপিসে বেরিয়ে গেলাম।

দুই

সমস্যার সমাধান কিন্তু হ'ল না। আরও জটিল সমস্যার সূত্রপাত হ'ল সিমিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। আমাদের বাড়িতে দু'চার দিন খাওয়ার পর সিমিয়ার শ্রী ফিরে গেল। আমরা সবাই আবিষ্কার করলুম সে পরমাসুন্দরী, নবোদ্ভিন্নযৌবনা কামিনী। একদিন শুনলাম আমার স্ত্রী তাকে ভৎসনা করছেন।

"সোমত্ত মেয়ে, ওই ছেঁড়া কাপড় পরে তোর সবার সামনে বসে বাসন মাজতে লজ্জা করে না? বেহায়া কোথাকার—"

আপিসে বসে কাজ করছি চাপরাশি এসে খবর দিলে, "এক জেনানি আপসে মুলাকাত্ মাংতী হ্যায়।"

বললাম, "ডেকে নিয়ে এস।"

সিমিয়া এসে প্রবেশ করল এবং বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, "পাঁচটা টাকা দিন, শাড়ি

কিনতে হবে। নতুন শাড়ি পরে না গেলে মাইজি কাজ করতে দেবে না। আজ খুব বকছিলেন। আর শাড়িটা তো সত্যিই ছিঁড়ে গেছে।"

বলে সে নিজের দেহখানাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শাড়ির কোন্ কোন অংশ ছেঁড়া। আমি একটু ধমকের সুরে বললাম, "এখানে এসেছিস কেন। মাইজির কাছে শাড়ির দাম চেয়ে নি গে যা—"

"মাইজি বাড়িতে নেই। ছায়ালু বাবুর সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছেন।"

তখন মনে পড়ল ওদের আজ একটা পিক্নিকে যাবার কথা ছিল। ছায়ালু আর সিসি ডুয়েট বাজাবে সেখানে।

আর অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে পাঁচটা টাকা সিমিয়াকে দিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে একটা মিষ্টি হাসি হেসে চলে গেল।

পাঁচ টাকায় যে অমন সুন্দর ফুল-পাড় গোলাপী শাড়ি পাওয়া যায় এমন ধারণা আমার ছিল না। পরদিন সকালে দেখলাম শাড়ির বাহার দিয়ে সিমিয়া ছাইগাদার পাশে বসে বাসন মাজছে। ছাইগাদায় পদ্মফুল ফুটেছে যেন। আমি যে তাকে ওই শাড়ি কেনার টাকা দিয়েছি একথা অবিদিত রইল না। ছায়ালুও এ আলোচনায় মুচকি হেসে হেসে যোগ দিল। গৃহিণী যে সব ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ম উক্তি করলেন তাতে যুক্তি ছিল না। ছিল জ্বালা। এর চেয়ে তুচ্ছতর কারণেও গৃহিণী ইদানীং জ্বালাময়ী হ'য়ে উঠছিলেন। সামান্য সামান্য কারণে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল আমাদের সংসারের উপর দিয়ে। সিমিয়ার ব্যাপারটায় আমি আর বাদ-প্রতিবাদ করলাম না, চুপ ক'রে থাকাটাই উচিত মনে হ'ল। কিন্তু কষ্ট হ'তে লাগল গৃহিণীর ব্যবহারে। তিনি যেন আমাকে এবং সিমিয়াকে পাহারা দিতে লাগলেন। এইভাবে দিন কতক কাটল। হঠাৎ একদিন দেখি ভিখু এসে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার বৈঠকখানার দরজার সামনে।

"কি খবর ভিখু?"

ভিখু বললে যে সিমিয়া আমার বাড়িতে আর কাজ করতে চায় না। মাইজি ওকে বড্ড বেশী বকেন। অত বকুনি সহ্য করা ওর অভ্যাস নেই। তারপর ট্যাঁক থেকে পাঁচটি টাকা বার ক'রে বললে, "ওকে যে শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন তার দামটা আমি ফেরত দিচ্ছি। আপনি ওর মাইনের হিসাবটা ক'রে দিন।"

দিতে হ'ল। কারণ সিমিয়া আর কিছুতেই আমার বাড়িতে কাজ করতে রাজী হ'ল না।

কয়েকদিন পরে দেখলাম সে লাদুরাম মাড়োয়ারীর বাড়িতে বাহাল হয়েছে। লাদুরাম মাড়োয়ারীর বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। তার বাড়ির সামনেই রাস্তার একটি কল আছে। সেই কলের ধারে আমার গোলাপী শাড়ি পরে সিমিয়া প্রায় অসীমা হ'য়ে উঠল। নানা জাতের ছোকরা নানারকম পোশাক পরে নানা ধাঁচে আলাপ করতে লাগল তার সঙ্গে। সিমিয়া বাসন মাজতে মাজতে এক মুখ হেসে তাদের সঙ্গে জুড়ে দিত গল্প। কলতলার আসর বেশ জমে উঠতে লাগল। এইভাবে কাটল কিছুদিন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম সিমিয়া আর কলতলায় বসছে না। মনে হ'ল, স্রোতের ফুল অন্য কোন ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে সম্ভবত।

দিন দুই পরে ভিখু এসে হাজির হ'ল আমার আপিসে। সেলাম ক'রে বললে— সিমিয়ার খুব অসুখ। আমি যদি আমার বন্ধু ডাক্তার সেনকে একটু অনুরোধ করি

তাহলে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। সে গরীব মানুষ, চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবার সামর্থ্য তার নেই। ডাক্তারবাবু যেন একটু দয়া করেন। ডাক্তার সুশীল সেন আমার বাল্যবন্ধু, লিখে দিলাম তাকে একখানা চিঠি। দিন পনরো পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল একটা পার্টিতে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সিমিয়ার কি হয়েছিল। মুচকি হেসে সে বললে, "গনোরিয়া। তুই ওর সম্বন্ধে অত ইনটারেস্ট নিচ্ছিস যে—?"

"ওর স্বামী আমার চাকর ছিল, এসে ধরলে, তাই লিখে দিলাম তোকে।"

"ওর সম্বন্ধে আর ইনটারেস্ট নিও না। শি ইজ রটন।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সুশীল।

ভিখুকে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখতাম। চানাচুর তৈরি করছে। আমাকে দেখে একদিন সেলাম ক'রে বললে, "আমার জেনানি বেশ ভাল আছে—"

"তাকে তো আর দেখি না, অন্য কোথাও চাকরি করছে না কি?"

"না, হুজুর তাকে আর চাকরি করতে দিই না। বাইরে বেরুলে লোকে তাকে বড় জ্বালাতন করে। ছেলেমানুষ তো, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এখন ও বাড়িতে বসেই চানা-ভাজা, ফুলুরি, খাবুনি তৈরি ক'রে দেয়, আমি বিক্রি করি। আগে আমাকেই করতে হ'ত সব নিজের হাতে, এখন ও সাহায্য করে। ভালই হয়েছে—"

কিন্তু মাসখানেক পরেই দেখা গেল বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রেখেও সিমিয়াকে কায়দা করতে পারেনি ভিখু। একদিন এক ডুলি ক'রে প্রায় অর্ধ-মৃতা সিমিয়াকে নিয়ে ভিখু হাজির হ'ল আমার বাড়িতে। সঙ্গে প্রায় দশ পনরো জন লোক। সবাই কলরব করছে। তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম সিমিয়া তাদের পাশের বাড়ির এক ছোকরার সঙ্গে কি যেন 'লট্‌পট্‌' করেছে। ছোকরাটি বাবু হর্চন্দ সিং জমিদারের ছেলে। কিন্তু ছোকরার বউও ছোট ঘরের মেয়ে নয়, তার বাবা সিংহেশ্বর সিং আরও বড় জমিদার। বউ তার বাপকে খবর দিয়ে বাপের বাড়ি থেকে লাঠিয়াল আনিয়েছিল। তারা সিমিয়াকে চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তায় এনে খুব ঠেঙিয়েছে। মেরেই ফেলত, পাড়ার লোকেরা কোনরকমে বাঁচিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম ভিখু কুণ্ঠিত অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সমস্ত দোষ তারই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল।

"হুজুর, বাঁচান ওকে আপনি। ওর কোনও দোষ নেই। ওর একমাত্র দোষ ও মেয়েমানুষ। মেয়েদের দোষটাই সকলের চোখে পড়ে। হর্চন্দবাবুর ছেলে যে কাণ্ড করত রোজ, তা যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে, বড়লোকের জামাই, ওর দোষ তো কেউ দেখবে না। আপনার বন্ধু সেই ডাক্তারবাবুকে একটা চিঠি লিখে দিন দয়া ক'রে হুজুর। চিকিৎসার খরচ যা লাগে আমি দেব—"

সিসি ঘরের ভিতর থেকে তর্জন ক'রে উঠল, "ওসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে তুমি থেকো না।"

বললাম, "আমি থাকব না। ওকে সুশীলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সুশীলকে লিখে দিলাম একটা চিঠি। সুশীলের মুচকি হাসিটা মনে পড়ল, তবু লিখে দিলাম।

মাসখানেক পরে ভিখুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে ফেরি

করছিল। বললে সিমিয়া সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেছে, যদিও চোট লেগেছিল অনেক জায়গায়। ডাক্তারবাবু বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাকে।

"হর্চন্দবাবুর ছেলে আর উৎপাত করছেন না তো? যদি ক'রে বোলো আমাকে। এখানে আজকাল যিনি এস. পি. তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে বললে তিনি শায়েস্তা ক'রে দেবেন ছোকরাকে—"

"ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর। এই শহরের আবহাওয়া ওর সহ্য হ'ল না। গাঁয়ে নিজের মায়ের কাছে গিয়ে আছে এখন। আমি মাসে দশ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দিই।"

আরও বছর পাঁচেক কেটে গেছে।

ভিখুর দেখা অনেক দিন পাইনি। তার খোঁজ খবরও করিনি। কারণ আমারও জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে এই ক'বছরে। মাথার-ঘায়ে-পাগল কুকুরের মতো আমিও ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি চারিদিকে।

হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। দেখলাম রিক্‌শা টানছে। ডাকলাম। রিক্‌শাই খুঁজছিলাম একটা।

"ভিখু, আজকাল রিক্‌শা চালাচ্ছ বুঝি—"

"হাঁ হুজুর।"

"চল তাহ'লে তোমার রিক্‌শাতেই যাই। আমাকে কোর্টে নিয়ে চল।"

ভিখুর রিক্‌শাতেই উঠে বসলাম।

"আপিস না গিয়ে কোর্টে যাচ্ছেন কেন হুজুর? কোন মকোর্দমা আছে না কি—"

"হাঁ—"

কি মকোর্দমা তা আর তাকে তখন বললাম না।

ভিখু একটু পরে আবার জিগ্যেস করল, "মাইজি ভাল আছেন?"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বললাম, "না, মাইজির খবর ভাল নয়। তোর বউ সিমিয়া কেমন আছে?"

ভিখু বলল, "সিমিয়া পালিয়ে গেছে হুজুর।"

"পালিয়ে গেছে? পুলিশে খবর দিসনি?"

"না হুজুর। পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে? পুলিশে খবর দিলে মন পাওয়া যায় না। রূপে গুণে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে সিমিয়া অনেক ভালো। সে স্বর্গের দেবী, সে আমার মতো লোকের সঙ্গে থেকে নরক-ভোগ করবে কেন—"

ভিখুর গলার স্বরটা শেষের দিকে কেঁপে গেল। তার কথা শুনে আমার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল যেন। কিছুদিন আগে সিসি পালিয়েছিল ছায়ালুর সঙ্গে। আমি কেস করেছিলাম। সেদিনই মকোর্দমার শুনানি ছিল। ঠিক করলাম আর মকোর্দমা করব না। ভিখুর সহজ জীবন-দর্শনে সহজ সত্যটা যেন দেখতে পেলাম।

আরও বছর খানেক কেটেছে।

সিসি অনুতপ্তচিত্তে ফিরে এসেছে আবার আমার কাছে। শুধু তাই নয়, একজন বিখ্যাত গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ধর্মে-কর্মে মনও দিয়েছে।

ভিখু আবার একদিন এসে হাজির।

"হুজুর, আপনার বন্ধু ডাক্তারবাবুকে আর একটা চিঠি লিখে দিন। সিমিয়া ফিরে এসেছে কাল। কিন্তু তার বড় অসুখ। পক্ষাঘাত হয়েছে, দুটো পা-ই পড়ে গেছে—

ভিখু হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

সুশীলকে আর একটা চিঠি দিলাম।

গিরিবালা

অমাবস্যা রাত্রি। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একটা নামহীন আশঙ্কায় সমস্ত প্রকৃতি যেন আচ্ছন্ন। নির্মেঘ আকাশে অগণ্য তারা। সেগুলোও যেন কাঁপছিল। শিয়ালগুলো তারস্বরে চীৎকার করছিল মাঝে মাঝে। ডাকতে ডাকতে হঠাৎ থেমেও যাচ্ছিল, নৈশনীরবতা তখন আরও যেন ঘন হয়ে উঠছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ছিন্নভিন্ন হয়েও যাচ্ছিল তীক্ষ্ম-কণ্ঠ নৈশ-পতঙ্গের তীব্র হাহাকারে। হাহাকারের মতোই শোনাচ্ছিল তা, বুক-ফাটা কান্নার মতো। হু-হু ক'রে হাওয়া বইছিল একটা, মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ অন্তিম নিঃশ্বাস যেন লক্ষ লক্ষ বুক থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে চলেছে। বৃহৎলাল হন-হন ক'রে মাঠামাঠি আসছিল। অনেকগুলো মাঠ পার হয়েছে সে, দুটো ঘাটও। ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিল সে, তবু কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল এই মাঠটা পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তবে পরনে খদ্দর, মাথায় গান্ধি টুপি। তাগড়া বলিষ্ঠ চেহারা। শেয়ালগুলো আবার ডেকে উঠল। আবার থেমে গেল হঠাৎ। নৈশ-পতঙ্গের তীব্র চীৎকারটা একটা প্রকাণ্ড ছোরার মতো আবার বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে গেল অন্ধকারকে। খদ্দর-ধারী বৃহৎলাল কিন্তু এসব শুনছিল না। এসব কানেই যাচ্ছিল না তার। সে কেবল শুনতে পাচ্ছিল এই সব শব্দ—

"মা, মা, মা-গো—"

"বাঁচাও বাঁচাও—"

"ঘরে আগুন দিয়েছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে—"

"বাবাকে মেরে ফেল্‌ছে—"

"মায়ের ঝুঁটি ধরে নিয়ে যাচ্ছে—"

"খবরদার বলছি গায়ে হাত দিও না—দিও না—দিও না—দিও না—"

ছুটতে ছুটতে অবশেষে বাড়িতে এসে পৌঁছল বৃহৎলাল।

বাড়িতে তার কেউ নেই। বিয়ে করেনি। মা-বাবা-ভাই-বোন সব মরে গেছে। আছে শুধু বসতবাটি, আর কালী মন্দিরটি পূর্বপুরুষদের স্থাপিত প্রতিমা। খুব জাগ্রত।

বৃহৎলালের মনে হ'ল মাকে একটা প্রণাম ক'রে যাই। দেখল মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। পুরুত মশাই কি কপাট বন্ধ করতে ভুলে গেছেন? আলো নেই কেন? কালী

মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে রইল বৃহৎলাল। মনে হ'ল মন্দিরের ভিতর অন্ধকার যেন আরও জমাট। পর মুহূর্তেই চমকে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মন্দিরের ভিতর কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুর ? শেয়াল ? কিন্তু না, এ কি—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কে। চাপা কান্না—। বৃহৎলালের পকেটে টর্চ ছিল। টর্চটা জেলেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মন্দিরে প্রতিমা নেই, মায়ের আসন শূন্য। তারপরই সে শিউরে উঠল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলল। পরক্ষণেই মনে হ'ল ভ্রম বুঝি। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল আবার। না, ভ্রম নয়। গিরিবালাই। সেই গিরিবালা। তেমনি কালো, তেমনি এক পিঠ চুল। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, উরু বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে। গিরিবালা এখানে কি ক'রে এল ? দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে !

"গিরিবালা—গিরি—"

হঠাৎ গিরিবালা মিলিয়ে গেল।

বৃহৎলাল টর্চ হাতে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছুটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে।

"সৌদামিনি—মোহন—"

ঝি-চাকর কারো সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। আলোটা জ্বালল। জ্বালতেই চোখে পড়ল রেডিওটা। আফশোষ হল। ওটার ভাল্ভ খারাপ হয়ে গেছে, সারানো হয়নি। ঠিক থাকলে শোনা যেত, সময় কাটত, দেশের হালচাল বোঝা যেত কিছু। রেডিওটার দিকে চেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল, গিরিবালা এখানে এলো কি করে ; তাকে তো—!

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিবে গেল। পাওয়ার হাউসের গোলমাল না কি ? না, তার কেটে দিল কেউ ! অন্ধকারে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বৃহৎলাল। তার পকেটে যে টর্চ আছে তা ভুলেই গেল কয়েক মুহূর্ত। একটু পরে মনে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে বিছানা করাই আছে। গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে যেন আরাম পেল একটু। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তড়াক ক'রে উঠে বসতে হ'ল আবার। মুখের উপর কার চুল এসে লাগছে। একরাশ চুল। মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে কিছু নেই। মাকড়শার জাল নয় তো ? আবার শুয়ে পড়ল সে। আবার চুল। টর্চটা জ্বেলে এবার সে কেরোসিনের একটা লণ্ঠন জ্বালল বাইরে গিয়ে। লণ্ঠনটা খুঁজতে দেরী হ'ল একটু। লণ্ঠনটা নিয়ে সে যখন আসছে তখন তার মনে হ'ল ঘরের ভিতর পিল পিল ক'রে কারা সব ঢুকছে যেন। বাইরে যেন অপেক্ষা করছিল, কপাট খুলতেই ঢুকে পড়ছে।

"কে—কে তোমরা—"

কোন সাড়া নেই। লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকল বৃহৎলাল।

ঘরে কেউ নেই। খিল দিয়ে লণ্ঠনটি একধারে কমিয়ে রেখে আবার শুয়ে পড়ল সে। আবার চোখ বুজল। মনে মনে রাম নাম করতে লাগল। তার ইচ্ছে হ'ল মহাত্মাজির প্রিয় গান রামধুনটা গাই। গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। প্রতিবারেই কে যেন হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরছে তার। হাত দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু চাপটা অনুভব করছে। মনে মনে রামনাম করতে লাগল। তার পরই একটা শব্দ হ'ল কড়-কড়-কড়-কড়্। চোখ চেয়ে প্রথমটা বুঝতে পারল না কিছু। হঠাৎ তারপর দেখতে পেলে মেঝেতে সারি-সারি বসে আছেন যেন কারা। পুরুষ-নারী-শিশুর দল, সবাই যেন মুখোস পরে

আছে, কারও চোখে পলক পড়ছে না, কারও নিশ্বাস পড়ছে না। তাদের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে শিউরে উঠল বৃহৎলাল। একটা লোকের হাত নেই, দুটো লোকের চোখ বেরিয়ে ঝুলছে, একটা কবন্ধ, একটা লোকের দাঁতগুলো সব বেরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে ঠোঁট নেই। আবার কড়-কড় ক'রে শব্দ হ'ল। বৃহৎলাল সবিস্ময়ে শুনল রেডিওটা বাজছে, দেখল মাঝখানের সেই সবুজ আলোটা সবুজ নয়, লাল হয়ে উঠেছে, টকটকে লাল।

রেডিও বলতে লাগল ঃ—আমি হতভাগিনী বঙ্গনারী। আজ ভারতবর্ষের কোনও রেডিও স্টেশন থেকে আমার বার্তা শোনা যাবে না। তাই আমি এই ভাঙা রেডিও আশ্রয় ক'রে আমার কথা শোনাচ্ছি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল এটা সভ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ। এখন বুঝেছি সেটা মিথ্যে কথা। এটা গুণ্ডারাজ, এখানে ভদ্রলোকের ধন-প্রাণ-মান-ভাষা-সাহিত্য কিছুই নিরাপদ নয়। আমার বাবা দেশের সেবা করবেন বলে দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন, আমার ভাইরা জেল খেটেছিল, স্বদেশী আমলে একজনের ফাঁসিও হয়েছিল। এত কৃচ্ছ্র সাধন করবার পর যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাতে আমাদেরই স্থান নেই। কোথাও স্থান নেই। বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি—সব ভুয়ো, সব ফেনা, সব বুদ্বুদ, সব রেকর্ডের গান, থিয়েটারের অভিনয়। ওঁদের কথায় আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। জিন্না সাহেবের কথাই ঠিক —সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা স্বাধীন ভারতে অসহায়, ব্রুট মেজরিটি তাদের পিষে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা বারবার উদ্বাস্তু হব। বারবার গুণ্ডায় এসে আমাদের ধর্ষণ করবে, নেতারা প্লেনে উড়ে উড়ে নির্লজ্জের মত বারবার ভুয়ো শান্তির বাণী আওড়াবেন। এই হবে বারবার, যদি আমরা আত্মরক্ষার জন্যে এখনও সজাগ না হই। আমি প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষিত হয়েছি, শিয়াল-কুকুরে আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে, আমার বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই, আমাদের বসত-বাড়ি পুড়ে গেছে। আমি এখন আর ভারতবাসী নই, পরলোকবাসী, কিন্তু তবু আমার দেশকে ভুলতে পারছি না। ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে-জিঘাংসায় জ্বলে মরছি। কামার্ত-দানবকে শাস্তি দেবার জন্য চণ্ডী নগ্নিকা হয়েছিলেন, লজ্জা বিসর্জন দিয়েছিলেন, খড়্গ ধারণ করেছিলেন। মহামেঘ রূপ ধারণ করে রণরঙ্গিনী হয়েছিলেন তিনি। তোমরা যারা এখনও বেঁচে আছ, আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে তোমাদেরও তাই হতে হবে। তোমাদের মধ্যে যে চণ্ডী আছেন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমার মধ্যে তিনি আজ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁর এক হাত সদ্য-ছিন্ন শির, কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা, পরিধানে শব-হস্তের কাঞ্চী, পদতলে শিব। আমাকে তিনি বলছেন ঃ ওই যে কামুক পশুটা বসে আছে, বলি দাও ওকে। অমোঘ অস্ত্র দিয়েছেন তিনি আমাকে। হা-হা-হা-হা। অমোঘ অস্ত্র—"

হঠাৎ ফেটে গেল রেডিওটা। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কালো একখানা হাত, আর সেই হাতে বিরাট একটা শাণিত খড়্গ। পর মুহূর্তেই আর্তনাদ ক'রে উঠল বৃহৎলাল। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। আলো নিবে গেল, রেডিও থেমে গেল।

তারপর দিন বৃহৎলালের কবন্ধটা তার ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু মুণ্ডটা পাওয়া গেল না। সবাই ভাবল কুকুর বা শেয়ালে নিয়ে গেছে বোধহয় সেটা। কিন্তু পরে জানা গেল তা নয়। যা জানা গেল তা ভয়ানক। পুরুতমশাই কালী পুজো

করতে এসেছিলেন। তিনি ছুটে এসে খবর দিলেন—মুণ্ডু এখানে রয়েছে। সবাই গিয়ে দেখল মা কালীর হাতে মুণ্ডটা ঝুলছে। তাঁর হাতে আগে যে পাথরের মুণ্ডুটা ছিল সেটা মাটিতে পড়ে আছে।

প্রতীক্ষা

রাজেন তখন কলেজে পড়তো। থাকতো বহুবাজারের একটা বোর্ডিং-হাউসে। ছাত্র-জীবনের নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে অর্থাভাব। রাজেনের বাবা দিলদরিয়া লোক ছিলেন ব'লে অর্থশালী ছিলেন না। যা রোজগার করতেন তা দু'হাতে খরচ ক'রে ফেলতেন। তার মেয়ে দুর্গার বিয়েতে যেভাবে খরচ করেছিলেন, বরযাত্রীদের যেভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন তা ও-অঞ্চলের বহু লোকের এখনও মনে আছে। সুতরাং তিনি তাঁর ছেলে রাজেনকে নিতান্ত প্রয়োজনের বেশী টাকা দিতে পারতেন না। মাসের শেষে রাজেনের প্রায়ই হাত খালি হয়ে যেতো এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধার চাইতে হতো। ধার দেবার মতো ধনী বন্ধুও ছিল তার একাধিক। রাজেনকে ভালবাসতো অনেকেই। এর কারণ সে-ও তার বাবার দিল-দরিয়া স্বভাবটা পেয়েছিল। যখন হাতে পয়সা থাকতো তখন বেপরোয়া খরচ করতো, বন্ধুদের খাওয়াতো, সিনেমা দেখাতো। মৌমাছি বা পিঁপড়ের কাছে সে শিক্ষালাভ করেনি, প্রজাপতিই ছিল তার আদর্শ। এজন্য মাঝে মাঝে কষ্টে পড়তো, কিন্তু তার স্বভাব বদলাতো না। বন্ধুরাই—বিশেষ ক'রে কুমার অলকেন্দ্র মৌলি—তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতো। বেশ বদান্য ব্যক্তি ছিল সে। টাকা দিয়ে কখনও ফেরত চাইতো না। তবে একটা অসুবিধাও ছিল। সে লম্বা লম্বা আধুনিক কবিতা লিখতো। সেগুলো যে শুধু মন দিয়ে শুনতে হতো তাই নয়, সেগুলোর তারিফও করতে হতো। অর্থাভাবে পড়লে এ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হতো রাজেনকে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন একটু বেশী টাকার দরকার প'ড়ে গেল। তার বোনের এক পিসশ্বশুর হাজির হলো এসে। ভদ্রলোক দেহাতী এবং কোলকাতা শহরের পক্ষে বেখাপ্পারকম বেমানান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি যখন রাজেনের বাসা আবিষ্কার করলেন তখন বোর্ডিংয়ের দ্বারবানকে তিনি প্রশ্ন করলেন—"হাঁ হে বাপু, নেত্য মোক্তারের ছেলে কি এখানে থাকে?" ছাপরাবাসী দ্বারবান উত্তর দিয়ে দিলে···"নেহি মালুম।" তখন তিনি বোর্ডিংয়েরই একটি লোককে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলে—"সকলের বাপের নাম তো আমি জানি না। তাঁর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বলতে পারবো তিনি এখানে থাকেন কিনা।"

"তার নাম রাজেন। কলেজে পড়ে।"

"রাজেন দাস কি?"

"হ্যাঁ দাসই বটে।"

"তাহ'লে চারতলায় চলে যান। তাঁর ঘরের নম্বর হচ্ছে—তিন।" পিসশ্বশুর মশায় সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চারতলায় উঠলেন।

সেদিন রবিবার, রাজেন ঘরেই ছিল। পিসশ্বশুর মশায় তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে একবার গলা-খাঁকারি দিলেন। রাজেন দেখলে একটি নাতিদীর্ঘ আজানুলম্বিত-বাহু লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, চোখ দুটি বড় বড় এবং রক্তাভ। নীচের ঠোঁটটি বেশ পুরু।

"রাজেন আছো নাকি ?"

"হ্যাঁ এই যে, আমিই রাজেন।"

"আমাকে চিনতে পারছো ?"

"আজ্ঞে না! কে আপনি ?"

"আমি বটুক-ভৈরব ঘোষ। তোমার বোনের পিসশ্বশুর গো। আমাকে তো তোমার মনে থাকা উচিত ছিল। আমি তোমার বোনের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম, ভরপেট খাওয়ার পর সত্তরটা ল্যাংড়া আম খেয়েছিলাম, আমাকে ভুলে যাওয়াটা উচিত হয়নি তোমার। মনে পড়লো ?"

"পড়েছে। আসুন বসুন।"

বটুক-ভৈরবকে রাজেন চিনতে পারলে না। কিন্তু সত্তরটা ল্যাংড়া আম খাওয়ার কাহিনীটা মনে পড়লো।

ঘরের ভিতর ঢুকে রাজেনের চৌকির উপর ব'সে ঘোষমশায় আবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন—"ডাগর-দীঘি অঞ্চলের ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই এক-ডাকে আমাকে চেনে। আর তুমি আমার আত্মীয় হয়ে আমাকে চিনতে পারলে না হে!"

"সেই একবার মাত্র দেখেছিলাম তো বছর-পাঁচেক আগে। তাই চিনতে পারিনি। আপনি এসেছেন কোথায় ?"

"তোমারই কাছে এলাম।"

রাজেন একটু বিস্মিত হলো।

"কেন, কোন দরকার আছে ?"

"দরকার আছে বই কি। বিনা দরকারে কি কেউ কারো কাছে আসে ? সে কাল কি আর আছে এখন! এখন সবাই দরকারেরই দাস।" এই ভূমিকা শুনে রাজেন আর একটু বিস্মিত হলো। কিছু না ব'লে চুপ করেই রইলো সে। বটুক-ভৈরবও চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"আমার দরকারের কথাটা শুনে তুমি হাসবে হয়তো, আজকালকার নব্য ছোকরা তো তোমরা! পূর্বজন্ম পরজন্মই কিছুই বিশ্বাস করো না। কিন্তু আমি করি। আমার বিশ্বাস, এজন্মে কোনও সাধ যদি অপূর্ণ থাকে তাহ'লে তা পূর্ণ করবার জন্যে ফের জন্মগ্রহণ করতে হয়। সব কামনা পূর্ণ না হ'লে নিষ্কাম হওয়া যায় না, আর নিষ্কাম না হ'লে মুক্তি হয় না। এ-কথা তোমরা হয়তো মানো না, কিন্তু আমি মানি। আমার ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো তাহ'লে তোমার কাছে আসতাম না, কিংবা হাতে যদি প্রচুর টাকা থাকতো তাহ'লেও আসতাম না! বেশী টাকা থাকলে ওই ডাগর-দীঘিতে ব'সেই আমার সাধ মেটাতে পারতাম। কিন্তু আমি গরীব। পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে একটা খাবারের দোকান আছে, সেইটে থেকে সংসার চলে। মনের সাধ মেটাবার মতো টাকা বাঁচে না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম কার কাছে মনের কথাটা বলি। ছেলেটা তো চলে গেল, সে বেঁচে থাকলে আমার সাধ সে মেটাতো, যেমন ক'রে হোক মেটাতো। বড় ভাল ছেলে ছিল গো—"

বটুক-ভৈরব হঠাৎ থেমে গেলেন। রাজেন দেখলে তাঁর মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে। নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে থর থর ক'রে। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাব রইলো না, আবার শুরু করলেন তিনি :

"আমি অনেকদিন থেকেই এ-কথা ভাবছিলাম। সকলের কাছে বলাও যায় না। বললে ভাববে, বুড়োটার ভীমরতী ধরেছে। তারপর হঠাৎ একদিন তোমার বোন দুর্গার সঙ্গে দেখা এক বিয়েবাড়িতে। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি। তার কাছেই শুনলাম তুমি কোলকাতায় আছো। তার কাছেই তোমার ঠিকানাটাও পেয়ে গেলাম। আমার কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল, তোমাকে বললেই আমার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। তুমি যখন নেত্য মোক্তারের ছেলে তখন আশা করা যায়, তুমিও তোমার বাপের মতন দিল-দরিয়া, আর তুমি কোলকাতাতেই আছো, অসুবিধা নেই কোনও—"

"কাজটা কি ?"

একটু ইতস্তত ক'রে বটুক-ভৈরব বললেন, "কাজটা যে খুব শক্ত তা নয়, কেবল মবলগ কিছু টাকার দরকার।"

"শুনিই না কি কাজ।"

"আমি নামজাদা একটা বিলিতি হোটেলে খেতে চাই। দিশী খাবার অনেক খেয়েছি, কিন্তু বিলিতী খাবার খাইনি কখনও। শুনেছি সেসব নাকি অপূর্ব। একদিন পেট ভ'রে খেতে চাই সেসব।"

"আপনি গোঁড়া নন্ তো ?"

"মোটেই না। আমি মুরগী-টুরগী সব খাই। আজকাল তো সবাই খাচ্ছে—"

"আর একটা মুশকিলও আছে।"

"কি ?"

"ভালো বিলিতী হোটেলে সাহেবী-পোষাক না প'রে গেলে ঢুকতে দেয় না।"

"তাই পরেই যাবো। দাও কিনে একটা সাহেবী পোষাক—"

"শুধু আপনার পোষাক হলেই তো হবে না—আমারও চাই। আমাকে তো থাকতে হবে আপনার সঙ্গে।"

"তা হবে বইকি। বেশ, দুটো পোষাকই কিনে ফ্যালো। গাড়িভাড়া বাদে আমার কাছে যা আছে সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

ট্যাঁক থেকে একটি অর্ধমলিন দশটাকার নোট বার করলেন বটুক-ভৈরব।

রাজেনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—"থাক, থাক, আপনাকে কিছু দিতে হবে না। দেখি আমি কি করতে পারি।"

মনে মনে কিন্তু ভাবনায় প'ড়ে গেল সে। অনেক টাকার মামলা।

"আপনি এখন এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করুন। আমি একটু বেরুচ্ছি।"

ছুটল সে অলকেন্দ্র মৌলির কাছে। এ অকুল-পাথারে ওই একমাত্র ভরসা। দরকার হ'লে সে ওর সব কবিতা শুনবে, যা থাকে কপালে।

দেড়শো টাকার উপর খরচ হলো। বটুক-ভৈরব তিনজনের খাবার একা খেলেন। যাবার সময় তিনি সু্যটটা দিয়ে গেলেন রাজেনকে। বললেন—"ওটা কেটে-ছেঁটে তোমার মাপের ক'রে নিও। খুব খুশী হলাম। বেঁচে থাকো। বাপের মুখ রেখেছো

তুমি। বাপ-কা বেটা হয়েছো—এই তো চাই। আমি গরীব মানুষ, সামান্য মানুষ কি আর আশীর্বাদ করবো তোমায়। দীর্ঘজীবি হও, রাজরাজেশ্বর হও। পুরুলিয়ায় কিন্তু যেও বাবা একবার। নিশ্চয় যেও। সেখানে প্রাণ ভ'রে খাওয়াবো তোমাকে। যেও, যেও—যাবে তো ?"

"যাবো।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় যেও। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো।"

"আচ্ছা। কোনও একটা ছুটিতে যাবো।

রাজেন বটুক-ভৈরবকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো। যাবার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং অশ্রুসজল-কণ্ঠে আবার অনুরোধ করলেন—"আমার ওখানে এসো একবার। এসো, নিশ্চয় এসো।"

রাজেন পুরুলিয়া গেল দশ বছর পরে। চাকরির চেষ্টায়। পুরুলিয়ার একজন নামজাদা উকিল তাকে ডেকেছিলেন, ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন ব'লে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতেই চাকরি।

রাজেন যে ট্রেনটায় যাচ্ছিলো সেটা পৌঁছোবার কথা সন্ধ্যা সাতটায় কিন্তু সামনের স্টেশনে একটা ইন্‌জিন ডিরেলড্ হয়ে গিয়েছিল বলে একটা স্টেশনে পাঁচঘণ্টা আট্‌কে থেকে গেল তার ট্রেনটা। পৌঁছলো রাত বারোটায়। রাজেন অবশ্য পেট ভ'রে খেয়ে নিয়েছিল। জিনিসপত্রও বিশেষ ছিল না সঙ্গে। রাতটা হয়তো সে স্টেশনে ওয়েটিংরুমেই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু তার মনে হলো উকিলবাবুটির বাসাতেই যাওয়া উচিত। সে যে ঠিক দিনে এসেছে এবং দেরিটা যে তার ইচ্ছাকৃত নয় এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। চাকরির ব্যাপার তো!

স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল বটুক-ভৈরবের সঙ্গে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি।

"আরে আরে—রাজেন যে! এতদিনে তোমার সময় হলো ? এসো, এসো—আমার দোকানে এসো। এই সামনেই আমার দোকান—ছি, ছি, বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছো।"

রাজেন স্টেশনের বাইরের মাঠে একটি সুসজ্জিত খাবারের দোকান দেখতে পেলে।

"চলো, বেশ পেট ভ'রে খাওয়াবো তোমাকে—"

"এখন আর খেতে পারবো না। একটু আগেই পেট ভ'রে খেয়েছি। কাল আসবো। এখন আমাকে একবার নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। বড় জরুরী দরকার—"

"একবার যাবে না দোকানে ?"

"এখন নয়। কাল আসবো।"

পরদিন সে গেল সেখানে। গিয়ে কিন্তু বটুক-ভৈরবকে দেখতে পেলে না। যেখানে দোকানটা দেখেছিল, সেখানে দেখলে ফাঁকা মাঠ। কিচ্ছু নেই।

একটু দূরে আর-একটা দোকান ছিল।

সেখানে গিয়ে রাজেন জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, বটুকবাবুর খাবারের দোকানটা কোথায় বলুন তো ?"

"সে দোকান তো পাঁচ বছর আগে উঠে গেছে। বটুকবাবুও মারা গেছেন।"

"কি যে বলেন! আমি কাল রাত্রে তাঁকে দেখেছি।"

দোকানদার মুচকি হেসে বললে—"ভুল দেখেছেন।"

আর-একটি লোক সেখানে বসেছিলেন। বুড়ো লোক। তিনি বললেন—"ভুল না-ও হতে পারে। আরও অনেক লোক দেখেছে বটুকবাবুকে! কোনও ট্রেন এলেই স্টেশনে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। যতীনবাবু দু'দিন দেখেছেন, রমেন একদিন দেখেছে, কালু দেখেছে। তুমি জানতে না খবরটা এতদিন?···পাঁচ বছর ধ'রে এই কাণ্ড!"

দোকানদারটি তখন বললে—"আমিও দেখেছি। ভদ্রলোক ভয় পাবেন বলে চেপে যাচ্ছিলুম।"

বুড়ো বললেন—"বটুক-ভৈরবের মুক্তি হয়নি। কোনও সাধ অপূর্ণ আছে হয়তো।"

পাখীদের মধ্যে

আমগাছের সবুজ পত্রপুঞ্জের মাঝখানে কালো মতো কি একটা যেন রয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। কি ওটা? একটু বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম কোকিল। একটা নয়, দুটো। একটা বড়, আর একটা ছোট। বড়টা ধাড়ি, ছোটটা বাচ্ছা। দুটোই পুরুষ, যদিও ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসে আছে দু'জনে। ব্যাপার কি? বিস্মিত হয়ে রইলাম।

কুক্, কুক্ কুক্—বড় কোকিলটা বললে।

ছোটটা নীরব।

কুক্ কুক্—আবার বললে বড়টা।

ছোট তবু নীরব।

এই রকম চলল মিনিট দশেক। মনে হ'ল বড়টা যেন ছোটটার কানে মন্ত্র দিচ্ছে। ছোটটা নীরব হ'য়ে আছে বটে কিন্তু শুনছে একাগ্র হ'য়ে।

কুক্ কুক্ কুক্—আবার শুরু হ'ল। আবার চলল খানিকক্ষণ। বাচ্ছাটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে গিয়ে বসল আর একটা ডালে। বড়টাও গিয়ে বসল তার পাশে। একেবারে ঘেঁষে। তারপর তার মুখের কাছে মুখ এনে আবার বলল—কুক্, কুক্। মনে হ'ল স্নেহ, অনুনয়, মিনতি যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল ওই ডাকে।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বাচ্ছাটা বলল—কুক্।

সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল ধাড়িটা—কুক্ কুক্ কুক্ কুহু, কুহু, কুহু, কুহু—।

মুখরিত হ'য়ে উঠল চারিদিক। একটা সাড়া পড়ে গেল।

আশপাশের গাছ থেকেও ডেকে উঠল অনেক কোকিল। ভাবটা যেন—এসেছে, এসেছে, এসেছে, এসেছে। আমাদের ডাক ডেকেছে।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে একটা কাক বসে আছে। করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোকিল বাচ্ছাটার দিকে। সে দৃষ্টির আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না

তাহা ভালো পেশোয়ারী চাল। ব্যঞ্জন সম্বন্ধেও বিলাসিতা কম নহে। মাছের ঝোল, ফ্রাই এবং অম্বল তাহার প্রত্যহ চাইই। এ সব ছাড়া দুই রকম ডাল ও নানারকম শাক্‌সব্‌জি। রাত্রে সামান্য পোলাও, একটি গোটা মুর্গির রোস্ট এবং একটি আপেল সিদ্ধ আহার করেন। চা-কফি সম্বন্ধেও তিনি খুব খুঁতখুঁতে। খুব উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া ব্যবহার করেন না। গ্রীষ্মকাল পড়িতে না পড়িতেই তাঁহাকে প্রতি বৎসর হয় দার্জিলিং না হয় সিমলা, না হয় মুসৌরি, না হয় রাণীক্ষেত যাইতে হয়। চৈত্র মাসের পর আর কলিকাতায় টিঁকিতে পারেন না।

সংক্ষেপে, তাঁহার জীবন যাপনের প্রণালীটি বেশ ব্যয়সাধ্য। চাকুরি করিতে হয় না, বড় ব্যবসা আছে। চট্টো-গঙ্গো নামক বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ইনি মালিক। কিন্তু তবু তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি বেশ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার মূলে আছে প্রেম।

গোড়া হইতে ব্যাপারটি খুলিয়া না বলিলে আপনাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে। তাই গোড়ার কথাটাই আগে বলি।

দুই

বহু পূর্বে বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক সঙ্গে এক কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাঁহাদের। এক মেসে এক ঘরে থাকিতেন, এক সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলা, ওঠা-বসা সব হইত। একজন আর একজনকে ছাড়িয়া বেশীক্ষণ কোথাও থাকিতে পারিতেন না। লম্বা ছুটির সময় দুই-জনেই বাড়িতে আধাআধি করিয়া অবকাশটা ভোগ করিতেন।

কলেজ জীবন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া যখন তাঁহারা কর্মজীবনে উত্তীর্ণ হইলেন তখন বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া উঠিল। বিনয়কুমার একটা কলেজে চাকুরি লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। মনীন্দ্রকুমার তখনও চাকরি জুটাইতে পারেন নাই, তিনিও বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মাস দুই পরে সেই কলেজের বার্ষিক উৎসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আসিলেন সভাপতিরূপে। তিনি যে বক্তৃতাটি দিলেন তাহার সার মর্ম, ব্যবসা না করিলে বাঙালীর বাঁচিবার আশা নাই! বলিলেন, এম-এ পাশ করিয়া স্বল্প বেতনে প্রফেসারি করা অপেক্ষা, অথবা বি-এল পাশ করিয়া কাছারির গাছতলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়ানো অপেক্ষা, বিড়ির দোকান করাও তিনি অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করেন। বলিলেন, বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি আছে, সে যদি তাহার সহিত চরিত্রবল যুক্ত করিতে পারে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সে অজেয় হইবে। অল্প মূলধনে কত রকম ব্যবসা করা সম্ভব তাহারও আভাস দিলেন তিনি। পরিশেষে বলিলেন, ব্যবসায়ে আসল মূলধন টাকা নয়, আসল মূলধন চরিত্র।

ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে মনীন্দ্রকুমারের এক নিঃসন্তান মাতুল মারা গিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রকুমার হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়া গেলেন। তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন গোলামী না করিয়া ব্যবসাই করা যাক। দুইজনে এক

সঙ্গে থাকাও যাইবে, রোজগারও করা যাইবে। বিনয় যদি মূলধনস্বরূপ কিছু না-ও দিতে পারেন ক্ষতি নাই। তাঁহার চরিত্র-মূলধন যদি তিনি ব্যবসায়ে পুরোপুরি নিয়োগ করেন তাহা হইলেই লাভের অর্ধাংশ তাঁহাকে দিতে মণীন্দ্রকুমার আপত্তি করিবেন না। এইভাবেই চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের প্রথম পত্তন হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিনয়কুমারও ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা মূলধনস্বরূপ দিয়াছিলেন।

কাপড়ের ব্যবসাই শুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা। আচার্য রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, ব্যবসায়টি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই বন্ধু বিবাহ করিয়াছিলেন। বিনয়কুমারের বিবাহ প্রথম হয়। মণীন্দ্রকুমার বিবাহ করেন বিনয়ের বিবাহের বছর চারেক পরে। স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল না বলিয়া তিনি বিলম্বে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিনয়কুমারের একটি পুত্র হয়, মণীন্দ্রকুমারের একটি কন্যা। দৈবাৎ এই যোগাযোগ হওয়াতে আর একটি সম্ভাবনার কথা তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। মণীন্দ্রকুমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে তাঁহার কন্যা দেবীর সহিত বিনয়ের পুত্র উন্মেষের বিবাহ দিবেন। বিনয়কুমারও সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিলেন ইহাতে। ইহা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়াবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, শেষকালে তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলেন যে তাঁহাদের এই শুভ বাসনাকে আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে! বাল্যবিবাহের বিরোধী বলিয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিলেন না কিন্তু উভয়ে মিলিয়া এমন একটি উইল করিবেন ঠিক করিলেন যাহাতে তাঁহাদের অবর্তমানেও তাঁহাদের পুত্রকন্যা তাঁহাদের এই সদিচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ঠিক হইল এমন উইল হইবে যে দেবী এবং উন্মেষ যদি আইনত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলেই তাহারা সমান ভাবে চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার লাভ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ অপরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ পাইবে না। উভয়েই যদি বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে উভয়েই বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। তখন বিষয়ের মালিক হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। ব্যবসায়লব্ধ অর্থ মিশনের কাজেই ব্যয়িত হইবে। ইহাদের উকিল রজনীভূষণ কানুনগো দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের উপর এতখানি জবরদস্তি করা ঠিক হবে না। তাদের খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তোমাদের বাবার নাম কি—"

বিনয়কুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।"

মণীন্দ্রকুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"আমার মতে যা হওয়া উচিত এবং সঙ্গত সেটা তাহলে লিখে দিচ্ছি দেখ—"

কানুনগো মহাশয় একটা কাগজে খস-খস করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন "শ্রীমতী দেবী গাঙ্গুলী যদি স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রীমান উন্মেষ চট্টোপাধ্যায়ও যদি স্বর্গীয় শ্রীনাথ গাঙ্গুলীর বংশের কোন কন্যাকে বিবাহ না করে তাহা হইলে বিষয়ের কোন অংশ পাইবে না। চট্টো-গঙ্গো প্রতিাঠান তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলিয়া যাইবে।"

বিনয় এবং মণীন্দ্র ইহাতে আপত্তির কিছু দেখিলেন না, কারণ তাঁহারা উভয়েই

পিতার এক পুত্র এবং তাঁহাদের পিতারাও তাঁহাদের পিতাদের এক পুত্র ছিলেন। সুতরাং এই উইল দ্বারা কার্যত দেবী এবং উন্মেষ আইনত আবদ্ধই থাকিবে।

কানুনগো মহাশয় তখন আইনের ভাষায় উক্ত উইলটি লিখিয়া ফেলিলেন এবং যথাসময়ে তাহা আইনত রেজেস্ট্রী হইয়া গেল। উইল করিবার এক বৎসর পরে মণীন্দ্রকুমার হঠাৎ মারা গেলেন। দেবীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর। মণীন্দ্রের আর কোন সন্তান হয় নাই। বিনয়কুমারেরও আর কোন সন্তান হয় নাই, কারণ উন্মেষকে প্রসব করিবার কিছুদিন পরেই উন্মেষের মা মারা যান। বিনয়কুমার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। নিজের পুত্র উন্মেষ এবং বন্ধুকন্যা দেবীকে ভালোভাবে মানুষ করিবার কাজে তিনি লাগিয়া পড়িলেন।

তিন

ষোল বৎসর পরে পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইল।

দেবী এম-এ পড়িতেছে, উন্মেষ এখানকার পড়া শেষ করিয়া লণ্ডনে গিয়াছে। বিনয়কুমার ব্যবসায়ের সুনিশ্চিত লাভ অনায়াসে ভোগ করিতে করিতে ঘোর বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু বিলাসে নয়, কোনও কোনও ব্যসনেও তাঁহার মতি গিয়াছে। ফাটকা খেলাতে, নানারূপ কাজে কোম্পানির শেয়ার কেনাতে, প্রচুর অর্থ নষ্ট করিয়াছেন তিনি। তাঁহার পুত্র উন্মেষও খরচ সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা আশঙ্কাজনক। চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের অডিটার কিছুদিন পূর্বে বিনয়কুমারকে জানাইয়াছেন ব্যবসায়ে তাঁহার লভ্যাংশের অতিরিক্ত টাকা তিনি প্রতি বৎসরই লইয়াছেন। তাঁহার ঋণের পরিমাণ এখন এত বেশী যে, তাঁহার অপর অংশীদার মনীন্দ্রকুমারের বিধবা পত্নী নীহারবালাই কার্যত ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। বিনয়কুমার এখন যাহা খরচ করিতেছেন তাহা নীহারবালার অংশ হইতেই ঋণস্বরূপ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। বিনয়কুমার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হইবারই কথা, কারণ খরচ করিবার সময় বোঝা যায় না, হিসাব করিবার পরই স্তম্ভিত হইতে হয়।

বিনয়কুমার আত্মসম্মানী লোক ছিলেন। বন্ধুর বিধবার নিকট তিনি প্রত্যহই ঋণী হইতেছেন ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মানে বড়ই আঘাত লাগিতে লাগিল। না-জানি নীহারবালা কি মনে করিতেছে এই চিন্তায় তাঁহার দুই রাত্রি ঘুম হইল না। শেষে ঠিক করিলেন একদিন তাঁহার সহিত এ বিষয়ে মুখোমুখি আলাপ করিবেন। উইলের কথাটাও তাঁহাকে বলিবেন। এতদিন উইলের কথা তিনি কাহাকেও জানান নাই। আজ যাইব কাল যাইব করিয়া কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নীহারবালা হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। নীহারবালার একমাত্র কন্যা দেবীই তখন বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া পড়িল।

বিনয়কুমার একদিন গিয়া তাহার নিকটেই উইলের কথাটি পাড়িবার চেষ্টা করিলেন।

দেবী বলিল, "আমি কাকাবাবু এখন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। উইল-টুইল নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। আমাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে—"

"এক মিনিট। উন্মেষকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে ?"

"উনু দা'কে ?"

হঠাৎ সে হাসিয়া ফেলিল।

"একথা জিজ্ঞেস করবার মানে ?"

"মানে আছে। উনুকে তুমি যদি বিয়ে করতে রাজী না হও, তাহলে মণির উইল অনুসারে তুমি চট্টো-গঙ্গোর কোন অংশ পাবে না।"

"কে পাবে তাহলে ?"

"উনু। সে যদি অবশ্য তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়—"

"আর সেও যদি না হয় ? হবেই এমন কোন কথা নেই, আমি তো দেখতে কালো। উনুদা আমাকে কি বলত জানেন ? তাড়কা। খুব সম্ভব সে রাজী হবে না। তাহলে কি হবে ?"

"সে-ও পাবে না কিছু। বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলে যাবে আমার মৃত্যুর পর।"

"যাক গে। ও নিয়ে অত ভাবছেন কেন এখন থেকে—"

"ভাবছি, কারণ আমার অংশের সব লাভ আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। এখন তোমার অংশ থেকে আমাকে টাকা নিতে হচ্ছে। বিবেকে বাধছে সেটা। তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হও তাহলে বাধবে না। আর মণির সেইটিই ইচ্ছে ছিল—"

"বেশ আমার আপত্তি নেই। উনুদার কি মত আছে ?"

"সেটা এখনও জানি না। তাকে চিঠি লিখেছি।"

চার

উন্মেষের উত্তর পাইয়া বিনয়কুমারের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। উন্মেষ লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। বিষয়ের লোভে আমি দেবীকে বিয়ে করতে পারব না। আমি লুসি নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। মেয়েটি খুব ভালো, দেখে আপনার নিশ্চয় পছন্দ হবে। তবে বিয়ের এখনও দেরী আছে। কারণ এর আগে তার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর বনছে না। ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবে ঠিক। তখন আমি তাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি বাড়ি ফিরে যাব। ডিভোর্সের ব্যাপার মিটে গেলে লুসিও আমার কাছে চলে যাবে

বলেছে। ভারতবর্ষেই বিয়ে হবে। আপনার সম্মতি ও আশীর্বাদের অপেক্ষায় রইলাম! আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত
উন্মেষ

উন্মেষের পত্র পাইয়া বিনয়কুমার কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। একটি কথাই বারবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—শেষে কি ওই মেয়েটার নিকটই তাঁহাকে সারা জীবন ঋণী হইয়া থাকিতে হইবে? উন্মেষ কাপড়ের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ শিখিতেই বিলাতে গিয়াছিল, যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু দেবীকে বিবাহ না করিলে ব্যবসায়ই তো তাহার থাকিবে না। সে অবশ্য অক্সফোর্ডের কি একটা পরীক্ষা দিতেছে। ফিরিয়া আসিলে কোথাও একটা চাকুরি পাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কি ওই লুসির সংসারে থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাদের উকিল রজনী ভূষণ কানুনগোকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন একটি। সব কথা খুলিয়া লিখিলেন। লিখিয়া মনে হইল বাহিরের লোককে পারিবারিক সব খবর জানানো কি ভালো? বিশেষতঃ নিজের অসংযত বিলাস-ব্যসনের কাহিনী কানুনগোকে জানাইয়া লাভ কি! কয়েকদিন মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, পত্রটি ড্রয়ারেই রাখিয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মনঃস্থির করিতেই হইল, ভাবিয়া দেখিলেন আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাপারে কানুনগো ছাড়া গতি নাই। জগদীশ চিঠিটি রেজেস্ট্রী করিয়া তাঁহার হাতে রসিদটি আনিয়া দিল। তিনি অধীর আগ্রহে কানুনগোর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঁচ

দেবীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়াছে সে। অপ্রত্যাশিত রকম ভালো। ঠিক করিয়াছে এইবার বেশ লম্বা একটা বেড়াইয়া আসিবে। কাশ্মীর যাইতে হইলে কোথায় কি করিতে হয় এইসব লইয়াই সে মাথা ঘামাইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন উন্মেষের খবরটা শুনিল। উন্মেষ নাকি দেশে ফিরিয়াছে এবং বিনয়কুমার নাকি তাহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। দূর করিয়া দিবার কারণ সে বিলাতী এক মেমসাহেবকে বিবাহ করিবে ঠিক করিয়াছে। খবরটা শুনিয়া সে মুচকি হাসিল একটু। সেই তাহা হইলে এখন চট্টো-গঙ্গার সম্পূর্ণ মালিক। তাহার পর সহসা উন্মেষের মুখখানা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। টকটকে ফরসা রং, সরু গোঁফ, জেদি-জেদি মুখের ভাব। বেশ অহঙ্কারী। এম-এস-সিতে ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পাইয়াছিল বলিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত! সে-ও এবার ফার্স্টক্লাস পাইয়া দেখাইয়া দিবে সে-ও কম নয়। শুধু ফার্স্টক্লাস নয়, সে হয়তো ফার্স্টই হইবে। উনুদা কোথায় আছে এখন? তাহার কাছে একবারও তো আসিতে পারিত! দুয়ারের কড়াটা খুব জোরে জোরে নাড়িয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল উনুদা আসিল নাকি। তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিয়া দেখিল, উনুদা নয়, পিওন। একটি চিঠি লইয়া আসিয়াছে, রেজেস্ট্রী

চিঠি, উইথ্ একনলেজ্মেণ্ট ডিউ। বিনয়কুমারের চিঠি! অবাক হইয়া গেল সে। রেজেস্ট্রী চিঠিতে কি লিখিয়াছেন কাকাবাবু? তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

"কল্যাণীয়াষু,

তুমি এ চিঠি পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক ভেবেও এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেলাম না। উন্মেষ বিলেত থেকে ফিরেছে। সে ঠিক করেছে এক মেমসাহেবকে বিয়ে করবে। তোমাকে বিয়ে করবে না। তাকে আমি বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিয়েছি। তোমার বাবা আর আমি দুজনে মিলে যে উইল করেছিলাম তার কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। পড়ে দেখলে বুঝতে পারবে আমার পিতা স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের যে কোনও লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমাদের বিষয়টা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে যাবে না। আমার ইচ্ছে নয়, যে প্রতিষ্ঠান আমরা দুই বন্ধুতে গড়ে তুলেছিলাম তা আমাদের পরিবারের বাইরে চলে যায়। উন্মেষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে সব দিক থেকেই সুখের হ'ত। কিন্তু সে কুলাঙ্গার, বংশের মান মর্যাদার কোন মূল্য নেই তার কাছে। আমাকে এখন কতদিন বেঁচে থাকতে হবে জানি না। অডিটারের হিসাব থেকে এটা বোঝা গেছে আমি যে পরিমাণ খরচ ক'রে ফেলেছি তাতে কার্যতঃ এখন তোমার কৃপার ভিখারী হয়েই আমাকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে। খুব হিসেব করে দীনভাবে থাকলে হয়তো শেষ জীবনে আমার ঋণটা শোধ হ'তে পারে। কিন্তু এ বয়সে আমার জীবনের ধারা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যে সব বিলাসে আমি এতদিন অভ্যস্ত হয়েছি তা বর্জন করা আমার পক্ষে এখন খুবই শক্ত। এইসব নানাদিক ভেবে আমি আমাদের উকিল কানুনগো মশাইকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি আমাকে লিখেছেন—আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তাই আমি এই পত্র দ্বারা তোমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করছি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলেও বে-আইনী নয়। তুমি যদি রাজী হও তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। এটাও মনে রেখ রাজী না হলে বিষয়ে তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না।

ব্যাপারটা ভালো ক'রে ভেবে আমাকে একটা উত্তর যত শীঘ্র সম্ভব দিও। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—"

দিন সাতেক পরে বিনয়কুমার দেবীর উত্তর পাইলেন। দেবী লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আপনি যা লিখেছেন তাতে রাজী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আপনি যে সমস্যার কথা লিখেছেন তা আমি অন্যভাবে সমাধান করে দিলাম। সমস্ত বিষয়টা আপনাকেই দান করে দিচ্ছি। ডীড্ অফ্ গিফ্ট্ রেজেস্ট্রী ক'রে পাঠালাম। উনুদাকে বিয়ে করতে আমি রাজী ছিলাম, এখনও আছি সুতরাং ভবিষ্যতে আমিই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী উইল অনুসারে। আমার সেই উত্তরাধিকারের সমস্ত স্বত্ব আপনাকে দান ক'রে দিলাম। আমার বাড়িটা আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওটার যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণতা
দেবী

ছয়

দুই বৎসর পরে বিনয়কুমার দেবীর নিকট হইতে আর একটি পত্র পাইলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আশা করি আপনি ভালো আছেন। একটি সুখবর দেবার জন্যে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখানকার কলেজে প্রফেসারি নিয়ে এসেছিলাম। দিনকতক পরে উনুদা-ও এই কলেজে এসে হাজির হলেন ফিজিক্সের প্রফেসার হ'য়ে। লুসির সঙ্গে উনুদার বিয়ে হয়নি। কারণ তার স্বামীর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, ডিভোর্স হয়নি। মাস ছয়েক আগে উনুদা আমাকে কি বললে জানেন? 'দেখ দেবী তোমাকে আমি ঠিক বিয়ে করতুম, কিন্তু বিষয়ের লোভে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে হবে এইটে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। লুসি মেয়েটাকেও ভালো লেগেছিল তখন। তাই তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি। এখন আর তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার মুখ নেই আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে পেলে জীবনে আমি সুখী হতাম।' কি কাণ্ড দেখুন! আমি প্রথমে কিছুতেই রাজী হইনি। কিন্তু ও কি রকম জেদি ছেলে তা জানেন তো? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোজই ওই এক কথা বলতে লাগল। শেষটা আমি রাজী হয়ে গেলুম। মাস তিনেক আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। নদীর ধারে যে বাংলোটা আমরা ভাড়া করেছি সেটা চমৎকার। আপনি একবার এসে বেড়িয়ে যাবেন? আপনার আসবার খবর পেলে দোতলার ফ্ল্যাটটা আপনার জন্যে ঠিক করিয়ে রাখব। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণতা
দেবী

তবে কি?

হরিসেবক আর বিলাসকুমার বাল্যকাল থেকেই নিবিড় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। ছেলেবেলায় পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছিল, স্কুলেও একসঙ্গে ছিল কিছুদিন। তারপর দুজনে দু'জায়গায় কলেজে পড়ে। হরিসেবক কাশীতে আর বিলাসকুমার হাজারিবাগে। কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন স্থানে। হরিসেবক একটি কলেজের অধ্যাপক, বিলাস একটি আপিসের কেরাণী। বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দুজনের মধ্যে আরও অনেক পার্থক্য আছে। হরিসেবক ধার্মিক প্রকৃতির লোক, বেশ গোঁড়াই বলা চলে। এযুগেও ত্রিসন্ধ্যা করে, জাতিভেদ মানে বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আঙুলে অষ্ট ধাতুর আংটি আছে। বিলাস বিপরীত প্রকৃতির। একটু বিলাসী গোছের। মাথার চুলটি সুবিন্যস্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিমছাম। চেহারাটিও সুন্দর। বেহালা বাজাবার শখ আছে।

হরিসেবক সকাল সন্ধ্যা পুজো করে, বিলাস বেহালা বাজায়। সাহিত্য, সিনেমা এসব শখও আছে। ভগবান বা দেবদেবী নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না কখনও।

এত অমিল সত্ত্বেও কিন্তু দুজনের ভাব খুব।

একবার পুজোর সময় হরিসেবক বিলাসকে লিখল—"এবার পুজোটা মান্দার পাহাড়ে কাটাব ঠিক করেছি। তুমি তো দুমকায় আছ, দুমকা মান্দার থেকে বেশী দূরে নয়। যদি দু'চার দিনের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে যাও বড় আনন্দের হবে। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না···"

বিলাস সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

এসে দেখল হরিসেবক কেবল বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে মান্দারে আসেনি। তার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। হরিসেবকের মেয়ে দীপু (দীপালি) কিছুদিন থেকে মূর্ছা রোগে ভুগছে। ডাক্তারি কবিরাজী কোন রকম চিকিৎসাতেই কোন রকম ফল হয়নি। হরিসেবক শেষে দৈব করেছিল। অনেক জায়গা থেকে মাদুলী আনিয়ে পরিয়েছিল, অনেক জায়গার পাদোদক আনিয়ে খাইয়েছিল, তবু কিছু হচ্ছিল না। এমন সময় সে একদিন স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্নে কে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ এসে যেন হরিসেবককে বলছে তুমি আগামী লক্ষ্মী পূর্ণিমা রাত্রিতে মান্দার পাহাড়ে যেও। সেখানে মধুসূদন আছেন। তিনি সেদিন একটি সভ্য লোককে তাঁর অভীষ্ট বর দেবেন। হরিসেবক সেইজন্যেই এখানে এসেছে। ঠিক করেছে পূর্ণিমা রাত্রে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে যাবে। বিলাসকে দেখে হরিসেবক উল্লসিত হ'য়ে উঠল। সব কথা তাকে খুলে বলল।

"তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

বিলাস বিস্মিত হ'ল।

"আমি! আমি গিয়ে কি করব। ওসব দেব-দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই ভাই। তা ছাড়া ওসব ব্যাপার একা একা করাই ভালো। কি জানি মধুসূদন হয়তো আমার মতো লোকের সামনে আবির্ভূতই হবেন না।"

"কিন্তু একা একা রাত্রে ওই পাহাড়ে উঠতে ভয় করে। শুনেছি ওখানে বাঘ-টাঘ বেরোয়। আচ্ছা, তুমি না যাও পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি খুব উঁচুদরের সাধকও একজন। রোজ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে পুজো করেন। তাঁকে বললে তিনি আপত্তি করবেন না।"

"তুমি সঙ্গে লোক জোটাতে চাইছ কেন? এ সব জিনিস একা একা করাই ভালো—"

"কিন্তু ওই যে একটা শর্ত আছে—সভ্য লোককেই মধুসূদন অভীষ্ট জিনিসটি দেবেন। মধুসূদনের বিচারে আমি যদি ঠিক সভ্য না হই তাহলে তো আর পাব না। তাই আরও দু'একজন শিক্ষিত লোককে নিয়ে যেতে চাই। আমাকে না দিলে তাঁকে দিতে পারেন হয়তো—"

"তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ কোন ভরসায়? আমি ম্লেচ্ছ লোক, অশাস্ত্রীয় ভোজন করি, মাঝে মাঝে মদ-টদও খেয়েছি। আমি সঙ্গে থাকলে তো মধুসূদন তোমার ত্রিসীমানায় আসবেন না।"

"বেশ আমি পণ্ডিতজীকেই নিয়ে যাব—"

দুই

লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রি। চারিদিকে স্বপ্নের পাথার। হরিসেবক আর পণ্ডিতজী অনেকক্ষণ আগে মান্দার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। বিলাস বাড়ির বাইরে একা চুপ ক'রে বসেছিল। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। হঠাৎ বিলাসের মনে হ'ল—আমিও পাহাড়টায় ঘুরে আসি একটু। এই জ্যোৎস্না রাত্রি পাহাড় থেকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছে। দেখে আসি।

নিজে বেহালাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সত্যই স্বপ্নের পাথার চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরে বিলাসও স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল সে যেন কোন অজানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যে মান্দারকে সে দিনের আলোয় দেখেছে এ যেন সে মান্দার নয়। এ যেন একটা নূতন আবির্ভাব। সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ অত্যন্ত পরিচিত। যে স্বপ্ন মনের গহনতম প্রদেশে সুপ্ত ছিল তা যেন সহসা রূপ নিয়েছে আজ রাত্রে।

...বিলাস পাহাড়ে উঠছিল। এর আগে সে উঁচু পাহাড়ে ওঠেনি কখনও। পাহাড়ে ওঠবার রাস্তাও তার জানা ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে হোঁচট খেতে খেতে তবু সে উঠেছিল। পাহাড়ের উপর থেকে এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি কেমন দেখায় এই আগ্রহ তাকে পেয়ে বসেছিল যেন। আরও ওপরে চল, আরও আরও...। অনেক দূর ওপরে উঠে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার ম'নে হতে লাগল শব্দহীন একটা মন্ত্রই যেন অপার্থিব সৌন্দর্যে রূপায়িত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এও যেন সে সহসা আবিষ্কার করল এই মন্ত্রের সাধনাই তো সে করেছে সারাজীবন ধরে অজ্ঞাতসারে, আজ সত্যটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার কাছে। অনাবিল এই সৌন্দর্যের দিকে নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। বারবার তার মনে হ'তে লাগল, ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম।

...কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো পড়েছিল—মসৃণ, সমতল এবং প্রকাণ্ড। অনেকটা চৌকির মতো। তার উপর বসে বেহালা বাজাতে লাগল বিলাস। সুরে আর সৌন্দর্যে সত্যই স্বর্গলোক মূর্ত হয়ে উঠল।

...কতক্ষণ কেটেছিল তা খেয়াল ছিল না বিলাসের। হঠাৎ তার মনে হ'ল তার বেহালার সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে কে যেন। বিলাস বেহালা থামিয়ে বাঁশী শুনতে লাগল। অপূর্ব সুর, দরবারী কানাড়ার এমন অপূর্ব আলাপ আর কখনও শোনেনি সে। বিলাস উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল, কাছেই একটু নীচে আর একটি চাতালের উপর বসে একটি কিশোর বাঁশী বাজাচ্ছে। আস্তে আস্তে নেমে গেল বিলাস। কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। বিলাসের মনে হ'ল কোন সাঁওতালের ছেলে বুঝি। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, তার উপর একটি ময়ূরের পালক গোঁজা।

"খুব চমৎকার বাঁশী বাজাও তো তুমি—বাঃ।"

"আপনার বেহালাও চমৎকার। আপনার বেহালা শুনেই আমি বাঁশী নিয়ে বেরুলাম—"

"তুমি এখানেই থাক?"

"হ্যাঁ। আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"এমনিই বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে যা পেলাম তা পাব আশা করিনি।"

"কি এমন পেলেন—"

"পেলাম না ? এই জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ দেখলাম, তোমার বাঁশী শুনলাম—"

"এখানে অনেকে মধুসূদনের কাছে বর প্রার্থনা করতে আসেন। আপনার তেমন কোন প্রার্থনা নেই ?"

"প্রার্থনা না করেই যা পেলাম তাই তো আমার আশাতীত। আর কি চাইব !"

মুচকি হেসে ছেলেটি বললে, "আচ্ছা তাহলে যাই এখন—"

তরতর ক'রে ছেলেটি নেমে যেতে লাগল। বিলাসের মনে হ'ল তার অন্তরতম প্রিয়জন যেন চলে যাচ্ছে।

"শোন শোন, তোমার পরিচয়ই তো নেওয়া হ'ল না। কি নাম তোমার ?"

ছেলেটি কিছু বলল না, ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে।

তিন

হরিসেবক ও পণ্ডিতজীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। হরিসেবক সমস্ত রাত ভাগবত পাঠ করেছিলেন, পণ্ডিতজী উপনিষদ। তাঁরা কোন প্রত্যাদেশ পাননি, কোন ওষুধও পাননি। হতাশ হয়েই ফিরেছিলেন তাঁরা। বিলাসের ছুটিও ফুরিয়ে গেল, সে আবার ফিরে গেল দুমকায়। মাস কয়েক পরে সে হরিসেবকের চিঠি পেল একটি।

ভাই বিলাস,

আশা করি ভাল আছ। গত লক্ষ্মী পূর্ণিমায় আমি পণ্ডিতজীকে নিয়ে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে গিয়েছিলাম, তা তো তুমি জানই। তখন কোন প্রত্যাদেশ বা ওষুধ পাইনি যদিও, কিন্তু তারপর থেকে দীপু ভাল আছে, আর একদিনও মূর্ছা হয়নি। মাঝে মাঝে খবর দিও। ভালবাসা জেন। ইতি

তোমারই
হরিসেবক

চিঠিটা পেয়ে বিলাস একটু বিস্মিত হ'ল। দিন কতক আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত মান্দার পাহাড়ে সে যেন বসে আছে কার প্রত্যাশায়। হঠাৎ একটা পাথরের পিছন থেকে সেই শ্যামবর্ণ কিশোরটি এসে দাঁড়াল। মুচকি মুচকি হাসছে, হাতে বাঁশি। বিলাসের দিকে চেয়ে যেন বললে, "সেদিন আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলা হয়নি। আমার নাম মধুসূদন।"

হরিসেবকের চিঠিটার দিকে চেয়ে বিলাসের মনে হ'ল তবে কি—? এর বেশী আর সে ভাবতে পারলে না। সেই শ্যামবর্ণ কিশোর ছেলেটির ছবি তার মানসপটে ফুটে উঠল কেবল। মাথার চুল চূড়া ক'রে বাঁধা, তাতে গোঁজা রয়েছে একটি ময়ূরের পালক। হাতে বেণু, মুখে হাসি।

দেওয়াল

টেলিফোনটা বেজে উঠল। বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল শোভনলাল। তার ধারণা হয়েছিল টেলিফোনটাও খারাপ হয়ে গেছে। সে মাঠে বসে ছিল। মাঠ থেকেই শুনতে পাচ্ছিল টেলিফোনটা বাজছে। কে এ সময় টেলিফোন করছে? তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, ঘরের ভিতর ঢুকতে ভয়ও করছিল। এ সময় কে টেলিফোন করতে পারে? তাকে টেলিফোন করবার মতো কে-ই বা আছে এ শহরে। সুজাতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইবার লোভেই সে অনেক খরচ ক'রে ফোনটা নিয়েছে। ওই ফোনেই সুজাতার সঙ্গে সামান্য যা একটু যোগাযোগ হয় ক্বচিৎ। তা-ও সুজাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও কথা বলে না। সুশোভন ফোন করলে তবে এসে ফোনটা ধরে। যখন কথা বলে, তখন পাশে নাকি তার মা দাঁড়িয়ে থাকে। তবু তার কথা শোনা যায় তো।

এইটুকুই শোভনলালের তৃপ্তি। সুজাতার জন্যেই এই বিহারে এসে পড়ে আছে সে। সুজাতার কাছাকাছি আছে এই সান্ত্বনা।

···ফোনটা বেজেই চলেছে।

হঠাৎ শোভনলালের মনে হ'ল সুজাতা ফোন করছে না কি? কিন্তু সুজাতা নিজের থেকে কখনও ফোন করে না। তাছাড়া সে তো এখানে নেই, কাল মুঙ্গেরে গেছে। ফিরেছে কি এর মধ্যে? বলেছিল সাত আট দিন পরে ফিরবে। হয়তো ফিরেছে।

শোভনলাল মাঠ থেকে উঠে ভিতরে গেল। ভিতরে যেতেই থেমে গেল ফোনটা। তবু তুলে নিল সে রিসিভারটা।

'হ্যালো—কে—'

কোন সাড়া নেই।

'হ্যালো—হ্যালো—'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার মাঠে এসে বসল।

সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল। ছেলেবেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে আলাপ। বাল্যকালে একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। তারপর সে কলেজে পড়বার জন্যে কোলকাতা চলে গেল। সুজাতাকে চিঠি লিখত সেখান থেকে। সুজাতা কি সে চিঠিগুলি রেখে দিয়েছে এখনও? ফোনে একদিন বলেছিল পুড়িয়ে দিয়েছি। সুজাতার কয়েকখানা চিঠিও তার কাছে আছে। অতি সংযত সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যেই, ওই সহজ অনাড়ম্বর কথাগুলোর মধ্যেই শোভনলাল নূতন মানে খুঁজে পেত। সে কখনও লিখত না 'আমি ভাল আছি'। লিখত, 'আমার শরীরটা ভাল আছে'। এর মধ্যে অনেক নিগূঢ় ইঙ্গিত পেত শোভনলাল। 'শরীরটা ভাল আছে' মানেই মনটা ভাল নেই, মন কেমন করছে। একথা তো খোলাখুলি লেখা যায় না। লিখত, 'আপনি কোলকাতার কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে আনন্দেই আছেন নিশ্চয়'। কখনও লেখেনি, 'আমাকে বোধহয় ভুলে গেছেন।' ওটুকু উহ্য থাকত, কিন্তু তা বুঝতে শোভনলালের অসুবিধা হ'ত না।

সুজাতার অনুক্ত কথাগুলিই বেশী অর্থ বহন করত শোভনলালের কাছে। শোভনলালের মনে হ'ত যেটুকু ও বলেনি সেটুকু যেন আরও ভাল ক'রে বলা হয়েছে। বললে, সব ফুরিয়ে যেত। না বলাতে অসীম অনন্তের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে সেটা। সীমা নেই, শেষ নেই। সুজাতার ছোট ছোট চিঠিগুলো কতবার যে পড়েছে শোভনলাল তার ঠিক নেই। প্রতিবারেই নূতন একটা অর্থ আবিষ্কার করেছে। একটা চিঠিতে লিখেছিল— 'পড়াশোনার কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না আশা করি'। এর মধ্যে যে নীরব ব্যঙ্গটা ছিল তা খুব উপভোগ করেছিল শোভনলাল। সুজাতার চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে গেল শোভনলাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত ঝনাৎকার, আকাশের কালো কালো মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু একটা তারা, স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ওই বিরাট বটগাছটা, সব যেন সুজাতা-ময় হয়ে উঠল। শোভনলালের মনে হতে লাগল— এই যে অন্ধকার এ তো সুজাতারই জীবনব্যাপী অন্ধকারের মতো। এই অশ্রান্ত ঝিল্লীর ঝঙ্কার—এ তো আমরা রোজই শুনি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আকূতি অনুভব করি কি? সমস্ত অন্ধকারকে যে বাণী স্পন্দিত করছে তার মর্মন্তুদ মর্ম কি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি? সুজাতাকে কি আমরা বুঝেছি? মেঘের মাঝে মাঝে দু' একটি উজ্জ্বল তারার মতো তার ক্বচিৎ-দীপ্ত আনন্দ-প্রকাশকে কি আমরা মূল্য দিতে পেরেছি? ওই ঘনীভূত অন্ধকারের ভিতর যে একটা প্রাণবন্ত বটগাছ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যার শিরায়-উপশিরায় প্রাণ-প্রবাহ, যার পাতায় কিশলয়ে আনন্দের উন্মুখতা, যার নীরব সত্তার প্রচ্ছন্ন উৎসবের সমারোহ তাকে আমরা চিনেছি কি? চিনিনি। সুজাতাকেও চিনিনি। সুজাতা একবার বলেছিল, 'আমাদের স্বাধীনতা কাগজে কলমে। আমাদের চারিধারে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে, তার রংটা মাঝে মাঝে বদলেছে হয়তো, কিন্তু দেওয়ালটা ভাঙেনি। তা আগেকার মতোই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে আছে।' সুজাতার মা মারা যাওয়াতে প্রাচীরটা আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। সুজাতার মা শোভনলালকে ভালবাসতেন। তাঁকে বললে, তিনি হয়তো রাজী হতেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণে বিয়ে তো আজকাল কত হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে বলবারই সুযোগ পায়নি শোভনলাল। হঠাৎ মারা গেলেন তিনি হার্টফেল ক'রে। তারপর সুজাতার বাবা বদলি হয়ে এলেন বিহারে। শোভনলালও চেষ্টাচরিত্র ক'রে বিহারে এল। কারণ সুজাতার কাছ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। কোলকাতাতেও বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতে হ'ত এখানেও বাড়ি ভাড়া করেছে। এখানে বাড়ি ভাড়া কম। বেশী হলেও শোভনলাল আসত। আসার কোন বাধা নেই, কারণ কোনও বন্ধনই নেই তার। বাপ মা ভাই-বোন তো নেই-ই, পেশা বা চাকরির বন্ধনও নেই। সে কবি, লেখক। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে অকুল পাথারে পড়ত। কিন্তু পড়েনি। সুজাতার বাবা বিহারে আসবার ছ' মাস পরে শোভনলাল এসেছিল। এসেই গিয়েছিল সে সুজাতাদের বাড়ি। গিয়ে দেখল সুজাতার বাবা বিয়ে করেছেন। আর বিয়ে করেছেন অমিতাকে। অমিতা শোভনলালের সহপাঠিনী ছিল। শুধু তাই নয়, তার প্রেমে পড়েছিল। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অমিতার লেখা অনেক চিঠি অনেক দিন সে রেখে দিয়েছিল সুজাতাকে দেখাবে বলে। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। পুড়িয়ে দিয়েছে চিঠিগুলো। সেই অমিতা যে সুজাতার সৎমা এবং অভিভাবিকা হয়ে দাঁড়াবে তা কে কল্পনা করেছিল! এখানে এসে প্রথমে যখন সে সুজাতার বাড়ি গিয়েছিল, তখন অমিতাকে দেখে চমকে উঠেছিল। অমিতাও উঠেছিল

নিশ্চয়। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করেনি। শোভনলালকে দেখে আধ-ঘোমটা দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। যেন চেনে না, যেন কখনও দেখেনি। শোভনলালও আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি সেখানে। সুজাতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা সে করেছিল পত্রযোগে। যে উত্তরটা এসেছিল, তা এখনও মনে আছে শোভনলালের—

প্রিয় শোভনলাল,

তুমি শিক্ষিত। তোমার নিকট এ পত্র প্রত্যাশা করি নাই। তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি, সুজাতাকে তুমি নিজের ভগ্নীর মতো দেখিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাছাড়া সুজাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি বৈদ্য। বৈদ্যরা নিজেদের আজকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমাজে এখনও তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সুজাতার মা, যদিও তাহার সৎমা, কিন্তু সে প্রকৃতই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সে এ বিবাহে কিছুতেই রাজী হইবে না। তাহাকে তোমার পত্র দেখাইয়াছিলাম, সে বলিল, যদি এ বিবাহ দাও আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। সুজাতার মা আর একটা কথাও বলিয়াছে। তোমার মনের ভাব যখন এইরূপ তখন তোমার আমাদের বাড়িতে না আসাই ভালো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীহরানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সত্যিই প্রাচীরটা দুর্লঙ্ঘ্য। অমিতা আসাতে আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। অমিতা যে কেন এত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়েছে তা শোভনলালের বুঝতে দেরি হয়নি। অমিতা যদি না থাকত তাহলে হরানন্দবাবুকে হয়তো শোভনলাল রাজী করাতে পারত। হরানন্দ-বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুঠির মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গাটায় শোভনলাল রোজ বেড়াতে যায়। ঝাউ-কুঠি একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি। খাপরায় ছাওয়া, বাংলো ধরনের। চারদিকে বড় বারান্দা, লম্বা লম্বা সিঁড়ির সারি। আর চারিদিকে প্রকাণ্ড হাতা। জায়গাটায় বড় ভালো লাগে শোভনলালের। রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় সেখানে। সুজাতাকে একদিন ফোনে সে বলেছিল 'আমার তো তোমার বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। তুমি একদিন কোন ছুতো ক'রে ঝাউ-কুঠিতে এস না, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।' সুজাতা আসতে রাজী হয়নি। তার দিন দুই পরে হরানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুঠির মাঠে। গভর্নমেণ্ট নাকি বাড়িটা কিনতে চান, গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তিনি বাড়িটা দেখতে এসেছিলেন।

'কি শোভন এখানেই আছ এখনও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কতদিন থাকবে?'

'বরাবরই থাকব।'

উত্তরটা শুনে একটু থমকে গেলেন হরানন্দবাবু।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মাথা ঠিক হলো?'

সবিনয়ে উত্তর দিয়েছিল শোভনলাল, 'আমার মাথা তো কখনও খারাপ হয়নি। যা আমি আপনাকে লিখেছিলাম তা বাজে কথা নয়। আমি সুজাতার জন্যে সারাজীবন

অপেক্ষা করব। আপনারা যদি সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতেন আমার উপর রাগ করতেন না।'

হরানন্দবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুজাতাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তার অমত নেই। যা যুগের হাওয়া তাতে আমিও শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজী হতুম, কিন্তু মুশকিল হয়েছে সুজাতার মাকে নিয়ে। তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা ওঁরই ডিক্‌টেশনে। ও বলেছে এ বিয়ে হলে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, না হয় গলায় দড়ি দেবে। এ অবস্থায় কি করি বল। অপেক্ষা কর, দেখা যাক যদি ওর মত বদলায়।'

শোভনলাল জানে মত বদলাবে না। আর এ ও জানে হরানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না।

······সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল শোভনলাল। হঠাৎ একবার তার মনে হ'ল পিছন দিকে কে এসে দাঁড়াল যেন। সে-ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, কেউ নেই। আবার বসল। হু হু ক'রে কনকনে হাওয়া বইছে। তবু বসে রইল সে। একটু পরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল। আবার উঠে দাঁড়াল শোভনলাল। টর্চ ফেলে ফেলে দেখল চারদিকে। কেউ নেই। কুকুরটা খানিকক্ষণ ডেকে থেমে গেল। তারপর ডাকতে লাগল পেঁচাগুলো। কর্কশকণ্ঠে কি একটা যেন বলতে চাইছে তারা, শোভনলাল বুঝতে পারল না। একটু পরে মনে হ'ল ওরা যেন বলছে—দেখছ না, দেখছ না, দেখছ না? কি দেখবে? অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলে সে ইজিচেয়ারটার উপর। কিন্তু তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দ সঞ্চরণে কার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে, চুলের মৃদু গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। আবার সব থেমে গেল। অসাড়ের মত পড়ে রইলো শোভনলাল।

·····ফোনটা বেজে উঠল আবার।

তাড়াতাড়ি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল শোভনলাল।

'হ্যালো, কে, সুজাতা? ও, সুজাতা—কি খবর?'

'আপনি একবার আসুন। এবার এলে দেখা হবে—'

কোন সুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে সুজাতার স্বর।

'তোমাদের বাড়িতে যাব?'

'না, ঝাউ-কুঠিতে। আপনি একদিন যেতে বলেছিলেন, তখন যেতে পারিনি। আজ এসেছি। আপনি আসুন—'

'এত রাত্রে ঝাউ কুঠিতে কি ক'রে গেলে—'

'আসুন, এলে বলব।'

ঝাউ-কুঠিতে গিয়ে শোভনলাল দেখল, সিঁড়ির উপর সুজাতা বসে আছে। একা। প্রথমে দেখতে পায়নি। টর্চ জ্বালবার পর দেখা গেল।

'সুজাতা?'

'হ্যাঁ। এইবার আমার চারদিকের দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি—আর কোন বাধা নেই।'

টর্চের আলোতে শোভনলাল দেখতে পেলে সুজাতার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে উঠেছে।

'মুক্তি পেয়েছ মানে ?'

'মুঙ্গেরে গিয়েছিলাম। একটু আগে মারা গেছি বাড়ি চাপা পড়ে। এখানে ভূমিকম্প হয়নি ?'

'হয়েছিল—'

'আপনি, তাহলে—'

'না, আমার কিছু হয়নি। আমি বেঁচে গেছি—'

'তাহলে তো আপনার দেওয়াল ভাঙেনি। আমরা তাহলে মিলব কি ক'রে ?'

হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সুজাতা। শোভনলাল ধরতে গেল, কিন্তু ধরা গেল না। সব হাওয়া, সুজাতা অশরীরী।

'আমরা তাহলে মিলব কি ক'রে ? আমার সব দেওয়াল তো ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু আপনার তো ভাঙেনি। মিলব কি করে—'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুজাতা।

'তুমিই বল কি ক'রে মিলব। তুমিই আমাকে বলে দাও সুজাতা—'

'ওই যে। লাফিয়ে পড়ুন ওর মধ্যে। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল—'

সুজাতা আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড বড় সেকেলে ইঁদারাটা দেখিয়ে দিলে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শোভনলাল।

'আসুন—'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সুজাতা ইঁদারাটার দিকে। শোভনলালও অনুসরণ করতে লাগল তাকে যন্ত্রচালিতবৎ।

ইঁদারার ধারে এসে সুজাতা বললে, 'লাফিয়ে পড়ুন। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল, দূর ক'রে দিন সব বাধা—'

শোভনলাল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে পড়ল।

পালানো যায় না

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-শ্বাসে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। শাখা-প্রশাখাময় একটা বিদ্যুৎ আকাশকে দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে দেবার পরই প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বজ্রপাত হ'ল তারপর আবার সব চুপচাপ। তারপরই সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে ঝড় এল। কামানগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল যেন। সোনাটুপি গ্রামের প্রান্তে যে অরণ্যটা আছে তার গাছগুলো হাহাকার করতে লাগল। অরণ্যের পাশেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুটো শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাক বক উড়তে লাগল বিভ্রান্ত হয়ে। তারপর বৃষ্টি নামল। বেশ মুষল-ধারে। ঝড়-বৃষ্টি দুটোই সমানে চলতে লাগল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল ক্রমশঃ। গাছের ডালপালা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাঠে। মনে হ'ল মৃত সৈনিকের দল আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন। ঝড়-বৃষ্টি আর অরণ্য মিলে শব্দেরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল একটা। কখনও মনে হচ্ছিল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কাঁদছে।

আর্তনাদের সঙ্গে খিকখিক হাসি, হাসির সঙ্গে হাততালি, হাততালির সঙ্গে ডম্বরু নিনাদ যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা আতঙ্কজনক। এতক্ষণ কোনও মানুষ দেখা যায়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল। বনোয়ারী বেরুল জঙ্গল থেকে। ছুটে বেরুল। যেন পালাচ্ছে অদ্ভুত তার চেহারা। মুখময় গোঁফ-দাড়ি। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। কাঁধে প্রকাণ্ড বোঁচকা। হাতে ব্যাগ। ফুল প্যাণ্টের উপর লম্বা ঝোলা কোট পরেছে একটা, পায়ে বুট জুতো। মাঠের মধ্যে পড়ে সে ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইতে লাগল। তার পিছনে কেউ ছুটছিল না, কিন্তু বনোয়ারির ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, তার যেন আশঙ্কা হচ্ছে কেউ তাড়া ক'রে আসছে তাকে পিছু পিছু। মাঠের অপরপ্রান্তে ঘর ছিল একটা। পোড়া বাড়ি। বনোয়ারি সেইদিকে দৌড়োতে লাগল।

···পোড়ো-বাড়িটা নীলকুঠি ছিল এককালে। এখন ওটা স্থানীয় জমিদারের সম্পত্তি। জমিদার কলিকাতায় থাকেন, সুতরাং বাড়িটা পোড়ো-বাড়িই হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের বাড়ি, রেকতার গাঁথুনি, একেবারে পড়ে যায়নি। দেওয়ালগুলো খাড়া আছে। কপাট-জানালাগুলোও আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের কপাট-জানালা চোরে খুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তর দিকের ঘরটা, দক্ষিণদিকের ঘাট আর পূর্বদিকের ঘরটা ঠিক আছে। পূর্বদিকের ঘরটাই বড়। হলের মতো, তার সামনে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার উত্তরে আর দক্ষিণে ঘর।

বনোয়ারী ছুটতে ছুটতে এসে পূর্বদিকের ঘরের সামনে চওড়া বারান্দাতে উঠে হাঁপাতে লাগল। আর একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল পূর্বদিকের বড় ঘরটাতে। ঢুকেই ঘরের কপাট বন্ধ ক'রে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝড় বৃষ্টির তুমুল গর্জন হচ্ছিল, কিন্তু বনোয়ারি তা শুনেছিল না, সে শোনবার চেষ্টা করছিল, কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। গত সাত দিন ধরে সে ওই পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সোনাটুপির জঙ্গলে ঢোকবার পর আর সে শব্দটা শুনতে পায়নি। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে ছপছপ শব্দ শুনেছিল। নির্ঘাত শুনেছিল, তার ভুল হয়নি। কিন্তু একবার মাত্রই শুনেছিল, আর শোনেনি। সে আশা করবার চেষ্টা করছিল, তবে কি হাড়-গিলা তাকে রেহাই দিলে ?

খুট খুট ক'রে শব্দ হ'ল বারান্দায়। চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলো বনোয়ারি, তার শরীরের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল! কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঝড় জলের দাপাদাপি, আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল বনোয়ারি, ছরছর ক'রে পড়ছে বারান্দায়, আর কোন শব্দ নেই। ছাগলের ডাকের মতো ওটা কি শোনা যাচ্ছে? এই ঝড়ে বৃষ্টিতে কারো ছাগল মাঠে বেরিয়ে পড়েছে নাকি! কিন্তু একটা ছাগল তো নয়। অনেক ছাগলের ডাক। তারপর বনোয়ারি বুঝতে পারল ব্যাং ডাকছে! আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর তার মনে হ'ল সমস্ত রাত তো কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

ভিতরে ঢুকে সে পিঠের বোঁচকা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম ক'রে খুলে গেল কপাটটা আর ছপ ছপ ছপ ছপ শব্দও হ'ল একটা বাইরে। বনোয়ারি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলে আবার। আবার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাড়গিলার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার মনে। ওর আসল নাম দনদন্। ভাল নাম ছিল দনুজারি। কিন্তু তার চেহারার জন্যে সবাই ওকে হাড়গিলা বলে ডাকত। হাড়গিলার মতোই দেখতে। লম্বা লিক্‌লিকে, কোমরের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরলরেখায় নয়। দুবার বেঁকেছে। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা বাঁক, হঠাৎ মনে হয় কুঁজো (এই বাঁকটার উপরেই ছুরি মেরেছিল বনোয়ারি), আর দ্বিতীয় বাঁকটা ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু এ বাঁকটা উল্টো রকম। লম্বাঘাড়টা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে আর গলার দিকটা বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে। মনে হয় কেউ যেন ওর ঘাড়ে লাথি মেরে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে গলাটা। গলাটা অসম্ভব লম্বাও। সাঁকিটাও বেশ উঁচু। খাঁড়ার মতো নাকের সঙ্গে সেটা যেন পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, ঠিক ফরসা নয়, হলদে। কপাল উঁচু, চোখ দুটো কটা, মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভুরু নেই। চোখ মুখে কেমন যেন একটা বকের ভাব। এরকম লোক যে কি ক'রে ঝুমকোর মতো মেয়েকে পটাতে পেরেছিল, তা বনোয়ারি বুঝতে পারেনি। হাড়গিলা অবশ্য ঝুমকোর প্রেমে পড়েনি, সে ঝুমকোর সঙ্গে ভাব করেছিল তার গয়না আর গিনিগুলো হাতাবার জন্যে, কিন্তু ঝুমকো তো পড়েছিল। তা না পড়লে ভিতরের অত খবর কি হাড়গিলা জানতে পারত? সে কোন বাক্সে গিনিগুলো রাখত, আলমারির কোনখানটায় তার গয়নাগুলো আছে সব কি বলত হাড়গিলাকে? ভাল না বাসলে বলত না। হাড়গিলাই বনোয়ারিকে নিয়ে গিয়েছিল ঝুমকোর কাছে। একা তো অতবড় জোয়ান মেয়েকে খুন করা যায় না, একজন সহকারী চাই। আর হাড়গিলা ছোরাছুরি বা গোলাগুলির পক্ষপাতি ছিল না। সে বলত ও সব বড় গোলমেলে জিনিস, ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। তার চেয়ে টুঁটি টিপে শেষ ক'রে দেওয়াই নিরাপদ। বনোয়ারি জাপটে ধরেছিল ঝুমকোকে, আর হাড়গিলে টুঁটি টিপেছিল··· বনোয়ারির চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। বারান্দায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল—ঠিক এমনি শব্দ ঝুমকোর গলা থেকেও বেরিয়েছিল।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে টর্চ আছে। তার ঝোলার মধ্যে লণ্ঠনও আছে একটা। টর্চটা ভিতরের পকেটে ছিল। খুব বেশী ভেজেনি। জ্বালা গেল। জ্বেলেই নিশ্চিন্ত হ'ল বনোয়ারি। কপাটে খিল ছিটকিনি দুই আছে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলে দুটোই। তারপর ঝোলাটার ভিতর থেকে লণ্ঠনটা বার করল। আলাদা একটা বোতলে কেরোসিন তেলও ছিল। গত পনেরা দিন থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কত অজানা জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে, আরও কত রাত কাটাতে হবে তার ঠিক নেই, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি, বিশেষ করে লণ্ঠন আর কেরোসিন তেল, টর্চ দেশলাই আর মোমবাতি সে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। কপাট বন্ধ ক'রে সে লণ্ঠন, তেলের শিশি বার করলে, টর্চের আলো জ্বেলে। দেশলাইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরী হ'ল। নানাবিধ কাপড়-জামার জটিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল। সব বার ক'রে ফেললে সে বোঁচকাটা থেকে। অনেক রকম কাপড় জামা ছিল। প্যাণ্ট, হাফ-প্যাণ্ট, ঝোলা-পাজামা, ধুতি, শার্ট, কোট, হাওয়াই-শার্ট হরেক রকমের, রঙ্গীন চশমা দু'তিন জোড়া। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে গিয়েছিল। বনোয়ারি ক্রমাগত পোষাক বদলে বদলে বেড়াচ্ছিল। তার ধারণা হয়েছিল পুলিশ তো বটেই হাড়গিলার প্রেতাত্মাও পোশাক বদল করলে বোধহয় তাকে চিনতে পারবে না। যদিও সে বারবার নিজের সঙ্গে তর্ক

করছিল যে ভূতটুত সব কুসংস্কার, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না, কিন্তু তবু সে সাবধানতা অবলম্বন করতে ছাড়েনি। তার্কিক বনোয়ারির পিছনে বসে আর একজন কানে কানে বলছিল—সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি একটা শব্দ যখন শুনেছ, তা যাই হোক, সাবধান হও। বনোয়ারি ক্রমাগত পালাচ্ছিল আর পোশাক বদলাচ্ছিল। কখনও সাহেবী পোশাক, কখনও পেশোয়ারী, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মিলিটারি। চোখে কখনও গগলস, কখনও সাদা চশমা, কখনও নীল···ভিজে কাপড়-জামার মধ্যে দেশলাইটা পাওয়া গেল অবশেষে। একদম ভিজে গেছে। টর্চের আলোতেই তাড়াতাড়ি তেল ভরে ফেলল সে। টর্চের আলোটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। টর্চটা নিবিয়ে রেখে দিল। একটু আলোর সম্বল রাখা ভাল। দেশলাইটা জ্বলবে কি? বড্ড ভিজে গেছে। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। একটা কাঠিও জ্বলল না। আবার শুরু করল সে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্, অন্ধকারে শব্দটা অদ্ভুত শোনাতে লাগল, কেউ যেন হাঁচছে। হাঁচছে? না, হাসছে? পাগলের মতো কাঠির পর কাঠি ঘসতে লাগল বনোয়ারি। একটাও জ্বলল না। সব কাঠি ফুরিয়ে গেল। টর্চটা জ্বেলে ছড়ানো কাঠিগুলোর দিকে সভয়ে চেয়ে রইল সে। আলোর টর্চটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। আর বেশীক্ষণ টিকবে না। আবার নিবিয়ে দিলে টর্চটা।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে বজ্র পড়ল একটা। মনে হল এই বাড়িতেই পড়ল। থর থর ক'রে কেঁপে উঠল বাড়িটা। বনোয়ারির মনে হ'ল সমস্ত রাত অন্ধকারে কি ক'রে কাটাব এখানে? আলোটা যদি জ্বালাতে পারতুম! আলো থাকলে কারো পরোয়া করতাম না। হঠাৎ ডান দিকে খিক্ খিক্ খিক্ ক'রে শব্দ হ'ল। তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলো বনোয়ারি। ঠিক যেন ব্যঙ্গ ক'রে কে হাসল। যেদিক থেকে হাসিটা এল টর্চটা জ্বেলে সেই দিকে দেখল চেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখতে পেল একটা খোলা জানালা রয়েছে, ওদিকের দেওয়ালে। এগিয়ে গেল সে-দিকে। টর্চ ফেলে দেখল বাইরের বারান্দায় দু'তিনটে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই খ্যাক খ্যাক শব্দ করছে সম্ভবত। ফিরে এল আবার। টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোঁফ-দাড়িগুলো খুলে ফেললে। জলে ভিজে পরচুলাগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল একটা। তারপর ব্যাগের ভিতর হাত পুরে একটা পাঁউরুটি বার ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। ভাগ্যে পাঁউরুটিটা সঙ্গে এনেছিল! খেতে খেতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গেই কথা শুরু ক'রে দিল। নিজের কণ্ঠস্বরই যেন সঙ্গী হ'ল তার সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে। "হাড়গিলে এ তুই কি করলি বল তো? তোর সঙ্গে কথা ছিল তুই আধা-আধি বখরা দিবি আমাকে। ছিল না? কিন্তু মাত্র কুড়িটি টাকা দিয়ে আমাকে তুই বিদেয় করে দিলি কোন আক্কেলে? আমি কি কুলী? আমি সাপটে না ধরলে তুই ওর গলা টিপতে পারতিস? আর আমাকেই কলা দেখালি। কেমন মজাটি টের পাইয়ে দিলুম। ছুরির একটা ঘায়ে তো কাৎ হয়ে পড়লি। আমার সঙ্গে চালাকি! গয়না গিনি সব পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিশ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাব আবার।"

বাইরে আবার ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে সেই খিক্ খিক্ হাসি।

"আঃ, শেয়ালগুলো জ্বালালে তো! হাড়গিলে, তুই ভাবছিস আমি ভূতের ভয়ে

কাঁপছি ? মোটেও না। তুই শেষ হয়ে গেছিস। তোকে আর ভয় নেই। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারলে কারো পরোয়া করতাম না। অন্ধকার বলেই গাটা ছমছম করছে—”

টক্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

মেঝেতে কি যেন পড়ল একটা উপর থেকে।

টর্চটা মুঠোয় চেপে ধরে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল বনোয়ারি। তারপর জ্বালল টর্চটা। যা দেখল তাতে তার মুখটা 'হাঁ' হয়ে গেল একটু। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতন হ'ল। মেঝের মাঝখানে একটা দেশলায়ের বাক্স পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তুলে নিলে সেটাকে। শুকনো খট্‌খটে নতুন দেশলাই একবাক্স, দু'দিকের কাগজ পর্যন্ত ঠিক আছে। কোত্থেকে এল এটা ? কে দিলে ? টর্চটা ছাতের উপর ফেলে দেখবার চেষ্টা করল একটু। কিছু দেখা গেল না। খিক্ খিক্ হাসিটা আবার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিবে গেল। তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনোয়ারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে নিলে দেশলাইটা। প্রথম কাঠিটাই জ্বলে উঠল।

······লণ্ঠনটা জ্বেলে বেশ ক'রে গুছিয়ে বসেছিল বনোয়ারি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আকাশের গুরু গুরু শব্দ আর ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল। আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে সেই ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ শব্দ আর খিক্ খিক্ হাসি। এইটেই শুনেছিল বনোয়ারি একাগ্র হয়ে। শেয়ালগুলো ও রকম করছে ? তাই নিশ্চয়। এই বিশ্বাসেই অনড় হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু একটু পরেই এ বিশ্বাস আর টিকল না। খিক্ খিক্ শব্দটা কানের খুব কাছে শোনা গেল। নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন গালে লাগল। আর মনে হতে লাগল ঘরের ভিতরই যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চোপরাও, খবরদার—”

টপ্ ক'রে ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল বনোয়ারি। শব্দটা থেমে গেল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ হ'ল না। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেল ঘরের কোণে ছায়ামূর্তির মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। ঠিক যেন হাড়গিলার ছায়া পড়েছে। বোঁ ক'রে ছোরাটা সেই দিকে ছুঁড়ে দিলে সে। ছায়াটা সট্ ক'রে যেন উপরের দিকে মিলিয়ে গেল, আর ছোরাটা গেঁথে গেল দেওয়ালে। বনোয়ারি উঠে গেল দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু পারলে না। ছোরাটা দেওয়ালে এমন গেঁথে বসে গিয়েছিল যে খোলা গেল না। টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তির চরম করল বনোয়ারি, কিন্তু কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না ছোরাটা। মনে হ'ল ভিতর থেকে ছোরাটাকে কে যেন শক্ত ক'রে ধরে রেখেছে। ছোরাটা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল বনোয়ারি। ছোরার বাঁটটা কাঁপতে লাগল, বনোয়ারির মনে হ'ল যেন বলছে—না, না, পারবে না। ছেড়ে দাও। ঠিক এই সময়ে খিক্ খিক্ হাসিটা আবার কানের পাশে শুনতে পেল সে। লাফিয়ে সরে গেল একধারে। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে। আর একবার চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল। টানতে টানতে হঠাৎ হাত ফসকে গেল তার, দড়াম্ ক'রে নিজেই পড়ে গেল মেঝের উপর। ছোরার বাঁটটা দুলে দুলে বলতে লাগল—না, না, না। আর সঙ্গে সঙ্গে খিক্ খিক্ হাসি। মেঝে থেকে উঠে কপাট খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল বনোয়ারি বাইরে। দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে তার

কাপড়-চোপড় উড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরের মেঝের চারদিকে। লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু নিবল না। তার আগেই বনোয়ারি ঘরে এসে ঢুকল প্রকাণ্ড লম্বা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে।

"পিটিয়ে লম্বা ক'রে দেব হারামজাদাকে—" উচ্চকণ্ঠে এই স্বগতোক্তি ক'রে কপাটটা আবার ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে সে। তারপর লম্বা ডালটা রাখল একধারে। কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে বোঁচকায় পুরে ফেললে। তারপর ঘরের মাঝখানে গুম্ হয়ে বসে রইল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্রমশ ঘুম পেতে লাগল তার। ঢুলতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল একবার। মনে হ'ল ঘরের আর একটা কোণে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কইছে যেন কারা। লম্বা ডালটা তুলে তেড়ে গেল সেদিকে। কেউ নেই। তারপর তার মনে হ'ল সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে বোধহয়। তাই ও-সব আজগুবি জিনিস দেখছে আর শুনছে। একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত? হুঃ যত সব বাজে কথা। বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝের উপর। চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘুম এলো না। তবু চোখ বুজে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত ছোট শব্দ হ'ল। চু-চু-চু। বনোয়ারি চোখ খুলে দেখলে ছাতের উপর থেকে কালো মতন কি একটা ঝুলছে। ঝুল না কি? পুরোনো বাড়িতে ঝুল থাকা অসম্ভব নয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। মনে হতে লাগল ক্রমশ সেটা বড় হচ্ছে। নীচের দিকে লম্বা হচ্ছে। সাপ নয় তো? বনোয়ারি উঠে সেই লম্বা ডালটা তুলে সেটার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডালটা খুব লম্বা, নাগাল অনায়াসেই পাওয়া যেত। কিন্তু ওটা ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল। আর ক্রমশঃ লম্বা হয়ে নামতে লাগল মেঝের দিকে। বনোয়ারি শেষে পাগলের মতো ঘোরাতে লাগল ডালটা। তারপর অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড হ'ল। হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে জাপটে ধরল তাকে। নরম দুটো হাত, ঠিক যেন মেয়েমানুষের হাত, পিঠের উপর স্তনের স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু। বনোয়ারির হাত থেকে ডালটা পড়ে গেল। আর ছাত থেকে সেই কালো বস্তুটা নামতে লাগল ক্রমশঃ। বনোয়ারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সে দিকে। দেখতে দেখতে সেটা তার চোখের সামনে নেমে এল। বনোয়ারি দেখলে সেটা ঝুল নয়, সাপও নয়, আঙুল একটা। বিরাট মোটা রোমশ আঙুল, প্রকাণ্ড নখ রয়েছে তাতে। আঙুলটা মেঝের কাছে আসতেই চড়াৎ ক'রে শব্দ হ'ল একটা, মেঝেটা ফেটে গেল। সেই ফাটলের ভিতর থেকে বেরুল হাড়গিলার মুণ্ডটা।

"কে, বনোয়ারি এস, এস, ভয় পাচ্ছ কেন? ঝুমকো এবার ছেড়ে দাও ওকে। ও আসবে এবার। ঝুমকো আমার গলাটাকে কামড়ে ছ্যাত্‌রাখ্যাত্‌রা ক'রে দিয়েছে একেবারে। দেখতে পাচ্ছ?"

বনোয়ারি দেখতে পেয়েছিল। হাড়গিলার গলার সাঁকিটা নেই তার জায়গায় একটা গর্ত। গর্তের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যাচ্ছে।

"ঝুমকো ছেড়ে দাও ওকে। ও এইবার আসবে। বনু এস—" অদৃশ্য হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অদৃশ্য এবার দৃশ্যও হ'ল। বনোয়ারি ঘাড় ফিরিলে এবার দেখতে পেল ঝুমকো দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড়টা ওদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, মুখময় ফেনা, চুলগুলো এলোমেলো। তারপর বনোয়ারি অনুভব করল

হাড়গিলা তার হাত ধরে টানছে আর ঝুমকো ঠেলছে তাকে পিছন থেকে। বনোয়ারি গর্তে ঢুকে পড়ল।

ফেরারি আসামি বনোয়ারির মৃতদেহ সাতদিন পরে পুলিশ আবিষ্কার করল ওই ঘরের মধ্যে। মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে একটা ফাটলের মধ্যে আটকে ছিল।

হাওয়া

ঘরের মধ্যে একটুও হাওয়া নেই। দমবন্ধ হ'য়ে আসছে। অথচ বাইরে দেখতে পাচ্ছি ঝড় হচ্চে। গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশে মেঘের দল উড়ে চলেছে মহানন্দে। অথচ ঘরে একটুও হাওয়া নেই কেন। ঘরের বাইরে হাওয়া প্রবল বেগে বইছে, অথচ ঘরের ভিতর সে ঢুকছে না কেন।

হঠাৎ মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথকে। বহুকাল আগে তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলাম এক সভায় অনেক দূর থেকে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি হাসছিলেন, হেসে হেসে গল্প করছিলেন কার সঙ্গে যেন। তাঁর চোখের অপরূপ দৃষ্টি, তাঁর মুখভাবের প্রদীপ্ত প্রকাশ, তাঁর প্রতিভার দিব্যদ্যুতি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু দূর থেকে। তাঁকে কাছে পাইনি। অপরিচয়ের বিরাট ব্যবধান ছিল। তাঁর স্পর্শ পাইনি তখন।

আজ হাওয়ার এই কাণ্ড দেখে তাঁকে মনে পড়ল। তিনিও তো হাওয়ার মতোই ছিলেন সর্বত্রবিহারী। কখনও দখিণে হাওয়া, কখনও ঝড়। কখনও আকাশে, কখনও গৃহকোণে। তাঁকে সেদিন পাইনি, আজ হাওয়াকেও পাচ্ছি না।

হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। জানলা বন্ধ আছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি সেটা। জানালার কাচ দিয়ে বাইরের ঝড় দেখা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে দিলাম। ভাল ক'রে খুলে দিলাম।

অবাক কাণ্ড। তবু হাওয়া ঘরে ঢুকল না। ঢুকল কায়াহীন কতকগুলো কথা।

"তোমার নাক বন্ধ, তাই নিশ্বাস নিতে পারছ না।"

"তোমার ফুসফুস নেই, তাই দমবন্ধ হ'য়ে আসছে।"

"তোমার চামড়া অসাড় হয়ে গেছে, তাই হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছ না।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কে যেন।

"আরে তুমি যে সিনেমা দেখছ—ও সত্যি ঝড় নয়, সিনেমার ঝড়।"

আসল সত্যটা কিন্তু স্পষ্ট হ'ল আর একটু পরে।

হাওয়া, কাচের জানলা, সিনেমা সবই মিথ্যা।

একটা বন্ধ ঘরে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—হাওয়ার স্বপ্ন। বাইরে প্রচুর হাওয়া, কিন্তু আমি বঞ্চিত হয়ে আছি। তারপর যা ঘটল তা অলৌকিক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। বন্ধ ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল। হু হু ক'রে হাওয়া ঢুকল ঘরে। গান শুনতে পেলাম।

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।

দেখি সামনেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।
হাওয়ার বেগে কাঁপছেন তিনি।

দুরবীনের দেখা

শীতকাল। পৌষের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনের বাড়ির আলসেতে চোখ পড়তেই উঠে পড়লাম। দুরবীনটা নিয়ে এলাম ঘরের ভিতর থেকে। শীতের অতিথি 'থির-থিরা' পাখীটা এসেছে। প্রতিবছরই আসে। দুরবীনের ভিতর দিয়ে দেখলাম। মাথাটি একটু ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানালে যেমন প্রতিবারেই জানায়। লেজটি পাশাপাশি নাড়ছে যেমন প্রতিবারেই নাড়ায় ছট্‌ফটে চঞ্চল পাখী। কালচে রং। কিন্তু উড়তেই ডানার নীচে লাল ঝলক দেখা গেল! আগুনের আভা বেরিয়ে এল যেন। ইংরেজি নাম রেড স্টার্ট (Red Start) এই জন্যেই। আলসেতে বেশীক্ষণ রইল না। চট্‌ ক'রে নেমে এল ঘাসের উপর। তারপর একটা পোকা ধরে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল আবার। জানি না আবার কখন আসবে।

পরদিন চিঠি নিয়ে এক চাকর এসে হাজির। বড় বড় অক্ষরে কাঁচা হাতের লেখা রুল-টানা একসারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতার উপর।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, কাল আপনি দুরবীন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমায় দেখছিলেন সকাল বেলায়। আমি তখন দোতলার জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। কেন দেখছিলেন তা কি জানাবেন? ইতি

পারুল

চাকরটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম পাশের বাড়িতে ওরা দিন দুই আগে এসেছে।

"পারুলের বয়স কত?"

"ন' বছর—"

বলাবাহুল্য আমি কাল পাখীটাকেই দেখেছিলাম, পারুলকে দেখতেই পাইনি। কিন্তু ওর মতো একটা দ্রষ্টব্য প্রাণী আমার নজরেই পড়েনি একথা কি লেখা যায়? ওরও একটা আত্মসম্মান আছে তো। তাই লিখলাম—

প্রিয় পারুল,

কাল তোমাকেই দেখছিলাম। তোমাকে দেখে আমার নাতনী টুলটুলের কথা মনে পড়ছিল। সে এখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে আবার চলে যায়। তোমার ভিতর তাকেই দেখছিলাম কাল। আমাদের বাড়িতে এসো। ইতি

তোমার নতুন দাদু

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে মনে হল আমার নাতনী টুলটুল ঠিক ওই থিরথিরা পাখীটার মতো। ক্ষণিকের অতিথি। কিছুক্ষণের জন্যে আসে, ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়ায়, রঙের চমক দেখিয়ে মুগ্ধ করে। তারপর আবার ফুড়ুৎ ক'রে চলে যায় স্বস্থানে। তাকেও তো দূরবীনের ভিতর দিয়ে দেখছি। বয়সের দূরবীন।

আবার দূরবীন চোখে দিয়ে বসলাম। দেখি পারুল জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। শৌখীন লাল রঙের ফ্রক পরেছে একটা। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। কি মিষ্টি হাসি। গালে টোল পড়েছে!

আইনের বাইরে

খুব দুঁদে ডেপুটি ছিলেন বিশ্বম্ভর বাঁড়ুয্যে। হামদো মুখ, গোল গোল ভাঁটার মতো চোখ, ভেড়ার শিংয়ের মতো গোঁফ। চিবুকের ঠিক মাঝখানে কালো আঁচিল একটা। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি। দেখলেই ভয় পেত সবাই। তিনি চাইতেনও যে সবাই ভয় পাক। কারো দিকে যখন চাইতেন, কটমট করে চাইতেন। তাঁর ধারণা পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বোম্বেটে বদমাইস, যত দূরে থাকে ততই ভালো। কারও সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা ছিল না তাঁর। কেবল তাঁর মেয়ে সুবি ছাড়া। তাঁর ওই মা-হারা মেয়েটাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। সুবি তাঁর একমাত্র সন্তানও। ওকে কেন্দ্র করেই তাঁর সংসার। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিল না। তাই, যদিও তিনি আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু সুবিকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তো সমস্ত দিন কাছারিতে থাকতে হত, বাড়িতে ওকে দেখবে কে। গতানুগতিক পথ ধরে সুবি স্কুল থেকে ক্রমশ কলেজেও গেল! বিশ্বম্ভর মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন বি. এ. পাশ করলে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রমদাচরণ মুকুজ্যের ছেলে সমরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। সমরও মাতৃহারা এবং প্রমদার এক মাত্র ছেলে। বেশ রাজঘোটক মিল হবে ভেবেছিলেন বিশ্বম্ভর। এ-ও তাঁর গোপনে গোপনে অভিসন্ধি ছিল যে সমরকে ক্রমশ ঘরজামাই করে ফেলবেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। সমর ছোকরা পণ করে বসল যে সে ডানাকাটা রাঙা পরী ছাড়া বিয়ে করবে না। সুবিকে তার মোটেই পছন্দ নয়, সে নাকি বিশ্বম্ভরের মতোই দেখতে। ডানাকাটা রাঙাপরী অবশ্য পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু স্নেহান্ধ প্রমদাচরণ তাই খুঁজে বেড়াতে লাগল ব্যাকুল চিত্তে। ছেলেকে ধমকে সুবির সঙ্গে যদি জোর করে বিয়ে দিয়ে দিত ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তা হল না, যা হল তা মর্মান্তিক। সমর 'লভে' পড়ে এক কালো সুঁটকো কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। প্রেমে পড়লে চোখের দৃষ্টিই অন্য রকম হয়ে যায় হয়তো। ওই সুঁটকো কালো মেয়েটাকেই তার রাঙা পরী বলে মনে হতে লাগল। বিশ্বম্ভর গোঁড়া লোক, এ বিয়েতে তিনি যাননি। দিন সাতেক পরে প্রমদাচরণের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল তখন তার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "কেমন, শিক্ষা হয়েছে তো, রাসকেল!"—বলেই হনহন করে চলে গেলেন বিপরীত দিকে।

কিন্তু একই খড়্গ যে তাঁরও মাথার উপর উদ্যত হয়েছিল তা টের পাননি বিশ্বম্ভর। অনেকদিন পাননি। যখন পেলেন তখন আর চারা নেই, ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। সাধুচরণ যে এ কাণ্ড করতে পারে তা তাঁর স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু আজকাল পরমাণুর যুগ, স্বপ্নাতীত ব্যাপারই ঘটছে সব।

গুরুচরণের পুত্র সাধুচরণ। গুরুচরণ জাতে মেথর। আধুনিক ভাষায় 'হরিজন'। গুরুচরণ আর বিশ্বম্ভর সমবয়সী। গুরুচরণই বোধহয় কিছু বড় ছিল। গুরুচরণকে বিশ্বম্ভরের বাবা ত্রিলোচন খুব স্নেহ করতেন। ছেলের মতোই। মেথর হলে কি হয়, গুরুচরণের মধ্যে এমন একটা নম্র শুচিতা ছিল যাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। গুরুচরণের বিয়েও ত্রিলোচনই দিয়েছিলেন। বিশ্বম্ভরের বিয়ের অনেক আগে গুরুচরণের বিয়ে হয়েছিল। গুরুচরণের ছেলে সাধুচরণের যখন জন্ম হল তখনও বিশ্বম্ভরের বিয়ে হয় নি। শিশু সাধুচরণ ত্রিলোচনের বাড়িতেই প্রায় সমস্ত দিন থাকত। বিশ্বম্ভরের মা তাকে খেতে দিতেন, দেখা শোনা করতেন। সাধুচরণের মা সমস্ত দিন কাজ করে বেড়াত। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ তো ছিলই, অনেকের বাড়িতেও কাজ করত সে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘুমন্ত সাধুচরণকে বাড়িতে নিয়ে যেত। ত্রিলোচনের সংসারে মানুষ হওয়াতে সাধুচরণও আর মেথরের ছেলে রইল না ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গেল। একটু বড় হলে ত্রিলোচন তাকে মাইনর স্কুলে ভরতি করে দিলেন। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হত, মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তিও পেল। তখন ত্রিলোচন তাকে পাঠালেন শহরে, বিশ্বম্ভরের কাছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে থেকে খেয়ে সে সসম্মানে ম্যাট্রিকুলেশনটাও পাশ করলে। সে যখন ফোর্থ ক্লাসে তখন সুবির জন্ম হয়। সাধুচরণই ওর সুবাসিনী নাম রেখেছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সে বৃত্তি পেয়েছিল। একটা ক্রিশ্চান কলেজে ভর্তি হয়ে গেল কলকাতায়। সেখানেও সসম্মানে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল সে। সর্বভারতীয় আই. এ. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন আগে সে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে। বিশ্বম্ভরের বাড়িতে প্রায় আসে। যখনই আসে তখনই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে। নিজের বাবারই মতো খাতির করে বিশ্বম্ভরকে। সুবি সাধুদা বলতে পাগল। সাধুচরণ এলে সে যে কি করবে ভেবে পায় না। এই সাধুচরণ যে শেষটা এমন দাগা দেবে তা বিশ্বম্ভর কল্পনা করেন নি। হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী তিনি, সাধুচরণের চিঠিটা পেয়ে তাঁর রগের শিরগুলো দপদপ করতে লাগল।

খুব বিনয় সহকারে সম্ভ্রমপূর্ণ চিঠিই লিখেছিল সাধুচরণ।

শ্রীচরণেষু,

আমি জানি আপনি খুব গোঁড়া এবং এ চিঠি পেয়ে খুব বিচলিত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখতে বাধ্য হলাম, কারণ না লিখে উপায় নেই। আপনি সুবাসিনীর বাবা, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে আমি তাকে বিয়ে করতে ইতস্তত করছি। আপনাকে এ চিঠি লিখবার আগে সুবাসিনীকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার খুব মত আছে। সে বি. এ পাশ করেছে, এ যুগের মেয়ে সে। সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকতে সে চায় না। জাতিভেদ চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। গুণ এবং কর্ম অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেকালের জাতি-ভেদ একালে অচল। একালে নতুন নতুন জাতি সৃষ্টি হয়েছে। যারা চাকুরে তারা একজাত। ওদের মধ্যেও শ্রেণী

বিভাগ হয়েছে। অফিসাররা এক গোষ্ঠীভুক্ত, পুলিসরাও তাই, ডাক্তাররাও তাই, রেলের বাবুরাও তাই। যারা ব্যবসা করে তারা আর একজাতের, যারা শিক্ষক তারা আবার আর এক জাত। মিলিটারিতে যারা থাকে তাদের ক্ষত্রিয় বলতে পারেন, লেখাপড়া নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ বড় বেশী নেই। কারণ যে বিশুদ্ধ চরিত্র এবং তপস্যার জন্যে তাঁরা সেকালে সমাজে শ্রদ্ধার আসন পেতেন তা এ যুগে দুর্লভ। এ যুগে বৃত্তি বা পেশা অনুসারে নতুন নতুন জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ হিসেবে আমি আপনার স্বজাতি, কারণ আপনিও চাকুরিজীবি, আমিও তাই। আপনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আমি ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং সুবিকে আমি যদি বিয়ে করি তাহলে তা অসবর্ণ বিয়ে হবে না। সুবি যখন খুব ছোট তখন থেকেই ওকে আমি ভালবাসি। আপনি যদি ওকে আমার বিবাহিতা পত্নী হবার অনুমতি দেন তাহলে আমাদের উভয়েরই জীবন সুখের হবে এবং আমি কৃতার্থ হব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। সামনাসামনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে সংকোচ হল বলেই চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। ইতি—

প্রণত
সাধুচরণ

বিনা মেঘে বজ্রপাত। খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন বিশ্বম্ভরবাবু। তারপর সুবি যখন কলেজ থেকে ফিরল তখন তাকে সাধুচরণের চিঠিটা দিয়ে বললেন—"ছোঁড়ার আস্পর্ধা দেখ্। এবার এলে ঢুকতে দিসনি বাড়িতে। দুধকলা দিয়ে কালসাপকে পুষেছিলাম আমরা—"

সুবি সবই জানত।

চিঠিখানা নীরবে পড়ে ফেরত দিলে।

"তোকেও বলেছিল, লিখেছে—"

"হ্যাঁ। আমি ওঁকেই বিয়ে করব। আপত্তি কোরো না তুমি—"

"মেথরের ছেলেকে বিয়ে করবি ?"

"মেথর বোলো না, হরিজন বল।"

"আমি মেথরকে মেথরই বলব। ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে বলেই তোর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, না ? ও সাধারণ মেথর থাকলে ওকে বিয়ে করতিস ?"

"ও সাধারণ নয়, ও অসাধারণ। ম্যাজিস্ট্রেট যদি না-ও হত তাহলেও ও অসাধারণ থাকত। তাহলেও ওকে আমি বিয়ে করতুম—"

বিশ্বম্ভরবাবুর গোল গোল চোখ দুটি আরও গোল হয়ে গেল। নির্নিমেষে তিনি কন্যার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সুবি দৃঢ়পদে অন্য ঘরে চলে গেল।

তার পরদিনই চিঠির উত্তর দিলেন বিশ্বম্ভর।

সাধুচরণ,

তোমার স্পর্ধা এবং ধৃষ্টতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। বামন হইয়া চন্দ্রে হাত দিবার লোভ সম্বরণ কর। আমি প্রাণ থাকিতে এ অনুমতি দিতে পারিব না। কিছুতেই না, কিছুতেই না। সুবি কিছুতেই তোমার পত্নী হইবে না, হইতে দিব না। ইতি— বিশ্বম্ভর

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল সাধুচরণের।

শ্রীচরণেষু,

বড় আশা করেছিলাম যে, বিবাহে আপনার আশীর্বাদ পাব। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা পেলাম না। একটা জিনিস বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন। সুবির বয়স একুশ পার হয়ে গেছে। আইনের চক্ষে সে এখন সাবালিকা। আপনার অনুমতি না নিয়েও সে আইনত আমাকে বিয়ে করতে পারে। সাতদিন পরে তাই হবে। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত
সাধুচরণ

সাতদিন পরে সুবি বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করে বলল—"বাবা, আমি যাচ্ছি। উনি গাড়ি পাঠিয়েছেন। তুমিও চল না বাবা—"

"উচ্ছন্নে যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও—"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বম্ভর। সুবি ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর যা হল তা প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত দুইই। দড়াম করে পড়ে গেলেন বিশ্বম্ভর মেঝের উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর।

বিয়ের দলিলে সুবাসিনী সই করতে যাচ্ছে, কলমটা তুলেছে, এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

"এ কি বাবা, ছাড় ছাড় হাতটা ছাড়, বড় লাগছে যে—"কলমটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। অফিসের অন্য সবাই অবাক হয়ে গেল, কারণ কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

তারপর যা হল তা আরও অদ্ভুত।

দড়াম করে পড়ে গেল সুবি অফিসের মেঝের উপর। তার এক গোছা চুল কেবল শূন্যে উঠে রইল। মনে হতে লাগল কে যেন তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"বাবা—বাবা—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

কিন্তু রেহাই পেল না সে। হড় হড় করে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সাধুচরণ তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যে টানছে তাকে দেখতেও পেল না।

বড় রাস্তার উপর টানতে টানতে নিয়ে এল সুবিকে। তারপর ছুঁড়ে দিল তাকে একটা ছুটন্ত লরির সামনে। নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সে।

খগার মা

আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় রোজ আড্ডা বসে একটা। নানাবিষয়ের আলোচনা হয় তাতে। পাশের বাড়ির কেচ্ছা থেকে শুরু করে ক্রুশ্চেভ-নেহরু, রবীন্দ্রনাথ-শেক্‌সপীয়র, কালোবাজার, উদ্বাস্তু-সমস্যা কিছু বাদ যেত না। আমরা ক্ষিতীশবাবুর কলেজে-পড়া-মেয়ের অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম কয়েকদিন থেকে, কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল চীন-ভারত-সীমান্তে লালফৌজের হুমকিতে। যদিও ম্যাকমোহন লাইন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না তবু তাতে আমাদের আলোচনা আটকায় নি। ওই নিয়েই আমরা ক'দিন ধ'রে জাবর কাটছিলুম, এমন সময়ে জগন্নাথবাবু উকিল হঠাৎ একদিন একটা নূতন বিষয় উত্থাপন করলেন। প্রফেসার ধীরেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, মশাই বলুন তো, আর্টের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ কি? যা সত্য তাই কি আর্টপদবাচ্য?"

সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরেন ভৌমিক বললেন, "না, নট্ নেসেসারিলি। সত্যের উপর আর্টিস্টের কল্পনার জাদুস্পর্শ না লাগলে তা আর্টের সম্মান পাবে না। নিরলংকার সত্য বিজ্ঞান বা দর্শনের এলাকায় সমাদৃত, আর্টের এলাকায় আসতে হলে তাকে অলংকার পরতে হবে, আর সে অলংকার পরাবার জন্মগত অধিকার আছে একমাত্র কবির।"

"কবি কাকে বলবেন?"

"যিনি রসস্রষ্টা তাঁকে।"

"রস কি বস্তু?"

"যা রসিকের চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করে।"

"ওটা থেকে কিছু বোঝা গেল না। ধরতে ছুঁতে পারা যায় এমন কোন সংজ্ঞা নেই রসের?"

"সংস্কৃতে একটা আছে কিন্তু সেটা আরও কটমট মনে হবে। বলব?"

"বলুন, শুনি—"

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্ব-প্রকাশানন্দ চিন্ময়
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ।"

"মানেটা বুঝিয়ে দিন—"

"রস হচ্ছে সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ চিন্ময়, জড়বস্তু নয়। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, মানে রসিক যখন এই রস আস্বাদন করেন তখন অন্য কোন বেদ্য মানে জ্ঞানগম্য বস্তু রসিকের চিত্তকে আর স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি রস আস্বাদনের সময় রসিক আত্মহারা হয়ে নিজেকেও ভুলে যান।"

"অখণ্ড কথাটার মানে কি?"

"দেশকালের গণ্ডী তাকে খণ্ডিত করতে পারে না। সর্বকালে সর্বদেশে সে রস আস্বাদন করে রসিকরা সমান আনন্দ পান। যে সত্য নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার তা মাঝে মাঝে বদলাতে পারে—কিন্তু রসের চেহারা কখনও বদলায় না।"

"ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর ব্যাপারটা কি ?"

"ব্রহ্মের উপলব্ধি করে জ্ঞানীরা, যোগীরা, ভক্তেরা যে আনন্দ লাভ করেন কাব্যরস সৃষ্টি করে এবং আস্বাদন করেও ঠিক সেই আনন্দ লাভ করেন স্রষ্টা এবং রসিক। তাই একে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হয়েছে।"

লাইফ ইন্‌শিওরেন্সের এজেন্ট জগুবাবু অধীর হয়ে পড়েছিলেন।

এ কি কচকচি শুরু করলেন আপনারা মশাই! আমি তো রস মানে বুঝি হয় ফলের রস, না হয় রসগোল্লার রস। হঠাৎ এ বিদ্ঘুটে রসের আমদানি করলেন কেন ?"

"বলছি—"

জগন্নাথবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন—"একজন রসিকের সঙ্গে একজন আর্টিস্টের মকোদ্দমা বেঁধেছে। তাই ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছিলুম—"

"কোন্ আর্টিস্ট—?"

"স্বচ্ছন্দ সুর। নাম শুনেছেন নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ। আজকাল তো খুব নাম করেছে ছোকরা। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। আচ্ছা স্বচ্ছন্দ সুর নামটা ও নিজেই নিয়েছে বোধহয় !"

"ঠিক ধরেছেন। ওর আসল নাম ভগেশ্বর। ভগা ভগা বলে ডাকত সবাই। ওর বাবাকেও আপনার হয়তো চেনেন অনেকে। নগা স্যাকরার খুব নাম ডাক ছিল এককালে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার বিয়ের সময় জড়োয়ার সেট তো ওই করেছিল। চমৎকার হাত। ওরকম কারিগর দুর্লভ আজকাল।"

"নগা সুরের দুই ছেলে ভগা আর খগা। বাপের দুটো গুণ ওরা দু'ভায়ে ভাগ করে নিয়েছিল। ভগা হ'ল আর্টিস্ট আর খগা হ'ল মিস্ত্রি। ভগা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, সে আর্টস্কুলে গেল। খগাটা ছিল বখাটে গোছের, স্কুলের ক্লাসে উঠতে পারত না। তাই নগেন স্যাকরা ওকে একটা ওয়ার্কশপে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওখানে বছর তিনেক থেকে সে ভালো একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হয়ে বেরুল। যদিও একই বৃক্ষের ফল, কিন্তু দু'জনের মধ্যে স্বভাবের এবং চেহারায় আকাশ পাতাল তফাত। ভগা আর্টস্কুলে পড়বার সময় যে সমাজে মিশেছিল সে সমাজে তার বাপ নগা বা ভাই খগা খাপ খেত না। সে সমাজের লোকেরা একটু উগ্ররকম আধুনিক। ধুতি-চাদর বর্জন করেছিল তারা অনেক আগেই। ভগাও তাদের অনুকরণ করত। তাদেরই নকলে ঢিলে পায়জামা পরত আর তার উপর পরত এক অদ্ভুত ধরনের জামা। তার উপরটা ডবল ব্রেস্টেড মিরজাইয়ের মতো, আর নীচেটা খুব লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়েও প্রায় বিঘৎ-খানেক লম্বা। লম্বা চুলে তেল দিত না, নাকি সুরে ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলত। পায়ে থাকত শুঁড়-তোলা নাগরা আর মুখে থাকত লম্বা-সরু-পাইপে লাগানো সিগারেট। ভগার চেহারাও ছিল খুব লিকলিকে। আর খগেশ্বর, মানে খগা, ছিল ঠিক এর উলটো। গ্যাঁট্টাগোঁট্টা গরিলার মতো। পরিধানে খাকির ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট, প্রায়ই তাতে তেলকালি লাগা থাকত। মাথার চুল ঝাঁকড়া, গোঁফ ঝাঁকড়া, ভুরুও ঝাঁকড়া। তেলে আর ময়লায় জট পাকানো। পায়ে শতছিন্ন একজোড়া ডার্বি শু। সিগারেট-টিগারেটের ধার ধারত না সে। গাঁজা খেত। কিন্তু মিস্ত্রী ছিল খুব ভালো। একটা বড় ইলেকট্রিক কনট্রাক-টারের ফার্মে কাজ করত।—"

তখন বারান্দায় খগার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল প্রথমে। আমাকে দেখে সে বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, একটা নমস্কারও করল।

"এখানে কি মনে করে? দাদার ছবি দেখতে এসেছ নাকি?"

"আজ্ঞে না। আমি বাল্‌বগুলো লাগাতে এসেছিলাম।"

"তোমার দাদার ছবি দেখেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"চল দেখি গিয়ে—"

খগার যাবার ইচ্ছে ছিল না খুব। কিন্তু আমার কথা এড়াতে না পেরে বলল—"চলুন—"

হলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম দুজনে।

"কোথায় তোমার দাদার ছবিটা আছে দেখেছ?"

"না, অত লক্ষ্য করিনি।"

বেশী খুঁজতে হ'ল না, সামনেই দেখলুম স্বচ্ছন্দ সুরের আঁকা ছবিখানা ঝুলছে। ছবির নাম 'মা'। ছবিটা দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল একটা স্তনের ছবি বুঝি। কিন্তু পরে লক্ষ্য করে দেখলুম' স্তন নয়, আব। গালের উপর একটি আব। মানুষের মুখ চোখ কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে খালি গালের খানিকটা অংশ আর তার উপর ওই আবটা। এঁকেছে ভালো। আমাকে দেখে স্বচ্ছন্দ এগিয়ে এল।

"কেমন লাগছে ছবিটা"—

খগা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ফিরে দেখি তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হয়েছে, রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে। আমি কিছু বলবার আগেই বোমার মতো ফেটে পড়ল খগা।

"ওই মায়ের ছবি হয়েছে! মায়ের মুখের ওই আবটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও নি তুমি শুয়োর!"

খগা তড়াক ক'রে এগিয়ে গেল আর পকেট থেকে ছুরি বার করে ফ্যাঁস করে কেটে দিলে ক্যানভাসটা।

"নাবিয়ে ফেলে দাও ও ছবি রাস্তায়। আমার মায়ের অপমান হ'তে আমি দেব না।"

"একি করলে তুমি রাসকেল—"

স্বচ্ছন্দ এগিয়ে আসতেই এক প্রচন্ড ঘুঁষি ঝেড়ে দিলে খগা তার নাকের উপর। রক্তারক্তি কান্ড। হৈ হৈ ব্যাপার। খগাকে ধরবার জন্যে অনেকে এগিয়ে এল, কিন্তু পারলে না, খগা সব্বাইকে মেরে ধুনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। অসুরের মতো শক্তি তো ওর গায়ে। পরে শুনলাম ওটা খগার মায়েরই পোট্রেট। খগার মায়ের গালে নাকি বেশ বড় আব আছে। আর একটা খবরও শুনলাম যা আগে জানতাম না। খগার মা স্বচ্ছন্দের মা নয়, সৎমা। স্বচ্ছন্দ নগা স্যাকরার প্রথম পক্ষের ছেলে। আজ খবর পেলাম খগাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। খগার বউ আমার কাছে এসেছিল। তাকে জামিনে খালাস করেছি। কিন্তু তার হয়ে মোকদ্দমাটা এইবার আমাকে লড়তে হবে। আর্টের ব্যাপার তো, তাই ভৌমিক মশায়ের কাছে আর্টের তত্ত্বটা জেনে নিতে চাই। খগাকে কি রসিক বলা চলবে?"

ভৌমিক মশায় বললেন, "না, বোধ হয়"—

"তাহলে কি বলবেন ওকে?"

"সুপুত্র।"

"আর স্বচ্ছন্দ সুরকে?"

"পাজি।"

ইন্‌শিওরেন্সের এজেণ্ট জগুবাবু বললেন—"শুধু পাজি নয়, পাজির পা-ঝাড়া।"

সেদিনের মতো সভা-ভঙ্গ হ'ল।

মাসখানেক পরে আবার সভা বসেছে। সেদিন আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ভেজাল। কোন্ কোন্ জিনিসের সঙ্গে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ জিনিস ভেজাল দেওয়া হয় তাই নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কেমিস্ট যুগল নাগ।

উকিল জগন্নাথবাবু প্রবেশ করলেন।

"আপনার সে মকোদ্দমার কি হ'ল মশাই"—প্রশ্ন করলেন জগুবাবু।

"মকোদ্দমায় হেরে গেলুম মশাই। খগার সাজা হ'য়ে গেল, পাঁচশ টাকা জরিমানা।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মকোদ্দমা আমি জিততাম। কিন্তু সব মাটি করে দিলেন খগার মা। ভগা তাঁকে সাক্ষী মেনেছিল। তিনি এসে কোর্টে দাঁড়িয়ে বললেন, তিনিই স্বচ্ছন্দ সুরকে তাঁর গালের আবের ছবিটা আঁকতে বলেছিলেন। তাঁকে অপমান করবার জন্যে সে ও ছবি আঁকেনি, তাঁর ফরমাশ মতো এঁকেছিল। আমি অনেক জেরা করলুম তাঁকে কিন্তু সুবিধে করতে পারলুম না কিছু। খগার মা অটল হ'য়ে রইলেন।

কোর্ট ভেঙে যাবার পর দেখা হ'ল আমার তাঁর সঙ্গে। বললুম আপনার মান বাঁচাবার জন্যে আপনার ছেলে এই কাণ্ডটা করলে আর আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে তারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে দিলেন! সত্যি কি আপনি আপনার আবটা আঁকতে বলেছিলেন ওকে? খগার মা কি উত্তর দিলেন শুনবেন?

'না। ও দুষ্টু, তাই ওরকম করে এঁকেছে। তার শাস্তিও তো খগা দিয়ে দিয়েছে ওকে হাতে হাতে। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করেছে খগা নয় ভগা। দশজনের সামনে তার মাথাটা নীচু হ'য়ে যাবে সেটা কি ভাল? তাই আমি ওকেই জিতিয়ে দিলুম।' আমি কি আর বলব! ঘাড়-বেঁকা গালে আবওলা বুড়িটার মুখের দিকে হতভম্ভ হ'য়ে চেয়ে রইলুম। শুনছি জরিমানার টাকাটা বুড়িই দিয়ে দিয়েছে।"

"আর স্বচ্ছন্দ সুরের খবর কি?"

"সে প্লেনে করে আমেরিকা চলে গেছে।"

"সেখানে ছবির প্রদর্শনী খোলবার জন্যে?"

"না। নাকের প্লাসটিক সার্জারি করবার জন্যে। নাকটা তো থেঁতো হয়ে গেছে একেবারে—"

জগুবাবু বলে উঠলেন—"খগেশ্বর জিন্দাবাদ।"

আবার শুরু হ'ল ভেজালের আলোচনা।

নদী

পীতাম্বর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। একই গ্রামে একই পরিবেশে আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। আমাদের গ্রামের ঠিক গা ঘেঁষে বইত তরলা নদী। সেই নদীর ধারে পীতাম্বর আর আমি কত খেলা খেলেছি, সেই নদীর জলে কত সাঁতার কেটেছি, কত নৌকা ভাসিয়েছি। সে নদীর কত ছবি আজও মনে আঁকা আছে। তরলাকে বাদ দিয়ে গ্রামের কথা আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। তরলা যেন গ্রামেরই একজন ছিল। তার সর্বাঙ্গে কত রূপ, তার মৃদু কলধ্বনিতে কত কথা। তাকে বড় ভালবাসতাম। আমার বড় কষ্ট হ'ত গ্রামের লোকেরা যখন তাতে জঞ্জাল ফেলত। গ্রামের সমস্ত জঞ্জাল জড়ো করে ফেলা হ'ত তরলার জলে। যেন ও নদী নয় নর্মদা। তরলা কিন্তু হাসিমুখে সে জঞ্জালও বইত। যখন জঞ্জাল ফেলা হ'ত তখন তাকে একটু বিব্রত বিপন্ন মনে হ'ত বটে, কিন্তু তার পরদিনই দেখতাম তরলা আবার হাসছে।

মায়ের কোলে যেমন চিরকাল থাকা যায় না, গ্রামের কোলেও তেমনি। গ্রাম ছেড়ে অবশেষে বাইরে যেতে হয়। গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ হ'তেই আমাকে আর পীতাম্বরকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি গেলাম কোলকাতায় আর পীতাম্বর গেল কুচবিহারে। আমি বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করতে লাগলাম। পীতাম্বরের মামা কুচবিহারে চাকরি করতেন, সে পড়াশোনা করতে লাগল তাঁর বাড়িতে থেকেই। প্রথম প্রথম কিছুদিন দু'জনের মধ্যে পত্রালাপ চলেছিল, কিন্তু তাও ক্রমশঃ থেমে গেল। পীতাম্বরের সঙ্গে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার ছাড়াছাড়ি। আমি লেখাপড়া করবার জন্য বিদেশেও গিয়েছিলাম। পীতাম্বর কুচবিহারেই তার পড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিল। বেশী দূর পড়াশোনা করতে পারেনি সে। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডীও পার হতে পারেনি বেচারী। তাই কর্মজীবনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, কারণ বাঙালীর কর্মজীবন মানে, চাকরি। নন্‌-ম্যাট্রিকের চাকরিজীবন উজ্জ্বল হওয়ার কথা নয়। একটা আপিসে দিনকতক কেরানীগিরি করবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছিল। কিন্তু যা মাইনে পেত তাতে তার কুলোত না। শেষে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ধরল সে। বিনা মূলধনে এবং বিনা বিদ্যায় যে ব্যবসা স্বচ্ছন্দে চলে সেই ব্যবসা—পুরোহিতগিরি। ব্রাহ্মণের ছেলে, নিষ্ঠারও ভড়ং ছিল, মিষ্টি কথা বলে গৃহিণীদের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতাও ছিল—তাই এই বারো-মাসে-তের পার্বনের দেশে তার রোজগার নিতান্ত মন্দ হ'ত না। বিবাহ করেছিল, কিন্তু ভগবানের দয়ায় ছেলেপিলে বেশী হয়নি। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—মেয়ে। তার নাম দিয়েছিল আদরিণী।

আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে নানা জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কুচবিহারে যখন এলাম তখন পীতাম্বরের সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রথমে তাকে আমি চিনতে পারিনি। সে যে কুচবিহারে আছে একথাও প্রথম প্রথম আমার মনে পড়েনি। আমার সঙ্গে আমার বিধবা বোন থাকত। সে খুব নিষ্ঠাবতী ছিল। যেখানেই যেতাম তার পুজাপার্বন ব্রত প্রভৃতির জন্য পুরোহিত যোগাড় করতে হ'ত আমাকে। কুচবিহারে

এসে পুরোহিতের খোঁজ করতেই পীতাম্বরকে পেলাম। আমারই আপিসের একজন ক্লার্ক তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এল। সত্যিই তাকে চিনতে পারিনি আমি। যে সুকুমার গৌরবর্ণ বালক আমার সহপাঠী ছিল তার চিহ্নমাত্রও ছিল না পীতু পুরুতের মধ্যে। লম্বা, রোগা, এক-মুখ-কাঁচা পাকা গোঁফদাঁড়ি, গায়ে আধময়লা নামাবলী, অনামিকায় অষ্টধাতুর আংটি, শরীরের উপরার্ধ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে, মুখে সশঙ্ক হাসি, চোখে উৎসুক দৃষ্টি, মুখের দু'কোণে সাদা সাদা ঘায়ের মতো দাগ—এই চেহারার সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধুর কিছুমাত্র মিল ছিল না। বাল্যকালে আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতাম। পীতু পুরুত একটু ইতস্ততঃ করে হাত কচলে বললে, "আমাকে চিনতে পারছেন স্যর ?"

আমি একটু অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। এ লোককে যে আগে কখনও দেখেছি তা মনে হ'ল না। বললাম, "না তো। আগে কি কোথাও দেখেছি আপনাকে ?"

"সোনাপুর গাঁয়ে আমি আপনার সঙ্গে রামঠাকুরের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম পীতাম্বর।"

"আরে— !"

সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

দুই

আদরিণী ক্রমশঃ আমারই বাড়ির মেয়ে হ'য়ে গেল। আমি যৌবনেই বিপত্নীক হয়েছিলাম। বাড়িতে আমার ওই বিধবা বোন ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দু'চার দিন আসা-যাওয়া করতে করতে আদরিণী অবশেষে সরলার (আমার বোনের) খুব প্রিয় হয়ে পড়ল। সত্যিই ভালবাসবার মতো মেয়ে আদরিণী। অমন নম্র মধুর স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। অর্থাভাবে পীতাম্বর তাকে কলেজে পড়াতে পারেনি। আমি বলেছিলাম, "আমিই ওর পড়াবার সব ভার নিচ্ছি। ওকে কলেজে ভরতি করে দাও।" কিন্তু পীতাম্বর এতে রাজী হ'ল না। মনে হ'ল আমার এ প্রস্তাবে তার আত্মসম্মান যেন একটু ক্ষুন্ন হয়েছে। দরিদ্রের আত্মসম্মান বড় তীক্ষ্ণ। সে ম্লান হেসে বললে, "বেশী পড়িয়ে আর কি হবে ভাই। শেষ পর্যন্ত তো বিয়ে দিতেই হবে। সেই চেষ্টাই দেখছি। ও ছেলেবেলা থেকে মন দিয়ে শিবপুজো করেছে। ওর ভালো বর জুটবেই। একটি ভালো পাত্রের সন্ধানও পেয়েছি।"

ভালো পাত্রের বাবা ও পিসেমশাই এলেন আদরিণীকে দেখতে। তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ পীতাম্বরকে বহন করতে হ'ল। যদিও তাঁরা দুজনেই কেরানী-শ্রেণীর লোক কিন্তু তাঁদের হাবভাব কথাবার্তা থেকে মনে হ'ল তাঁরা যেন আমীর-ওমরাহ! সাধ্যাতীত খরচ করে পীতাম্বর তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরা আদরিণীর আপাদমস্তক নানাভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তারপর মত প্রকাশ

করলেন—মেয়ে কালো। আমরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাত্রী খুঁজছি। এ পাত্রী চলবে না। আদরিণীর রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়, সে শ্যামাঙ্গিনী। কিন্তু ওর মতো শ্রীমতী মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না। পীতাম্বর হতাশ হ'ল। কিন্তু আবার পাত্র খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয়বার যে পাত্রটি পাওয়া গেল, তাকে সুপাত্র বলা চলে না। আই. এ. পাশ করে বাড়িতে বসে আছে। এরা আদরিণীকে পছন্দ করল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ পণ দাবি করল তা পীতাম্বর দিতে পারল না। পীতাম্বর অতি কষ্টে মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছিল এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে। এ পাত্র নগদই চাইল পাঁচ হাজার, তাছাড়া অলংকার, বরাভরণ এবং কুড়িজন বরযাত্রীর যাওয়া-আসার ভাড়া। সুতরাং এটাও ফসকে গেল। এরপরও ক্রমাগতই ফসকে যেতে লাগল। অধিকাংশ লোকেরই মেয়ে পছন্দ হ'ল না, অনেকের পণের দাবি পীতম্বরের পক্ষে সাধ্যাতীত হ'ল, অনেক জায়গায় কুষ্ঠী মিলল না। এই শেষোক্ত পর্যায়ে আমার এক বন্ধু সুধীরের ছেলে পড়ে। আমার সহপাঠী ছিল, একসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলাম। তার ছেলে দীপঙ্কর সত্যিই ভালো ছেলে। খবর পেলাম এম. এ পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমিই আদরিণীর সঙ্গে দীপঙ্করের সম্বন্ধ করে সুধীরকে চিঠি লিখলাম। আশা ছিল সুধীর আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না। সুধীর সোজাসুজি অগ্রাহ্য করেওনি। সে মেয়েও দেখতে চাইলে না। লিখলে, 'তুমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ করেছ আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু দীপঙ্কর আমাদের একমাত্র ছেলে, তাই আমার স্ত্রীর বিশেষ ইচ্ছা যে পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচার করে যেখানে ভালো মিল হবে সেইখানে ছেলের বিয়ে দেবেন।' আদরিণীর কুষ্ঠী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সাত দিন পরে খবর এল, মিল হয়নি। বাঙ্গালীদের চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল, যেখানে সোজা পথে প্রত্যাখ্যান কর সম্ভব নয় সেখানে বাঁকা-পথ আবিষ্কার করে চক্ষুলজ্জার মর্যাদা রক্ষা করবার মতো বুদ্ধিও তার আছে। যাই হোক, আমি ওখানে যতদিন ছিলাম ততদিন আদরিণীর বিয়ের কোন ব্যবস্থা হয়নি। হবে এ আশাও ছিল না। কারণ যে যোগাযোগের ফলে আমাদের সমাজে মেয়ের বিয়ে হয় সে যোগাযোগ ঘটাবার সামর্থ্য পীতম্বরের ছিল না।

কিছুদিন পরে আমি ওখান থেকে বদলি হ'য়ে গেলাম।

আমি বগুড়ায় গিয়ে আমার আর এক বন্ধু দ্বিজেনের চিঠি পেলাম। দ্বিজেন সুধীরেরও বন্ধু। দ্বিজেন লিখেছে, 'সুধীর তার ছেলের জন্যে চারিদিকে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। মুখে যদিও খোলাখুলি বলছে না, কিন্তু মনে হয় তার আসল লক্ষ্য টাকা। এক-জায়গায় শুনলাম খোলাখুলিই নাকি সে নগদ দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। মেয়ের বাবা যখন বললেন অত টাকা আমি দিতে পারব না, বড় জোর হাজার ছয়েক দিতে পারি,—সুধীর কি উত্তর দিলে জান? লিখলে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে কুষ্ঠির মিল হয়নি।

এ চিঠি পাওয়ার মাস ছয়েক পরে খবর পেলাম সুধীরের ছেলে দীপঙ্কর আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর কিছুদিন পরে সে আমারই কাছে এ. ডি. এম. হ'য়ে এল ট্রেনিং নেবার জন্য। খুশী হলাম তাকে দেখে।

এসেই সে তার বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। কালো সুঁটকো লম্বা একটি মেয়ে। শুনলাম জাতে সোনারবেনে, কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো। দীপঙ্করের

সহপাঠিনী ছিল। লভ্ ম্যারেজ। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে ভালোই লাগল। কথায় কথায় জানতে পারলাম এ বিয়েতে কুষ্ঠিও মেলানো হয়নি, পণ নিয়ে কচলাকচলি করবার সুযোগও পায়নি সুধীর। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সুধীর দীপঙ্করের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধও ছিন্ন করেনি। এই বউকেই বরণ করে নিয়েছে।

তিন

বদলি হয়ে চলে আসবার পর পীতাম্বরের একটি মাত্র চিঠি পেয়ে ছিলাম। আদরিণীও একটি চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ তারা থেমে গেল। আমি চিঠি লিখেও আর তাদের পেলাম না। নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত আমাকে, আর তাদের খবর নিতে পারিনি। তারপর সাধারণতঃ যা হয়, ক্রমশঃ তাদের কথা ভুলেই গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা গেল না।

আমি রিটায়ার করে কলকাতায় বসবাস করছিলাম। সময় কাটাবার জন্যে কাজও নিয়েছিলাম একটা। পাঞ্জাবের একজন বড় চামড়া-ব্যবসায়ী জাফর খাঁ তার ব্যবসায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন আমাকে। আপিসে একদিন বসে আছি, চাপরাসী এসে খবর দিলে—এক 'আওরৎ' আমার সঙ্গে 'মুলাকাত' করতে চান। আমার কামরায় নিয়ে আসতে বললাম। আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন। অবাক হ'য়ে গেলুম যখন সে বোরখার মুখের কাপড়টা তুলে ফেললে।

"আমাকে চিনতে পারছেন কাকাবাবু ?"

সত্যিই আমি চিনতে পারিনি।

"আমি আদরিণী—"

"আদরিণী ! তোমার এ বেশ !"

"আমি মুসলমানকে বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না। এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে, আদর করে রেখেছে, আমি সুখে আছি। আমার স্বামী আপনার আপিসেই আপনার অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার।

"কাদের সাহেব তোমার স্বামী ?"

"হ্যাঁ—"

নির্বাক হ'য়ে রইলাম।

একটি ছেলে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

"এটি আমার ছেলে। আব্বাস এদিকে আয়। নানা। নানাকে আদাব কর—"

আব্বাস এসে আদাব করল। আমি তার গাল টিপে একটু আদর করলাম। কি ক'রে আদরিণী মুসলমানকে বিয়ে করল, পীতাম্বরের খবর কি, এসব কথা আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না।

চার

অনেকদিন পরে সোনাপুর গিয়েছিলাম একবার। গিয়ে দেখলাম তরলা নদী আর গ্রামের পাশ দিয়ে বইছে না। তার জলে জঞ্জাল ফেলে ফেলে গ্রামের লোকেরা তার খাত প্রায় বুজিয়ে দিয়েছে। নদী কিন্তু মরেনি। সে তার গতি পরিবর্তন করে পাশের গাঁয়ের গা ঘেঁষে বইছে। যে নদী সোনাপুরের শোভা ছিল, যে নদী সোনাপুরকে শস্যশ্যামল করে রাখত, সে নদী এখন রহিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বইছে রহিমগঞ্জের শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে।

জবর দখল

আমি যখন সুনন্দাকে দেখতে যাই, তখন আমি জানতাম না যে সে আমার বাল্যবন্ধু হরিশের স্ত্রী। হরিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব অবশ্য বাল্যকালেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা-ও মাত্র এক বৎসরের জন্য! মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি, তখন আর একবার দেখা হয়েছিল। সে কলেজে এসেছিল বসন্তের টিকা নেবার জন্য। বলেছিল, আফ্রিকা যাচ্ছি একটা চাকরি পেয়ে। তখন তার বিয়ের কথা শুনিনি। তারপর তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি পাশ করবার পর মেডিকেল কলেজেই হাউস সার্জন হয়ে বছর দুই ছিলাম। তারপর প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম কলকাতায়। অবশ্য নামেই 'প্র্যাকটিস', পয়সা দেনেওলা রোগী প্রায়ই জুটত না। অধিকাংশ সময়ই ব্যাগার খাটতে হ'ত। এই সময়েই আবিষ্কার করেছিলাম 'কলকাতা' শহরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা কত বেশী। আমি যতদিন ডাক্তার হইনি ততদিন তারা আমার বিশেষ খবর নিত না। কিন্তু ডাক্তার হয়ে গ্রে স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করে বসবামাত্র পিল পিল করে বেরিয়ে এল তারা সবাই চার দিক থেকে। অনেককে আমি চিনতেও পারতাম না, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় পত্র থাকত, তখন বুঝতে পারতাম তারা আমার অমুক খুড়তুতো বোনের দেওর বা অমুক মামাতো ভায়ের খুড়তুতো শালী। এ সময়ে আমি পয়সা রোজগার করতে পারিনি বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম অনেক। এই সময়েই আমি সুনন্দাকে দেখি। যারা আমাকে সুনন্দাকে দেখবার জন্যে ডেকেছিলেন, তাঁরা আমাকে বলেন নি যে সুনন্দা আমার বাল্যবন্ধু হরিশের স্ত্রী। সম্ভবত তাঁরা নিজেরাও জানতেন না এ কথা। আমাকে তাঁরা ডেকেছিলেন, কারণ একটি অর্ধ-পাগলিনী মেয়ে আমার চিকিৎসায় ভালো হয়েছিল এবং সে ছিল সুনন্দাদের পাশের বাড়িতে। তার স্বামীর সুপারিশের জোরেই আমার ডাক পড়েছিল। সুনন্দার বাবাই আমাকে ডাকতে এসেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম কলকাতার কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারকেও তাঁরা দেখিয়েছেন। কবিরাজী এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও হয়েছে।

কিন্তু কোথাও কোন ফল হয়নি। শেষে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তাঁকে আমার কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রীর হিষ্টিরিয়া হয়েছিল, ফিট্ হ'ত এবং সেই সময় আবোল-তাবোল বক্‌ত। হিষ্টিরিয়ার সাধারণ চিকিৎসা করেই ভালো হয়েছিল সে। সুনন্দার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মেয়েরও কি ফিট্ হচ্ছে ?"

"প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম, ফিট্ই হয়েছে। কিন্তু 'ফিট্' হলে তো 'ফিট্' ভাঙ্গে, এ গত দু'মাস থেকে আচ্ছন্নের মতো পড়েই আছে। চলুন না আপনি নিজেই দেখবেন ব্যাপারটা—"

দুই

সুনন্দা বিছানায় চোখ বুজে শুয়েছিল আর ফিস্ ফিস্ করে বলছিল,—"জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার।" অনবরত ওই কথাই বলছিল। কিন্তু ফিস্ ফিস্ করে বলছে কেন তা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

"ওই রকম ফিস্ ফিস্ করেই কি বরাবর কথা বলছে ?"

"না, প্রথম প্রথম খুব চীৎকার করত। এখন গলা ভেঙ্গে গেছে।"

নাড়ী দেখলাম। নাড়ী ভালই মনে হল। আমি অবাক হয়ে গেলাম সুনন্দার রূপ দেখে। মহাভারতের কৃষ্ণার রূপবর্ণনা পড়েছিলাম, সুনন্দাকে দেখে তা মনে পড়ে গেল। রং কালো বটে, কিন্তু কি চমৎকার মুখশ্রী! কি কালো চুল! অমন সুন্দর চুল আমি আগে কখনও দেখিনি। বালিশের উপর গোছা গোছা ছড়ানো ছিল এলোমেলো হয়ে, সত্যিই মনে হচ্ছিল মেঘ নেমেছে। চোখ দুটি বোঁজা ছিল, কিন্তু তবু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, সে দুটি টানা টানা। অদ্ভুত রূপসী।

"জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার"—ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত বলে চলেছে।

"কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?"

কোন উত্তর নেই।

"কি কষ্ট হচ্ছে বলুন। চোখ খুলুন, চেয়ে দেখুন আমার দিকে—"

চোখ খুলল না, কোনও উত্তরও পেলাম না।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম চোখের কোণ থেকে জল পড়ছে।

একটা ইন্‌জেক্‌শন দিলাম ঘুমের জন্য।

বললাম, "কাল আবার আমাকে খবর দেবেন।"

সুনন্দার বাবা আমাকে ফি দিতে এলেন।

বললাম, "আগে উনি ভালো হয়ে উঠুন। তারপর ওসব কথা হবে—"

"ভালো হবে তো ?"

"চেষ্টা তো করব।"

তিন

তার পরদিন খবর পেলাম সুনন্দার ঘুম হয়নি। ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর তার আচ্ছন্ন ভাবটা আর একটু বেড়েছিল মাত্র, যাকে ঘুম বলে তা হয়নি। সমস্ত রাত ঠোঁট সমানে নড়েছে আর তেমনি ফিস্‌ ফিস্‌ করে ক্রমাগত বলেছে—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। তবে সেটা আর খুব স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে না।

গিয়ে দেখলাম, সুনন্দা তেমনিভাবেই পড়ে আছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। বুঝতে পারলাম খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে ওর।

টেম্পারেচার নিয়ে দেখলাম জ্বর নেই। নাড়ীও ভালো। রক্তের চাপ এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু ও বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। অনেকদিন থেকেই পারছে না। প্রায়ই বিছানা নষ্ট করে ফেলে। দেখলাম এইটেই ওদের পক্ষে সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন করে বুঝলাম, প্রস্রাব, পায়খানা স্বাভাবিক যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। ও'রা যতটা পারছেন ওকে খেতেও দিচ্ছেন। গলা-গলা ভাত, আলু, ডিম, তরি-তরকারি, ফলের রস, ভিটামিন, সিদ্ধ মাছ সবই দেওয়া হচ্ছে। মুখের ভিতর চামচে করে আস্তে আস্তে দিয়ে দিলে বেশ খেয়ে নেয়। ক'দিন থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করে তাঁরা আশ্চর্য বোধ করছেন। তরি-তরকারীর মধ্যে বেগুন থাকলে ও খেতে চাইছে না, মুখ থেকে বার করে দিচ্ছে। অথচ বেগুন ওর খুব প্রিয় তরকারী। বেগুন ভাজা, পোড়া, সিদ্ধ সবরকম ও খেতে খুব ভালবাসত। অথচ এখন খেতে চাইছে না।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর অতি সাধারণ একটা ঘুমের ওষুধ, যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে সিডেটিভ মিকশ্চার, তাই দিয়ে চলে এলাম।

চার

কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপার ঘনীভূত হ'তে লাগল। একদিন সকালে গিয়ে লক্ষ্য করলাম তার সর্বাঙ্গে ফোস্‌কার মতো হয়েছে। অনেক জায়গায় চামড়া কুঁচকে গেছে। তাছাড়া মনে হল চোখের কোণ দিয়ে পুঁজ পড়ছে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মুখখানা জরাগ্রস্ত। সুনন্দার কালো রং আরও কালো হয়ে গেছে। যেন ঝলসে দিয়েছে কেউ। মুখের সে সুন্দর শ্রী আর নেই। মুখটা বেগুন-পোড়ার মতো দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো কিন্তু নড়ে যাচ্ছে সমানে। কিন্তু কথা আর শোনা যাচ্ছে না। ঠোঁটের চামড়াও কুঁচকে গেছে দেখলাম।

সুনন্দার নিদারুণ পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ডাক্তারি

ছয়

হাসপাতালে গিয়ে সুনন্দা সুস্থ হতে লাগল ক্রমশ। মাথার ঘা সেরে গেল, চুলও উঠতে লাগল নতুন করে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, চুলের রং কালো নয়, লালচে। আর একটা জিনিসও হল যা অদ্ভুত। তার সর্বাঙ্গের চামড়া যেন খোলসের মতো খসে পড়ল। নতুন যে চামড়া দেখা দিল তার রং কালো নয় গোলাপী। চোখের চেহারা বদলাল। টানা টানা চোখ ছিল সুনন্দার। কিন্তু চোখের কোণে ঘা হয়েছিল, চোখের পাতাতেও। ঘা অবশ্য সারল, কিন্তু চোখ আর টানা টানা রইল না। সুনন্দার চোখের ভিতরেও ঘা হয়েছিল। ঘা সারতে দেখা গেল, চোখের তারার রংও বদলেছে। ছিল কালো, হয়েছে কটা। সুনন্দার বাবা বললেন, গলার স্বরেরও নাকি পরিবর্তন ঘটেছে। রুচিরও। সুনন্দা বেগুন খেতে ভালবাসত কিন্তু ভালো হবার পর আর বেগুন খেতে চায় না। সুনন্দার পোস্ত মোটে ভালো লাগত না, কিন্তু ভালো হবার পর খুব পোস্ত খাচ্ছে। সুনন্দার গান-বাজনার খুব ঝোঁক ছিল, কিন্তু ভালো হবার পর তাকে আর কেউ গান গাইতে শোনেনি। সেতারটা একবারও ছোঁয়নি।

কোনও ইনফেক্‌শনের ফলে কোন ব্যক্তির এরকম দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের কথা শুনিনি। এ নিয়ে একটা গবেষণা করব ভাবছিলাম। এমন সময় হরিশ এসে হাজির হল। হরিশ যখন তার স্ত্রীকে দেখতে এল, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হরিশ এসেই চমকে উঠল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"এ কি আভা! তুমি!"

সুনন্দা মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি—"

পরে হরিশের কাছে শুনলাম, আভা ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের দু বছর পরে ও সুনন্দার প্রেমে পড়ে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল সুনন্দাকে। কিন্তু খবরটা বেশী দিন চাপা থাকেনি। অন্তত আভার কাছে থাকেনি। সে আত্মহত্যা করেছিল।

ক্ষীর

পীতাম্বর দাস চাষা লোক। ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকে। জমিতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। ঘরে চার-পাঁচটি গাই আছে। তাহাদের সেবাও স্বহস্তে করে পীতাম্বর। অসুখ-বিসুখ যে মাঝেমাঝে হয় না তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর তাহার শরীর বেশ সুস্থ। আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ব্যঞ্জন এবং খাঁটি এক সের দুধ সে অনায়াসে হজম করিয়া থাকে। পীতাম্বরের ভাই নীলাম্বর স্কুলে পড়িয়াছিল, স্কুল হইতে কলেজে যায়। কলেজ হইতে বাহির হইয়া সে কেরানী হইয়াছে। কলিকাতায় একটি এঁদো গলিতে

বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। দশবৎসর একটানা কেরানীগিরিই করিয়া চলিয়াছে। ছুটি লয় নাই, বাড়ি যায় নাই। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র পীতাম্বর তাহার বিবাহ দিয়াছিল। কেরানীগিরি পাইবামাত্র নীলাম্বর বধূকে আনিয়া উক্ত এঁদো গলির মধ্যে তাহার গৃহস্থালি পাতিয়াছে। গুটি তিনেক সন্তানও হইয়াছে। পীতাম্বর ভাইকে দশ বৎসর দেখে নাই। নীলুর ছেলেমেয়ে কলিকাতাতেই হইয়াছে। পীতাম্বর পোস্টকার্ডযোগে সে খবর পাইয়াছে মাত্র।

···সহসা তাহার চিত্ত একদিন আকুল হইয়া উঠিল। ধানকাটা শেষ করিয়া সে ঠিক করিল নীলুকে এইবার একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। সুযোগও জুটিয়া গেল, গ্রামের একটি ছেলে কমল কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতা যাইতেছিল, পীতাম্বর ঠিক করিল তাহার সহিতই যাইবে। সঙ্গে কেহ না থাকিলে তাহার পক্ষে কলিকাতা শহরে নীলুকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব, কমলকে সঙ্গে পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

নীলুর জন্য পীতাম্বর ক্ষীর লইয়া যাইতেছিল। বাড়ির গরুর দুধ প্রায় পাঁচ সের হয়, বিধু গয়লানীর নিকট সে আরও পাঁচ সের লইয়াছিল। এই দশ সের দুধ মারিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। লোকমুখে সে শুনিয়াছিল কলিকাতা শহরে নাকি ভাল দুধের খুব অভাব। কমল ছোকরা খুব বুদ্ধিমান। বলিল, ক্ষীর মাটির হাঁড়িতে লইবেন না। অ্যালুমিনিয়ম বা পিতলের হাড়িতে লওয়াই ভাল। মাটির হাঁড়িতে লইলে ট্রেনের ভিড়ে ঠোকা লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া যাইতে পারে।

তাহার দ্বিতীয় পরামর্শটিও সুপরামর্শ। সে বলিল, একটি বড় ঝুড়ির ভিতর হাঁড়িটি বসাইয়া লউন। হাঁড়ি গড়াইবে না, তা ছাড়া হাঁড়ির চারিপাশে বরফ দেওয়ারও সুবিধা হইবে। কলিকাতা পৌঁছিতে বারো ঘণ্টার উপর লাগিবে। গ্রীষ্মকালে ক্ষীর পচিয়া যাইতে পারে। হাঁড়ির চারিদিকে বরফ দিলে সে ভয় আর থাকিবে না। পীতাম্বর কমলের দুইটি উপদেশই পালন করিল।

হাওড়া স্টেশনে যখন তাহারা নামিল তখন রাত্রি প্রায় নটা। ঝুড়িসুদ্ধ ক্ষীরের হাঁড়ি লইয়া ট্রামে বা বাসে চড়া গেল না। কমল বলিল ট্যাক্সি করিতে হইবে। ট্যাক্সির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

ক্ষীরের জন্য এত ঝঞ্ঝাট, তবু কিন্তু পীতাম্বর উৎফুল্ল। খাঁটি ক্ষীর পাইয়া নীলু, নীলুর বউ এবং ছেলেমেয়েরা যে কত খুশী হইবে এই মনে করিয়া সমস্ত ঝামেলা সে হাসিমুখে সহ্য করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাহারা নীলুর বাসায় পৌঁছিল। নীলুর চেহারা দেখিয়া পীতাম্বর তো অবাক। চেনা যায় না। চক্ষু কোটরাগত, গালের হাড় দুইটা উঁচু, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। তাহার বউ, ছেলে-মেয়েরাও খুব রোগা।

ঝুড়িসুদ্ধ ক্ষিরের হাঁড়িটা দেখাইয়া নীলু প্রশ্ন করিলে—"ওটা কি ?"

"ক্ষীর। খাঁটি ক্ষীর এনেছি তোদের জন্য—"

"ক্ষীর! ক্ষীর না এনে কিছু কাঁচকলা আনলেই পারতে—"

"কাঁচকলা! কাঁচকলা কি এখানে পাওয়া যায় না ?"

"যায়, কিন্তু বড্ড দাম—"

"সে খেয়াল তো করিনি। যাই হোক, ক্ষীরটা এনেছি, খেয়ে ফেল। এখনই খা। তা না হলে টকে যাবে। বরফ দিয়ে দিয়ে এনেছি—"

"এখন তো খাওয়া যাবে না—"

"কেন!"

"চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই।"

তিনটি

জবালাল পূর্বে কুকুর পুষিতেন। এখন বাঁদর পুষিতেছেন। তিনি ইতিহাসের সাহায্যে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, বাঁদরদের সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়া সীতা-উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কার্য উদ্ধারের আশায় তাই বাঁদরদের প্রশ্রয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য, কলার লোভেই বাঁদররা বশীভূত হইয়াছে। জবালাল আরও নানা উপায়ে বাঁদরদের চিত্ত জয় করিয়াছেন। নানা-বর্ণের প্ল্যাষ্টিকের কণ্ঠাভরণ উপহার দিয়াছেন তিনি বাঁদরদের। কোনটা লাল, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটা বা সোনালি। যদিও দেখিতে সেগুলি অনেকটা কুকুরের গলার বকলেশের মতো কিন্তু জবালাল সেগুলির নাম দিয়াছেন শ্রীহার। তিনটি বাঁদরের কিন্তু বিশেষ রকম খাতির হইয়াছে। তাহাদের পুচ্ছাগ্রও সোনালি প্ল্যাষ্টিকে মণ্ডিত করিয়াছেন জবালাল। তাহাদের বলিয়াছেন, তোমরা বাঁদরশ্রেষ্ঠ, তোমরা বানরোত্তম। ইহা শুনিয়া তিনজনই বিশেষ রকম অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং গদগদ কণ্ঠে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ করিতেছে।

প্রথম বাঁদর। টিক্ টিকা টিকা টিকা টিকা।

দ্বিতীয় বাঁদর। লিক্ লিকা লিকা লিকা লিকা।

তৃতীয় বাঁদর। চিক্ চিকা চিকা চিকা চিকা।

এ আলাপের অর্থ কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু তাহাদের খাড়া ল্যাজ, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, পা ফাঁক করিয়া চলা, কষায়িত লোচন দেখিয়া অনুমান করা যায় তাহারা বড়ই হৃষ্ট হইয়াছে।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু বিপদ দেখা দিল। তাহাদের খাড়া ল্যাজ আর কিছুতেই নামিতে চাহে না, সর্বদাই খাড়া হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাহারা ইচ্ছা করিয়াই ল্যাজটাকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন টনটন করিতে লাগিল তখন তাহাদের মনে হইল কিছুক্ষণ নামাইয়া রাখা যাক, একটু পরে আবার খাড়া করিব কিন্তু নামাইতে গিয়া দেখে কি সর্বনাশ—ল্যাজ নামিতেছে না। শুধু তাহাই নয়। ল্যাজের ডগা টন্‌টন্ করিতেছে। তাহাদের আলাপের ভাষা বদলাইয়া গেল।

প্রথম বাঁদর। টুক্ টুক্‌রু টুক্ টুক্‌রু।

দ্বিতীয় বাঁদর। লুক্ লুক্‌রু লুক্ লুক্‌রু।

তৃতীয় বাঁদর। চুক্ চুক্‌রু চুক্ চুক্‌রু।

এবারও কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু তাহাদের আর্ত ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল তাহারা বেকায়দায় পড়িয়াছে।

বাঁদর মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কয়েকটি পালোয়ান বাঁদর টানিয়া ল্যাজ নামাইতে চেষ্টা করিল, ল্যাজ নামিল না। কয়েকটি ভক্ত বাঁদর প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে পুচ্ছ, তুমি অবনত হও। দয়া কর, অবনত হও, একটু নামো। ল্যাজ নামিল না। জবালাল মজা দেখিতেছিলেন। তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী ডাক্তার পাঠাইলেন।

ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন—প্ল্যাষ্টিকের সোনালি টুপিগুলি ল্যাজের ডগায় কাপে কাপে বসিয়াছে। রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া পচ্ ধরিয়াছে—ডাক্তারি ভাষায় যাহাকে গ্যাংগ্রিন বলে তাহাই হইয়াছে। ডগার খানিকটা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর ল্যাজের গোড়ায় বাত হইয়াছে, যাহাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে স্পণ্ডিলাইটিস। ক্রমাগত ল্যাজ খাড়া করিয়া রাখিবার ফলেই সম্ভবত এইরূপ হইয়াছে। ইনজেক্‌শন দিলে সারিতে পারে, যদি না সারে গোটা ল্যাজটাই কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া বাঁদর তিনটির মুখে মানুষের ভাষা ফুটিল—

প্রথম বাঁদর। কিছুতেই ল্যাজ কাটিব না।

দ্বিতীয় বাঁদর। Ditto

তৃতীয় বাঁদর। Ditto

জবালালের পা ধরিয়া তাহারা তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

জবালাল বলিলেন, "ছি, ছি, বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে লোকে কি বলিবে? তুচ্ছ রক্তমাংসের ল্যাজ কাটিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি? আমি ভাল সোনায় তোমাদের ল্যাজ গড়াইয়া সোনার স্প্রিং দিয়া তোমাদের পশ্চাদ্দেশে লাগাইয়া দিব। আসল ল্যাজের চেয়ে দেখিতে আরও ভাল হইবে।"

শোনা যাইতেছে বাঁদর তিনটি রাজি হইয়াছে।

উপলক্ষ

শশধর কানুনগো এবং পরমেশ্বর আইচ খবরটি শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত এবং পরে আতঙ্কিত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয় বসাক রামানন্দ গোস্বামীর কাছে মন্ত্র লইয়াছে! কি সর্বনাশ! তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয়ের খরচে এত দিন ধরিয়া তাঁহারা যে মুর্গি-মেধ যজ্ঞ চালাইতেছিলেন তাহা তো বন্ধ হইয়া যাইবে! মুর্গির স্থান হয়তো মালপো অধিকার করিবে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি! শশধর কানুনগো বহুমূত্র রোগে কাবু, আর পরমেশ্বরের মালপো মুখে দিলেই বমি আসে। ওই তুলতুলে চটচটে ব্যাপার পছন্দই করেন না তিনি। রামানন্দ গোস্বামীর নিকট মন্ত্র লইয়াছে—কি সর্বনাশ! অবিলম্বে তাঁহারা বন্ধুর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের একটি আশা ছিল মৃত্যুঞ্জয় বিবেচক ব্যক্তি। রামানন্দ গোস্বামীর সম্বন্ধে সত্য সংবাদগুলি সে হয়তো জানে না, তাই ওই খপ্পরে

পড়িয়াছে। সংবাদগুলি শুনিলে তাহার ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইবে না। রামানন্দ সম্পর্কে যে সব মারাত্মক খবর পরমেশ্বর জানেন তাহা শুনিবার পরও কি মৃত্যুঞ্জয় বসাকের মতো একজন বৈজ্ঞানিক তাহাকে গুরুপদে বহাল রাখিবে? অসম্ভব। শশধর কানুনগোর ভাণ্ডারেও গুরুবিরোধী কতকগুলি চোখা চোখা যুক্তি ছিল। তাঁহার আশা ছিল তাহাও মৃত্যুঞ্জয়কে বিচলিত করিবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার ত্রিতলের ঘর হইতে দেখিলেন শশধর এবং পরমেশ্বর আসিতেছেন। তিনি নামিয়া আসিলেন।

"কি খবর হে—"

"শুনলাম তুমি মন্ত্র নিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"রামানন্দ গোস্বামীর কাছে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

উভয় বন্ধু ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার গুরুদেবের সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু বক্তব্য আছে—"

শশধর বলিলেন, "তাছাড়া তোমার গুরু নেওয়ার দরকারটাই বা কিসের—"

মৃত্যুঞ্জয় একবার পরমেশ্বর একবার শশধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা বস। আমি আসছি একটু ভিতর থেকে—"

মৃত্যুঞ্জয় ভিতরে চলিয়া গেলেন।

"দেখেছ, এর মধ্যেই গেরুয়া ধারণ করেছে!"

"কপালের মাঝখানে সূক্ষ্ম তিলকটি লক্ষ্য কর নি?"

"করেছি বই কি। কিন্তু ওকে আমরা কন্‌ভিন্স করবই।"

"ফিজিক্সের প্রফেসার—ছি, ছি, ছি। একটা কথা কিন্তু শুনেছি ভাই, লুকিয়ে লুকিয়ে ও কবিতা লেখে—ওই রন্ধ্র পথেই বোধ হয় শনি ঢুকেছে—"

মৃত্যুঞ্জয় প্রবেশ করিলেন।

"কি বলবে বল—"

পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"তোমার রামানন্দ স্বামীর আসল পরিচয় বোধ হয় তুমি জান না। ওর আসল নাম হচ্ছে ঘোঁতনা। আমার পিসতুতো শালার বাড়িতে বাজার সরকার ছিল। তখন ওর বয়স বেশী নয়। কিছুদিন পরে হঠাৎ দেখা গেল ও দাড়ি কামাচ্ছে না, চুলও ছাঁটছে না। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে মুচকি মুচকি হাসে শুধু। তারপর উধাও হল একদিন। পাশের বাড়ির বউটিও নিরুদ্দেশ, সঙ্গে সঙ্গে তার গয়নার বাক্সটিও। থানা পুলিশ হল। ধরাও পড়ল কাশীতে। তুমি যদি চাও প্রমাণ দিতে পারি—"

মৃত্যুঞ্জয় নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না।

পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"তারপর জেল থেকে যখন ঘোঁতনা বেরুল তখন তার মুনি ঋষির মতো চেহারা হয়ে গেছে। তারপর কোথায় সে কি সাধনা কোন গুহায় বসে করেছিল জানি না, এখন দেখছি তোমরা দলে দলে তার দিকে দৌড়ুচ্ছ। ভদ্রঘরের জোয়ান জোয়ান মেয়েরা তাকে ঘিরে আরতি করছে, তার গা ঘেঁষে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে। মনে হচ্ছে বাঙালী জাতটা সব হারিয়ে এখন সিনেমা

আর গুরু নিয়ে মেতেছে, কারণ ওটা একই মনোবৃত্তির দুটো দিক। কিন্তু তোমার মতো লোক যে এই খপ্পরে পড়বে শেষে তা ভাবি নি—"

মৃত্যুঞ্জয় কোন জবাব দিলেন না।

শশধর বলিলেন, "তাছাড়া ধরেই যদি নেওয়া যায় যে গুরু হিসেবে রামানন্দ স্বামী খুব উঁচুদরের লোক তাহলেও তোমার কি দরকার আছে গুরুর? কোন্‌টা ধর্ম কোন্‌টা অধর্ম তা কি তুমি জান না? যে খোঁড়া তারই ক্রাচ্ দরকার, যে অন্ধ তারই লাঠি দরকার, তুমি চক্ষুষ্মান তোমার এক জোড়া সমর্থ পা রয়েছে তুমি ক্রাচ্ নিয়ে লাঠি হাতে করে বেড়াচ্ছ কেন? চোখ মেলে দেখলেই তো ভগবানের অসংখ্য লীলা দেখতে পাওয়া যায়, তা দেখবার জন্যে অন্ধকার ঘরে বসে নাক টিপে বিশেষ একটা মন্ত্র যপ করা কি দরকার তোমার পক্ষে? মুর্গি ছেড়ে মালপো খেলেই কি তুমি ভদ্রলোক হয়ে যাবে? না, না মৃত্যুঞ্জয়, ওসব পাগলামি তোমাকে সাজে না। গুরু টুরু ছাড়ো। আমরা কিছুতেই ওসব বরদাস্ত করব না—"

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল প্রস্তরবৎই রইল।

"কিছু বলছ না যে—"

পরমেশ্বর প্রশ্ন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নীরব।

শশধর তাঁহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "কি হল হে, তোমার—"

মৃত্যুঞ্জয়ের যেন চমক ভাঙিল।

বলিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি—"

"ভাবাভাবি নয়, আমাদের গা ছুঁয়ে কথা দাও যে ও গুরুকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না—"

"না, না, ভাবুক একটু। কাল আমরা আবার আসব।',

পরমেশ্বর এবং শশধর বাহির হইয়া গেলেন।

শশধর হাসিয়া বলিলেন, "একটু ভিজেছে মনে হচ্ছে—"

"ভিজতে হবেই। চালাকি নাকি—"

মৃত্যুঞ্জয় জানালা দিয়ে যখন দেখিলেন যে শশধর এবং পরমেশ্বর বেশ কিছু দূর চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার দুই কান হইতে তুলাগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি দামী মোটরকার আসিয়া থামিল। রামানন্দ স্বামী অবতরণ করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বসাক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আসুন—"

রামানন্দ স্বামী যখন চলিয়া গেলেন তখন মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটু আগে শশধর এবং পরমেশ্বর এসেছিল। গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছিল সম্ভবত। রাস্কেলরা এটা বুঝতে পারছে না যে তাঁর কথা শুনে আমার মনে যে কল্পনা-বিগ্রহ মূর্ত হয়েছে আমি তাঁর পূজা করছি। রামানন্দ স্বামী উপলক্ষ মাত্র—"

"স্ত্রী বলিলেন—"তাতো বটেই! এস, অনেকক্ষণ কিছু খাওনি। ক্ষীরটুকু খেয়ে নাও—"

রাতে ও প্রভাতে

আমার বারান্দার ঠিক নীচেই গোলাপ বাগান। আর বারান্দায় ওঠবার সিঁড়ির ঠিক উপরেই হাই পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক বাতি। সেটা জ্বেলে দিলে আমার বাড়ির সামনেটা আলোয় ভরে যায় গেট পর্যন্ত। সেদিন রাত্রি তখন বারোটা। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমিও শুয়েছিলাম, কিন্তু তখনও ঘুম আসেনি। মনে হল গেটের কড়াটা কে যেন নাড়ছে। উঠতে হল। আলোটা জ্বেলে বাইরে এলাম। গেটের কাছে কাউকে দেখতে পেলাম না। মনে হল বোধহয় হাওয়ার শব্দ। ফিরছিলাম, কিন্তু হঠাৎ যা চোখে পড়ল তাতে আর ফিরতে পারলাম না। দেখলাম বাল্‌বটার ঠিক নীচেই একটা মাকড়সা জাল তৈরী করছে। ধপধপে সাদা মাকড়সাটা ঠিক যেন একটা নিটোল মুক্তোর মতো। আর সেই মুক্তোটা যেন ঘুরে ঘুরে তার নিজের ভিতর থেকেই মুক্তোর সুতো বার করে অপরূপ জাল বুনে চলেছে। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। উপনিষদের একটা শ্লোক মনে পড়ল। মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল তারপর জালটা আলোর নীচে। উর্ণার সঙ্গে, চূর্ণা, পূর্ণা, ঘূর্ণা, ঝরণা প্রভৃতির মিল মিলিয়ে কবিতাও রচনা করতে লাগলাম মনে মনে। তারপর মাকড়সাটা শোঁ করে নেবে গেল। অনেকক্ষণ ফিরল না। আমি ভিতরে চলে গেলাম, ভাবলাম কাল সকালে এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টিটা ভাল করে দেখা যাবে।

দুই

"বাবা, বাবা ওঠ, কি কাণ্ড হয়েছে দেখবে এস।"

"কি ?"

"আমাদের ক্লিওপেট্রা গোলাপের কুঁড়িটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে।"

"সে কি! কে ?"

উঠে বসলাম।

"একটা মাকড়সা। ইয়া বড় সাদা একটা মাকড়সা। বাল্‌বটার নীচে প্রকাণ্ড একটা জাল পেতেছিল—"

উঠে বেরিয়ে এলাম।

"কই জালটা ?"

"ঝেঁটিয়ে সব সাফ করে দিয়েছি।"

"মাকড়সাটা কোথায় ?"

"পালিয়ে গেল।"

ক্লিওপেট্রার কুঁড়িটা দেখলাম। বেচারার প্রাণরস শুষে নিয়েছে একেবারে।

কুঁকড়ে গেছে। মনে পড়ল মিশরের রাণী নীল-নদ-নন্দিনী ক্লিওপেট্রাকে। পরক্ষণে, মাকড়সাটাকে দেখতে পেলাম—পাশের ডালে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে গোলাপ কুঁড়িটার দিকে। সাদা টোগা পরে রোমান দস্যু অক্টেভিয়াস যেন দেখছে সর্পাহতা ক্লিওপেট্রাকে। আমাকে দেখেই টপ করে সরে পড়ল আবার।

মড়াটা

ব্যাপারটার সূত্রপাত তর্ক থেকে। মেডিকেল কলেজের একটা মেসে থাকত জীবেন, কানু আর অমল। তিনজনেই থার্ড ইয়ারে পড়ে। তখন শীতকাল। মড়া-কাটা চলছে। অ্যানাটমি হলের প্রত্যেক টেবিলেই তখন এক-একটি করে মড়া শোয়ানো। মাথা মুখ গলা বুক হাত পা পেট কেটে কেটে ছিন্নভিন্ন করেছে ছাত্রের দল।

জীবেন আর কানু এক ঘরে থাকে। আর অমল থাকে তেতলার উপর ছোট্ট একটা ঘরে, একা। সে ঘরটা খুব ছোট, তাই সিঙ্গেল-সীটেড।

জীবেনদের ঘরেই তর্কটা শুরু হয়েছিল।

কানু। আজ ভাই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

জীবেন। হঠাৎ? বউয়ের চিঠি আসেনি?

কানু। চিঠি এসেছে। মন খারাপ হয়েছে অন্য কারণে—

অমল। টাকা ফুরিয়ে গেছে বুঝি—

কানু। আরে না না, সে সব নয়। টাকা ফুরুলেই বা কি! নীলমণি ধার দিতে কোনদিন আপত্তি করবে না।

নীলমণি কলেজ-রেস্তোরাঁর মালিক। ছাত্ররা তার দোকানে ধারেই খাওয়া দাওয়া করে।

অমল। তাহলে মন খারাপ হবার কারণটা কি হল হঠাৎ?

কানু। আমাকে যে 'বডি' (body) দিয়েছে সেটা মেয়েছেলের। তার হাতে উলকি দিয়ে নাম লেখা আছে 'পারুল'। ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। তার নামও পারুল। অনেকদিন তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। আজ ডিসেকশন করতে করতে কেবলই তার কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

অমল হো হো করে হেসে উঠল।

অমল। ছি, ছি এত ভীতু তুই! ওর মুখ দেখে চিনতে পারলি না?

কানু। মুখ তো নেই। হেড নেক ডিসেকশন হয়ে গেছে যে—আমি পা-টা করছি, মহসীন পেটটা, গোবিন্দ হাতখানা। ওদের পার্টনার হচ্ছে কালী, যতীন আর মহাবীর। ওরাও বলছিল ওদের গা ছমছম করছে।

অমল। দূৎ! যত সব কুসংস্কারের ডিপো!

জীবেন। তোর কুসংস্কার নেই?

অমল। একদম না।

জীবেন। গরুর মাংস খেতে পারিস?

অমল। থিয়োরেটিকালি আপত্তি নেই। খাই না কারণ খেতে প্রবৃত্তি হয় না।

জীবেন। ওইটেই প্রচ্ছন্ন কুসংস্কার।

অমল। তা হতে পারে। কিন্তু কানুর মতো অমন দিনে দুপুরে গা-ছমছম করবে না।

জীবেন। রাত্রেও করবে না?

অমল। না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না।

জীবেন। বিশ্বাস না করার মানে? অনাদিকাল থেকে পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের সব স্তরের লোক যা বিশ্বাস করে সেটা কি ভূয়ো হতে পারে? তোমার অবিশ্বাসের হেতু কি?

অমল। আমি নিজে কখন দেখিনি—

জীবেন। তুমি কি নিজে কখনও সুইজারল্যাণ্ড বা আইসল্যাণ্ড দেখেছ? ওগুলো নেই? মাইক্রোসকোপ আবিষ্কার হবার আগে কি কেউ ব্যাকটিরিয়া দেখেছিল, তা বলে কি ওগুলো ছিল না?

কানু। হয়তো একদিন কেউ ভূতোস্কোপ আবিষ্কার করবে। তখন দেখা যাবে যে আমাদের চারদিকে ভূত কিলবিল করছে।

অমল। যত সব বাজে কথা।

কানু। আমার কিন্তু ভাই গা ছমছম করছিল—এটা বাজে কথা নয়।

জীবেন। আজ যে বডিটা এসেছে দেখেছিস? কালো মুসকো, ষণ্ডা চেহারা, দু'গাল ভরতি কাঁচা-পাকা দাড়ি, প্রকাণ্ড চোখ, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন হাসছে, ওটাকে দেখে আমারও গা ছমছম করছিল। ওটাতে কাদের পার্ট পড়বে কে জানে? মনে হয় ওর গায়ে ছুরি বসালে ও লাফিয়ে উঠে কামড়ে দেবে—বাবা কি চেহারা!

অমল। আমিও দেখেছি, আমার কিন্তু ভয় করেনি। মড়া মড়া, তাকে আবার ভয় কি?

জীবেন। রাত বারোটার সময় অন্ধকারে একা অ্যানাটমি হলে ঢুকে ওটার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আসতে পার?

অমল। অনায়াসে পারি।

জীবেন। কক্‌খনো পারবে না।

অমল। নিশ্চয় পারব—

জীবেন। আমি বাজি রাখতে পারি পারবে না। দিনের আলোয় বসে ওরকম লম্বাই চওড়াই সবাই করতে পারে।

অমল। বেশ, রাখ বাজি, কত দেবে?

জীবেন। দশ টাকা।

অমল। বেশ।

জীবেন। আজ রাত্রি বারোটার পর আমরা তোমাকে মেস থেকে বার করে দেব।

মুন্না ডোমকে দুটো টাকা দিলেই সে 'অ্যানাটমি হল' খুলে দেবে। তাকে বলে রাখব আমি। আমাকে সে খুব খাতির করে। তুমি কিন্তু কোন আলো বা টর্চ নিয়ে যেতে পারবে না। অন্ধকারে হলের ভিতর ঢুকতে হবে। টেবিলটা কোথায় আছে তা আন্দাজ করে নিতে পারবে আশা করি। প্রোসেকটারের ঘরের সামনেই। রাজি তো ?

অমল। রাজি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জীবেনের মেসে থাকা হল না। তার বোনের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এল, রাত্রে সেখানে খাবার জন্য। ঠিক হল রাত্রি বারোটার পর কানুই অমলের সঙ্গে যাবে। কানু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর অমল ঢুকবে 'অ্যানাটমি হলে'।

ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়ে শুয়েছিল তারা বারোটার সময়। এলার্ম বাজতেই উঠে পড়ল দুজনে। অমল সিঁদুর আর তেল আগেই গুলে রেখেছিল একটা শিশিতে। সেইটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

কানু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। অমল চলে গেল অ্যানাটমি হলের দিকে। গিয়ে দেখল 'অ্যানাটমি হলে' ঢোকবার কপাটটা খোলা রয়েছে। জীবেন আগেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্রথমে ঢুকেই কিছু দেখতে পেল না সে। সব অন্ধকার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। খুট খুট করে শব্দ হল। ভাবলে ইঁদুর সম্ভবতঃ। অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হওয়ার পর টেবিলগুলো আবছাভাবে চোখে পড়তে লাগল। প্রোসেকটারের ঘরের সামনের টেবিলটাও চোখে পড়ল তার। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ডান হাতের তর্জনী আঙুলটায় সিঁদুর মাখিয়ে মড়ার কপালে যেই সেটা লাগাতে যাবে অমনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড হয়ে গেল একটা। মড়াটা তাকে জাপটে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চীৎকারও শোনা গেল ভিন্ন কণ্ঠে।

ছুটে গেল কানু আর মুন্না ডোম।

গিয়ে দেখল, অমল অজ্ঞান হয়ে আছে আর জীবেন রক্তে ভাসছে। মড়াটাকে টেবিল থেকে নামিয়ে দিয়ে জীবেনই শুয়েছিল টেবিলের উপর মুন্নার সঙ্গে সড় করে। আর অমলও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল একটা ছুরি।

মুখে জলের ঝাপটা দিতেই অমলের জ্ঞান ফিরে এল। জীবেনকে 'ইমারজেন্সি রুমে' নিয়ে যাওয়া হল। কানু তার কাছে রইল।

অমল যখন নিজের ঘরে ফিরল তখন দুটো বেজে গেছে। ঘরে ঢুকেই আবার চীৎকার করে উঠল অমল। সেই কালো ষণ্ডা মড়াটা তার বিছানার উপর বসে আছে। প্রকাণ্ড চোখ, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। ভূত !

ভূত ধীরভাবে বলল—"তোমাদের খেলা তো শেষ হল, এইবার আমার একটা ব্যবস্থা কর। আমাকে নীচে মেঝের উপর শুইয়ে রেখেছে। আমার বড় শীত করছে—"

অমল কিন্তু তার কথাগুলো শুনতে পেল না, কারণ সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুমার বৈঠকে

ছুটির সময় একপাল ছেলে-মেয়ে জুটেছিল বাড়িতে। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। তর্কে গানে গল্পে বাড়ি একেবারে মশগুল। সেদিন হঠাৎ রাজা-রানীর বিষয়ে তর্ক উঠে পড়ল ঠাকুমার বৈঠকে।

ষোল বছরের ফনতি সবে কলেজে ঢুকেছে।

সে বেণী দুলিয়ে মন্তব্য করল—"যাই বল তোমরা, কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো রানী কখনও হয়নি, আর হবেও না।"

ফনতির সমবয়সী শান্তা ঠোঁট উলটে বলল—"বাজে কথা বলিস নি। রানীর মতো রানী ছিল এলিজাবেথ, যাকে স্প্যানিশ আর্মাডা সামলাতে হয়েছিল। ঘরে বাইরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে নিজের মাথা উঁচু করে রেখেছিল যে, তার সঙ্গে কোন রাজারই তুলনা হয় না তো কুইন ভিক্টোরিয়া,—"

জগু প্রতিবাদ করল এইবার।

"থাম থাম। ওঁরা সব নামেই রানী। ওঁদের প্রত্যেকের পিছনে জাঁদরেল জাঁদরেল পুরুষ মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ছিলেন আলফ্রেড্ দি গ্রেট, উইলিয়ম দি কঙকারার, রিচার্ড দি লায়ন-হার্টেড্। নাম করতে হলে এদের নাম করা উচিত—"

বিলু বললে—"ফ্রান্সের লুই, রাশিয়ার আইভান এরাও কম কি—"

ফনতি হটবার পাত্রী নয়।

সে বলল—"তোমাদের গলায় জোর আছে চেঁচিয়ে যাও, কিন্তু এটা ঠিক জেনে রেখ পৃথিবীর সব রাজা-রানীর সেরা হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়া।"

বিমল তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে এক লাইন গানই গেয়ে দিলে, "রাজা-রানীর সেরা সে যে ভিক্টোরিয়া রানী। আচ্ছা, মেনে নিলাম। ভাল করে চা কর দিকি—"

"আমি একলা পারব না এত কাপ চা করতে। শান্তা তুইও চল—"

ফনতি আর শান্তা চলে গেল।

জীবু এতক্ষণ কিছু বলেনি। বিলুর দিকে চেয়ে এইবার সে বলল—"তুমি ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন এদের রাজা বলবে না?

বিলু বলল—"না। ওরা জাতে আলাদা। জবা ফুল যত ভালো আর যত বড়ই হোক তাকে গোলাপ ফুল কিছুতেই বলা চলবে না—"

বিলু বি. এ. পড়ে। তার ভাব ভঙ্গি একটু ভারিক্কি গোছের।

"ওদের কি বলবে তাহলে?"

"ইংরেজীতে ডিক্‌টেটার বলে। বাংলায় ডাকাতের সর্দার বললে খুব অন্যায় হবে না।"

বারো বছরের মিনি বলে উঠল—"আমার ইতিহাসে কিন্তু যে সব রাজাদের নাম আছে তার তো একটাও বলছ না মেজদা। রামেশিস ইমনাটোন, হাম্মুরাবি, সীজার, নীরো—"

"এসব তোদের পড়াচ্ছে না কি আজকাল—"

"আমাদের বিশ্বের ইতিহাস পড়তে হয় যে—"

"ও বাবা, তাতো জানতাম না !"

মিনির দাদা রমু বললে—"আমাদের দেশের রাজাদের নামও তো করলে না তোমরা। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ করে, দেবপাল, ধর্মপাল, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত কত ভালো ভালো রাজা হয়েছে আদাদের দেশে—"

বিলু ধমকে উঠল।

"থাম থাম ডেঁপো কোথাকার। হিস্ট্রিতে লেটার পেয়ে ভেবেছিস খুব একটা দিগগজ হয়েছিস, না ? ভারতবর্ষের ওসব রাজারা হচ্ছে রূপকথার রাজা—"

রমু ভালো ছেলে, স্কলারশিপ পেয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকেছে, বিলু তা পারে নি, তাই রমুর উপর বিলুর হিংসে আছে একটু।

রমু কিছু না বলে চুপ করে গেল। দাদার মুখের উপর উত্তর দেওয়া যে অনুচিত, এ জ্ঞান তার আছে।

বিমল কিন্তু রমুর হ'য়ে জবাব দিল—"রমু ঠিকই বলেছে। আমাদের দেশের রাজারাই আদর্শ রাজা। রূপকথার রাজা মানে ? অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল এরা সব রূপকথার রাজা ?"

বিলু মুখ বেঁকিয়ে মুচকি হেসে বলল—"প্রায় তাই—"

দীপ্তি বিমলের দিকে চেয়ে হাসল একটু। বিলুর ছোট মাসী সে। বি. এ. পড়ছে।

"বিলুকে বেশী ঘাঁটিও না। ও মস্ত লায়েক হয়েছে। এখুনি হয়তো বলে বসবে সুরেন বাঁড়ুয্যে, চিত্তরঞ্জন, গান্ধি, নেহেরু এরাও সব রূপকথা—"

বিলু কলেজে পড়ে বটে, কিন্তু এখনও বেশ ছেলেমানুষ আছে।

সে নাকে কেঁদে ঠাকুমার দিকে চেয়ে বলল—"দেখ না ঠাকুমা, ছোট মাসী রাগাচ্ছে আমাকে—"

ঠাকুমা আপিং খেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন বসে। কিন্তু এদের কথা শুনছিলেন সব।

বললেন—"তোমরা কেউ কিছু জান না। আসল রাজাদের তো নামই করলে না কেউ—"

"আসল রাজা মানে ?"

"যারা পৃথিবীতে প্রথম রাজা হয়েছিল।"

ঠাকুমার দিকে অবাক হয়ে চাইল সবাই। ঠাকুমা আবার কি বলে!

ঠাকুমা সেকেলে লোক হলেও মুর্খ নন। সে যুগেও বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তা ছাড়া এই সেদিন পর্যন্ত কাগজে কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর কথা তুচ্ছ করবার মতো নয়। ঠাকুমা কি বলেন তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল সবাই। ঠাকুমা কিন্তু কিছু বললেন না, নিমীলিতনয়নে হাসিমুখে বসে রইলেন।

"কোন রাজাদের কথা তুমি বলছ ঠাকুমা ?

"পৃথিবীর প্রথম রাজাদের কথা।"

"কোন বইয়ে আছে তাদের খবর ?"

"কোন বইয়ে নেই।"

আর একটু হাসলেন ঠাকুমা।

"কোথায় আছে তাহলে—?"

"তারা আমার ভাঁড়ার ঘরে আছে!"

ঠাকুমা বলে কি! হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

"তোমার ভাঁড়ার ঘরে!"

ঠাকুমা হাসিমুখে বললেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভাঁড়ার ঘরে। তোমারাও চেন তাদের, কিন্তু জান না। তোমরা কেতাবী কথা মুখস্থ করতেই ব্যস্ত।"

ফনতি আর শান্তা ফিরে এল।

ফনতি বললে—"দুধ কেটে গেছে, চা হল না। কারু এসে দুধ দুইবে তারপর চা হবে।"

"আচ্ছা, তাই হবে না হয়। তোরা বস, ঠাকুমা মজার কথা বলেছেন একটা। পৃথিবীর প্রথম রাজারা না কি ওঁর ভাঁড়ার ঘরে বন্দী হয়ে আছেন—"

শান্তা ঠোঁট টিপে হাসল একটু।

ফনতি গিয়ে ঠাকুমার পাশে বসে তাঁর গলা জড়িয়ে বললে—"কতটা আপিং আজ খেয়েছ ঠাকুমা?"

"সরে বস্ মুখপুড়ী। গায়ে আমানির মতো গন্ধ ছাড়ছে। কি যে সব ছাইপাঁশ মাখিস তোরা আজকাল—"

ফনতি হেসে বললে—"কাল তোমাকেও মাখিয়ে দেব। তোমার টুকটুকে রং আরও টুকটুকে হয়ে যাবে।"

বিমল ধমকে উঠলো।

"ঠাকুমাকে গল্পটা বলতে দে না। এই ফনতি সরে বস ওখান থেকে—"

ঠাকুমা ফনতিকে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—"থাক না, বেশ তো বসে আছে। তোর যদি হিংসে হয় তুইও না হয় এপাশে এসে বস—"

"আমি এখানেই বেশ আছি। পৃথিবীর প্রথম রাজাদের গল্পটা বল শুনি। সব চেয়ে প্রথম রাজা কে?"

ঠাকুমা মুচকি হেসে বললেন—"বেগুন—"

"বেগুন!"

হাসির ধুম পড়ে গেল আবার।

হাসি থামলে ঠাকুমা বললেন—"গোড়া থেকে শোন তবে। পৃথিবী এককালে ঘোর অন্ধকার ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর অন্ধকারে কেটেছে। তারপর সেই অন্ধকার ক্রমশঃ বেগুনী হয়ে গেল। সব বেগুনী। আকাশ বাতাস গাছপালা সব বেগুনী। তখন জন্তু-জানোয়ার মানুষ-টানুষ কিছু জন্মায় নি। চারিদিকে জল আর গাছ-পালা। সেই যুগে একটি ছোট গাছে একটি ফল ফলল, তার রংও বেগুনী। সে-ই রাজা হল। সে-ই হচ্ছে বেগুন। প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগল বেগুন। হুকুম জারি করে দিলে, যার রং বেগুনী নয় সে রাজসরকারে কোন চাকরি পাবে না। হাজার হাজার বচ্ছর এই আইন চলল। কিন্তু এরকম অত্যাচার বেশী দিন চলতে পারে না। বেগুনী রংকে আক্রমণ করল ঘন-নীল রং। অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে ঘন-নীল জিতল। বেগুনী রংকে দূর করে দিয়ে ঘন-নীলের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। ঘন-নীলের রাজত্বকালে রাজা হয়নি, রানী হয়েছিল। তার নাম অপরাজিতা। ভাঁড়ার ঘরের মা-কালীকে যে অপরাজিতা দিয়ে পুজো করি রোজ, সেই অপরাজিতা। ছোট্ট

ওইটুকু ফুল তো, কিন্তু কি যে প্রতাপ ছিল তার সেকালে। সমস্ত পৃথিবী ঘন-নীল করে দিয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুই চিরকাল থাকে না, ঘন নীলের রাজত্বও রইল না। নীল এসে হারিয়ে দিলে তাকে। নীলেদের সঙ্গে আপোষ করে অপরাজিতা একটু ফিকে হয়ে গেল। কিছুদিন রানীও রইল সে।

কিন্তু নীল আকাশই রাজা হল শেষ পর্যন্ত। আকাশের সঙ্গে কি ওইটুকু ফুল পারে? কিন্তু নীলের রাজত্বও বেশী দিন থাকেনি। আগেই বলেছি পৃথিবীতে তখন গাছ-পালাই বেশী। গাছ-পালাদের সবুজ রং জোট পাকিয়ে বিদ্রোহ করলে নীলের বিরুদ্ধে, তারাই জিতল শেষকালে। তারাই প্রথমে শাসন-পরিষদ্ তৈরি করে—যাকে তোমরা এখন পার্লামেণ্ট বল। সবুজ শাসন-পরিষদ। পালংশাক থেকে আরম্ভ করে বটগাছ পর্যন্ত সব রকম সবুজ-পাতাওলা গাছ থাকতে সে সবুজ-পরিষদে। ভোট নিয়ে ঠিক হত কে প্রধানমন্ত্রী হবে। যে পালং শাকের চচ্চড়ি তোমরা রোজ খাও, সে-ই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল একবার। অনেকদিন রাজত্ব করেছিল এরা। কিন্তু একটা জিনিস প্রথমে এদের মাথায় ঢোকেনি, সবুজ চিরকাল সবুজ থাকে না, একটু বুড়ো হলেই হলদে হয়ে যায়। তখন ঠিক হল যে-সব সবুজ প্রবীণ হয়ে হলদে হয়ে গেছে তারা রাজত্ব করুক। পাকা কলা, পাকা লেবু পাকা আম, পাকা পেয়ারা অনেক রকম হলদে পাকা পাতা এরা তখন শাসন-পরিষদে জাঁকিয়ে বসল এসে। কমলা-লেবুরা বললে, আমরা হলদে হইনি বটে, কিন্তু আমরাই বা কম কিসে। আমরাও তো পাকা, আমরাও রসে ভরপুর, আমাদের বাদ দেবে কেন?

মহা আন্দোলন শুরু করলে তারা। শেষ পর্যন্ত জিতেও গেল। কমলা রংই সিংহাসন দখল করে রইল কিছুদিন। কিন্তু সব ফল পাকলে হলদে বা কমলা রং হয় না। লালও হয় অনেকে। তারা বললে—বারে, আমরা বাদ পড়ব কেন তাহলে? লঙ্কা আর তেলাকুচো ফল দল পাকাতে লাগল। রাঙাজবা, রঙ্গন, পলাশ, এরাও সব দলে ভিড়ে গেল। শেষে ভোটেও জিতল তারা। তারাও রাজত্ব করল কিছুদিন। দুনিয়া লালে লাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন অন্য রঙেরা ক্ষেপে উঠল আবার। মহা হট্টগোল বাধল একটা। তাদের হট্টগোলে দেবতারা চটে গেলেন। পাঠিয়ে দিলেন তোদের ঠাকুরদাকে—"

"ঠাকুরদাকে"—সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তিনি এসে গপাগপ করে রংগুলোকে গিলে ফেললেন। আপদের শান্তি হল। কিন্তু তিনি নিজে বিপদে পড়ে গেলেন। অতগুলো রংকে হজম করা কি সহজ কথা। তিনি ছিলেন লম্বা, পট্ করে গোল হয়ে গেলেন। আর গা থেকে তেজ আর আলোর ছটা বেরুতে লাগল। তারপর বনবন করে ঘুরতে লাগলেন। আজও ঘুরছেন। দিবারাত্রি ঘুরছেন। এই চলছে এখন।"

ঠাকুমা চুপ করলেন। ঠাকুরদার কথা উঠে পড়াতে বাকি সকলেও চুপ করে রইল। বছর দুই আগে ঠাকুরদা মারা গেছেন। ঠাকুরদার সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলেন ঠাকুমা। যা বলেন সব সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। যৌবনে ঠাকুরদা না কি গোটা কাঁঠাল, গোটা পাঁঠা খেতে পারতেন। দশ বিশ ক্রোশ পায়ে হেঁটেই চলে যেতেন। কাকে যেন এক থাপ্পোড় মেরেছিলেন, তিন দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। শহর থেকে সায়েব ডাক্তার এনে তবে না কি তার জ্ঞান-ফেরানো হয়।

এ ঠাকুরদাকে অবশ্য নাতি-নাতনীরা দেখেনি। তারা দেখেছিল পুরু-লেন্সের-চশমা পরা রোগা লম্বা এক বৃদ্ধকে। দিনরাত গীতা খুলে বসে থাকতেন। তবে খেতে পারতেন। রোজ ক্ষীর খেতেন একটি বাটি। ঠাকুরদার সম্বন্ধে ঠাকুমা অনেক আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলেন আর সে-সব বিশ্বাস না করলে মনে মনে দুঃখও পান। সবাই ভাবলে সেই রকম বানানো গল্প এটা। আপিঙের ঝোঁকে আরও অদ্ভুত করে ফেলেছেন।

জিতেন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, একটি কথাও বলেনি। সে আই. এস. সি. পড়ে। সে হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল—"বুঝেছি, বুঝেছি, তোমার গল্প বুঝেছি ঠাকুমা। ঠাকুরদার নাম ছিল দিবাকর, দিবাকর মানে সূর্য আর সূর্যের আলোয় সাতটা রং আছে, ভিবজিওর। এইটেই গল্প করে বললে তুমি না? স্বামীর নাম করতে নেই বলে সূর্যের নাম করনি, নয়?"

ঠাকুমা হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

তারপর জিগ্যেস করলেন, "কি বই পড়িস তোরা আজকাল? আমরা গ্যানো পড়েছিলাম।"

ফনতি হঠাৎ ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে চুমু খেলে।

"সর আর জ্বালাস নি তুই। ধুমসি কোথাকার—"

বিমল বলে উঠল—"বোলো ভাই ঠাকুমা মহারানী কী জয়—"

সবাই সমস্বরে বলল—"জয়—"

রবীন্দ্রনাথের গল্প

একবার গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম। খুব গরম সেদিন। তিনি আমার ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"খুব গরম লাগছে বুঝি? পাখার কাছে একটু সরে বস।"

তারপর একটু হেসে বললেন, "এখন এখানে ইলেকট্রিসিটি হয়েছে, আগে তো কিছুই ছিল না। ঘোর গ্রীষ্মে তখন কতদিন কাটিয়েছি এখানে—"

বললাম, "কষ্ট হত নিশ্চয় খুব—"

হেসে উত্তর দিলেন, "না খুব কষ্ট হত না। গরম নিবারণের একটা খুব ভাল ওষুধ জানা আছে আমার।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

বললেন, "কবিতা লেখা। বেলা বারোটার সময় একটা কবিতা লিখতে শুরু করলে সমস্ত দুপুরটা যে কোন দিক দিয়ে কেটে যায় জানতেও পারি না। হঠাৎ দেখি বিকেল হয়ে গেছে।"

কুঁজোর জল

আর একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে দেখি তিনি টেবিলের উপর খুব ঝুঁকে পড়ে লিখছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, বস। তাঁর ওই ঝুঁকে পড়া দেহটার দিকে চেয়ে আমার মনে হল নিশ্চয়ই ওঁর ওভাবে লিখতে কষ্ট হচ্ছে।

বললাম, আজকাল তো নানারকম টেবিল নানারকম ডেস্ক বেরিয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেও আরামে লেখা যায়।

তিনি উত্তর দিলেন, সে সব আমার আছে, তবু কিন্তু এই টেবিলে বসে এমনি করে লিখতে হয়। কুঁজোয় জল কমে গেছে যে, উপুড় না করলে কিছু বেরোয় না।

ভোরের স্বপ্ন

খোকন এখন অনেক বড় হয়েছে কিন্তু এখনও সে সেই স্বপ্নটা দেখে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, জেগে জেগেই। তখন স্কুলে পড়ত। সেটা ঠিক সরস্বতী পুজোর আগের দিন। স্কুলে খুব ধুমধাম করে পুজো হবে। মাস্টারমশাই বলেছেন কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা হবে, তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন। পুজোর ঠিক আগের রাত্রে তিনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন প্রতিমা। বিকেল বেলাই দেবদারু-পাতা আর রঙীন-কাগজের শিকল দিয়ে স্কুল সাজানো হয়ে গেছে। কালু, রমু, বিনয় আর পরেশের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, তারা খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ডাকতে আসবে খোকনকে। সবাই মিলে মাঠে যাবে যবের শীষ, আমের মুকুল আর কুল সংগ্রহ করতে। খোকন বাইরের ঘরে শুয়েছে সেজন্য, যাতে তারা ডাকলেই শুনতে পায়।

...ভোর বেলা স্বপ্নটা দেখল।

খোকন একাই যেন চলেছে মাঠের দিকে। পকেটে আছে বাঁশের ছোট বাঁশিটা, আর গোটা দুই চকোলেট। খোকন তখনই বাঁশি বাজাতে শিখেছিল। যাঁর কাছে শিখত তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি মন দিয়ে বাজাও তাহলে বেশ বড় বাজিয়ে হতে পারবে। বাবা বলেছিলেন, ক্লাসে যদি ফার্স্ট হতে পার ভাল বাঁশি কিনে দেব। তাই খোকন যখনই বেড়াতে বেরোয় বাঁশিটি সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। শহরের বাইরে যে মাঠটা আছে সেটার ওপারে আছে একটা বাগানের মতো। ঠিক সাজানো গোছানো বাগান নয়। এলোমেলো নানা-রকম গাছ আছে সেখানে, অনেক গাছের নামও জানে না সে। আম, জাম, আতা, শিমুল, আকন্দ, কাপাস, ঘেঁটু, বাবলা এলোমেলো ভাবে হয়েছে সেখানে। এক ধারে একটা বাঁশ ঝাড়ও আছে। তারপর আবার মাঠ। যব, গম, সর্ষের ক্ষেত। জায়গাটি খুব পছন্দ খোকনের। বেশ নির্জন। এইখানে এসে অনেক সময় সে বাঁশি বাজায় বসে।

সেই বাগানের দিকেই চলেছে খোকন। সঙ্গে টর্চও নিয়েছে। অন্ধকার তখনও কাটেনি ভাল করে। তার ভয় করছে না। খুব ভাল লাগছে।...চলেছে তো চলেইছে।

পথ যেন ফুরোয় না। মনে হচ্ছে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা যেন সুর বাজাছে। সুর, না নূপুরের আওয়াজ, না ঝিঁঝির ডাক? টর্চের আলো ফেলে ফেলে চলতে লাগল। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। চলতে লাগল সে। তার কেবলি মনে হতে লাগল কিছু একটা হবে এইবার। কি হবে তা কিন্তু বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ পরে মাঠে এসে পড়ল। চেনা মাঠ কিন্তু মনে হতে লাগল অচেনা। দিনের বেলা কত ছোট কিন্তু অন্ধকারে মনে হচ্ছে অফুরন্ত। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেলে কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল খোকন। তারপর টর্চের আলো ফেলে দেখলে। আশ্চর্য হয়ে গেল, ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি। এ রকম সময়ে কোন্ মেয়ে একা মাঠে আসবে! দিনের বেলাতেও কোনও মেয়েকে সে মাঠে দেখেনি। আরও আশ্চর্য হল মেয়েটি যখন আর একটু এগিয়ে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সুন্দর মুখখানি। ধপধপে ফরসা রং, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি, একমাথা কালো চুল, পিছনে বেণী দুলছে। চমৎকার কোটও গায়ে দিয়েছে একটি। খোকনের মনে হল মখমলের, সাদা মখমল। তার উপর ফিকে নীল রেশমের কাজ করা। অদ্ভুত মানিয়েছে। সমস্তটাই যেন অদ্ভুত মনে হল খোকনের। গায়ে-পড়ে আলাপ করা তার স্বভাব নয়। মেয়েটির দিকে এক নজর চেয়ে তাই এগিয়ে গেল সে। তারপর আলো ফুটতে লাগল ধীরে ধীরে। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। খোকন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটি তার পিছু পিছু আসছে। চোখাচোখি হতেই আবার মুচকি হাসল একটু। তারপর এক ছুটে চলে এল তার কাছে।

"তুমি বুঝি খোকন?"

"হ্যাঁ। আমার নাম জানলে কি করে তুমি!"

মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে বললে, "অনেকদিন থেকে জানি!" খোকন তো একে দেখেই নি কখনও। এই সহরেই থাকে না কি! কোন পাড়ায়?

"তুমি কি এইখানেই থাক?"

ঘাড় কাত করে মেয়েটি জানালে এইখানেই থাকে সে।

"নাম কি তোমার?"

"মণ্টি।"

বলেই সে হাসতে লাগল।

তারপর পাশাপাশি চলতে লাগল দু'জনে।

হঠাৎ মেয়েটি বললে, "তোমার বাঁশি আমি শুনেছি—"

"কোথায় শুনলে!"

এর জবাব না দিয়ে মুচকি হাসলে সে আবার। খোকন লক্ষ্য করল, হাসলে তার গালে টোল পড়ে।

খোকন উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল।

মেয়েটি তার পকেটের দিকে চেয়ে বললে, "বাঁশি এনেছ দেখছি। দেখি বাঁশিটা—"

খোকন বাঁশিটা পকেট থেকে বার করে তার হাতে দিলে। বার করতে গিয়ে একটা চকোলেট পড়ে গেল মাটিতে। খোকন সেটা কুড়িয়ে পকেটে রেখে দিলে।

"ওটা কি?"

"চকোলেট।"

"একটি মাত্র এনেছ না কি ?"

"আর একটা আছে।"

মেয়েটি আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। অদ্ভুত হাসি মেয়েটির। মনে হয় ভিতর থেকে একটা আলোর আভা যেন ছড়িয়ে পড়ছে চোখে মুখে।

"হাসছ কেন ?"

"চকোলেট পকেটে রেখেছ দেখে।"

"কোথায় রাখব তাহলে ?"

"মুখে।"

খোকনও হেসে ফেললে এবার।

"মুখেই রাখতাম। কিন্তু আজ সরস্বতী পুজো। অঞ্জলি না দিয়ে খাব কি করে।—"

"ও, তাই বুঝি ?"

একথা শুনে আবার অবাক হল খোকন। অঞ্জলি না দিয়ে কিছু খেতে নেই তা জানে না এই বুড়ো ধাড়ি মেয়ে। খ্রীষ্টান না কি।

···মাঠের মাঝামাঝি এসে পড়েছে তারা তখন। একপাল গরু আর ভেড়াও চরছে দেখা গেল।

হঠাৎ মেয়েটি বললে, "আমি একটা ম্যাজিক জানি। দেখবে ?"

"কি ম্যাজিক ?"

"দেখবে কি না বল না ?"

"দেখাও তো দেখব না কেন ?"

"ভয় পাবে না তো ?"

"আমি ভীতু নই। দেখাও কি দেখাবে।"

মেয়েটি হেসে ঠোঁটের ভঙ্গী করে বললে, "আমি কিন্তু অমনি ম্যাজিক দেখাই না।"

"আমি তো পয়সা সঙ্গে করে আনিনি।"

"একটা চকোলেট পেলেই দেখাব।"

ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটি তার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। সত্যি কি মিষ্টি হাসি মেয়েটার।

"এখনই চকোলেট খাবে ? অঞ্জলি দেবে না ?"

এর কোন উত্তর না দিয়ে একছুটে এগিয়ে গেল মেয়েটি। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে খোকনের দিকে একবার চেয়ে আবার ছুটতে লাগল। খোকনের ভয় হল রাগ করে চলে যাচ্ছে না কি।

"শোন, শোন—"

ডাক শুনে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর ফিরে দাঁড়াল। মুখে মুচকি হাসি, চোখে ফুটে উঠেছে যেন একটা গর্ব আর স্পর্ধা। ভাবটা যেন—জানতাম আবার ডাকবে। কি বলছ—?

"ম্যাজিক দেখাবে বললে অথচ চলে যাচ্ছ যে। এই নাও চকোলেট—"

এগিয়ে গিয়ে দুটো চকোলেটই সে বার করলে পকেট থেকে।

"দুটো চাই না। একটা নেব। আর একটা তোমার জন্যে থাক।"

টপ্ করে একটা চকোলেট সে খোকনের হাত থেকে তুলে নিলে, তারপর আড়চোখে খোকনের দিকে চাইতে চাইতে রাংতার মোড়কটা খুলতে লাগলো।

"কি রকম ম্যাজিক দেখাবে?"

চকোলেটটা মুখে ফেলে দিয়ে মেয়েটি বলল, "এখুনি দেখতে পাবে। তোমার হাতটা দেখি—"

হাত বাড়িয়ে দিলে খোকন।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলে ধপধপে সাদা একটা শাঁকের আংটি পরিয়ে দিলে মেয়েটি। তারপর বললে, "ওই দেখ—।" বলেই দে ছুট। দূরে একটু কুয়াসা হয়েছিল। খোকনের মনে হল মেয়েটি সেই কুয়াসার ভিতর মিলিয়ে গেল।

তারপরই ঘটতে লাগল সব অদ্ভুত কাণ্ড।

সামনে যে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছিল তাদের দিকে চেয়ে খোকন অবাক হয়ে গেল। গরুগুলো নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শিং-ওলা মানুষ কতকগুলো। পায়ে জুতোর বদলে খুর, হাতেও আঙুলের বদলে খুর। মুখও গরুর মতো, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে, ঠিক মানুষ যেন। মানুষের মতোই কাপড়-জামা পরা, কিন্তু পিছনে কাছার ফাঁক দিয়ে ল্যাজও ঝুলছে। এরা কে! মানুষ-গরু, না গরু-মানুষ। মনে পড়ে গেল সুকুমার রায়ের কবিতাটা। শুধু গরু নয়, যে ক'টা ভেড়া ছিল তারাও মানুষের মতো দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে! আর সবচেয়ে আশ্চর্য, বাঙালীর মতো বাংলা ভাষায় কথা বলছে তারা!

খোকন শুনতে পেলে একটা গরু বলছে, "ওই যে আসছে ডাকাতটা। জুতো মশমশিয়ে আসছে। লজ্জাও নেই। আমাদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে জুতো বানিয়েছে আর তাই পরে বেড়াচ্ছে। অথচ এর জন্যে এতটুকু লজ্জা নেই ওর। শুধু কি জুতো, আমাদের কি কম নির্যাতন করে ওরা! আমরা ওদের লাঙল টানছি, মাল বইছি। আমরা ওদের দুধ খাওয়াচ্ছি। আমাদের বাছুরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে ওরা। ভণ্ডামি করে আবার গরুকে মা বলা হয়। পাজি ভণ্ড সব!"

ভেড়া বললে, "শুধু তোমাদের কেন, আমাদের উপর কি ওরা কম অত্যাচার করে? ওর ওই গরম কোটটা দেখ না। আমাদের গা থেকে লোম কেটে নিয়ে তবে না ওই গরম জামা হয়েছে। শুধু কি জামা, কম্বল টম্বল কত কি বানায় ওরা আমাদের লোম লুট করে! আর ওর নধর চেহারাটা কি কেবল দুধ খেয়ে হয়েছে ভেবেছ, মাংস খায় না? আমাদের কেটে খায়। কেটে কেটে আমাদের তো শেষ করে এনেছে। ওরা আবার নিজেদের সভ্য বলে! ওরা খুনে, ওরা পাষণ্ড—"

হঠাৎ চারিদিক থেকে রব উঠল—"ওরা আমাদের খায়। আমাদের ডাল, পাতা, ফল, শিকড় কিছু বাদ দেয় না। আমাদের কেটে কুচিয়ে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে ভেজে ধ্বংস করে রোজ। কি যন্ত্রণা যে দেয় তা আর কহতব্য নয়।"

খোকন দেখলে মাঠের গাছেরা চীৎকার করছে। বাগানের আমগাছ, জামগাছ, মাঠের গম যবের চারা, তার পাশে সবজী-ক্ষেতের শাক-সব্জিরা সবাই যোগ দিয়েছে সে চীৎকারে।

পাশে যে পুকুরটা ছিল তার থেকে মাছেরাও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বলতে লাগল—"আমাদেরও বাদ দেওয়া হয় না। আমরা জলের তলায় থাকি তবু আমাদের নিস্তার

নেই। রোজ লক্ষ লক্ষ ছিপ আর লক্ষ লক্ষ জাল পড়ছে আমাদের জন্যে। ওরা সর্বভুক্, ওরা রাক্ষস—"

আকাশ থেকেও শব্দ আসতে লাগল।

"আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি। ওরা আমাদের এলাকাতেও হানা দিয়েছে এবার।"

খোকন দিশাহারা হয়ে পড়ল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, মেয়েটিকে দেখতে পেল না কোথাও। ছুটে এগিয়ে গেল খানিকটা। সামনেই সারি সারি কয়েকটা কার্পাস গাছ।

শুনতে পেল তারা বলছে—"আমাদের তুলা চুরি করে কেমন কাপড় পরেছে দেখ না—"

কি করবে ভেবে পেল না খোকন। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর ভরে উঠল তার। শীতেও কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সত্যিই কি আমি চোর, ডাকাত, খুনে, রাক্ষস? কিন্তু ওরা যা বলছে তাও তো মিছে কথা নয়!

শুনতে পেল বাঁশগাছের ঝাড় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে, "আমাদের কেটে চিরে টুকরো টুকরো করে ঘর-বাড়ী তৈরী করে ওরা, আসবাব তৈরী করে। ওই যে ওর পকেটে বাঁশিটা রয়েছে সেটা আমাদেরই কাউকে কেটে করেছে। আর শুধু কি কেটে? কেটে, শুকিয়ে, চেঁচে, গরম লোহার শিক পুড়িয়ে ছাঁদা করে তবে হয়েছে ওই বাঁশী—! ভয়ানক নিষ্ঠুর ওরা।"

খোকন আংটিটা খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে সব যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। দেখতে পেল সেই মেয়েটাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার দিকে চেয়ে হাসছে।

খোকন অবাক তো হয়েই ছিল এবার ভয়ও পেল একটু। যদিও একটু আগেই সে বলছিল ভয় পাবে না। কে এই মেয়েটি? কোন মায়াবিনী ডাইনী টাইনী নয় তো। কোথা থেকে এল! এর আগে তো কখনও দেখিনি একে।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস না এদিকে—"

মেয়েটি মুচকি হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলে খোকনকে।

খোকন দাঁড়িয়ে রইল, যাবে কি না ভাবতে লাগল। এক-একবার এ-ও মনে হতে লাগল বাড়ী ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু তখনই মনে পড়ল যবের শীষ, আমের মুকুল সংগ্রহ করা হয়নি। অঞ্জলি দেবার সময় ওগুলো চাই।

কালু রমেশ, বিনুরা আসবে বলেছিল কিন্তু কেউ তো এল না। কোথা থেকে এই অদ্ভুত মেয়েটা জুটে গেল।

হঠাৎ খোকন দেখতে পেল মেয়েটাই ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই খোকন বললে—"এই নাও তোমার আংটি—"

মেয়েটি মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, "কেমন ম্যাজিক দেখালুম?"

"খুব অদ্ভুত সত্যি। কি করে হল বল তো?

"তা জানি না। কেমন লাগল তোমার?"

"খুব খারাপ লাগল। আমি সত্যি ওই রকম? দু'হাতে কেবল লুট আর খুন করে চলেছি?"

"পৃথিবীর সমস্ত বীরদের তো ওই পরিচয়। ইতিহাস তো পড়েছ?"

"পড়েছি। কিন্তু এমনভাবে চোখে আঙুল দিয়ে কেউ আর দেখিয়ে দেয়নি যেমন তোমার আংটি দেখিয়ে দিলে। আচ্ছা, কেমন করে হল বল তো?"

"বললুম তো জানি না। ও আংটি যে পরে সে-ই ওরকম দেখতে পায়। যে শাঁখা দিয়ে ও তৈরী সে শাঁখের নাম জ্ঞান-শঙ্খ। আমি একজন সাধুর কাছে পেয়েছিলুম ওটা।"

"আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, "তোমাকে কিন্তু একটা কথা বলতে পারি।"

"কি?"

"নিজেকে তুমি যতটা হীন মনে করছ ততটা হীন তুমি নয়। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে অপরকে খানিকটা শোষণ করেই বাঁচতে হয়। গাছেরা মাটির রস শোষণ করে, গরু-ভেড়ারা ঘাস-পাতা ছিঁড়ে খায়। এ না হলে সৃষ্টি রক্ষা হত না। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না তুমি। তোমার আর একটা রূপ আছে। সেটা তোমার চোখে পড়েনি এখনও।"

"কি সেটা?"

"দেখাচ্ছি। এস না আমার সঙ্গে—"

"কোথায় যাব?"

"ওই মাঠে।"

খোকন মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলতে লাগল মেয়েটির পিছু পিছু।

মেয়েটি বাগান পেরিয়ে নামল মাঠে। যবের ক্ষেত। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। তার উপর হীরের টুকরোর মতো ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য শিশিরকণা। যবের ক্ষেতের মাঝখানে একটি আমগাছ। থোকো থোকো মুকুল তাতে। গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি চলতে লাগল সেই গাছের দিকে। গাছের তলায় দুটো ঢিবি ছিল। একটা উঁচু আর একটা নীচু। মেয়েটি যবক্ষেতের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেই উঁচু ঢিবিটিতে উঠে বসল।

"তুমি এইটেতে বস।"

খোকন বসল নীচু ঢিপিতে।

"এইবার আংটিটি পরে চোখ বুজে বাঁশি বাজাও দিকি। বেশ মজার জিনিস দেখতে পাবে একটা। চোখ খুলো না কিন্তু"—

খোকন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আপত্তি করবার মতো মনের জোর ছিল না তার আর। সে চোখ বুজে বাঁশিতে ফুঁ দিলে। কিছুদিন থেকে সে আশাবরীর গৎ সাধছিলো একটা, সেইটেই বাজাতে লাগল। বাজাতে শুরু করেই আশ্চর্য হয়ে গেল সে। বাঃ, সুন্দর বাজছে তো। এমনভাবে তার বাঁশি তো আর কোনদিন বাজেনি। মনে হল সুরের ঝরণা যেন নেমে আসছে তার বাঁশি থেকে। তন্ময় হয়ে বাজাতে লাগল খোকন। আশাবরীতে ডুবে গেল সে যেন।

...ক্রমশঃ তার নিমীলিত দৃষ্টির সামনে মূর্ত হতে লাগল এক নূতন জগৎ। সে জগতে অন্ধকার নেই, প্রখর আলোও নেই। এক আবছা মৃদু নীলাভ আলোর ঢাকা সমস্ত আকাশ। অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছে। এমন নীল আকাশ আর এত উজ্জ্বল নক্ষত্র খোকন আর কখনও দেখেনি। তার মনে হল নক্ষত্রগুলো যেন কাঁপছে;

তারা যেন জীবন্ত, বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে কি যেন বলতে চাইছে আলোর ভাষায়, কিন্তু খোকন বুঝতে পারছে না, সে কেবল দেখছে নক্ষত্রগুলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ক্রমশঃ। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে তাদের দিকে। তাদের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সে সচেতন হল, তার চারপাশেও ভিড় জমে গেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন এসে দাঁড়িয়েছে। যে গরু আর ভেড়ারা একটু আগে তাকে গাল দিচ্ছিল সবাই হাত-জোড় করে দাঁড়িয়েছে তারা।

বলছে, "এতক্ষণ আমরা ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। তুমি সুরের সাধক, তাই তুমি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্। তোমার এই সুর শুধু বাঁশিতেই বাজছে না, বাজছে তোমার ধর্মে, তোমার বিজ্ঞানে, তোমার সভ্যতায়, তোমার সংস্কৃতিতে। তোমার এই বিরাট সৃষ্টির জয়যাত্রায় আমাদেরও ডেকেছ তুমি সহায়তা করবার জন্য, এতেই আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য।"

গাছপালা মাটি আকাশ সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য।"

খোকন তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছে।

এরপর যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত। খোকনের বাঁশির সুর ছাপিয়ে আর একটা সুর বাজতে লাগল। সুন্দর গম্ভীর মিষ্টি সুর একটা। সে সুরের ঝংকারে আকুল হয়ে উঠতে লাগল চতুর্দিক। সেই আবছা মৃদু নীলাভ আলো স্বচ্ছ হতে লাগল ক্রমশঃ। এর ঠিক পরেই একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখতে পেলে খোকন চক্রবাল-রেখায়। যেখান থেকে রোজ সূর্য ওঠে সেইখানে সোনার মতো চকচকে কি যেন একটা উঠেছে, রঙটা সূর্যেরই মতো, কিন্তু গোল নয় তিন-কোণা। সূর্য তিন-কোণা হয়ে গেল কি করে? ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল সেটা। তখন খোকন দেখে অবাক হয়ে গেল ওটা সূর্য নয়, মণিমাণিক্য-খচিত সোনার মুকুট তারপর মুকুটের নীচে কপাল দেখা গেল, তারপর চোখ আর ভুরু। জীবন্ত চোখ, কি দৃষ্টি সে চোখের! সমস্ত মুখটা উঠল তারপর। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সুরের ঝংকার, মনে হতে লাগল লক্ষ লক্ষ ভ্রমর গুঞ্জন করছে যেন। মুখের পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটা দেখা গেল। খোকন সবিস্ময়ে দেখল— এ কি! এ যে সরস্বতীর জীবন্ত প্রতিমা, সদ্য-ফোটা শতদলের উপরে বসে আছেন, পায়ের কাছে জীবন্ত হাঁস, বীণা বাজাচ্ছেন বীণাপাণি। সোনালী আলোর ছোঁয়া লেগে স্বচ্ছ হয়ে গেছে আবছা নীলাভ আলো। খোকন অবাক হয়ে দেখতে লাগল— সরস্বতীর মুখ ওই মেয়েটির মতো।

খোকনের বাঁশি থেমে গেল। চোখ খুলে চেয়ে দেখলে উঁচু ঢিবির উপর মেয়েটি বসে আছে। খোকনের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে যবের শীষ, মাথার উপর দুলছে আমের মুকুল। আমের মুকুল ঝরে ঝরেও পড়ছে তার পায়ে।

"বাঁশি থামালে কেন, চোখই বা খুললে কেন?

এসব কথার জবাব না দিয়ে খোকন জিগ্যেস করলে, "তুমিই কি সরস্বতী?"

"দুৎ। আমি তো মণ্টি।"

"কিন্তু তোমাকে ঠিক সরস্বতীর মতো দেখাচ্ছে। তোমার পায়ের কাছে যবের শীষ আর আমের মুকুল। মনে হচ্ছে যেন সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে—"

"অঞ্জলি দেওয়া যখন হয়েই গেছে তখন চকোলেটটা খেয়ে ফেল এইবার।"

ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল খোকনের। দেখলে অনেক বেলা হয়ে গেছে। তাকে তো ডাকতে আসেনি ওরা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল বিছানা থেকে। জামা গায়ে দিল। জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখলে দুটো চকোলেটই আছে। তারপর মুখ ধুয়ে ছুটল স্কুলে। রাত্রের ট্রেনে মাষ্টারমশাই কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়। এতক্ষণ প্রতিমা বোধ হয় বসানো হয়ে গেছে।

খোকন গিয়ে দেখল এ প্রতিমার মুখও ঠিক সেই মেয়েটির মতো। তার দিকে চেয়ে ঠিক মুচকি মুচকি হাসছে।

মণ্টিকে আর দেখতে পায়নি খোকন।

খোকন এখন অনেক বড় হয়েছে। নাম-করা বাঁশি-বাজিয়ে হয়েছে সে। অনেক প্রাইজ, অনেক মেডেল পেয়েছে। লেখা-পড়াতেও সে বেশ ভালো ছেলে। কিন্তু ওই স্বপ্নটা সে এখনও দেখে, ঘুমিয়ে নয়, জেগে জেগেই।

কোলকাতার আকাশ

সুরেন পালিত মফঃস্বল থেকে কোলকাতায় এসেছে তার ভগ্নীপতির বাড়িতে। চিৎপুরের একটা গলির ভিতরে চারতলা একটা বাড়ীর ফ্লাটে থাকে তার ভগ্নীপতি নীলমণি। নীলমণি আটটার সময়ে কাজে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যা ছ'টার পর। যাবার সময় সুরেনকে সাবধান করে যায়—একলা রাস্তায় বেরিও না যেন। সুরেন মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা। সুরেন খাওয়াদাওয়া সেরে চুপ করে বসে থাকে জানালার ধারে, চেয়ে থাকে কলকাতার আকাশের দিকে। দেখে অনেক চিল উড়ছে, অনেক। এত চিল কোথা থেকে আসে এখানে? মনে প্রশ্ন জাগে তার, কিন্তু উত্তর পায় না। তার দিদিকে একদিন জিগ্যেস করেছিস সে। দিদি সংক্ষেপে বলেছিল, কি জানি। তারপর তার মনে জেগেছিল আর একটা প্রশ্ন, এত চিল রাত্রে থাকে কোথায়? কোথায় ঘুমোয় ওরা? চারিদিকে তো কেবল বাড়ী, বাড়ী আর বাড়ী। গাছপালা তো তেমন নেই। দিদিকে এ কথাটাও জিগ্যেস করেছিল সে। দিদি সেই একই উত্তর দিয়েছিল, কি জানি। তারপর হেসে বলেছিল, চিল নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে মরছিস কেন? ঘুমো একটু। কিন্তু সুরেনের চোখে ঘুম আসে না। সে সারাদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। একদিন এরোপ্লেন দেখতে পেলে একটা। আর একদিন ঘুড়ি। এরোপ্লেন আর ঘুড়ি সে গ্রামেও দেখেছে। কিন্তু এত চিল সে কখনও দেখেনি একসঙ্গে। অসংখ্য চিল ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে, আশ্চর্য ব্যাপার। চিলের ব্যাপারটা তার মনে বেশ দাগ কেটে বসে গেল। বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। একি কাণ্ড!

সুরেনের বয়স বেশী নয়। আট বছর মাত্র। তাদের বাড়ী হুগলী জেলার এক পাড়াগাঁয়ে। বাড়ীর পিছনে পুকুর, পাশে শিবমন্দির। পুকুরের পাড়ে তালগাছের সারি। তাছাড়া আরও নানারকম ঝোপ ঝাপ, নানারকম পাখি। চড়ুই, শালিক, টিয়া, হলদে পাখি, দোয়েল, বুলবুল, কোকিল কত রকম পাখি দেখছে সে এখানে। মাঝে

মাঝে শিয়ালও দু'একটা। কিন্তু এখানে কেবল চিল আর কাক। পায়রাও আছে, কিন্তু চিলই বেশী।

তার ভগ্নীপতি নীলমণিবাবু আপিস থেকে ফিরে এসে রোজই এক কথা বলে, কাছাকাছি স্কুলে সীট পাওয়া যাচ্ছে না। কোলকাতার স্কুলে পড়বে বলে সুরেন এসেছে। কোলকাতায় অনেক স্কুল, কিন্তু নীলমণি সুরেনকে দূরে পাঠাতে চায় না। তার ভয় হয় পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ট্রামে বাসে চড়তে পারে না, হয়ত কোথাও হারিয়ে যাবে।

এইভাবে দিন কাটছিল। রোজই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। দিনের বেলা জানলার ধারে বসে চিল দেখা আর সন্ধে-বেলা নীলমণিবাবুর কথা শোনা—স্কুলে সীট পাওয়া যাচ্ছে না।

দিন কতক পরে পাড়ার বীরেনের সঙ্গে ভাব হল তার। বীরেন বয়সে কিছু বড়। একেবারে চৌকশ ছেলে। কত খবরই যে রাখে। খেলার খবর, সিনেমার খবর, কোথায় কবে প্রসেশন বেরুবে তার খবর, সমস্ত তার নখদর্পণে। পরনে হাফ্‌প্যাণ্ট, হাফ্‌সার্ট। পায়ে চপ্‌পল। মাথার চুল অদ্ভুত কায়দায় ছাঁটা। পিছনে কিছু নেই, সামনে গোছা গোছা।

বীরেন একনজরেই বুঝে গেল সুরেন কি চীজ্‌। ওকে তাক লাগিয়ে দেওয়া কত সহজ। নানারকম লম্বাই চওড়াই করতে লাগল সে সুরেনের কাছে। কি করে সে স্কুলের দুঁদে মাষ্টার বিশ্বম্ভরবাবুকে এক ধমক দিয়ে 'থ' করে দিয়েছিল, কি করে স্কুলের দুর্জয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড ধীরু সাণ্ডেলকে লেঙ্গি মেরে কাত করে দিয়েছিল, কোন্‌ সিনেমা স্টারের বারোটা বেজে গেছে, কোন্‌ ক্রিকেট টিমের পড়তা পড়েছে এবার—এই ধরনের গল্প করে সুরেনকে অবাক করে দিত সে। সুরেন হাঁ করে তার কথা শুনত, আর যা শুনত তা বিশ্বাস করত।

সুরেন একদিন তাকে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, ভাই, একটা কথা বলতে পার? এখানে দিনের বেলা আকাশে এত চিল ওড়ে কেন, আর রাত্তির বেলা ওরা থাকেই বা কোথা।"

সবজান্তা হাসি হেসে বীরেন বলল—"ও, তা জান না বুঝি। জানবেই বা কি করে? অজ পাড়াগাঁয়ে থাকো তো। ওসব চিল সাধারণ চিল নয়।"

"কি রকম?"

"ওরা মানুষ। চোর, ডাকাত, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। রাত্রে চুরি ডাকাতি করে চোরা-বাজারে ঘোরে আর দিনের বেলা আকাশে চিল হয়ে ওড়ে।"

সুরেনের চোখ দুটো দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

"মানুষ চিল হয় কি করে?"

"তা জান না বুঝি, জানবেই বা কি করে। ওদের প্রত্যেকের এক একটি করে গুরু আছে। সে গুরুরা মন্ত্রবলে ওদের চিল করে দেয়। সে মন্ত্রের নাম ছোঁ-মন্ত্র। সেই মন্ত্র বলে গুরুরা একবার ছুঁয়ে দিলেই মানুষ চিল হয়ে যায়। আবার আর এক মন্ত্রে চিলরা মানুষ হয়।"

"সত্যি?"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল সুরেন।

বীরেনের কথা অবিশ্বাস করবার শক্তি ছিল না সুরেনের। বীরেন চলে যাবার পর আকাশের দিকে চেয়ে রইল সে। ওই অত চিল—সব চোর ডাকাত! ভয় ভয় করতে লাগল।

এর দিন দুই পরে আর একটা লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটল। ছাত্রেরা নাকি শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, পুলিশ তাদের উপর গুলি চালিয়েছে। হতাহতের সংখ্যা অনেক। হাত-পা নেড়ে বিরাট বক্তৃতা করে গেল বীরেন।

সুরেন হাঁ করে শুনতে লাগল।

"পুলিশ গুলি চালিয়েছে কেন?"

"আরে, কি বোকা, ওরা গুলি চালাবার জন্যে মাইনে পায়, গুলি চালাবে না?"

চুপ করে রইল সুরেন।

তার আর একটা কথা জিগ্যেস করছে ইচ্ছে করছিল—ছাত্রেরা শোভাযাত্রা করেছে কেন। শোভাযাত্রা মানে কি।

কিন্তু বীরেনের কাছে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করতে লজ্জা হল তার।

চুপ করে রইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে চুপ করে বসেছিল জানালার ধারে। একটিও চিল নেই আকাশে। এতক্ষণে সব মানুষ হয়ে গেছে বোধ হয়। ছোরাছুরি নিয়ে কিলবিল করছে কোলকাতার অলিতে-গলিতে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল তার।

তারপর দেখতে পেল দু'একটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সন্ধ্যাতারাকে। তাদের গাজিপুরে এই সময় রোজ দেখা যেত তাকে। বারান্দায় বসে দেখতে পেত। শিবমন্দিরের চুড়োর পাশে দপদপ করে জ্বলত রোজ। অনেকক্ষণ ধরে জ্বলত। তারপর তালগাছটার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত খানিকক্ষণ। তারপর আবার বেরুত। সুরেনের মনে হত তার সঙ্গে যেন ও লুকোচুরি খেলছে। কিন্তু এখানে কোথায় গেল সেই সন্ধ্যাতারা?

প্রত্যাশিত দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল সে।

তার পরদিন জিগ্যেস করলে বীরেনকে—"আচ্ছা ভাই, এখানে সন্ধ্যাতারা দেখা যায় না?"

"দেখা যায় বই কি।"

"আমি তো একদিনও দেখতে পাইনি।"

"তুমি হাঁদারাম তাই দেখতে পাওনি। আচ্ছা, আজ সন্ধ্যের সময় দেখিয়ে দেব তোমাকে।"

সন্ধের সময় বীরেন এসে নিয়ে গেল ছাদে।

"ওই দেখ—"

সুরেন দেখল রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো বাড়ি দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাড়ির ছাদের উপর থেকে বিরাট শজারুর কাঁটার মতো অনেক কাঁটা বেরিয়ে আকাশে যেন খোঁচা মারছে।

"ওগুলো কি?"

"ম্যারাপ্ বেঁধেছে। বিয়ে হবে বোধ হয়।"

"বিয়ে হবে? কই আমরা তো শুনিনি। আমাদের তো নিমন্ত্রণ করেনি।"

"হাঁদারাম কোথাকার। তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে যাবে কেন? তোমরা কি ওদের আত্মীয়? কোলকাতায় আত্মীয়দেরই অনেকে করে না। এ কি তোমাদের পাড়াগাঁ পেয়েছ?"

সুরেন কেমন যেন একটু বিমর্ষ হয়ে গেল। চুপ করে চেয়ে রইল ম্যারাপের দিকে। আকাশে খোঁচা মারছে, কেবলি মনে হতে লাগল তার।

"সন্ধ্যাতারা কোথায়?"

"ওই যে। দুটো বাড়ির ফাঁকে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ না?" প্রকাণ্ড দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে আকাশে যে চিলতেটুকু দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে দেখতে লাগল বীরেন।

"ওই যে দেখতে পাচ্ছ না?"

"ওই সন্ধ্যাতারা? আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যাতারা ওঠে শিবমন্দিরে চুড়োর পাশে, দপ দপ করে জ্বলে। কি তার রূপ! এ তো টিম টিম করছে।"

"হাঁদারাম, এ পাড়াগাঁ নয়, এ কোলকাতা।"

সুরেনের মনে হল ওই ম্যারাপ-ওলা বাড়িটার ভয়ে সন্ধ্যাতারা হয়তো ছোট হয়ে গেছে। কাঁপছে···।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নীলমণিবাবু খবর আনলেন একটা সীট অনেক কষ্টে পাওয়া গেছে। কেরানীকে নগদ পাঁচটাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

এরপর সুরেন যা করলো তা কেউ প্রত্যাশা করেনি।

সে বলল—"আমি এখানে পড়ব না। আমি গ্রামের পাঠশালেই পড়ব।"

"ওসব আবদার চলবে না, তোমার বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এখানেই পড়তে হবে। সীট যোগাড় করতে নাজেহাল হতে হয়েছে আমাকে—!"

···তার পরদিন সুরেনকে জোর করে স্কুলে নিয়ে গেল নীলমণি। সুরেন কিছুতেই যাবে না, হাত ধরে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হল তাকে।

রাস্তার ধারেই স্কুল। সুরেন দেখল স্কুলের গেটের সামনে লাল পাগড়ি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে একজন। দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তার। ওরা গুলি চালাবার জন্য মাইনে পায়।

তারপর স্কুলে ঢুকেই দেখতে পেল সারি সারি তিনটে চিল বসে আছে স্কুলের কার্নিসের ধারে।

"আমি এখানে থাকতে পারব না। আমায় ছেড়ে দাও গো জামাইবাবু, ছেড়ে দাও—"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়, আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ল একটা ছুটন্ত ট্যাকসির চাকার তলায়।

মৎস্য পুরাণ

খুকুর বিয়ের গল্প, সে এক অদ্ভুত গল্প। বললে কেউ বিশ্বাস করে না। তোমাদেরও বলছি, দেখ তোমরা বিশ্বাস করতে পার কি না। খুকুর ভাল নাম মানকুমারী। মানের মরাই একটি, নামের মর্যাদা ও রেখেছে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলে ওঠে, নাকের ডগা কাঁপতে থাকে, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এখন তার বয়স ষোল, এখনও অমনি।

তার এই আশ্চর্য বিয়ের গল্প বলতে হলে শুরু করতে হবে তার ছেলেবেলা থেকে। যখন তার বয়স তিন কি চার তখন তার মাসী তাকে একটি বড় পুতুল উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে। বেশ বড় পুতুল, যেন বড়সড় খোকা একটি। নীল চোখ, মাথার চুল চমৎকার কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, আর কি মিষ্টি হাসি তাতে। খুকু পুতুলটিকে দিনের বেলা তো কাছ-ছাড়া করতই না, রাত্রেও কাছে নিয়ে শুত। কিন্তু এক আপদ জুটেল দিন কয়েক পরে, ফনুতি মাসীর বায়নাদার মেয়ে মনু। ভালো নাম মনোরমা কিন্তু ওই নামেই মনোরমা, কাজের বেলায় ঠিক উলটো। একবার গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই, কাঁদছে তো কাঁদছেই, বাড়িতে কাক চিল বসবার উপায় নেই, বাড়ির লোকদের প্রাণান্ত হবার উপক্রম। আর কথায় কথায় বায়না, এটা চাই, ওটা চাই। এই মেয়েকে নিয়ে ফনুতি মাসী এল শরীর সারতে। খুকু জানত না তখন যে মনুটি কি 'চিজ্', তাহলে কি আর তাকে পুতুল দেখায়? আগেই লুকিয়ে ফেলত। কিন্তু তা হল না। মনু আসতেই খুকু এক মুখ হেসে এগিয়ে গিয়ে বললে—"আমার পুতুল দেখ্। চল্ একে নিয়ে খেলি গিয়ে। একে আজ বর সাজাই আয়। পাশের বাড়িতে মানতুর খুকীপুতুল আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দেব। মানতুর বাড়ি যাবি?" মনু কিন্তু লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল পুতুলটার দিকে। কিছু না বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েই রইল মিনিটখানেক। তারপর বলল, "ও পুতুল তোমার নয়, আমার—"

"ইস তোমার বই কি। মাসী আমাকে জন্মদিনে কিনে দিয়েছে—"

যুক্তি মানবার মেয়ে মনু নয়। সে আরও খানিকক্ষণ পুতুলটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লাফিয়ে এগিয়ে গেল খুকুর দিকে, ছোঁ মেরে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে বললে—"আমার পুতুল—তোমার নয়। আমার—"

এ রকম জবরদস্তি সহ্য করা শক্ত। খুকু এক ধাক্কায় মনুকে ধরাশায়ী করে কেড়ে নিলে পুতুলটা। তারপরেই শুরু হল মনুর আকাশ-ফাটানো চিৎকার। হাঁ হাঁ করে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। কুটুমের মেয়ে দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, কি হল তার। খুকু এক ছুটে আগেই চলে গিয়েছিল চিলে কোঠার ঘরটাতে। সেখানে শ্রীমন্ত মালীর খোলা কাঠের বাক্সটাতে লুকিয়ে ফেলেছে পুতুলটাকে। যখন জানা গেল সামান্য একটা পুতুলের জন্য এই কাণ্ড তখন খুকুর মা বললেন, কেঁদো না মনু, লক্ষ্মীটি, তোমাকেও আমি আনিয়ে দিচ্ছি ঠিক অমনি পুতুল। পুরীর সমস্ত দোকান খুঁজেও কিন্তু ঠিক অত বড় দ্বিতীয় পুতুল আর পাওয়া গেল না। মনু ছোট পুতুল নেবে না,

ঠিক অত বড় পুতুলই চাই। কিছুতেই কান্না থামে না তার। খুকুর মা শেষে খুকুকে বললেন দিয়ে দাও তোমার পুতুলটা মনুকে। তোমার ছোট বোন হয়, কোলকাতা থেকে তোমাকে আনিয়ে দেব একটা পুতুল। এখন ওটা দিয়ে দাও ওকে, ছোট বোনকে কি কাঁদাতে আছে?—মায়ের কণ্ঠস্বরে আদেশের আমেজ পেয়ে খুকু আর আপত্তি করতে সাহস করলে না। দিয়ে দিলে পুতুলটা। কিন্তু বুক ফেটে গেল তার। মালী শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ল সে একেবারে। বৃদ্ধ শ্রীমন্ত মালীই তার মনের কথা বোঝে, বিপদে আপদে আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয়ও দেয় নানাভাবে। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে কিনা, তাই যত আবদার তার কাছেই। সে ওড়িয়া ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, এতে কাঁদবার কি আছে। ওর চেয়ে ঢের ভালো পুতুল তাকে সে এনে দেবে। যদি এনে দিতে না পারে নিজের নাক কেটে ফেলবে সে, শুধু তাই নয় নিজের নামও বদলে ফেলবে। শ্রীমন্তর মুখে এমন সব কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে খুকুর আশা হল। আজ পর্যন্ত শ্রীমন্তর কথার খেলাপ হয়নি। এই সেদিনও সে তাকে একটি পাকা চালতা এনে দিয়েছে লুকিয়ে।

মাসখানেক পরেই মনুরা চলে গেল। বলা বাহুল্য, পুতুলটা নিয়েই গেল সে। পুরীর বাজারে আর তেমন পুতুল একটিও এল না। মামাবাবু কোলকাতা থেকে জানালেন সেলুলয়েডের বড় পুতুল আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না আর। শ্রীমন্ত চেষ্টার ত্রুটি করছিল না অবশ্য। এদিক সেদিক থেকে প্রায়ই সে পুতুল জোগাড় করে আনত। কখনও ন্যাকড়ার পুতুল, কখন মাটির পুতুল, কখনও রবারের পুতুল। গালার পুতুলও এনেছিল একদিন। কিন্তু খুকুর একটাও পছন্দ হয়নি। শ্রীমন্ত কিন্তু নিজের নাক কাটবার জন্য বা নাম বদলে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হল না। সে ক্রমাগত খুকুকে আশ্বাস দিয়ে যেতে লাগল যে ওর চেয়েও ভালো পুতুল সে খুকুকে এনে দেবেই দেবে। দিলেও একদিন। ভারী আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল একটা।

একদিন সকালে শ্রীমন্ত খুকুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আস্তে আস্তে বলল, তোর পুতুল এনেছি খুকু, জীয়ন্ত পুতুল।

কোথা?

বাগানের পিছনে যে চৌবাচ্চাটা আছে, তার ভিতরে।

চৌবাচ্চার ভিতরে পুতুল রাখতে গেলে! কি বুদ্ধি তোমার শ্রীমন্ত দা।

দেখেই যা না আগে—

খুকু গিয়ে সত্যই অবাক হয়ে গেল।

এক চৌবাচ্চা জলের ভিতর সত্যিই একটা জীবন্ত পুতুল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে! কাছে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল সে। পুতুলের উপরটা মানুষের মতো, কিন্তু কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত মাছ। মাছের প্রতিটি আঁশ যেন রুপোর তৈরি আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রামধনুর সাতটি রং। মাছের ল্যাজের পাখনাগুলোও অপরূপ, ঠিক যেন মখমলের তৈরি।

শ্রীমন্ত বললে, আমার এক জেলে বন্ধু আছে, সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কাল তারই জালে ধরা পড়েছে এটি। আমি তার কাছ থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। চিড়িয়াখানায় বিক্রি করলে আরও বেশী টাকা পেত সে। বন্ধু বলে আমাকে দশ টাকায় দিয়েছে।

খুকু অবাক হয়ে গেল।

খবর চাপা রইল না। দলে দলে লোক দেখতে এল মৎস্য নারীকে। খুকুর কিন্তু আশ্চর্য লাগল, নারী কি নর, তা এরা ঠিক করছে কি করে! কিছু তো বোঝা যায় না। মাথার চুলগুলো একটু লম্বা। কিন্তু ছেলেদেরও লম্বা চুল হয় না কি? ওই তো মাখনবাবুর ছেলে বুলু, লম্বা লম্বা চুল তার, মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করা আছে। পুরুষ কি মেয়ে যাই হোক সুন্দর দেখতে কিন্তু। ধপধপে ফরসা গায়ের রং, টানা টানা চোখ, মিশ কালো চোখের তারা, পাতালা ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে। খুকু এগিয়ে যায় তার সঙ্গে ভাব করতে, সে-ও এগিয়ে আসে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

তোমার নাম কি—খুকু জিগ্যেস করে।

চুপ করে চেয়ে থাকে সে, উত্তর দিতে পারে না। খুকুর মাঝে মাঝে মনে হয় তার চোখ দুটো যেন হাসছে। লজেন্স, বিস্কুট, সন্দেশ, রসগোল্লা, আচার নিয়ে রোজ তাকে সাধাসাধি করে, সে কিন্তু স্পর্শ পর্যন্ত করে না কিছু। শ্রীমন্ত বললে ও সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খায়, আমি রোজ সকালে এনে দি। শ্রীমন্ত আর একটা কাজও করে। সমুদ্র থেকে জল এনে চৌবাচ্চাটার জল বদলে দেয় রোজ। সমুদ্রের প্রাণী কি না, কুয়োর জল সহ্য হবে না হয়তো।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল।

মৎস্যনারীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল খুকুর। মানুষের খাবারও খেতে লাগল সে ক্রমশঃ; বিস্কুট, মাছভাজা, টোস্ট, ওমলেট্—খুকু তাকে রোজ খাওয়াতো। মনে হতে লাগল কথা বলবারও যেন চেষ্টা করছে, কু-কু বলত মাঝে মাঝে। খুকুর কি আনন্দ! প্রথম ভাগ এনে পড়াতেই শুরু করে দিলে তাকে। মনে হত সে-ও যেন পড়বার চেষ্টা করছে। খুকু স্কুলে যেত না। একজন মাস্টার মশাই তাকে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। খুকুর জেদাজেদীতে মৎস্যনারীকে পড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁরও মনে হল, চেষ্টা করলে ওকে হয়তো কিছু শেখান যাবে। খুকুর বাবা-মাও কৌতুক অনুভব করলেন এতে, মাস্টার মশাইকে বললেন, দেখুন না ওকে কথা কওয়াতে পারেন যদি, তাহলে খুকুর বেশ সঙ্গী হয় একটি। মাস্টার মশাই চেষ্টা করতে লাগলেন। আর খুকুর তো কথাই নেই, সে যেন মেতে উঠল। সমস্তক্ষণই সে ওকে নিয়ে থাকত। অনেক বকাবকি করে তবে তাকে খেতে বা শুতে নিয়ে যাওয়া হত।

মৎস্যনারী ক্রমশঃ কথা কইতে শিখল, লেখাপড়াও শিখতে লাগল।

তারপর প্রায় দশ বৎসর কেটে গেছে। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

এখন খুকুর বয়স ষোল। মৎস্যনারীও বড় হয়েছে বেশ, তার জন্যে আরও বড় চৌবাচ্চা করানো হয়েছে, আর সেই চৌবাচ্চা ঘিরে হয়েছে কাচের প্রকাণ্ড ঘর। আর একটা বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটেছে যা চমকে দিয়েছে সকলকে। মৎস্যনারী আর নারী নেই, সে রূপান্তরিত হয়েছে নরে। তার গোঁফ উঠেছে। চমৎকার বাংলা কথা বলতে পারে সে, বাংলা ইংরাজী দুই পড়তে পারে, অঙ্ক কষতে পারে, এমন কি

অ্যালজেব্রার অংকও। চৌবাচ্চার ধারে প্রকাণ্ড টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্ফ। এখন রীতিমত ছাত্র সে। মাস্টার মশাই বলেন, খুকুর চেয়ে ওরই নাকি পড়ায় বেশী মন।

একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু। খুকুর বিয়ে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। খুকু বলছে—সমুদ্রগুপ্তকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাস্টার মশাই ওর নাম দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তকে সমুদ্রের ধার ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ সমুদ্রের জল না পেলে ও বাঁচবে না। অথচ সমুদ্রের ধারে যে সব শহর বা গ্রাম আছে তাতে খুকুর যোগ্য কোনও পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। খুকুর বাবা ওয়াল্টেয়ার, মাদ্রাজ পর্যন্ত খোঁজ করে দেখছেন।

শেষে তাঁরা ঠিক করলেন জোর করেই খুকুর অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে হবে। পাটনায় খুব ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ পাত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়। খুকু না-হয় মাঝে মাঝে এসে সমুদ্রগুপ্তকে দেখে যাবে। একটা পোষা জানোয়ারের জন্যে সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করার মানে হয় কোনও? সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু সামান্য একটা জানোয়ার বলে মনে করতে কষ্ট হচ্ছিল খুকুর বাবা মার। রাজপুত্রের মতো চেহারা, কি বুদ্ধি, কি কথাবার্তা।

খুকুর মা বললেন, "আহা, ওর নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম। খুকুই তো আমাদের একমাত্র সন্তান, জামাইও ঘরে থাকত তাহলে।"

খুকুর বাবা বললেন, "যা হবার নয় তা ভাবছ কেন?"

বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল। একদিন খুকু শুনল তাকে দেখবার জন্য পাটনা থেকে পাত্রের বাবা আসছেন।

গভীর রাত্রি।

সমুদ্রগুপ্তের ঘরে বসে খুকু কাঁদছিল। সমুদ্রগুপ্ত খুকুকে কখনও কাঁদতে দেখেনি। খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

"ও কি করছ তুমি—"

খুকু চোখের জল মুছে ফেললে।

"কি করছিলে?"

"কাঁদছিলাম।"

"কাঁদছিলে? কেন! বইয়ে পড়েছি লোকে দুঃখ হলে কাঁদে। কি দুঃখ হয়েছে তোমার?"

"তোমাকে ছেড়ে এইবার চলে যেতে হবে।"

"সে কি! কোথায় যাবে?"

"শ্বশুরবাড়ি। আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। পরশু আমাকে ওরা দেখতে আসবে—"

সমুদ্রগুপ্ত নির্বাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।"

"পাটনায় তুমি থাকবে কেমন করে? তোমার চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল চাই।

সেখানে তো সমুদ্র নেই। তোমার মাছের অংশটা যদি না থাকত তাহলে কোন ভাবনাই ছিল না।"

তারপর একটু থেমে খুকু বললে—"মা কাল কি বলছিল জান? বলছিল সমুদ্রগুপ্তের নীচের দিকটা যদি মাছের মতো না হত তাহলে ওর সঙ্গেই খুকুর বিয়ে দিতাম।"

"তাই না কি!"

সমুদ্রগুপ্তের সমস্ত মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার যে অংশটুকু মাছের মতো সেটা জলের ভিতর নিষ্পন্দ হয়ে গেল হঠাৎ।

তার পরদিন খুব ভোরে খুকুর ঘুম ভেঙ্গে গেল হঠাৎ। শুনতে পেলে সমুদ্রগুপ্ত খুব জোরে জোরে তার নাম ধরে ডাকছে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নেবে সে ছুটে চলে গেল সমুদ্রগুপ্তের ঘরে।

"খুকু দেখ দেখ, আমার মাছের খোলসটা ফেটে গেছে। আমি একা হাত দিয়ে ওটা ছাড়াতে পারছি না, তুমি একটু সাহায্য কর। আমি বুঝতে পারছি ওই খোলসটার ভিতর আমার পা আছে। একটু জোরে টান, মাছের খোলসটা খুলে যাবে এখুনি।"

খুকু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। সত্যিই ফেটে গেছে খোলসটা।

"দাঁড়াও, আগে বাবার হাফপ্যাণ্টটা নিয়ে আসি তাহলে—"

ছুটে চলে গেল খুকু এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এল একটা হাফপ্যাণ্ট হাতে করে।

আধ-ঘণ্টা পরে খুকুর বাবা মাও অবাক হয়ে গেলেন হাফপ্যাণ্টপরা সমুদ্রগুপ্তকে দেখে। এ কি কাণ্ড!

পাটনায় তখ্খুনি 'তার' চলে গেল, পাত্রের বাবার আসবার দরকার নেই। খুকুর বাবা পুরোহিত মশাইকে খবর দিতে বেরিয়ে গেলেন। খুকুর মা গেলেন লুচি ভাজতে।

খুকু জিগ্যেস করলে—"আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। কি করে তুমি বেরুলে!"

সমুদ্রগুপ্ত বললে—"ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্ত কত অসাধ্য-সাধন করেছিলেন, আর আমি এটুকু পারব না? চেষ্টায় কি না হয়। আমি তোমার কথা শুনে কাল সমস্ত রাত ধ'রে বেরুতে চেষ্টা করেছি—ভোরের দিকে ফেটে গেল খোলসটা—"

সাতদিন পরে খুকুর বিয়ে হয়ে গেল সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে।

বরকর্তা হল শ্রীমন্ত।

কবি জানেন

বহুকাল পূর্বে বনমহল নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজা ছিল না, ছিল এক রাণী। রাণীর নাম ছিল বনদেবী। তিনি এত ভাল ছিলেন যে বনের পশু-পাখী গাছপালা সবাই ভালবাসত তাঁকে। তিনিও সবাইকে ভালবাসতেন। আকাশ-বাতাস রোদ জ্যোৎস্নার সঙ্গেও ভাব ছিল তাঁর। এরাও তাঁকে খাতির করত, ভালবাসত! এত ভালবাসা পেলে কি আর কোনও অভাব থাকে? বনমহলের রাণী বনদেবী সত্যিই

রাণীর মতো থাকতেন। গাছেরা তাঁকে ফল দিত, গাই এসে দুধ দিয়ে যেত, পাখীরা গান শোনাত, ফুলেরা গন্ধ দিত। বনের মধ্যে ছোট্ট একটি নদী ছিল, সে দিত পিপাসার জল। তার জলে আকাশের ছায়া পড়ত। সন্ধ্যা-উষার আলোয় জল রাঙা হয়ে উঠত কখনও, বর্ষার মেঘের ছায়া পড়লে মনে হত নদী যেন নীলাম্বরী শাড়ি পরেছে। কত রকম ছবি যে ফুটে উঠত নদীর বুকে তার আর ঠিক নেই। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা বসে বসে দেখতেন। অনেক সহচরী ছিল তাঁর। তাদের নিয়ে বনমহলে বেশ সুখেই ছিলেন তিনি।

কিন্তু বিপদ এল একদিন। শহর থেকে একদল মানুষ এসে বনমহল ঘেরাও করল। অনেক জিনিস লুটপাট করে নিয়ে গেল তারা। বনদেবী আর তাঁর সহচরীরা খুব উঁচু গাছে উঠে ঘনপাতার আড়ালে বসে দেখলেন সব। বনদেবী বললেন—"এর ফল ভাল হবে না। নিজেদের অস্ত্রে ওরা নিজেরাই মরবে একদিন।" কিন্তু ওদের সব চেয়ে দুঃখ হল যখন দেখলে ওদের প্রিয় ঘোড়া পবনকে ওরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সকলের। আহা, বেচারা!

কিন্তু ওই পবনই একদিন শহর থেকে লাল রঙের ঘাগরা নিয়ে এল। এক আধটা ঘাগরা নয়, এক গাড়ী ঘাগরা। প্রত্যেকটি লাল টুকটুকে। পবনের চেহারাও অদ্ভুত। মুখে লাগাম, খুরে লোহার নাল। গলায় পুঁথির মালা, তাতে আবার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। প্রকাণ্ড একটা গাড়ি টানতে টানতে ঝড়ের বেগে পবন এসে ঢুকল একদিন বনমহলে। গাড়ির ভিতর অসংখ্য লাল ঘাগরা। পবন যা বলল তা-ও অদ্ভুত। তাকে দিয়ে ওরা নাকি গাড়ি টানায়। সে গাড়িতে মানুষ থাকে না, মাল থাকে। এক দোকান থেকে মাল নিয়ে আর এক দোকানে যেতে হয়। সেদিন পবন ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। আবার তাকে নাকি ফিরে যেতে হবে।

"ঘাগরাগুলো নামিয়ে নাও তোমরা। কারণ এখুনি আমি চলে যাব। না গেলে ওরা আবার এখানে আসবে, আবার সব লুটপাট করবে। ভয়ংকর লোক ওরা। সিংহপতিকে অবশ্য বলে যাব—।"

বনদেবীর সহচরীরা ঘাগরাগুলো নামিয়ে নিলে গাড়ি থেকে। তারা কখনও ঘাগরা দেখেনি, সবাই বল্কল পরে থাকত। ঘাগরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এ নিয়ে কি করব আমরা—?"

"পর। শহরের মেয়েরা এই জিনিস পরে। পরলে চমৎকার দেখাবে।"

বনদেবী বললেন, "এ নিয়ে আবার গোলমাল হবে না তো?"

"না। আমি যাবার সময় সিংহপতিকে খবর দিয়ে যাব। তিনি বনমহল পাহারা দেবার ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।"

বনমহলের পাশেই বিরাট-মহল। সিংহপতি সেখানকার রাজা। সিংহপতির সঙ্গে বনদেবীর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে। বিয়ে দু'বছর পরে হবে। বিরাট-মহলের নিয়ম গোঁফ না উঠলে বিয়ে হয় না। সিংহপতির তখনও গোঁফ ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে বিক্রমে তিনি কিছু কম নন। শহরের লোকেরা বনমহল আক্রমণ করেছে শুনলে তিনি ক্ষেপে উঠবেন।

পবন চলে গেল।

বনদেবীর সহচরীরা লাল ঘাগরা পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল মনের আনন্দে। তাদের

প্রত্যেকেরই গায়ের রং ধপধপে সাদা। লাল ঘাগরায় চমৎকার মানালো তাদের। মনে হতে লাগল যেন নূতন ধরনের ফুলেরা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনদেবী বললেন—"এগুলো ছিঁড়ে গেলে আবার শহর থেকে এমনি লাল ঘাগরা আনিয়ে দেব তোমাদের। আর তোমাদের বল্কল পরতে হবে না।"

"সত্যি বলছ?"

সহচরীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘিরে ধরল বনদেবীকে।

বনদেবী প্রতিশ্রুতি দিলেন—"সত্যি বলছি। আবার আনিয়ে দেব। বরাবর আনিয়ে দেব।"

"কে নিয়ে আসবে শহর থেকে—?"

"পবনই হয়তো আবার আসবে। না আসে তো কোন না কোন ব্যবস্থা করবই।"

বনদেবীর আশা ছিল, কিছুদিন পরেই সিংহপতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যাবে। কারণ একদল প্রজাপতি সেদিন বনমহল থেকে বিরাট-মহলে গিয়েছিল। তারা বলল সিংহপতির গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সিংহপতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না। তার প্রচুর লোকবল।

···বিয়ে কিন্তু হল না। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির ঘোর যুদ্ধ বেধে গেল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটতে লাগল, যুদ্ধ আর থামে না। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। বনমহলের আকাশের উপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে লক্ষ লক্ষ তীর বেগে চলে যায়। পাখী দেখা যায় না, অনেক সময় মেঘও দেখা যায় না। এদিকে পবনের কোনও খবর নেই, সিংহপতিরও কোনও খবর নেই।

···লাল ঘাগরাগুলি ক্রমশ ময়লা হয়ে গেল, ছিঁড়তে লাগল। সহচরীরা ঘাগরার জন্য মুখ ফুটে আর তাগাদা করতে পারে না, কারণ তারা জানে কেন ঘাগরা আসছে না। এই সর্বনেশে যুদ্ধ না থামলে আর আসবেও না। সহচরীরা কিছু না বললেও বনদেবীর খুব কষ্ট হতে লাগল, লজ্জাও হতে লাগল। তিনি ওদের কথা দিয়েছিলেন যে ঘাগরা ছিঁড়ে গেলে নতুন ঘাগরা আনিয়ে দেবেন, বরাবর আনিয়ে দেবেন। কিন্তু একি হল! তাঁর কথার নড়চড় কখনও হয়নি, ভগবান কোন না কোন উপায়ে বরাবর তাঁর মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার একি হল! বনদেবী ভগবানকেই ডাকতে লাগলেন। গভীর রাত্রে উঠে তিনি চুপি চুপি নদীর তীরে চলে যেতেন আর সেখানে চোখ বুজে বসে একমনে প্রার্থনা করতেন, ভগবান, আমার মানরক্ষা কর। ওদের আমি কথা দিয়েছি। আমার কথা যেন থাকে। রোজই যেতেন। একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বনদেবী রোজ যেমন চোখ বুজে বসে প্রার্থনা করেন সেদিনও তেমনি করছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁর বোজা-চোখের ভিতর দিয়েও তিনি যেন আলো দেখতে পাচ্ছেন। চোখ খুললেন, দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, "আপনার একাগ্র প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ভগবান আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বনদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কে?"

"আমি সূর্য। আমি আপনার সহচরীদের ঘাগরার ভার নিয়েছি। আমি যখন ভোরে পূর্বাকাশে উঠি তখন আপনার এই নদীর জল টুকটুকে লাল হয়ে যায়। সেই সময় যদি আপনার সহচরীরা নদীর জলে ঘাগরা পরে স্নান করে, তাহলে তাদের

ঘাগরা আবার নতুন হয়ে যাবে। একটুও ময়লা থাকবে না, একটুও ছেঁড়া থাকবে না, টুকটুকে লাল হয়ে যাবে আবার।"

কথাগুলি বলে সূর্য অন্তর্ধান করলেন।

বনদেবী অবাক হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখলেন বুঝি বা। কিন্তু স্বপ্নও তো অনেক সময় সত্য হয়।

...সত্যই হল। পরদিন উষার কিরণ পড়ে নদীর জল যখন লালে লাল হয়ে উঠেছে তখন বনদেবীর সহচরীরা তাদের ময়লা ছেঁড়া ঘাগরা পরে নামল তাতে স্নান করবার জন্য। স্নান করে যখন উঠল তখন প্রত্যেকের ঘাগরা শুধু নতুন নয়, অপরূপ হয়ে গেছে। ভগবানের দয়া হলে সবই হয়।

বনদেবী আর একদিন সূর্যের দেখা পেয়েছিলেন। সেদিনও তিনি নদীতীরে বসে ভাবছিলেন—এই অসম্ভব আশ্চর্য কাণ্ড বারবার কি হবে? পাশেই একটা সূর্যমুখী গাছে প্রকাণ্ড একটা সূর্যমুখী ফুল ফুটেছিল। সে কথা কয়ে উঠলো। বলল—আপনি যতদিন থাকবেন, ততদিন হবে। বনদেবী চেয়ে দেখলেন সূর্যমুখীর প্রতিটি পাপড়ি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। বনদেবীর বুঝতে দেরী হল না যে স্বয়ং সূর্যই ফুলের ভিতর আবির্ভূত হয়ে আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাঁকে।

...ঘাগরা সমস্যার সমাধান হল বটে কিন্তু আর একটি সমস্যা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। শহরের মানুষদের সঙ্গে সিংহপতির যুদ্ধ ক্রমশ তুমুল হয়ে উঠল। পাখীরা এসে খবর দিল যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। সিংহপতির সৈন্য-সামন্তেরা সমস্ত বনমহল ঘিরে রেখেছে যাতে শহরের মানুষেরা সেখানে হানা দিতে না পারে। শহরের মানুষরাও চেষ্টার ত্রুটি করছে না। দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র আনাচ্ছে তারা। দুপক্ষের অসংখ্য তীর শন শন করে আকাশ দিয়ে যাচ্ছে। যে সাঁকো দিয়ে শহরের লোকেরা বনমহলে আসতো সেই সাঁকো সিংহপতি নাকি ভেঙে দিয়েছে। তাই পবনও আর আসতে পারে না। ভাঙা সাঁকোর সামনে স্বয়ং সিংহপতি সসৈন্যে দাঁড়িয়ে আছে যাতে শহরের মানুষেরা আবার সাঁকো তৈরী করতে না পারে।

সমস্ত বনমহল বিষাদে আচ্ছন্ন। পাখীরা পর্যন্ত ভয়ে ওড়ে না। যদি কারও গায়ে তীর লেগে যায়! কেবল শকুনি আর কাকেরাই সব বিপদ তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধ হওয়াতে তাদের যেন সুবিধাই হয়েছে। অনেক মড়া পাচ্ছে তারা। এমন ভোজ বহুদিন তাদের ভাগ্যে জোটেনি। একটি কাকই একদিন নিদারুণ দুঃসংবাদটি নিয়ে এল। সিংহপতি যুদ্ধে মারা গেছেন।

...দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। বনদেবী স্থির নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। মুখে কথা নেই, চোখে জল নেই। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। আর তাঁকে ঘিরে বসে আছে তাঁর অসংখ্য সহচরীরা। ফুলের মতো দেখতে, টুকটুকে লাল ঘাগরা পরা। তাদেরও কারও মুখে কথা নেই।

অনাহারে বসে রইলেন বনদেবী দিনের পর দিন। পাখীরা ঠোঁটে করে ফল এনে কত সাধ্যসাধনা করল, নদী অনুরোধ করল, আমার জল খাও এসে কিন্তু বনদেবীর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তিনি নিশ্চল হয়ে বসেই রইলেন আর তাঁর সহচরীরাও নির্বাক হয়ে ঘিরে বসে রইল তাঁকে। একদিন বুলবুলির দল এসে দেখলে বনদেবী মারা গেছেন। তাঁর সহচরীরাও বেঁচে নেই কেউ। বনদেবীর প্রাণহীন দেহ যেন পাথরের

মূর্তির মতো বসে আছে আর তাঁকে ঘিরে শুয়ে আছে লাল ঘাগরা-পরা সহচরীর দল।

...তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে। বনদেবীর কথা ভুলে গেছে সবাই, কেবল একজন ছাড়া। তিনি কবি। তিনি জানেন বনদেবী মরেন নি। নূতন রূপে বেঁচে আছেন। তোমরাও নূতন রূপে দেখেছ তাঁকে, কিন্তু চেন না।

শিউলি গাছ দেখনি? শিউলি গাছই বনদেবী। শরতকালে লাল ঘাঘরা-পরা তাঁর সহচরীদেরও দেখেছ তোমরা নিশ্চয়। শিউলি ফুল হয়ে প্রতি বছর আসে তারা। বনদেবীকে ঘিরে প্রতি বছরই ঝরে পড়ে, আবার ফুল হয়ে ফোটে, আবার ঝরে পড়ে।

কবিই জানেন মৃত্যু মানে রূপান্তর। তাই তিনি বনদেবীকে ভোলেন নি।

কেন এমন?

কুমারের বয়স মাত্র দশ বছর। খুব বড়লোকের ছেলে সে। একমাত্র ছেলে। শুধু তাই নয়, কুমার পিতৃহীন। বাবার বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার মাকে সবাই রানী-মা বলে ডাকে। কুমার বুঝতে পারে না কেন ডাকে। তার বাবা তো রাজা ছিলেন না। কুমার এর প্রতিবাদ করতে পারে না, কিন্তু মনে মনে লজ্জিত হয়। যে রানী নয় তাকে রানী বলে ডাকা কি তাকে ঠাট্টা করা নয়? মনে মনে এই সব ভাবে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

রানী-মায়ের সমস্ত স্নেহ পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তাঁর একমাত্র ছেলে কুমারকে কেন্দ্র করে। তার জন্যে আলাদা মোটর গাড়ি, আলাদা একটা টাট্টু ঘোড়া। তার জন্যে দুটো ঝি, দুটো চাকর। দুজন প্রাইভেট টিউটর তাকে পড়াতে আসেন। একজন সকালে, আর একজন সন্ধ্যায়।

কুমার হাঁপিয়ে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার একটুও অবসর নেই, একটুও একলা থাকতে পায় না। ভোরবেলা সে চোখ খুলেই দেখতে পায় রামাকে। রামা তার মুখ ধোয়াবে, বাথরুমে নিয়ে যাবে, কাপড় বদলে দেবে, মাথার চুল আঁচড়ে দিয়ে পৌঁছে দেবে তাকে মণি পিসির কাছে। মণি পিসি বাড়ির পুরোনো ঝি। কুমারের খাওয়া-দাওয়ার ভার তার উপর। সে প্রথমেই এক গ্রাশ দুধ খাইয়ে দেবে জোর করে। এর পর কি আর কিছু খাওয়া যায়? কিন্তু খেতেই হবে। আঙুর, আপেল, পেস্তা, বাদাম, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, তরকারি একগাদা খাবার সামনে ধরে দিয়ে সাধাসাধনা করবে মণি পিসি খাবার জন্যে। মণি পিসির কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তাকে খুশি করবার জন্য কিছু খেতেই হয়। কিন্তু ভাল লাগে না কুমারের। খাওয়া শেষ হতে না হতেই বাইরের চাকর খবর দেয়—কুমারবাবু, মাস্টার মশাই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ঘরে যেতে হয়। শিবনাথবাবু বেশ ভাল মাস্টার, প্রবীণ লোক। আগে কলেজে প্রফেসারি করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁর পড়াবার ধরণ একটু স্বতন্ত্র। তিনি প্রথমেই এসে একজন বিখ্যাত লোকের জীবনী মুখে মুখে গল্প করে বলেন। তারপর পড়াতে শুরু করেন। দশটা বাজতে না বাজতেই ভিতর থেকে ডাক

আসে, মা ডাকছেন। মা খুব ভোরে উঠেই স্নান করে পুজোর ঘরে ঢোকেন। অনেকক্ষণ পুজো করে তবে বেরোন। বেরিয়েই কুমারকে ডাকেন তিনি। কুমারের খাস খানসামা তিতু তখন তাকে তেল মাখাবে মায়ের সামনে। রানী-মা বসে বসে নির্দেশ দেন আর তিতু তেল মাখায়। তিন রকম তেল মাখানো হয় তাকে। সরষের তেল, অলিভ অয়েল আর জবাকুসুম। অলিভ অয়েল সর্বাঙ্গে মালিশ করা হয়। সরষের তেল কানে আর নাকে টেনে নিতে হয়। জবাকুসুম মাখানো হয় মাথায়।

বিরক্তি ধরে যায় কুমারের। তিতু যেন তাকে দলাই মলাই করে, সে যেন মানুষ নয় ঘোড়া। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। মা সামনে বসে থাকেন। তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে বাথ-টবে বসিয়ে মা তাকে নিজের হাতে স্নান করান গরম জলে। তোয়ালে দিয়ে এমন জোরে জোরে ঘষেন! কুমার মাঝে মাঝে বলে—আমি কি বাসন নাকি যে অমন জোরে জোরে ঘষছ? মা উত্তরে বলেন—এই যে হয়ে গেল বাবা, একটু থাম না। না ঘষলে গায়ের ময়লা উঠবে কেমন করে। কুমার জানে তার গায়ে একটুও ময়লা নেই। ময়লা লাগবে কি করে? সর্বদা জামা-কাপড় পরে থাকতে হয়, জুতোও কয়েক জোড়া আছে, খালি পায়ে হাঁটতে মানা। শুধু জুতো নয়, মোজাও আছে। শীতকালে দস্তানাও পরতে হয়। ময়লা লাগবে কি করে? কিন্তু রানী-মার ময়লা-ময়লা বাতিক। মুখটা এমন জোরে জোরে ঘষে দেন গামছা দিয়ে যে কুমারের মনে হয় চামড়া উঠে যাবে। সে চেঁচায়, কিন্তু মা ছাড়েন না। বলেন—থাম না তেলগুলো উঠিয়ে দি। তেল ওঠবার পর সাবান মাখাবার পালা। সে-ও এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। সাবান খুব দামী, কিন্তু চোখের ভিতর ফ্যানা ঢুকে গেলে জ্বালা কিছু কম করে না। স্নান পর্ব শেষ হলে শুরু হয় প্রসাধনের পালা। এ কাজটাও রানী-মা নিজের হাতে করেন। চিরুনি দিয়ে এমন জোরে জোরে মাথা আঁচড়ে দেন যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে কুমারের। রুপোর চিরুনি, তার দাঁতগুলো কি ধার! কুমার যত বলে—ছাড়, ছাড়—মা তত জোরে জোরে চিরুনি চালান। তারপর বুরুশ। তারপর স্নো, তারপর পাউডার। তারপর জামা আর পায়জামা পরা। প্রত্যেকটাই বিরক্তিকর।

সব শেষ হলে মা একটি চুমু খেয়ে বলেন, চল এইবার খাবে চল। এই চুমুটাই বেশ ভাল লাগে কুমারের। কিন্তু খাবার প্রস্তাবটা ভাল লাগে না। বলে—এখনও খিদে পায়নি। ধমকে ওঠেন রানী-মা—খিদে তো তোমার কখনও পায় না। এগারোটার সময় খেতে বলে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মনে নেই?

একজন ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে এসে পরীক্ষা করে যায় কুমারকে। তাঁর হুকুম মতো চলতে হয়। বড়দের খাবার জন্যে শ্বেতপাথরের একটা 'ডাইনিং টেব্‌ল্' আছে। কিন্তু কুমারের পক্ষে সেটা বড্ড বেশী উঁচু। তাই তার জন্যে শ্বেতপাথরের কম-উঁচু এক ছোট টেবিল কিনে দিয়েছেন রানী-মা। অনেকটা জলচৌকির মতো। সেই টেবিলের সামনে একটি দামী কার্পেটের আসন পাতা হয়। সেই আসনে বসে কুমার খায়। রানী-মাও পাশে একটি ছোট মোড়ায় বসেন এবং খাইয়ে দেন তাকে। ঘাড়ে ধরে খাইয়ে দেন বললে ঠিক হয়। সে-ও এক হৈ-হৈ ব্যাপার। কুমার প্রতিটি জিনিস খাবার সময় বায়না করে, 'ঝাল' ঝাল' বলে বার বার জল খায়, কাঁটা বলে মাছ খেতে চায় না, কিন্তু রানী মাও ছাড়বার পাত্রী নন। খোশামোদ করে, ধমক দিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়েন। অথচ

কুমারের যে জিনিসটির দিকে প্রচুর লোভ, আচার, সেটি দেন না তাকে বেশি। কুমারের মনে হয় অত্যাচার, সেরেফ অত্যাচার। খাওয়ার পর তাকে শুতে হবে। ঘুম পাক না পাক শুতে হবেই। প্রায়ই ঘুম আসে না। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, চমৎকার বিছানা, ঠাণ্ডা ঘর, দরজা জানালা বন্ধ, কিন্তু তবু ঘুম আসে না তার। সে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকে। উঠে পালাবার উপায় নেই, কারণ মা ঠিক পাশেই শুয়ে থাকেন।

বেলা তিনটে পর্যন্ত এই নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাকে। তিনটের পর খেলার ঘরে নিয়ে যায় তাকে রামা। রামা তার সঙ্গে খেলা করে না, খেলার ঘরের দরজায় বসে পাহারা দেয় খালি। খেলার ঘরে নানারকম খেলনা আছে। বড় কাঠের ঘোড়া, বড় টেডি বিয়ার, ভাল একটা মেকানো, কার্ডবোর্ডের তৈরি ইঁট-কড়ি-বরগা, তাছাড়া নানারকম পুতুল, নানারকম ছবি। একটা ছোট রকিং চেয়ারও আছে। কুমারের কিন্তু এদের সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য নেই, এদের নিয়ে খেলা যেন আর জমে না। সব পুরোনো হয়ে গেছে, মন ভরে না। মেকানোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু, ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটু দোলা যায়, কিন্তু খেলা ঠিক জমে না। যন্ত্রচালিতবৎ এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মনে হয় খেলাটাও যেন পড়ার মতো একটা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। ওতে মজা নেই। ঘণ্টা দেড়েক খেলার ঘরে থেকে আবার যেতে হয় তাকে খাবার ঘরে। অর্থাৎ আবার মণি পিসির পাল্লায় পড়তে হয় মণি পিসি গরম হালুয়া আর লুচি করেছে তাই খেতে হবে। মুখটি বুজে খেতে হয়। কারণ বেশি আপত্তি করলে গোলমাল হবে আর মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কুমার তিনটের সময় উঠে পড়ে, কিন্তু রানী-মা ওঠেন না, তিনি পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমোন। তাঁর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলে মাথা ধরে, বারবার অডিকোলন দিলেও সে মাথা ব্যাথা কমে না। মেজাজও খারাপ হয়ে যায়, সবাইকে তুচ্ছ কারণে বকেন। তাই কুমার এ সময়টা খেতে বেশি আপত্তি করে না। করলেও হাত নেড়ে বা ভুরু কুঁচকে করে। খাবার পর মণি পিসিই তাকে বেড়াতে যাওয়ার পোশাক পরিয়ে দেয়। নিত্য নূতন পোশাক। কখনও ভেলভেটের কোট প্যাণ্ট, কখনও আন্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী জরি পেড়ে ধুতি, কখনও নিকার বোকার, কখনও ঢিলে পাজামা হাওয়াই শার্ট। কুমার এসব বেশ উৎসাহ সহকারেই পরে। কারণ এর পর বেড়াতে যেতে হবে। ড্রাইভার বিজয় তাকে অনেকদূরে এক মাঠে নিয়ে যায়। সেই মাঠের ধারে একটা বস্তি আছে। গরীবদের বস্তি। কুমারের খুব ভাল লাগে বস্তির কাছে যেতে। সেখানে ফাগুয়া আছে। তারই সমবয়সী।

ফাগুয়া চামারের ছেলে। তার বাবা দুখন রোজ মজুরী খাটতে যায়। তার মা-ও। ছোট্ট একটি খাপরার ঘর তাদের। পাশাপাশি আরও কয়েকটা ঘর আছে। চামারদের ছোট বস্তি ওটা। একটা উঠোনের চারপাশেই ঘরগুলো। সে উঠোনে সকলেরই সমান অধিকার। কুমারের মোটর থেকে দেখা যায় উঠোনটা। একধারে ছাই-গাদা। আর একধারে ঘুঁটে। একটা মুরগী একপাল বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে 'ক্লাক' 'ক্লাক' করে শব্দ করছে। ফাগুয়ার দুটি বোন, ঝুমরি আর সুনরি। ঝুমরির বয়স ছ'বছর, সুনরির চার বছর। মাথা-ভরা ঝাঁকড়া চুল তাদের। চুলে তেল নেই। চোখের কোণে পিঁচুটি, নাকভরা সর্দি। খালি গা, পরনে এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া। ওরা রাস্তার ধারে বসেই ধুলো নিয়ে

খেলা করে। ধুলোর স্তূপ করে, তার একধারে ছোট্ট একটু ফাঁক রেখে, ঘর বানায়। পথের ধারে ঘাস পাতা ছিঁড়ে তরকারী করে, ভাঙা হাঁড়ির টুকরো ওদের কড়া, পাশাপাশি ভাঙা দুটো ইঁট দিয়ে ওদের উনুন হয়েছে। পাশেই ডোবা আছে একটা। মাটির ভাঁড় করে ঝুমরি সুনরি জল নিয়ে আসে সেখান থেকে। একবার নয়, বারবার নিয়ে আসে। পায়ে কাদা লেগে যায়, গ্রাহ্য করে না। তাদের ভাই ফাগুয়া মোষ চরায় ওই মাঠে। মোষের পিঠে বসা থাকে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে।

অতবড় ভীষণ মোষ কিন্তু ফাগুয়াকে কিছু বলে না। ফাগুয়া 'হেট্' 'হেট্' করে যেখানে খুশি নিয়ে যায় তাকে। মোষের সঙ্গে তার বাচ্চাও থাকে। কি সুন্দর সেটা! মায়ের পিছনের দু' পায়ে মুখ ঢুকিয়ে দুধ খায়। কখনও ফাগুয়া আবার শুয়ে পড়ে মোষটার পিঠে লম্বা হয়ে। ফাগুয়ার একটা ছোট বাঁশি আছে, বাঁশের বাঁশি। মোষর পিঠে বসে বসে বাঁশি বাজায় সে মাঝে মাঝে। কাছেই একটা বটগাছ আছে। অনেক ঝুরি নেমেছে তার থেকে, ফাগুয়া মাঝে মাঝে মোষের পিঠ থেকে নেমে গিয়ে সেই ঝুরি ধরে দোলে। কখনও আরও দু'তিনজন রাখাল এসে জোটে, তখন তারা খেলে ডাংগুলি।

কুমার দামী পোশাক পরে দামী মোটরে চক্কোর খেয়ে এদের দেখে। প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে তার মন। ভাবে আহা, আমি যদি ঝুমরি, সুনরি আর ফাগুয়ার সঙ্গে খেলতে পারতুম! মনে হয়—মোটরে চড়ার চেয়ে মোষের পিঠে চড়া ঢের ভাল। কাঠের ঘোড়ার পিঠে দোল খাওয়ার সঙ্গে ওই ঝুরি ধরে দোল খাওয়ার কি তুলনা হয়! মোটর ধীরে ধীরে মাঠে চক্কোর দেয় আর কুমার ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে। কিন্তু সে মনে মনে জানে ওদের সঙ্গে খেলবার সুযোগ সে কোনদিন পাবে না। বিজয় মোটর থামাবেও না, তাকে যেতেও দেবে না। তাকে মোটরে বসেই দূর থেকে দেখতে হবে ওসব।

ফাগুয়াও দূর থেকে রোজ দেখে মোটরটাকে। প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে সে-ও চেয়ে থাকে। ভাবে, আহা কি সুন্দর মোটরটা! কি সুন্দর রং, কেমন চকচকে ঝক্ঝকে। ফরসা-কাপড়-জামা-পরা খোকাবাবুর দিকে সে চেয়ে থাকে নির্নিমেষে। যেন দেব-দর্শন করছে। তারও মনে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগে—আহা আমি যদি একবার মোটরটায় চড়তে পেতাম। কিন্তু সে জানে এ সুযোগ কখনও আসবে না।

কিন্তু সুযোগ একদিন এসে গেল।

ড্রাইভার বিজয় রোজ আফিং খায়। একদিন হঠাৎ তার মনে পড়ল তার আফিং তো ফুরিয়েছে, কেনা হয়নি। বাড়ি ফিরে গিয়ে দোকান থেকে আফিং কেনবার আর সময় থাকবে না। কালালি বন্ধ হয়ে যাবে। একবার সে ভাবল, মোটরটা নিয়ে সোজা কালালিতে চলে যাই। কিন্তু রানী-মার কানে যদি কথাটা ওঠে তাহলে চাকরি যাবে। তাঁর কড়া হুকুম বাজারের ভিড়ে যেন কুমারকে কখনও না নিয়ে যাওয়া হয়। তার বন্ধু বোনু মাঠের ওপরে আর একটা বস্তিতে থাকে। সে-ও আফিং খায়। তার কাছ থেকে চেয়ে আনবে একটু? কিন্তু মোটর নিয়ে তো সেখানেও যাওয়া যাবে না। রাস্তা খুব খারাপ। হেঁটেই যেতে হবে।

"কুমার সাহেব, তুমি মোটরে চুপ করে বস একটু। আমি ঘুরে আসছি এখুনি। তুমি মোটর থেকে নেমো না যেন। আমি যাব আর আসব—"

বিজয় চলে গেল।

চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কুমার নেমে পড়ল মোটর থেকে। এক ছুটে চলে গেল ফাগুয়ার কাছে। ফাগুয়া তখন মোষের পিঠে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল।

"তোমার নাম কি ভাই?"

"ফাগুয়া।"

"আমাকে তোমার মোষের পিঠে চড়তে দেবে?"

"হ্যাঁ—"

দেখা গেল ফাগুয়ার গায়ের জোর বুদ্ধির জোর দুই-ই আছে। সে মাটিতে বসল। কুমার তার কাঁধে পা দিয়ে উঠে পড়ল মোষের পিঠে। মোষের পিঠে চড়ে ঘুরল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, "আমি ওই ঝুরি ধরে দুলব—" ফাগুয়ার সাহায্যে ঝুরি ধরে দোলও খেল সে খানিকক্ষণ।

তারপর ঝুমরি সুন্দরিকে দেখিয়ে বলল, "ওরা কে?"

"ওরা আমার বোন। ঝুমরি আর সুন্দরি।"

"ওদের সঙ্গে গিয়ে একটু খেলে আসি?"

"বেশ তো যাও না—চল আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

সেই ধুলো কাদার মধ্যে গিয়ে চাপটালি খেয়ে বসল কুমার। হাতে যেন স্বর্গ পেল।

ফাগুয়া কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলল—"আমাকে তোমার মোটরে চড়াবে খোকাবাবু?"

"বেশ তো গিয়ে চড় না।"

ঝুমরি সুন্দরি বললে—"আমরাও চড়ব।"

"খোকাবাবু, তুমি ততক্ষণ ধুলো দিয়ে ঘর বানাও, আমরা মোটরে চড়ি গিয়ে—"

"বেশ—"

একছুটে চলে গেল তারা তিনজন। মোটরের কপাট খোলাই ছিল। ঝুমরি সুন্দরি বসল পিছনের সীটে আর ফাগুয়া বসল স্টীয়ারিং ধরে।

একটু পরেই আর্ত চীৎকার শুনে চমকে উঠল কুমার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিজয় ফিরেছে আর মারছে ওদের। ছুটতে ছুটতে কুমার গিয়ে হাজির হল সেখানে। দেখল ফাগুয়াকে বিজয় এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। ঝুমরি আর সুন্দরির গালে চড়ের দাগ।

"ছেড়ে দাও ওদের। আমিই ওদের বসতে বলেছিলাম—"

বিজয় বললে—"ছি, ছি, কি কাণ্ড তুমি করেছ কুমারবাবু! তোমার জামায় কাপড়ে এত ধুলো, এত কাদা, জুতো ভিজে গেছে—রানী-মা আমাকে কি বলবেন—"

সেইদিনই বিজয়ের চাকরি গেল।

তার জায়গায় বহাল হল সরদার শার্দুল সিং।

এখনও কুমারের মোটর সেই মাঠে চক্কোর দেয়। কুমার দূর থেকে দেখতে পায় ফাগুয়া আর ঝুমরি-সুন্দরিকে। কিন্তু আর তাদের কাছে সে যেতে পারে না। শার্দুল সিং খুব কড়া লোক।

ওদের মাঝখানে যে অদৃশ্য প্রাচীরটা ছিল সেটা একদিনের জন্য হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল। আবার মেরামত করে দিয়েছেন সেটাকে রানী-মা। আর ভাঙবার আশা নেই। কুমার ভাবে—কেন এই অদ্ভুত নিয়ম। ফাগুয়া আর ঝুমরি-সুন্দরিও তাই ভাবে।

গুলি

রবার্ট ব্রুস একবার উর্ণনাভের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক গুহায় লুকিয়ে বসে ছিলেন। সেখানে তাঁর চোখ পড়েছিল একটা উর্ণনাভ বারবার সুতো বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছে আর বারবার পড়ে যাচ্ছে। সে কিন্তু হতাশ বা নিরুদ্যম হয়নি। তার অধ্যবসায় শেষকালে জয়ী হয়েছিল। সুতা বেয়ে উপরে উঠতে পেরেছিল সে। পরাজিত রবার্ট ব্রুস এ দেখে উৎসাহিত হলেন, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করলেন এবং জিতলেন।

আমি সেদিন রাত্রে যা দেখলাম তা ঠিক এ জাতীয় জিনিস নয়, কিন্তু তাতে আলোকের ইঙ্গিত আছে।

ঘুম হচ্ছিল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। এমন সময় বাজখাঁই গলায় কে যেন ডাক দিলে—"ডাক্তার, জেগে আছ নাকি?"

তাড়াতাড়ি উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। একটি দিব্যকান্তি পুরুষ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

"আমাকে চিনতে পারলে না বোধ হয়—"

"না। কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো?"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। আমি যখন বিখ্যাত ছিলাম, তখন তোমার জন্ম হয়নি। গুলিখোর তিনু গোঁসাইয়ের নাম শুনেছ কি কখনও—?"

মনে পড়ল শুনেছি। বাবার বৈঠকখানায় উনি বসতেন এসে, আর খুব মজার মজার গল্প বলতেন।

বললাম—"আসুন, বসুন। এত রাত্রে এসেছেন যে, কোন দরকার আছে নাকি? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি কারো—"

চেয়ারে বসে মৃদু হেসে বললেন—"রাত্রিই এখন আমাদের দিন! অন্ধকারই আলো। অন্ধকারই দরকার। আর অসুখের কথা বলছ, সুখ কোথায়, সবই তো অসুখ। তোমার বাবাকে এককালে অনেক গল্প শুনিয়েছিলুম। সবাই হেসেছিল তা শুনে। এখন মনে হচ্ছে আমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল তা গল্প নয় ভবিষ্যদ্বাণী। অহিফেন-প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলুম। তোমাকেও বলি কয়েকটা—"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। তিনি বললেন—"অনেকদিন আগে আমি একটা দোতলার ঘরে বাস করতুম। ঠিক আমার নিচের ঘরেই থাকত একটা দরজি। সে ছুঁচ দিয়ে হাতের কাজ করত। সে যতক্ষণ কাজ করত আমি চমকে চমকে উঠতুম। সবাই জিগ্যেস করত—'কি তনুদা অমন চমকাচ্ছ কেন? কি হল তোমার?' আমি বলতাম—"ওই ছুঁচটা এসে লাগতে পারে তো। তারা হা হা করে হাসতে শুনে। কিন্তু এখন দেখ সেই ছুঁচই ফাল নয় বর্শা হয়েছে, বুকে এসে বিঁধছে।"

তিনু গোঁসাইয়ের চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম চকচক করতে লাগল। খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে বললেন—"আর একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। একদিন রাত্রে

গ্নলির আড্ডা থেকে ফিরছি। একটা গলির ভিতর ঢুকেছি। হঠাৎ সামনে দেখি এক গাড়ি বাঁশ। চক্ষ্ন চড়ক গাছ হয়ে গেল, নেশা ছ্নটে যাবার উপক্রম। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম। ধাক্কাটা লাগল, কিন্তু পিছন দিক থেকে। তখন চোখ খ্নলে দেখি সকাল হয়ে গেছে, বাঁশের গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে। আমি একজনের কপাটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, সে-ই কপাট খ্নলতে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে আমাকে। আমি তখন বলেছিলাম, "জানতাম ধাক্কা লাগবেই, ভাগ্যি ভাল তাই চোখটা বেঁচে গেছে। ইংরেজের বাঁশের গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে, ধাক্কা খাচ্ছি আমরা এখন পিছন দিকে ঘরের লোকের কাছ থেকে। এবারেও চোখটা বেঁচে গেছে, শ্নধ্ন বাঁচেনি ভাল করে খ্নলে গেছে—"

হা হা করে হেসে উঠলেন তিন্ন গোঁসাই। আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। এ যে অট্টহাস্য। আমার মনে হতে লাগল গ্নলিখোরের ধরণ-ধারণ তো এ রকম হয় না। তারা সাধারণত চোখ ব্নজে নিঝ্ঝুম হয়ে থাকে। হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে তিন্ন গোঁসাই স্মিতম্নখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

"আর একটা গল্প শোনাই তোমাকে। আমি তখন গঙ্গা পেরিয়ে আমাদের এক আড্ডায় যেতাম গ্নলি খেতে। চারটে পয়সা কাছায় বেঁধে নিয়ে যেতাম। পারানীর পয়সা। পাছে খরচ করে ফেলি সেইজন্য কাছায় বেঁধে নিয়ে যেতাম। কিন্তু নেশার ঝোঁকে একদিন সেটাও খরচ হয়ে গেল। ফিরবার সময় মাঝি ব্যাটা কিছ্নতেই পার করে দিলে না। তাকে বললাম—"কাল পারানীর পয়সা দিয়ে যাব। কর্ণপাত করলে না আমার কথায়। আমাকে সমস্ত রাত গঙ্গার তীরে তীরে ঘ্নরে বেড়াতে হল। সেদিন একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বাহাদ্নর লোক বটে হন্নমান। গন্ধমাদন পর্বতের দরকার হয়েছিল, মাথায় করে বয়ে আনলে তাকে। দরকার যেই শেষ হয়ে গেল অমনি যেখানকার গন্ধমাদন সেইখানে রেখে এল। কিন্তু ভগীরথ লোকটা করলে কি। প্নর্ব-প্নর্নষদের উদ্ধার করবার জন্যে স্বর্গ থেকে টেনে আনলে গঙ্গাকে। প্নর্বপ্নর্নষ উদ্ধার হয়ে গেল, যেখানকার গঙ্গা সেইখানে রেখে আয়। তুই যে দেশময় গঙ্গাকে ছেড়ে দিয়ে গেলি এখন আমরা পেরিয়ে বাড়ি যাই কি করে। আমাদের নেতারাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটি মেকি স্বাধীনতার গঙ্গা এনেছেন বিলেতের স্বর্গ থেকে। সে গঙ্গা এখন দেশময় ছড়িয়ে গেছে, তার প্রবল বন্যায় দেশ ডুবে গেল, সে গঙ্গা পেরিয়ে পালাবারও উপায় নেই। কি বিপদ বল দিকি!"

ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ আবার বললেন, "আর একটা গল্প মনে পড়ল। একবার আমি আর তেনা গ্নলি খেয়ে ফিরছি। বেশ রাত হয়েছে। চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের। একটা সর্ন গলি দিয়ে যাচ্ছি দ্ন'জনে। হঠাৎ তেনা থমকে দাঁড়িয়ে তরতর করে পেছিয়ে গেল। আমিও গেলন্ম। তারপর তাকে জিগ্যেস করলন্ম—কি রে অমন ভাবে পেছিয়ে গেলি কেন? সে চোখ বড় বড় করে তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই দেখ। ওটা কি বল দেখি? দেখলাম রাস্তার উপর আড় হয়ে কি যেন একটা পড়ে আছে। তেনাকে বললন্ম—একটা ঢিল ছোঁড় না। যদি ওড়ে তাহলে ব্নঝবি ঘ্নঘ্ন তা না হলে নিশ্চয় উট। আসলে সেটা ছিল একটা আধ-ভাঙ্গা ইঁট। এদের কি উপমা দেব তাতো মাথায় আসছে না। এদের

প্রথমে যা মনে হয়েছিল এখন দেখছি তা নয়, কিন্তু এদের আসল স্বরূপ যে কি তাও তো বুঝতে পারছি না।"

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম—"আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন ?"

"নিজের ঢাক পেটাবার জন্যে। আমাকে গুলিখোর বলে সবাই ঠাট্টা করত এককালে। কিন্তু আমার কথাগুলো যে আসলে ভবিষ্যদ্বাণী সেইটে জাহির করবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। এখন যারা নিজেদের ঢাক পেটাচ্ছে—তারা তো গাঁজাখোর গুলিখোরদেরও কান কেটে দিয়েছে। জোঁক বলছে, 'দেখ আমি কেমন লম্বা হতে পারি, সরু হতে পারি, চেপ্টা হতে পারি, গোল হতে পারি, আমাকে তোমার গলার হার কর।' আমি যখন প্রথম গুলি খেতে শিখি তখন রাত্রে বাড়ি ফিরে লাঠিটাকে বিছানায় শুইয়ে নিজে সারারাত কোণে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মায়ের কাছে এজন্য কত বকুনি খেয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি আমি ঠিকই করতাম। লাঠিরই তো জয়জয়কার আজকাল। শুধু বিছানায় কেন সিংহাসনে সবাই বসিয়েছে তাকে। আমি গুলির ঝোঁকে যা করেছিলাম তা সত্যি হয়ে গেছে। তাই আমার একটা কথা মনে হয়। আশা হয়—"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তিনু গোঁসাই।

"কি আশা হয়—?"

"আশা হয় যে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীকমলাকান্ত শর্মার স্বপ্নও হয়তো সফল হবে একদিন।"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ?"

"কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' পড়নি ? শোন—"

তিনু গোঁসাই গড়গড় করে বলে গেলেন—"কোথা মা ! কই আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি ? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙমণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা ? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা রূপিণী—অনন্ত-রত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এই মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্তিময়ী সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা……"

তিন গোঁসাই চুপ করে গেলেন।

তারপর মৃদু হেসে বললেন—"গুরুদেবের এ স্বপ্ন সফল করতে গেলে আরও অনেক গুলি খেতে হবে।"

"গুলি ?"

"হ্যাঁ গুলি। কিন্তু আফিমের নয়, সীসের। এইবার আমি চলি। তুমি দেশের কথা ভেবে ছটফট করছ দেখে তোমার কাছে এসেছিলাম। এবার উঠি—"

"কোথায় থাকেন আপনি?"

"ওপারে।"

মৃদু হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি।

রঘুনাথের ভাগ্য

রঘুনাথ তালুকদার ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। ভাগ্যলিপি ললাটেই লেখা থাকে, ইহাই জনশ্রুতি, কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, সে লিপির অর্থ কোথায় সার্থক হইবে তাহা অন্বেষণ-সাপেক্ষ। যাহার জন্ম বঙ্গদেশে, তাহার ভাগ্য হয়ত বোম্বাই শহরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। যাহার জন্ম শহরে, তাহার ভাগ্যোদয় হইল হয়ত অরণ্যে। যে সব ভাল ছেলে একের পর এক পরীক্ষার বেড়াগুলি কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে সাফল্যের সম্মুখীন হয়, রঘুনাথ সে দলের ছেলে নয়। সে একটা পরীক্ষাতেও পাশ করিতে পারে নাই। পাঠ্য পুস্তকগুলির কাঠিন্য এবং বুদ্ধির দুর্বলতাই যে কেবল তাহার সাফল্যের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা নয়, তাহার পিতামহ, পিতামহী এবং পিসিমাও বাণী-মন্দিরের পথে উত্তুঙ্গ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বদ্ধ ধারণা ছিল, লঘু রামায়ণ-মহাভারতটা যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলেই শিক্ষার চরম হইল, স্কুল কলেজে পড়িয়া আর কি হইবে? ওই তো ঘোষেদের বাড়ীর ক্যাবলা এম-এ পাশ করিয়াও ক্যাবলাই থাকিয়া গিয়াছে, একটি পয়সা উপার্জন করিতে পারে না, নানারকম কিম্ভূতকিমাকার পোষাক পরে আর চালিয়াতি করে। বস্তু কিছু নাই। তাঁহারা আরও বলিতেন, রঘুর ভাবনা কি? তাহার দাদা প্রভু নিশ্চয় রঘুকে ত্যাগ করিবে না। সে শ্বশুরবাড়ী হইতে যে বিষয় পাইয়াছে তাহাতে দুই ভাইয়ের হাসিয়া খেলিয়াই সারাজীবন চলিয়া যাইবে। রঘুর পিতামহ, পিতামহী এবং পিসীমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন সত্যই রঘুর হাসিয়া-খেলিয়াই চলিয়াছিল। সে গাছে চড়িত, পুকুরে সাঁতার দিত, বন্দুক দিয়া পাখী শিকার করিত, ফুটবল খেলিত, যে কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অগ্রণী হইত এবং রামায়ণ শুনিত। রামায়ণ পড়িবার মতো বিদ্যা তাহার ছিল না, পাড়ার ঠাকুর-মশায় প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন, তাহাই শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া রঘুর চিত্ত-সংস্কার করিত।

এইভাবে কিছু দিন বেশ চলিল। কিন্তু পিতামহ-পিতামহী-পিসীমা কেহই অমর ছিলেন না। যথাকালে তাঁহারা সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন। পিসীমাই সর্বশেষে গেলেন। তখন রঘুর বয়স বাইশ বৎসর। অতঃপর প্রভুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। দেখা গেল তিনি মহাপ্রভু। সংক্ষেপে একদিন বলিয়া দিলেন—গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এতদিন তোমাকে অনেক খাওয়াইয়াছি, পরাইয়াছি, তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। আর করিব না। এইবার তুমি নিজের রাস্তা দেখ।

রঘুনাথ সহজে নিজের রাস্তা দেখে নাই। প্রভুর ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত এক উকিলের

সহায়তায় প্রায় বিনা খরচে মামলা মোকদ্দমাও করিয়াছিল, কিন্তু কিছু হয় নাই। প্রভুর শ্বশুর কন্যাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা কন্যার নামেই স্ত্রী-ধন স্বরূপ দিয়াছিলেন, রঘু তাহার কিছুই পাইল না। রঘুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল বসতবাড়ীখানি এবং তিন বিঘা ধেনো জমি। তাহারই অর্ধাংশ সে পাইল। কিন্তু এরূপ হৃদয়হীন দাদা বৌদিদির সান্নিধ্য রঘু সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার অংশটুকু উক্ত উকিলকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া একদিন বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল। উকিল মহাশয় তাহাকে পাঁচশত টাকা মাত্র দিয়াছিলেন।

এই পাঁচ শত টাকা সম্বল করিয়া রঘু নানা স্থানে ঘুরিল, নানা ঘাটের জল খাইল, নানা লোকের সহিত আলাপ করিল। দেখিল, রামায়ণে যদিও রামকে আদর্শ পুরুষ বলা হইয়াছে এবং এদেশে রাম মহিমা যদিও বহুকাল হইতে কীর্তিত হইতেছে, কিন্তু কার্যকালে কেহই রামের মতো হইতে চায় না। রাবণের মতো হইবার দিকেই সকলের বেশি ঝোঁক। সকলেই ধন চায়, মান চায়, প্রতিপত্তি চায়, সকলের উপর, এমন কি ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বরুণের উপরও প্রভুত্ব করিতে চায়। পর-স্ত্রীকে হরণ করিয়া বা ফুসলাইয়া ভোগ করিবার ইচ্ছা বেশীর ভাগ লোকেরই। এই নিদারুণ সত্য আবিষ্কার করিয়া রঘু কিন্তু দুঃখিত হইল না, তাহার মনেও বাসনা জাগিল, সে-ও রাবণ হইবে। যেদিন এ বাসনা তাহার মনে জাগিল সেদিন দেখিল, তাহার পকেটে মাত্র একটি আধময়লা দশ টাকার নোট আছে। মাত্র এই সম্বল লইয়া রাবণ হওয়া যায় না, অনতিবিলম্বে অমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপে? বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে সহসা তাহার চমকলালের কথা মনে পড়িল। কিছু দিন পূর্বে সে তাহাকে একটি পত্রও লিখিয়াছিল। তাহার ঠিকানা জানা আছে। তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? সে নাকি 'বিজনেস্' করিয়া লাল হইয়াছে এবং সকলকে চমকাইয়া দিয়াছে। সার্থকনামা ব্যক্তি। পুরাতন বন্ধুও। রঘুনাথ তাহার নিকট যাওয়াই স্থির করিল।

চমকলালের সহিত রঘুনাথের ঘনিষ্ঠতার আদি কারণ লোভ। চমকলাল বৈষ্ণব বংশের সন্তান। তাহাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় মাছ মাংসের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কুসঙ্গে মিশিয়া চমকলাল মাছ-মাংসের স্বাদ পাইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই লুকাইয়া-চুরাইয়া ওই নিষিদ্ধ আমিষগুলি সে সানন্দে ভক্ষণ করিত। কিন্তু তাহার সবিশেষ লোভ ছিল পক্ষীমাংসের প্রতি। এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিত রঘুনাথ। রঘুনাথ পক্ষীশিকারে সিদ্ধহস্ত ছিল। রঘুনাথেরও পক্ষী লইয়া বাড়ীতে যাইবার উপায় ছিল না। কারণ পিতামহী অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। সুতরাং পক্ষী-শিকার করিয়া প্রায়ই তাহা বাগানে, মাঠে বা ঝিলের ধারে ঝলসাইয়া গলাধঃকরণ করিতে হইত। চমকলাল এইভাবে এককালে অনেক ঘুঘু-পোড়া খাইয়াছে। রঘুনাথ ঘুঘুই বেশি শিকার করিত, হাঁস, তিতির বা হরিয়াল বড় একটা জুটিত না। ঘুঘুর মাধ্যমে উভয়ের প্রণয়টা বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল।

চমকলাল বলিল, "তোকে ত এক্ষুণি একটা খুব ভাল কাজ দিতে পারি, কিন্তু তুই পারবি কি?"

"পারব না কেন, কি কাজ—"

চমকলাল কয়েক মুহূর্ত স্থির-দৃষ্টিতে রঘুনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কিছু বলবার আগে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতে হবে। আমার কাজ

যদি ভাল না লাগে ছেড়ে দিতে পার, কিন্তু আমাদের কথা ঘ্ণাক্ষরে প্রকাশ করতে পাবে না। যদি কর প্রাণ যাবে। এতে রাজি ?"

"প্রাণ যাবে ?"

"প্রাণ যাবে। তোমারও যাবে আমারও যাবে—"

"কি রকম রোজগার হবে এতে ?"

"বছর খানেকের মধ্যেই লক্ষপতি হতে পারবে।"

"বলিস্ কি! রাজি আছি। প্রতিজ্ঞা করলাম আমার দ্বারা কখনও কিছু প্রকাশ হবে না।"

"তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।"

রঘুনাথ তাহাই করিল। তামা তুলসী গঙ্গাজল চমকলালের বাড়ীতেই ছিল।

তখন চমকলাল বলিল—"আমাদের কাজ হচ্ছে নোট জাল করা। জার্মানী থেকে ভাল মেশিন আনিয়েছি, দশ টাকার নোটই জাল করছি এখন। কিছুদিন পরেই একশ টাকার নোটে হাত দেব। নোট ম্যানুফ্যাকচার হয় এক জায়গায় আর সেগুলোকে পাচার করতে হয় নানা জায়গা থেকে। তোমাকে একটা সেণ্টারের চার্জে দিতে পারি। জায়গাটা বড় নির্জন, সেখানে থাকবার মতো বিশ্বাসযোগ্য কোনও লোকই পাচ্ছি না।

"আমাকে কি করতে হবে ?"

"সেখানে আমাদের একটা কাছারি আছে, সেই কাছারিতে তোমাকে ম্যানেজার সেজে যেতে হবে। কাছারি এককালে আমাদের জমিদারীর কাছারি ছিল। এখন কেউ থাকে না। এর সঙ্গে নোট জালের কোন সম্পর্ক নেই। কাছেই পাহাড় আর নদী আছে। তোমার কাজ হবে, সেই নদীর উপরে গেরুয়া রঙের পাল-তোলা কোনও নৌকো আসছে কিনা লক্ষ্য করা। নৌকো দেখলেই তাকে ডাকবে এবং জিজ্ঞেস করবে, খড়্কে বাটা মাছ আছে? সেটা যদি আমাদের নৌকো হয় তাহলে মাঝি বলবে—আছে, কিন্তু সবাইকে বেচি না। আপনি যদি ভাল দাম দেন, দিতে পারি। তখন তুমি তিন-কোণা পিতলের চাকতিটি বার করে তাকে দেখাবে। সে তৎক্ষণাৎ চাকতিটি নিয়ে একটি ছোটো বাক্স তোমাকে দেবে। সেই বাক্সর ভিতর নোট আছে। বাক্সটি নিয়ে তুমি পাহাড়ের উপর চলে যাবে আর সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেই জায়গায় রেখে চলে আসবে। তার পরদিন দেখবে, বাক্সটি সে জায়গায় নেই, তার জায়গায় নগদ একশোটি টাকা রয়েছে। এই টাকাটি তোমার নগদ মজুরি। এ ছাড়া বিজনেসের শেয়ারও তোমাকে দেব। কাছারির ম্যানেজার হিসাবে দুশো টাকা মাইনে এবং খাওয়া-দাওয়ার খরচও পাবে।"

"পিতলের তিন-কোণা চাকতি কোথায় পাব ?"

"আমিই দেব। নম্বর দেওয়া অনেক চাকতি আছে আমাদের। কিন্তু আর একটি অসুবিধা আছে। খাওয়ার খরচ আমরা দেব বটে, কিন্তু সেখানে চাকর বা রাঁধুনী রাখা চলবে না। স্বপাক খেতে হবে। মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে, সেখানে জিনিস-পত্র পাওয়া যায়। একটা সাইকেল রেখো, তাহলেই সহজে আনতে পারবে। আমিই দেব একটা সাইকেল তোমাকে। একটা বন্দুক আর একটা বাইনোকুলারও দেব।"

রঘুনাথ অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

বলিল, "এ যে উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে।"

"উপন্যাস ত কল্পনা, আর এটা হল সত্যি, সুতরাং উপন্যাসের চেয়েও ভাল। তুই রাজি আছিস্ ত? একা নির্জন-বাস করতে হবে কিন্তু।"

"তুমি মাঝে মাঝে যাবে ত?"

"কখনও সখনও যাব। আমাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়, তোমার ওখানে যাবার পালা যখন আসবে তখন যাব। রাজি ত?"

"রাজি।"

দুই

স্থানটি রঘুনাথের বড়ই ভাল লাগিল। মনোরম স্থান। শুধু যে নদী, পাহাড় এবং অরণ্য সৌন্দর্যের জন্যই মনোরম তাহা নয়। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, একটা অনির্বচনীয়, অনবদ্য শোভা যেন চতুর্দিক হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, সে শোভার বর্ণনা করা যায় না, তাহা চক্ষুগ্রাহ্য নহে, সূক্ষ্মরূপে তাহা সমস্ত অনুভূতিকে আবিষ্ট করে। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন দেবস্থানে আসিয়াছে। একটা অদৃশ্য মহিমা, অবর্ণনীয় পবিত্রতা যেন সমস্ত স্থানটাকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাহাড়, বিরাট বিরাট বনস্পতি, এমন কি ওই চটুলা নদীটা পর্যন্ত যেন সসম্ভ্রমে কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। রঘুনাথও অভিভূত হইল।

যে কাজের জন্য রঘুনাথ আসয়াছিল, সে কাজও বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছিল। সে মাত্র একমাস আসিয়াছে, এই একমাসের মধ্যেই গেরুয়া-পাল-তোলা নৌকা বার পাঁচেক দেখা দিয়াছে। প্রথম দুইবার নৌকায় গেরুয়া রঙের পাল ছিল কিন্তু পরে সাদা পাল উড়াইয়াই নৌকা আসিয়াছে। কারণ, যে লোকটি নোটের বাক্স লইয়া আসে, তাহার সহিত জানা-শোনা হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "নতুন লোকের কাছেই আমরা প্রথম প্রথম গেরুয়া পাল উড়িয়ে যাই। পরে আর দরকার হয় না। বার বার গেরুয়া পাল উড়িয়ে আসাটা নিরাপদও নয়, পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।"

রঘুনাথ সাধারণতঃ পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাইত। ইহার প্রথম কারণ, পাহাড়ের উপর হইতে সমস্ত নদীটা দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ, ওই পাহাড়ী জঙ্গলে প্রচুর পাখী। ঘুঘু, বন-পায়রা, তিতির প্রায়ই শিকার করিত সে। দিনের বেলা রান্নার হাঙ্গামা সে করিত না। রাঁধিত রাত্রে, পাখীর মাংস আর আলোচালের ভাত। দিনের বেলা সে চিঁড়া-মুড়ি দই-মিষ্টি খাইয়া কাটাইয়া দিত। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সে বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে পাখির পিছনে পিছনে ঘুরিত। বস্তুতঃ, শিকার করিবার সুযোগ না থাকিলে রঘুনাথ এই নির্জন নির্বান্ধব স্থানে টিঁকিতে পারিত কিনা সন্দেহ এবং এই শিকারের সূত্র ধরিয়াই সে একদিন তাহার অদ্ভুত আবিষ্কারটা করিয়া ফেলিল।

রঘুনাথ সাধারণতঃ নদীর তীরের পাহাড়গুলির উপরই বিচরণ করিত। কিন্তু এ পাহাড়গুলির পিছনেও আরও অনেক পাহাড় ছিল, অনেক বড় বড় পাহাড়। রঘুনাথ মধ্যে মধ্যে পাহাড়গুলির দিকে প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, ওখানে

নিশ্চয় আরও নানারকম পাখি আছে। সে দূর হইতে কয়েকবার ময়ূরের ডাক শুনিয়াছে, বন্য মুরগীর ডাকও শুনিয়াছে। তাহার ধারণা, ফ্লরিকানও ওই জঙ্গলে নিশ্চয়ই আছে। ফ্লরিকানের মাংস এক জমিদার বন্ধুর কৃপায় একবার খাইয়াছিল। চমৎকার! স্বাদটা যেন আজও মুখে লাগিয়া আছে। সে মনে মনে রোজই বলিত—ওই পাহাড়গুলো একবার ঘুরে দেখতে হবে।

একদিন সে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। যে পাহাড়ে সে রোজ ওঠে সেই পাহাড়ের গা বাহিয়া সে ধীরে ধীরে নামিতেছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, এই পাহাড় হইতে নামিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যে যে অরণ্যটা আছে সেটা পার হইয়া ওপারের পাহাড়টায় চড়িবে, কিন্তু কিছুদূর নামিতেই বাধা পড়িল। ভয়ঙ্কর বাধা। কোথা হইতে বিরাট একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সাপটা কিন্তু তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল না। ফণা তুলিয়া মূর্তিমান নিষেধের মতো একস্থানে স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। রঘুনাথ শিকারী মানুষ, তাহার লোভ হইল, ওটাকে খতম করিয়া দিলে কেমন হয়। দো-নলা বন্দুকে গুলি ভরাই ছিল, ফায়ার করিল। রঘুনাথের হাতের লক্ষ্য সাধারণতঃ অব্যর্থ হয়। কিন্তু এবার ব্যর্থ হইল। গুলি লাগিল না, সাপটাও দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার ফায়ার করিল রঘুনাথ। এবারও লাগিল না। সাপটা কিন্তু ফণা তুলিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন কতবার মারিবে মার না, দেখি তোমার দৌড় কতদূর। রঘুনাথ সভয় বিস্ময়ে সাপটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর ফায়ার করিতে সাহস করিল না। সাপটা আরও খানিকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচের জঙ্গলে মিলাইয়া গেল। ইহার পর যে সব বিস্ময়কর ঘটনা-পরম্পরা রঘুনাথের সাধারণ বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল, এই ঘটনাটিতেই তাহার সূত্রপাত, কিন্তু এটিকে রঘুনাথ অলৌকিক বলিয়া একবারও মনে করে নাই। সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে বিস্ময় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে নাই।

দ্বিতীয় দিন রঘুনাথ পাহাড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিল না। সে সমতলের উপর দিয়াই [illegible] পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দূরবর্তী যে দোকান হইতে [illegible] প্রত্যহ খাবার আনিতে যাইত, সেই দোকানের মালিককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে, ওই বড় বড় পাহাড়গুলিতে ওঠা যায় কি না, গেলে কোন্ পথ দিয়া ওঠা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই পাহাড়ের মাঝে যে জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলের ভিতর সরু পথ আছে একটা। অনেক ঘুরিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়। রাস্তাটা তিনি বলিয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। দু' একজন যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, মারা পড়েছে—"

"তাই না কি? কাল একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ দেখেছিলাম।"

"অনেক কিছু আছে ওখানে। এ অঞ্চলের কোনও লোক ওদিকে যায় না। ওই জঙ্গলের ভিতর শিকার করবার মতো অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে, শিকারীর পক্ষে খুব লোভনীয়, কিন্তু আমার মনে হয় না যাওয়াই ভাল।"

"সঙ্গে আমার বন্দুক থাকবে, জানোয়ারকে ভয় করি না।"

"ভয়টা ঠিক জানোয়ারের নয়—"

"তবে?"

দোকানদার একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "সবাই বলে ওখানে দেবীজি আছেন।"

"দেবীজি কি? মেয়ে মানুষ?"

"তাই ত শুনি। আমি নিজের চোখে দেখিনি কখনও। কেউই বোধহয় দেখেনি। কিন্তু গুজব যে ওই পাহাড়ের এক গুহায় এক দেবীজি থাকেন—"

রঘুনাথ দোকানদারের নিকট ইহার বেশি আর কোনও খবর পায় নাই। দোকানদার যদিও তাহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিল কিন্তু সে বারণে সে কর্ণপাত করিল না। সে আরও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। অজানার আহ্বান তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওই অরণ্যের গহনে কি রহস্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা দেখিতেই হইবে—একটা জেদ যেন তাহাকে পাইয়া বসিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিল সে। অনেক দূর হাঁটিয়া যখন সে জঙ্গলের একপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল তখনও পর্যন্ত তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় নাই। সে নির্ভয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। শাল বন। ছোট বড় অনেক শালগাছ এবং অসংখ্য ছোট ছোট গুল্ম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই কিন্তু তাহার মনে হইল—ঠিক কি যে মনে হইল তাহা তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে হয়ত বলিতে পারিত না—কিন্তু তাহার মনে হইল, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। একটা অদৃশ্য বাধার প্রাচীর যেন স্থানটাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তাহার মনে হইল—না, এভাবে সময় নষ্ট করা ত ঠিক হইতেছে না। এতদূর যখন আসিয়াছি শেষ পর্যন্ত যাইব। কিন্তু সে যাইতে পারিল না। যাইবার উপক্রম করিতেই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সম্মুখের সু-উচ্চ শালগাছে একটা বিরাটকায় বন্য-কুক্কুট উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ। রঘুনাথ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, যেন কোন প্রহরী সতর্ক করিয়া দিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু আত্মস্থ হইল সে। বন্দুক হাতে আছে, ভয় কি। উপর্যুপরি দুইবার ফায়ার করিল। কিছুই হইল না মোরগের, একটি পালক পর্যন্ত পড়িল না। সগর্বে মাথা তুলিয়া সে আর একবার ডাকিয়া উঠিল—কোঁকর কোঁ···। সাপটার কথা মনে পড়িল রঘুনাথের। তাহারও ত গায়ে গুলি লাগে নাই, সে-ও ত এমনি স্পর্দ্ধাভরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর বন্দুক তুলিতে সাহস করিল না। ভাবিল—থাক না মোরগটা, যত ইচ্ছা ডাকুক, আমি বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়ি। কিন্তু সে ঢুকিতে পারিল না। পা তুলিতেই ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ হইল, রঘুনাথের মনে হইল কর্কশকণ্ঠে কে যেন হাসিতেছে। চোখ তুলিয়াই রঘুনাথের বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। বিরাট একটা ভালুক পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া সামনের পা দুইটি দুই হাতের মতো দুইদিকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাহার চোখ-মুখের ভাব যেন—খবরদার, আর এক পা-ও এগিও না। রঘুনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মোরগটা আবার ডাকিয়া উঠিল। রঘুনাথের মনে হইতে লাগিল, সেই ঘর্ঘর-হাসিটা যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই।

পরদিন সে আর অরণ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিল না। কিন্তু তাহার কৌতূহল শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সেদিন নদীর ধারের যে পাহাড়টার উপর সে রোজ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই

পাহাড়েই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বাইনোকুলার দিয়া দূরের পাহাড়টাকে, পাহাড়ের পাদদেশের ঘন অরণ্যকে দেখিতে লাগিল বারবার। দেখিয়া দেখিয়া যেন আশা মিটিতেছিল না, কিন্তু এই রহস্যের উপর আলোকপাত করিতে পারে এমন কিছুই তাহার চোখে পড়িল না। মাঝে মাঝে নদীর দিকেও সে দেখিতেছিল, কোন নৌকা আসিতেছে কিনা। এমন সময় হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস তাহার চোখে পড়িল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অরণ্যের একটা অংশ কিছুদূরে গিয়া নদীতীরাভিমুখী হইয়াছে। এ জঙ্গল খুব ঘন নহে। একটা সরু পথের দুইপাশে সারি সারি কয়েকটা উচ্চশীর্ষ দেবদারু গাছ একটা বীথিকা সৃষ্টি করিয়াছে। জনশ্রুতি, ওই পথ দিয়া একটি বাঘ নদীতে জল খাইতে আসে। সেজন্য ও পথের কাছাকাছি কেহ যাইতে চাহে না। রঘুনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সেইদিকে একদল পাখী ধীরে ধীরে উড়িয়া চলিয়াছে। একরকম পাখী নয়, নানারকম পাখী অদ্ভুত শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলায় যেন একটি বিচিত্র বর্ণাঢ্য চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। চতুর্দিকে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ওই পাখীর চন্দ্রাতপ খানিকটা ছায়াময় করিয়াছে আর সেই ছায়ায় হাঁটিয়া চলিয়াছেন এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী। তাঁহার পিছনে পিছনে একটা দৈত্য কাপড়-গামছা এবং একটি উজ্জ্বল কলস বহন করিয়া চলিয়াছে। আরও ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া রঘুনাথের মনে হইল, দৈত্যটি একটি বিরাটকায় হনুমান এবং কলসটি সম্ভবতঃ সোনার। বিস্মিত রঘুনাথ আরও দেখিল, সেই নারী যখন দেবদারু-বীথিকার সমীপবর্তী হইলেন তখন দেবদারু গাছগুলি মাথা নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রঘুনাথ অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল, তিনি ধীরে ধীরে নদীতে নামিলেন, মনে হইল যেন নদীর তরঙ্গমালা তাঁহার পাদবন্দনা করিতেছে। হনুমান তাঁহার হাতে কাপড়-গামছা দিয়া কলসটি নদীতীরে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর একটি দেবদারুগাছের শীর্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিল। ইহার অব্যবহিত পরেই যাহা ঘটিল তাহাও অদ্ভুত। একটা দুগ্ধ ধবল কুজ্ঝটিকায় নদীর ঘাট অবলুপ্ত হইয়া গেল। সেই মহিমময়ী নারীকে আর দেখা গেল না। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ওই কুজ্ঝটিকার অন্তরালে তিনি স্নান সমাপন করিতেছেন। একটু পরেই কুজ্ঝটিকা মিলাইয়া গেল। তিনি স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিলেন। হনুমানও দেবদারু গাছ হইতে নামিয়া নদী হইতে এক কলস জল ভরিয়া লইল এবং সেটি মাথায় করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। দেবদারু গাছগুলি আবার প্রণত হইল, পাখীর চন্দ্রাতপ আবার আকাশে ভাসমান হইয়া তাঁহার মস্তকে ছায়াপাত করিতে করিতে চলিল। একটা অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য কল্পনা যেন রঘুনাথের বিস্মিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। ইনিই কি দেবীজি? নিশ্চয়ই ইনিই। এমন অপরূপ লাবণ্য রঘুনাথ আর কখনও দেখে নাই। রঘুনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে যেন আলোকের আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তিনি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রঘুনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। দেবীজি যে পথে আসিলেন এবং গেলেন সেই পথের দিকেই পা বাড়াইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই দেবদারুর সারি ত ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দেবীজিকে আর কখনও দেখে নাই ত! ইনি কে? তাঁহাকে আর একবার দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগিল।

কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিল, উনি নিজে কৃপা না করিলে দেখা পাওয়া যাইবে না, এখানকার সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতি, সমস্ত পশুপক্ষী, এমন কি সর্প পর্যন্ত উঁহার সেবায় নিযুক্ত। সকলেই যেন উঁহাকে আগলাইয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া দেবীজির সান্নিধ্য লাভ করিবে, কি করিলে তিনি কৃপা করিবেন, এই অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার কি করিয়া দিবালোকে সম্ভব হইল—এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ক্রমশঃ সেই দেবদারু গাছের সারির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, দেবীজি যে পথ দিয়া বনের মধ্যে গেলেন, সেই পথে গেলে কেমন হয়? কিন্তু ওই বিরাটকায় হনুমানের চেহারাটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সে নিশ্চয় বাধা দিবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। নদীর দিকে চাহিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। যে নৌকাটা তাহাকে নোটের বাক্স দিয়া যায়, সেই নৌকাটা তীরের কাছাকাছি আসিয়াছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া আরও দুইটি নৌকা। পুলিশের নৌকা। কারণ নৌকা দুইটির আরোহীদের সকলেরই মিলিটারী পোষাক এবং হাতে বন্দুক। রঘুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে এত সাবধানতা সত্ত্বেও চমকলালের নৌকা বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। তিনটি নৌকাই দেখিতে দেখিতে তীরে ভিড়িল। পুলিশ অফিসাররা নীচে নামিয়া তাহার দিকেই অগ্রসর হইল। একজন পুরুষকণ্ঠে আদেশ করিল—এই, এদিকে এস। রঘুনাথ আর কালবিলম্ব করিল না—ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দেবীজি যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথেই ছুটিতে লাগিল। আরও দুইবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বনের মধ্যে কিছুদূর যাইতেই সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। বজ্রপাতের মতো শব্দ হইল—হুপ্, হুপ্। ঘূর্ণিত লোচন প্রকটিত। দংষ্ট্রা হনুমান এক লম্ফে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল রঘুনাথ—"মা, মা দেবীজি, আমাকে বাঁচান—"

সম্মুখেই একটি পুষ্পিত লতামণ্ডপ ছিল। তাহার ভিতর হইতে দেবীজি বাহির হইয়া আসিলেন এবং হনুমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাবীর, কিছু বলো না ওকে। আসতে দাও—"

হনুমান সরিয়া গেল। রঘুনাথ দেবীজির পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—"আমাকে রক্ষা করুন দেবীজি, আমাকে পুলিশে তাড়া করেছে, দয়া করে আমাকে বাঁচান।"

"মহাবীর, দেখ ত কে ওকে তাড়া করেছে"—হনুমান একলম্ফে বাহিরে চলিয়া গেল। রঘুনাথ নিঃশঙ্ক হইল। মহাবীরকে পরাস্ত করিয়া পুলিশের লোক বনে ঢুকিতে পারিবে না, তা সে যত শক্তিমান পুলিশই হোক না কেন।

"তুমি কে? তোমার নাম কি?"—দেবীজি প্রশ্ন করিলেন।

"আমার নাম রঘুনাথ।"

"রঘুনাথ?"

দেবীর কপোল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

"এখানে কি কর?"

"চাকরি করি—"

"কি চাকরি?"

রঘুনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। সে যে জাল নোট পাচার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে, একথা বলিতে তাহার শুধু ভয় নয়, লজ্জাও করিতে লাগিল। মনে হইল দেবীর নিকট মিথ্যা কথা বলাটা কি সমীচীন হইবে? তাছাড়া উঁহার নিকট সত্য গোপন করা যাইবে কি? দেবীরা ত অন্তর্যামিনী! সরলভাবে সত্য কথাই বলা ভাল। অকপটে সব কথা সে খুলিয়া বলিল। সর্বশেষে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত গরীব। আমার ভাই আমাকে দূর করে দিয়েছে। অভাবে পড়েই আমি এ হীন কাজ করছি। টাকা না থাকলে যে এক পা-ও চলবার উপায় নেই মা—"

দেবীজি প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কত টাকা চাই তোমার?"

এ প্রশ্নের জন্য রঘুনাথ প্রস্তুত ছিল না। একটু থতমত খাইয়া গেল।

"কত টাকা হলে চলবে তোমার, বল"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

রঘুনাথ ভাবিল, কম করিয়া বলি কেন। ইনি দেবী, ইচ্ছা করিলে অসম্ভব প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে পারেন।

বলিল—"অন্ততঃ লাখখানেক টাকা ব্যাঙ্কে না থাকলে আজকালকার দিনে সংসারে স্বচ্ছন্দে চলা যায় না।"

দেবীজির মুখের হাসি আরও প্রসন্ন হইল।

বলিলেন—"আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—"

রঘুনাথকে লইয়া তিনি গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর গিয়া একটি উন্মুক্ত প্রান্তর পাওয়া গেল। প্রান্তরটি ঘন সবুজ দূর্বায় সমাচ্ছন্ন, চতুর্দিকে তাল—গাছের সারি। রঘুনাথ সবিস্ময়ে দেখিল, প্রান্তরের উপর একটি সোনার হরিণ চরিতেছে। তাহার মাথায় শাখাপ্রশাখাময় বিরাট সুবর্ণ-শৃঙ্গ। সর্বাঙ্গে সুবর্ণদ্যুতি। দেবীজিকে দেখিয়া হরিণটি আগাইয়া আসিল। দেবীজি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমার শিং দুটো একে দিয়ে দাও। বেচারা গরীব। তোমার শিং দুটোতে যত সোনা হবে তাতে এর জীবন চলে যাবে। দিয়ে দাও ওকে, ও আমার শরণাপন্ন হয়েছে—"

হরিণ যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়কর। সে পিছনের বাম পদ দিয়া দক্ষিণ শৃঙ্গটি এবং দক্ষিণ পদ দিয়া বাম শৃঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। কপালের দুই পাশে দুইটি গোলাকৃতি রক্তাক্ত চিহ্ন রহিল কেবল। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আবার চরিতে আরম্ভ করিল।

"ওই দুটো তুমি নিয়ে যাও। দুটোর ওজন দশ-পনের সের ত হবেই। খাঁটি সোনা। আশা করি এতে চলে যাবে তোমার।"

রঘুনাথ নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

"তুলে নাও—"

রঘুনাথ বিরাট শৃঙ্গ দুইটি তুলিতে গিয়া দেখিল, বেশ ভারি। তবু অনেক কষ্টে সে দুইহাতে দুইটাকে ঝুলাইয়া লইল। তাহার পর তাহার মনে হইল—বাহিরে গেলেই ত এখন ধরা পড়িবে। তাছাড়া এই সুবর্ণ-শৃঙ্গের জন্য কি জবাবদিহি দিবে সে? এই অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা ত কেহ বিশ্বাসই করিবে না।

সে দেবীজিকে বলিল—"মা, এখানে কোথাও আমাকে কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয়

দেবেন ? এই বড় বড় সোনার শিং নিয়ে ত বাইরে যাওয়া যাবে না। গেলেই একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। তার চেয়ে আমি এখানে বসে এগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে বাইরে নিয়ে যাব—"

দেবীজি বলিলেন—"আমার গুহায় অনায়াসেই থাকতে পার। সেখানে কুড়ুল কাটারি সব আছে। এস, দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, ভালই হবে, আমি কয়েকদিন থাকব না এখানে, তুমি আমার গৃহস্থালী দেখাশোনা ক'রো। এস—"

দেবীজি অগ্রসর হইলেন। রঘুনাথ অনুসরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হইতেই প্রশ্নটা রঘুনাথের অন্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"মা, আপনার পরিচয় ত দিলেন না কে আপনি ?"

রঘুনাথ নিজের কর্ণকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দেবীজি উত্তর দিলেন—"আমি জনক-নন্দিনী সীতা।"

রঘুনাথ অভিভূত হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

তাহার পর বলিল—"কিন্তু রামায়ণে লেখা আছে আপনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন—"

"করেছিলাম। কিন্তু আমার মা বসুন্ধরা বললেন, তুমি ফিরে যাও। পতি-গৃহই নারীর কাম্য স্থান। রামও তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। তুমি ফিরে যাও। তাই ফিরে এসেছি। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। শুনেছি এখানে রামরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, তিনি নিশ্চয় তাহলে কোথাও আছেন। আমি মহাবীরের সহায়তায় নানা প্রদেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি, যদি কোথাও তাঁকে দেখতে পাই। কাল পম্পা সরোবরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে—"

"কিন্তু ওই সোনার হরিণ কি ক'রে এল এখানে—"

"এখানে আসবার কয়েকদিন পরেই ও হঠাৎ আপনা থেকেই এল একদিন। বললে —মা, আমিই আপনার কষ্টের কারণ হয়েছিলাম বলে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। আজ আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, আর আমি পালাব না, আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে থাকব। আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিন। সেই থেকে ও আছে—"

"ও অমন অনায়াসে শিং দুটো খুলে দিলে কি করে ?"

"ও মায়াবী, ও সব পারে !"

তিন

মহাবীরের সঙ্গে সীতা পম্পা সরোবরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যাওয়াটাও একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এ যুগে যে ইহা ঘটিতে পারে তাহা রঘুনাথের সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁহাকে বহন করিবার জন্য দিব্যকান্তি পুষ্পকরথ আসিয়াছিল। তাহা প্রাণহীন ধাতু নির্মিত রথ নহে, তাহা সজীব, তাহার আচরণ সম্ভ্রমপূর্ণ।

সে আসিয়া স-সম্ভ্রমে বলিল—"মহাবীরের নির্দেশ অনুসারে আমি এসেছি। কোথায় আপনাকে নিয়ে যাব বলুন—"

"পম্পা সরোবরে—"

দেবী রথের উপর আসীন হইলেন। রথ উড়িয়া গেল। মহাবীর একলম্ফে শূন্যে উঠিয়া রথকে অনুসরণ করিতে লাগিল। মনে হইল, বিরাট একটা ধূসর মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। সম্ভবতঃ ওই মেঘ পুষ্পকরথকে আবৃতও করিয়াছিল, কারণ পুষ্পক রথকে আর দেখা গেল না।

রঘুনাথ স্বর্ণশৃঙ্গ দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার মনে হইতেছিল—ওজনে অন্ততঃ আধ মণ হইবে। আধ মণ খাঁটি সোনা। লক্ষ টাকার অনেক বেশি পাইবে। কিন্তু মাত্র লক্ষ টাকাতে কি সে সুখে থাকিতে পারিবে? শুনিতেই লক্ষ টাকা। আজকাল সমস্ত জিনিসপত্র যা অগ্নিমূল্য। একটা সাধারণ মোটরকার কিনতেই ত হাজার বিশেক টাকা লাগিয়া যাইবে। দেবীজির কাছে আরও বেশি কিছু টাকা চাহিলে ভাল হইত। তাহার পর সে ভাবিল—ওই হরিণটার কাছেই চাহিয়া দেখা যাক না। পায়ের ক্ষুরগুলো যদি খুলিয়া দেয়, আরও কিছু টাকা হইবে। হরিণের শিং লইবার পর সে আর হরিণের কাছে যায় নাই। গুহায় বসিয়া সেগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিতেই ব্যস্ত ছিল। ক্ষুরের কথা মনে উদয় হইবামাত্র সে হরিণের সন্ধানে বাহির হইল। গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল হরিণের শিং দুইটি আবার গজাইয়াছে, ঠিক তত বড় এবং তেমনি সুন্দর শাখা প্রশাখাময়। রঘুনাথ ধীরে ধীরে হরিণের কাছে গেল। ভাবিল, ক্ষুর না চাহিয়া, শিং দুইটাই আবার চাওয়া যাক।

"ভাই হরিণ, তোমার এ শিং দুটোও আমাকে দাও না—"

হরিণ ঘাড় ফিরাইয়া তার দিকে একবার চাহিল, তাহার পর যেমন ঘাস খাইতেছিল, খাইতে লাগিল।

"ভাই হরিণ, দাও না শিং দুটো। তোমার ত আবার গজাবে। দাওনা ভাই—"

হরিণের পিছনের দিকে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিল রঘুনাথ। তড়াক্ করিয়া হরিণটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়া করিল তাহাকে। রঘুনাথ ছুটিতে ছুটিতে গুহায় ফিরিয়া আসিল। সে কেমন যেন অপমানিত বোধ করিতেছিল। একটা হরিণ—তা হউক না সোনার হরিণ—তাহাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা তাহার মনে খেলিয়া গেল। বন্দুকের এক গুলিতে ওটাকে শেষ করিয়া দিলে কেমন হয়! সঙ্গেই ত বন্দুক এবং গুলি আছে। চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। তাহার বন্দুকের গুলি যে বারবার ব্যর্থ হইয়াছে একথা সে ভুলিয়া গেল, তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সমস্ত হরিণটাকে যদি লইয়া যাইতে পারি, কয়েক মণ সোনা পাইব। বন্দুকে গুলি ভরিয়া বাহির হইয়া গেল সে।

হরিণ মাঠের মাঝখানে নির্ভয়ে চরিতেছিল। রঘুনাথ ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা, খুব কাছাকাছি আসিয়া বুকের নিকট গুলি করিবে। খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল রঘুনাথ। হরিণের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেমন চরিতেছিল, চরিতে লাগিল। খুব নিকটে আসিয়া রঘুনাথ

ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। কি অপূর্ব স্বর্ণ কান্তি! কান দুইটা মাঝে মাঝে নাড়িতেছে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন। সমস্ত হরিণটা যদি পায় সে 'মাল্‌টি মিলিয়নেয়ার' হইয়া যাইবে। এদেশে আর থাকিবে না, আমেরিকায় গিয়া আকাশচুম্বী বাড়ী কিনিবে।

গুলি করিবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণ অদৃশ্য হইয়া গেল!

তাহার স্থানে আবির্ভূত হইল একটি বিকট রাক্ষস।

রঘুনাথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

"কে, আপনি—"

"আমি মারীচ রাক্ষস। তুই কি জানিস না, যে আমিই সোনার হরিণের রূপ ধরেছিলাম? পাষণ্ড লোভাতুর, তুই দেবীকে প্রতারণা করেছিস্, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবি না। দূর হ—"

চুলের মুঠি ধরিয়া মারীচ রঘুনাথকে শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

চূর্ণিত-মস্তক রঘুনাথের মৃতদেহটা পাহাড়ের উপর পড়িয়াছিল! পাশে বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিশ অফিসারও ছিলেন।

একজন বলিতেছিলেন—"আমার গুলিটাই ঠিক মাথায় লেগেছিল—"

আর একজন বলিলেন—"আমিও ফায়ার করেছিলাম। হয়ত আমারটা লাগেনি। লোকটা বনে ঢুকে পড়ল কিনা। ওই হনুমানটা তেড়ে না এলে আমি ঠিক বনের মধ্যে ঢুকে জীবন্তই ধরতাম ওকে। আমার কিন্তু আশ্চর্য লাগছে, হনুমানটাকেও গুলি করেছিলাম, কিন্তু তার ত কিছু হল না—"

"মিস করেছিলে—"

"আর একটা কথা। লোকটা বনের মধ্যে ঢুকেছিল, আপনার গুলি যদি ওর মাথায় লেগে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মরবার কথা। ও পাহাড়ে এল কি করে?"

"কোনও জানোয়ার টেনে এনেছে বোধহয়—"

"কিন্তু খায় নি ত?"

"কি জানি!"

অন্তিম উপলব্ধি

সুরেন প্রাণভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আমবাগানে। বাগানটা গ্রামের বাইরে। সেখানে একটা খোড়ো ঘরও ছিল। সেই ঘরে এসে বসেছিল সুরেন। বসে কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, কেবলি মনে হচ্ছিল, এ কি হল। এত সাধ, এত স্বপ্ন, এত বক্তৃতা, এত উৎসাহ, এত লাফালাফি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব। হঠাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হল সে। চতুর্দিকে মেঘঢাকা জ্যোৎস্না। আম গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর প্রত্যেকটি গাছে অসংখ্য জোনাকী। লক্ষ লক্ষ চোখ যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারা যেন উৎসুক

হয়ে প্রতীক্ষা করছে কারও। এ-ও তার মনে হল ওই অসংখ্য চোখে যেন ব্যঙ্গের হাসিও ফুটে বেরুচ্ছে। তারা যেন নীরবে তাকে বলছে ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? ওই গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লড়তে লড়তে মরতে পারলে না? সহসা ওই অসংখ্য চোখের দৃষ্টি যেন সরব হয়ে উঠল লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীকণ্ঠে। প্রশ্ন করতে লাগল তারা।

"ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? পালিয়ে এলে কেন? কেন, কেন, কেন—"

"আমি একা কি অত লোকের সঙ্গে লড়তে পারি!"

"নিশ্চয়ই পার। ইচ্ছে করলে তুমি একাই একশ' হ'তে পার। তোমার দেহটা হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত কিন্তু তুমি বাঁচতে। রোজ তো গীতা আওড়াও এ কথাটা মাথায় ঢোকেনি এখনও—"

"কিন্তু আমার এই দেহটার জন্যেই তো সব। সমাজ, দেশ, রাজনীতি, সাহিত্য, আত্মীয়স্বজন সবই তো এই দেহটাকে কেন্দ্র করে। দেহটাই যদি না থাকে—"

"তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তুমি আদিম অসভ্য বর্বর। স্বার্থপরের মতো নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। কিন্তু এটা কি ভুলে গেছ স্বার্থপরতাই শেষ পর্যন্ত সমূহ বিনাশের কারণ হয়? এটা কি জান না যে, পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারো না? এখনই যদি ওই গুণ্ডার দল তোমাকে এখানে ঘিরে ধরে, কি করতে পার তুমি! আবার ছুটবে, কতদূর ছুটবে? শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত মরতে হবেই। পশুর মতো মরতে হবে। তার চেয়ে বীরের মতো মরলে না কেন? তারা স্বার্থপর পশু, তারা যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের অধঃপতন হবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যারা মরেছে তাদেরই সম্মিলিত শক্তি শেষ পর্যন্ত টেনে নাবিয়ে দেবে তাকে। ওই দেখ—"

সুরেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখল অসংখ্য জোনাকী তার দিকে চেয়ে যেন সকৌতুকে হাসছে। ঝিল্লীকণ্ঠ অবিশ্রান্ত বলে যাচ্ছে—পালিয়ে এলে কেন! কেন, কেন, কেন—তারপর একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন বিদীর্ণ করে দিলে অন্ধকারকে। একটা পেঁচা ডেকে উঠল। তারপর আর একটা পেঁচা। তারপর আর একটা। সুরেনের মনে হল কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটা হঠাৎ বেশী আলোকিত হয়ে উঠল। চাঁদ এতক্ষণ মেঘ-ঢাকা ছিল, সহসা মেঘমুক্ত হল। তারপর কোলাহল উঠল একটা। অসংখ্য লোকের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজনা। মনে হল যেন কারা টিন বাজাচ্ছে। পরমুহূর্তে আর সন্দেহ রইলো না। একজন লোক ছুটতে ছুটতে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে দাঁড়াল সেই আলোকিত স্থানটায়। লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ থিয়েটারের রাজার মতন। কিন্তু বিস্রস্ত। একদিকের জুলফি নেই, খুলে পড়েছে। তার পিছু পিছু ছুটে এল একদল লোক টিন বাজাতে বাজাতে। আর একদল লোক তারস্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল একটা—

খুলে গেছে রাংতা যে ধুয়ে গেছে রং
আর কেন আর কেন মিথ্যে ভড়ং।
বেরিয়েছে মাটি খড়
করে সব নড়বড়

আর তো মানাচ্ছে না
থিয়েটারি ঢং
খুলে গেছে রাংতা যে ধুয়ে গেছে রং।

সব টিনগুলো একসঙ্গে বেজে উঠল। হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। থিয়েটারের রাজা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। ভাবটা যে ফাঁক পেলে পালাবে। কিন্তু ফাঁক নেই।

তখন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সে।

"ঠিক করে দেব, ঠিক করে দেব—সব ঠিক করে দেব—" হা-হা করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই। আবার শুরু হল আবৃত্তি।

পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে?
মুখোশ যে সরে গেছে চিনেছে তোরে।
ধরা পড়ে গেছ দাদা
বেরিয়ে পড়েছে কাদা
আর কেন আর কেন
পড়না সরে!
পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে!

থিয়েটারের রাজা কটমট করে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত জনতার দিকে। যেন তাদের ভস্ম করে দেবে। কিন্তু কিছু হল না। আবার উঠল উচ্চ হাসির রোল। আবার বেজে উঠল টিনগুলো। সুরেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আবার শুরু হল আবৃত্তি।

ফুলিয়ে গলার শির দিয়ে লেক্‌চার
বোকাদের কতকাল ভোলাবে গো আর?
আসবে দণ্ডদাতা
আসবে ভয়ত্রাতা
দম্ভের গম্বুজ হবে ছারখার
বোকাদের কত কাল ভোলাবে গো আর!

"আমি বলছি সব ঠিক করে দেব। সব ঠিক হয়ে গেছে, তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমাকে যেতে দাও—"

চীৎকার করে হাত পা নেড়ে বলতে লাগল থিয়েটারের রাজা। কিন্তু কেউ তাকে যেতে দিলে না। আরও ঘিরে ধরল চারদিকে। আরও জোরে জোরে বাজতে লাগল টিন। আরও জোরে জোরে করতে লাগল আবৃত্তি।

এ কথা যে লেখা আছে ইতিহাসময়
শিবহীন যজ্ঞের ধ্বংসই হয়।
দক্ষ পারেনি যাহা
তুমি কি পারিবে তাহা?
বীরভদ্রের কথা অলীক তো নয়
তার পদাঘাতে সব চূর্ণ যে হয়।

"থাম—থাম—থাম তোমরা"—

কিন্তু কেউ থামল না। হঠাৎ সুরেন লক্ষ্য করল তার জামাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতে একটা গুলি লেগেছিল মনে পড়ল। জামাটা খুলে ফেলে ক্ষতস্থানটা সে চেপে ধরল আর একহাত দিয়ে। কবিতার আবৃত্তি চলতে লাগল।

যে কান্না ফেটে পড়ে লক্ষ চোখে
বজ্র হয় যে তাহা রুদ্রলোকে
মহাকাল করে আজ
উদ্যত সেই বাজ
কি করে এখন বল রুকবে ওকে।
ঝরিয়েছ অশ্রু যে লক্ষ চোখে।
পুড়িয়ে ঘরের চাল উড়িয়েছ ছাই
করিয়েছ হত্যা যে পিতামাতা ভাই
ধর্ষিতা রমণীর
ঝরেছে নয়ননীর
সুতরাং ওরে পাপী নিস্তার নাই।
সুদে ও আসলে শোধ হবে পাই পাই।

এর পর অন্ধকার নেমে এলো সুরেনের চোখে। তার মৃত্যু হল। "কই, পালিয়েও তো তুমি বাঁচতে পারলে না?"

একটি যুবক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল। সুরেনের মনে হল তাহলে সে তো মরেনি।

"কে আপনি?"

"আমি ক্ষুদিরাম।"

যেমন আছে থাক

হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা সাবানের বাক্সে নানারঙের 'রিবন' রয়েছে। পাশেই আর একটা কৌটো, ঢাকনাটা প্লাস্টিকের, তার ভিতর নানারকম পুঁতি। শেলফের উপরেই তিনটে মোটা মোটা খাতা, এক্সারসাইজ বুক। খুলে দেখলাম প্রত্যেকটি ছবিতে ভরা। একটাতে ওয়াল্ট্ ডিস্নের আঁকা ট লাইফ অ্যাড্ভেন্চারস্। আর একটাতে প্রজাপতি আর পাখীর রঙীন ছবি। কয়েকটা কুকুরেরও। সুন্দর সুন্দর ছবি সব। তৃতীয়টাতে ডাকটিকিট। ... ক্যালেণ্ডার ঝুলছে এপাশে ওপাশে। একটাতে ক্রন্দনোন্মুখ একটি নাদুসনুদুস ছোট ছেলের ছবি, আর একটাতে তাজমহলের। বাঁ দিকের শেলফে নিপুণভাবে গোছানো বইয়ের সারি। অধিকাংশই কলেজের বই, কিন্তু 'সঞ্চয়িতা' এবং 'গীতবিতান'ও আছে। শেলফের পাশেই নীল টেবিলটা আর তার উপরে তার শৌখীন টেবিল ল্যাম্পটা। সেকালে মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তায় যে ধরনের আলো দিত, ল্যাম্পটা দেখতে সেইরকম। দেওয়ালের আর একটি ল্যাম্প। তার কাগজের শেডে চমৎকার ফুল-কাটা, অনেকটা রঙীন আলপনার মতো। বিছানার ধারে ধব্ধবে শাদা বেড্ সুইচটি ঝুলছে। শৌখীন বেডকভার ঢাকা ছোট্ট বিছানাটি

পাতাই রয়েছে। এর পাশেই একটা ছোট শেল্‌ফ। তাতে ছোট্ট টাইমপিস্‌টি রয়েছে, বন্ধ হয়ে রয়েছে, দম দেওয়া হয় নি বলে। ঘড়ি ছাড়া টুকিটাকি আরও কত জিনিস। অদ্ভুত আকৃতির বেঁটে সুন্দর একটা আতরের শিশি। তাছাড়া মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে, ছোট ছোট-ঝিনুক-দিয়ে-তৈরি ফুলের মতো একটা পেপারওয়েট। আর একটা পেপারওয়েট ডিম্বাকৃতি, কাঁচের, গাঢ় বাদামী রঙের। ওদিকের আলমারিতে পুতুলের সমারোহ। কেষ্টনগরের লক্ষ্মী-সরস্বতী-মহাদেব। বৈদিক ধাঁচের দাঁড়ানো সরস্বতীও রয়েছে একটি। তাছাড়া ব্রোঞ্জের মতো দেখতে আর কটি কলসীকাঁখে তন্বী তরুণী। শান্তিনিকেতনের পুতুল কৃষক-দম্পতি। স্ত্রীর মাথায় ঝুড়ি, পুরুষের কাঁধে শিশুপুত্র। তার এপাশে একটি বক্‌, আর এক-পাশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি, তার পিছনে একটা শৌখীন ট্রে। ট্রের মাথার কাছে একটা টিক্‌টিকি, আর একটা আরশোলা। দেখলে জীবন্ত মনে হয়, কিন্তু মাটির। বুদ্ধ-গয়া, শিব-লিঙ্গ, ধূপদানী, ফোটো-ফ্রেম, ভুঁড়ি-বার-করা ন্যাড়ামাথা বিকশিত-দন্ত একটা লোক, কাঠের তৈরি ড্রাগন, তারপরই প্যাঁচা একটা। ঠিক তার উপরে তিনটি আহিরিণী গোয়ালিনীর অপূর্ব মৃন্ময় মূর্তি, মাথায় দুধের কেঁড়ে নিয়ে হাত দুলিয়ে চলেছে সদর্পে। ফুলদানীই কত। পাথরের, মাটির, কাঁচের, পিতলের চীনে মাটির। তার পাশেই রেঙ্গুন থেকে আনা ল্যাকারের জিনিস, ফুলদানী, কৌটো, চায়ের ট্রে। তার ওধাবে চীনে-ধাঁচের বুদ্ধ মূর্তি। গয়ার পাথরের বুদ্ধ মূর্তিও রয়েছে পাশে। তার পাশেই একটা 'কাপ্‌', আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর শ্রীশ্রীমায়ের ফোটোও রয়েছে। তাঁদের সামনে রঙীন ছোট ছোট থালায় কন্যাকুমারী থেকে আনা পাথরের চাল, আর নুড়ি রয়েছে নানারকম। নানারঙের ঝিনুক এবং সামুদ্রিক শামুকের খোলাও। কোণে মোড়া রয়েছে কাগজের রঙীন পাখাটি। আরও কত জিনিস—ছোট ছোট কাপ, ছোট ছোট পাখী, মাটির ফল, কাঠের নেপালী ফুলদানী। তার পিছনে গণেশ।...

ভুটান আর জাম্বু—কুকুর দুটো—মুখ শুকিয়ে বসে আছে থাবার উপর মুখ রেখে। কোথা গেল!

সদ্য-বিবাহিতা কন্যা সব ফেলে রেখে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এখানকার একটি জিনিসেও আর দরকার নেই তার। নূতন জায়গায় নূতন জিনিস নিয়ে নূতন সংসার পেতেছে।

চারিদিকেই তার স্মৃতিচিহ্ন। দেখে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু ওগুলো যেখানে যেমন আছে থাক। দেখে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু এই কষ্টটাই মিষ্টি। এই মাধুর্যের সম্বলই তো এখন একমাত্র সম্বল।

মন

এবার আমার বাড়িতে দেওয়ালি খুব জমে নি। চাকরদের সাহায্যে কিছু প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েরা কেউ নেই—আলোগুলো যেন জ্বলেও জ্বলছিল না। আমার দাইয়ের নাতি বিজয় আর নাতনী সালিয়ার জন্যে কয়েক প্যাকেট ফুলঝুরি কিনেছিলাম। তাদের হাস্যকলরবে দীপালি-উৎসব সার্থক হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। ফুলঝুরি ফুরিয়ে গেল, তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর আমি গৃহিণীকে নিয়ে মোটরে করে বেরুলাম শহরের দেওয়ালি দেখবার জন্য। বাড়িতে একা একা ভাল লাগছিল না। কিছুদূরে গিয়েই কিন্তু বুঝতে পারলাম ভুল করেছি। এসব উৎসব পায়ে হেঁটে দেখতে হয়, মোটরে চড়ে নয়। আমাদের যখন সামর্থ্য ছিল তখন তাই দেখতাম। এখন আর পারি না। এতদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়িতেই দেওয়ালি করেছি, বাইরে বেরুবার দরকার হয় নি। এখন এতদিন পরে বেরিয়ে দেখছি জনতার স্রোতে গা ঢেলে দেবার সামর্থ্যই নেই। মন খারাপ হয়ে গেল। বড় বড় বাড়ি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়েছে, আকাশে হাউই ছুটছে, নানা রঙের আতসবাজি হচ্ছে, কাছে দূরে পটকা ফুটছে, বৈদ্যুতিক আলোর নানারকম রঙীন কৌশলে আমাদের নোংরা শহরটাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। কিন্তু মন খুশী হয়ে উঠল না, আগে যেমন হত। একটা অর্থনৈতিক তত্ত্ব মনে উদিত হয়ে সমস্ত উৎসবকে যেন ম্লান করে দিতে লাগল। মনে হল লোকে খেতে পাচ্ছে না, বানে চারিদিক ডুবে গেছে, এ সময়ে অনর্থক আলো জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মানে হয় কোনও। আমার মোটরটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামনে পিছনে দু পাশে লোকের ভিড়ে তারাও এগুতে পারছিল না। নজরে পড়ল একটি গরীব মায়ের কোলে একটি ছেলে অবাক হয়ে বিস্ফারিত নয়নে বাজি পোড়ানো দেখছে। তার সমস্ত মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। হঠাৎ ছেলেটি আমার দিকে ফিরে চেয়ে হাসল। যেন সে-ও আমাকে তার আনন্দের অংশীদার হতে আহ্বান করছে।

"আসবি আমার কাছে?"

হাত বাড়াতেই সে মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে আমার কাছে এল। মোটরের জানলা দিয়েই তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে কোলে বসিয়ে নিলাম। কি আনন্দ তার। কিছু পুতুল আর মিষ্টিও কিনে দিলাম তাকে। সেই ভিড়ের মধ্যে সহসা একটা স্বর্গলোক সৃষ্টি হল যেন। আমার বয়স অনেক কমে গেল। কবিতা গুনগুনিয়ে উঠল মনে।

ওগো চেনা কেমন করে
এমন মিষ্টি হেসে
আত্মীয়তা করলে দাবি
সহজ ভাবে এসে।

লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়ে যে মন একটু আগে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সেই মনই আবার নতুন কথা বলতে লাগল—অপচয়ে না হলে উৎসব হয় না। যেসব ছেলেমেয়েরা দেশের ভবিষ্যৎ তারা যখন আনন্দ পেয়েছে তখন এ তো সার্থক খরচ।

কুমারসম্ভব

ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একদিন আসিয়া আলাপ করিলেন। আমার লেখার সুখ্যাতি করিলেন এবং আরও এমন সব কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করিলাম। কথা বলিতে বলিতে মুখটি মাঝে মাঝে সুচোলো করিয়া ফেলেন। একটু পরেই আলাপে ব্যাঘাত হইল, দুই-চারিজন রোগী আসিয়া পড়িল। তখন তিনি বলিলেন, "আপনার বাড়িটা কোথায়? সন্ধ্যার পর সেইখানেই যাব। এখন এই ভিড়ের মধ্যে কথা কওয়া যাবে না।"

তাঁহাকে বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিলাম। সন্ধ্যার পর তিনি যখন আমার বাড়িতে গেলেন, তখন আমি 'কুমারসম্ভব' পড়িতেছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

"আসুন, আসুন। কালিদাস পড়ছি। বসুন—"

তিনি মুখটা সুচোলো করিয়া সামনের চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

"কালিদাসের উপমা সত্যিই অপূর্ব। শুনবেন একটু?"

পড়িতে লাগিলাম ঃ

"প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রীমার্গয়েব
ত্রিদিবস্য মার্গঃ
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী,
তয়া স পূতশ্চ বিভূতিশ্চ ॥"

দেখিলাম তিনি মুখ সুচোলো করিয়া জানলার বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। কালিদাসের উপমায় কিছুমাত্র মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ভাবিলাম, সংস্কৃত ভাষা বোধহয় তেমন জানা নাই, তাই রসটা ভালো উপভোষ করিতে পারিতেছেন না। ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"শুনুন, দীপঃ, মানে প্রদীপ, প্রভামহত্যা শিখয়া মানে সমুজ্জ্বল শিখা দ্বারা ইব যেমন শোভা পায়, ত্রিদিবস্য মার্গঃ, মানে স্বর্গের পথ, ত্রিমার্গয়া ইব, মানে গঙ্গার দ্বারা যেমন শোভা পায়, মনীষী মানে পণ্ডিতগণ, সংস্কারবতী মানে বিশুদ্ধ, গিরা ইব মানে বাক্য দ্বারা যেমন শোভিত হন, সঃ, মানে হিমালয়, তয়া মানে পার্বতী দ্বারা সেইরূপ পূত, মানে পবিত্র, বিভূতিশ্চ এবং অলঙ্কৃতও হয়েছিলেন। টানা মানে হল তাহলে—অত্যুজ্জ্বল শিখা দ্বারা যেমন প্রদীপ, ত্রিপথবাহিনী সুরধুনীর দ্বারা যেমন স্বর্গ এবং সংস্কার বিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা যেমন মনীষিগণ পূত ও বিভূষিত হন, এই কন্যাকার দ্বারা গিরিরাজও তদ্রূপ পবিত্র ও বিভূষিত হয়েছিলেন—"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখ তেমনি সুচোলোই আছে, অধিকন্তু দ্রূযুগলে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিয়াছে।

"কুমারসম্ভব ভালো লাগছে না?"

"ও পড়ে আর কি করব। আমি কুমারসম্ভবের চূড়ান্ত করেছি। আর ভালো লাগে না।"

"কি রকম ! অনেকবার পড়েছেন বুঝি ?"

"আরে মশাই, কালিদাস তো মাত্র একটি কুমারসম্ভব করেছেন। আমি করেছি এগারোটি। এগারোটি ছেলে আমার। গৃহিণী দ্বাদশ গর্ভভার বহন করছেন, জানি না, এবার কুমার না কুমারী কে আসছেন।"

কালিদাসকে হার মানিতে হইল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "ও, তাই নাকি ! বাঃ !"

হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই। দুবেলা খোরাক জোটাতে পারি না। শুনেছি, আপনি সদাশয় লোক, যদি কিছু অর্থসাহায্য করতে পারেন বড়ই উপকৃত হব।"

মুখ সুচোলো করিয়া আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

সর্বন গোয়ালা

সর্বন গোয়ালা ভালোমানুষ লোক এবং আমার অত্যন্ত অনুগত। আমার প্রতি তাহার বিশ্বাস এত প্রবল যে, আমি যদি বলি যে নদীর জল জল নয়, উহা ভগবানের বিগলিত স্নেহ, সে তৎক্ষণাৎ তাহা বিশ্বাস করিবে। একদিন সন্ধ্যায় সর্বনের সহিত মাঠ হইতে ফিরিতেছিলাম। আমার যে বিঘা দশেক জমি আছে তাহা সর্বই চাষ করে। বৎসরান্তে আমাকে কিছু ফসল আনিয়া দেয়। ফসল কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সর্বন বলিয়া উঠিল, কি সুন্দর ! ডাক্তারবাবু, আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন। কি চমৎকার রং ফুটে উঠেছে। দেখিলাম ভাদ্রের আকাশে মহাসমারোহে সূর্যাস্ত হইতেছে। বলিলাম, হবে না ? ভাদ্র মাসে স্বয়ং বিশ্বকর্মা যে সরস্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিজে তুলি দিয়ে সকাল সন্ধ্যে মেঘে রং দেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সর্বন বলিল, ও, তাই নাকি ! তাই এত কাণ্ড ! সর্বন আমার কথা বিশ্বাস করিল। এ বিশ্বাসের মূলে কি আছে জানেন ? এক খোরাক স্যানটোনাইন। একবার সর্বনের পেটে খুব ব্যথা হয়, আমি তাহার মল পরীক্ষা করিয়া তাহাকে বলি তোমার পেটে বড় বড় কৃমি আছে, এই ওষুধটা খাও, ঠিক হইয়া যাইবে। তাহার পরদিন সর্বন গোয়ালা উদ্ভাসিত মুখে আসিয়া বলিল, প্রায় একশত কেঁচোর মতো কৃমি বাহির হইয়া গিয়াছে, পেটের ব্যথাও আর নাই।

সেদিন ডিসপেন্সারিতে আসিয়া দেখি, সর্বন সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বিমর্ষ মুখে বসিয়া আছে। চক্ষু দুইটি লাল। সমস্ত মুখখানা যেন ঝামরাইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

"কি হয়েছে সর্বন ?"

নাড়ী দেখিলাম, বেশ জ্বর আছে। সর্দিও খুব। মনে হইল ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

"কাঁদছ কেন ? ঠাণ্ডা লেগেছে, ভাল হয়ে যাবে।"

তখন সে তাহার পা দুইটি বাহির করিয়া দেখাইল। দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। দুটি পা-ই ক্ষত-বিক্ষত।

"কি করে হল এসব ?"

"আমার শুকুমণি হারিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু।"

"তোমার মেয়ে ?"

"আজ্ঞে না। আমার গাই। দুজনেরই এক নাম। দুজনেই শুক্রবারে হয়েছিল কিনা।"

"পায়ের দশা এমন হল কি করে !"

"শুকুমণিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম যে। বনে-বাদাড়ে, হাটে-মাঠে, খোঁয়াড়ে-কশাই খানায় কোথায় না খুঁজেছি। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুকুমণি আমার হারিয়ে গেল ডাক্তারবাবু—"

সর্বন গোয়ালা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিলাম, "কেঁদো না। তোমার অসুখটা তো আগে সারুক।"

কিছু আগেই একটা ভালো ব্রডস্পেকট্রাম অ্যান্টিবাইয়োটিক ওষুধের নমুনা বিনামূল্যে পাইয়াছিলাম। সর্বনকে সেইটাই ইনজেকশন দিয়া দিলাম।

পরদিন সর্বন গোয়ালা হাসিমুখে আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে আমিও অবাক হইয়া গেলাম।

"ডাক্তারবাবু, কি আশ্চর্য ইনজেকশন আপনার! আমার অসুখ তো সেরে গেছেই, আমার শুকুমণিও ফিরে এসেছে। ভোরে উঠে দেখি, গোয়ালে জাবনা খাচ্ছে!"

চাচী

আজকাল সহৃদয় মানুষের বড় অভাব। সকলেই আমরা নিজেদের অতিসংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর পশুর মতো বাস করিতেছি। হৃদ্যতা বজায় রাখিবার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। প্রথম উপকরণ অবশ্য মন। দিলদরিয়া মন চাই। কিন্তু অভাবের তাড়নায়, পরশ্রীকাতরতার উত্তাপে, স্বার্থকলুষিত রাজনীতির বিষে আমাদের দিলদরিয়া মন মরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় উপকরণ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ; অতিথিকে, বন্ধুকে, আত্মীয়স্বজনকে নানাভাবে আপ্যায়িত করিবার সামর্থ্য কই ? এখন আমরা নিজেরাই খাইতে পাই না, নিজেরাই পরিতে পাই না। দিলদরিয়া হইতে হইলে তৃতীয় উপকরণ, স্থান। ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাস করিয়া দিলদরিয়া হওয়া যায় না। ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র খোপে বেশী দিন বাস করিলে মনটাও ছোট হইয়া যায়। এই সব কারণেই আজকাল বোধহয় সহৃদয় ব্যক্তির দেখা বড় একটা পাই না। সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটি অচেনা ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমার আত্মীয় তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমাকে ভাই রাত্রে থাকতে বলতাম, কিন্তু দেখছই তো দুটি মাত্র ঘর। খেতেও বলতে পারলাম না—আমাদের রাত্রে রান্নাই হয় না, আমরা পাঁউরুটি খেয়ে থাকি।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কি। আমি কোনও হোটেলে গিয়ে উঠছি। কাল যদি থাকি বিকেলে আসব।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার আত্মীয়ের স্ত্রী বলিলেন, "আমরা কষ্ট করে বিছানা খাট সরিয়ে ও'কে থাকতে বলতে পারতাম। স্টোভে খানকয়েক লুচি আর ডিমের ডালনা করে দেওয়াও অসম্ভব হত না, কিন্তু লোকটা মুসলমান, তাই আর প্রবৃত্তি হল না।"

ভদ্রমহিলা পাকিস্তানের মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল কি করে?"

"ইসমাইলের বাবা ও'র বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তাই উনি যখনই কলকাতায় আসেন একবার দেখা করে যান। কিন্তু যখনই আসেন আমার কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে, মনে হয় গেলে বাঁচি।"

আমার আত্মীয় হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা ভুলো না; ওর দৌলতেই আমার চাকরি। ইসমাইল চেষ্টা না করলে এ চাকরি পেতাম না।"

"তা হোক, ওরা আমাদের যে ক্ষতি করেছে তারপর আর ওদের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের ত্রিসীমানায় থাকতে চাই না।"

ভদ্রমহিলার চক্ষু দুইটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম মাউণ্টব্যাটেন ইহাই চাহিয়াছিলেন এবং আমাদের নেতাদের সহযোগিতায় তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চাচীর কথা মনে পড়িল।

আমার বাবা ছিলেন মনিহারী গ্রামের ডাক্তার। শুধু মনিহারীতেই নয়, আশপাশের অনেকগুলি গ্রামে তাঁহার পসার ছিল। চাচীর সঙ্গে আমাদের কবে যে পরিচয় হইয়াছিল তাহা মনে নাই। শুনিয়াছি আমাদের জন্মের পূর্বে তিনি একবার আমাদের বাড়িতে আসিয়া মাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহার স্বামী রহমতুল্লা সাহেব বাবাকে 'বড় ভাই' পদে বরণ করিয়া বাবার হাতে একটি রঙীন রাখীবাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে বাল্যকাল হইতেই চাচীর দেওয়া নানা উপহার পাইয়াছি। আমার খুব ছেলেবেলায় তিনি আমাকে একটি জরির টুপি দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের হাতের সেলাই করা প্রকাণ্ড একটি 'সুজনি' আমাদের বিছানায় পাতা থাকিত মনে পড়িতেছে। দোলের সময় আমাকে তিনি একটি লাল রঙের ছাতা লাল রেশমের পাঞ্জাবি ও পায়জামা উপহার দিয়াছিলেন। যখনই যেখানে যাইতেন আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। চাচী যে মুসলমান তাহা অনেকদিন জানিতামই না। ধারণা ছিল তিনি আমাদেরই কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বৈরিয়া গ্রামে বাস করেন। চমৎকার বাংলা বলিতেন। সেইজন্য আরও বুঝিতে পারিতাম না যে তিনি পর। তাঁহার ছেলে-মেয়ে ছিল না। ডাক্তারি, কবিরাজী, হেকিমি চিকিৎসায় তাঁহার বন্ধ্যাত্ব মোচন হয় নাই, তাই তিনি নানা তীর্থে নানা পীরের দরগায় গিয়া সন্তান কামনা করিতেন। ভারতবর্ষের নানা তীর্থে তো গিয়াছিলেনই, মক্কা-মদিনাও গিয়াছিলেন। যেখানেই যাইতেন আমার জন্য কিছু না কিছু আনিতেন। তাঁহার দুইটি উপহারের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। একটি ছোট্ট রুপার কৌটা, ঠিক আঙুরের মতো দেখিতে। তাহার ভিতর ভালো আতর-মাখানো তুলা ছিল। দ্বিতীয় জিনিসটি 'কৌনি'র চাল। 'কৌনি' বলিয়া একরকম ক্ষুদ্রকায় শস্য এদেশে হয়। খুব ছোট-দানার চাল হয় তাহা হইতে। সেই চালের পায়েস অতি উপাদেয়।

চাচী আমাদের বাড়িতে যখন আসিতেন তখন দূর হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার গরুর গাড়ির গরু দুইটির গলায় অনেক ঘণ্টা ছিল, গরু দুইটির চেহারাও ছিল চমৎকার। অমন ধপধপে সাদা বলিষ্ঠ প্রশান্ত-মূর্তি গরু বড় একটা চোখে পড়ে না। ছোট ছোট কালো শিং দুইটি যেন কষ্টিপাথরের। মুখের ভাব এত শান্ত, এত ভদ্র, যেন মনে হইত দুইটি অভিজাত বংশের সুসন্তান। চাচী তাহাদের কপালে পানের আকারে দুইটি কাঁসার টিকলি ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের আরও সুন্দর দেখাইত। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হইতে যে সৌম্য স্নিগ্ধ শান্ত ভদ্রতা বিকীর্ণ হইত তাহা তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিতেও বড় একটা দেখা যায় না। চাচীর গাড়িটি ছিল আরও সুন্দর। গাড়ির অমন টপ্পর (ছই) এ অঞ্চলে অন্তত আমি আর দেখি নাই। সেটি ছিল একটি চতুষ্কোণ ঘরের মতো। বাঁশের ও রঙীন দড়ির কারুকার্যে মনোরম। তাহাতে জানলা ছিল। আয়না ছিল। তাহার ভিতর কয়েকটি ছবিও টাঙানো থাকিত। এই গাড়ি আসার শব্দ শুনিলেই আমরা উল্লসিত হইয়া উঠিতাম। মা গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন। তবু চাচী আসিয়া যখন বিছানায় বা চেয়ারে বসিতেন মা কোনও আপত্তি করিতেন না। চাচী চলিয়া গেলে তিনি চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া সব আবার শুদ্ধ করিয়া লইতেন। চাচীর অকৃত্রিম স্নেহ মায়ের গোঁড়ামিকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল। চাচী যখনই আসিতেন আমাদের জন্য খাবার করিয়া আনিতেন। চিঁড়েভাজা, মুড়ির মোয়া, নানারকম সন্দেশ, হালুয়া এইসবই সাধারণতঃ আনিতেন তিনি। মা নিজে যদিও খাইতেন না, কিন্তু আমাদের খাইতে দিতে তিনি কখনও আপত্তি করেন নাই। অবশ্য খাইতে দিবার পূর্বে খাবারগুলিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া লইতেন।

একবার মা মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। সেবার আমার উপনয়ন হইয়াছে। তখনও আমার মাথা ন্যাড়া, সাড়ম্বরে ত্রিসন্ধ্যা করি এবং খাওয়ার সময় কথা বলি না। চাচী তাঁহার গরুর গাড়ি লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মাকে বলিলেন, আমি আমার ছেলেকে নিজের বাড়ি লইয়া যাইব। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি। মা প্রমাদ গণিলেন। চাচীর সহিত এমন একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা শক্ত। অথচ মাথা-ন্যাড়া একটা সদ্য-ব্রহ্মচারীকে মুসলমানের বাড়ি গিয়া অন্ন-গ্রহণ করিবার অনুমতিই বা দেন কি করিয়া! মা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাবা বলিলেন, ওখানে তোমাদের রান্না খাবার খাওয়া অবশ্য চলিবে না। এক বছর আমাদের নিয়মে থাকিতে হয়। তবে এমনি গিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারে। চাচী বলিলেন, ছেলে আমাদের বাড়ি যাইবে আর না খাইয়া ফিরিয়া আসিবে তা কি সম্ভব? ওখানে যাইতে হইবে, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, উহার জাত আমি মারিব না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, শরৎ দাদাকেও আমাদের সঙ্গে দিন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া পাহারাদার হইয়া আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনারাও যদি যাইতে চান, আর একটা গাড়ি পাঠাইয়া দিতেছি।

শেষ পর্যন্ত যাইতে হইল। মামাবাবু অশ্বারোহণে গাড়ির পিছু পিছু গেলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। চাচীর বাড়ির প্রকাণ্ড হাতা। দেখিলাম, চাচী সেই হাতার এক প্রান্তে দুইটি বেশ বড় বড় খড়ের ঘর করাইয়াছেন। তাহার একটিতে নূতন খাট, নূতন বিছানা এবং এমন কি নূতন একটি চেয়ার পর্যন্ত

সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অন্য ঘরটিতে রান্না হইতেছে। মৈথিল ঠাকুর রান্না করিতেছে। ভাল ঘিয়ের লুচি, আলুর দম, পটল ভাজা, বুটের ডাল, সন্দেশ, পায়েস—সবই সেই ঠাকুর করিতেছে। তাহার দুইজন সহকারীও মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া যে দুইটি চাকর রহিয়াছে, তাহারা গোয়ালা। আমাদের আশেপাশে মুসলমানের ছায়া পর্যন্ত নাই। আমাদের খাইবার জন্য চাচী বাসনপত্র আনাইয়াছেন স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার গৌরবাবুর বাড়ি হইতে। রুপোর বাসন।

আমাদের খাইবার সময় চাচী একটি মোড়া আনিয়া একটু দূরে উপবেশন করিলেন এবং মামাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিদিকে বলিয়া দিবেন তাঁহার ছেলের জাত আমি মারি নাই।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তিনি আমাকে একটি গেরুয়া রঙের রেশমের পাঞ্জাবি কাপড় এবং চাদর দিলেন।

চাচীর কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার মনিহারী গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলাম, আত্মীয়ের স্ত্রীর কথায় আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম।

"আপনি চা খাবেন কি? যদি খান তো স্টোভ জ্বেলে জল চড়িয়ে দি।"

"না, এত রাত্রে আর চা খাব না।"

উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। আজকাল বেশীক্ষণ কোথাও বসা যায় না।

শ্রীনাথ পণ্ডিত

মনিহারী স্কুলের নূতন শিক্ষক আসিয়াছিলেন শ্রীনাথবাবু। অনেকদিন আগেকার কথা। তখন মনিহারী স্কুল হাই স্কুল হয় নাই, মাইনর স্কুল ছিল। মাইনর স্কুলেরও সমৃদ্ধি ছিল না কোনও। মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। এটাও হইয়াছিল পণ্ডিত দুর্গা ওঝার বদান্যতায়। পণ্ডিত দুর্গা ওঝা পণ্ডিত ছিলেন না, মহাপণ্ডিত ছিলেন, অর্থাৎ তাহার অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কৃতী পুরুষ ছিলেন তিনি। সামান্য রেলওয়ে পয়েণ্টস্‌ম্যান রূপে কর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার, সে চাকরি অবশ্য বেশী দিন তিনি করেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা ধরিয়াছিলেন। গোলাদারি ব্যবসা। কর্মজীবন যখন তাহার শেষ হইল তখন দেখা গেল তিনি হাজার বিঘা জমি, ব্যাঙ্কে কয়েক লক্ষ টাকা এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসা রাখিয়া গিয়াছেন। মনিহারী গ্রামের ডাক্তারের ছোট ভাই চারুবাবুকে খুব ভক্তি করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবু সত্যই ভক্তি করিবার মতো লোক। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং পরোপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। গ্রামের মধ্যে তিনিই ছিলেন বোধহয় একমাত্র লোক যিনি সেকালের এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। বহু লোকের ইংরেজি চিঠিপত্র তিনি পড়িয়া দিতেন এবং উত্তরও লিখিয়া দিতেন। দুর্গা ওঝা রেলের কুলি কন্‌ট্রাক্ট লইয়া ছিলেন। সুতরাং অনেক ইংরেজি চিঠি আসিত তাঁহার কাছে। চারুবাবুই সব চিঠি পড়িয়া জবাব দিতেন। চারুবাবুকে এই সব কারণে খুব শ্রদ্ধা করিতেন দুর্গা ওঝা। চারুবাবুর রস-বোধ ছিল, তিনিই নিরক্ষর দুর্গা ওঝাকে পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন। মনিহারীর অপার

প্রাইমারি স্কুলকে যখন মাইনার স্কুল করিবার চেষ্টা হইতেছিল তখন কর্তৃপক্ষ বলিলেন মাইনার স্কুলের নিজস্ব বাড়ি হইলে তাহারা মাইনার স্কুল করিবার অনুমতি দিবেন। অপর প্রাইমারি স্কুলটি বসিত গ্রামের দুর্গা-স্থানে। সেখানে মাইনার স্কুল হওয়া অসম্ভব। স্কুল গৃহের জন্য চাঁদার খাতা খোলা হইল। কিন্তু মাস তিনেক চেষ্টার পরও কোনও সন্তোষজনক ফল দেখা গেল না। পাশাপাশি দশখানি গ্রাম হইতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার প্রতিশ্রুতি মিলিল। চারুবাবু দুর্গা ওঝাকে বলিলেন, এখানে যদি মাইনার স্কুল হত আমিই হয়তো হেডমাস্টার হতে পারতাম। দুর্গা ওঝা বলিলেন, স্কুল হলে আপনি থাকবেন? বেশ আমিই স্কুল করিয়ে দেব। যদিও মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল তবু ওঝাজির প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হইয়াছিল শুনিয়াছি।

এই স্কুলে শ্রীনাথবাবু শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন। হেড পণ্ডিত। বেতন কাগজে কলমে মাসিক কুড়ি টাকা। কিন্তু তাঁহাকে দেওয়া হইত ষোল টাকা। এই সর্তেই তিনি চাকুরি লইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট টাকা দিতেন না, ছাত্র-সংখ্যাও বেশী ছিল না। অনেকে স্বত প্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়মিত দিতেন না। যাঁহার মাসে মাত্র চার আনা করিয়া দিবার কথা, দেখা যাইত তাঁহারও কাছে দশ বারো টাকা বাকী পড়িয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই শিক্ষকদের বেতন কমাইতে হইয়াছিল। চারুবাবু বহুকাল বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথবাবুর বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার কোন গ্রামে। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ। অদ্ভুত চেহারা ছিল ভদ্রলোকের। সর্বাঙ্গের চামড়া কেমন যেন ঢিলা, একেবারেই আট-সাঁট নয়। কপালে বহু রেখা। ভুরুর চামড়া ঝুলিয়া প্রায় চোখের উপর পড়িয়াছে। গালের চামড়াও ঝোলো-ঝোলা। কান দুইটা অস্বাভাবিক লম্বা। তাহাকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত কোনও জন্তু বুঝি। হাসিলে মুখটা আরও কদর্য হইয়া উঠিত, রাগিলে আরও ভীষণ। তাহার ঢিলা চামড়া দেখিয়া সন্দেহ হইত এককালে তিনি সম্ভবত বেশ মোটাসোটা ছিলেন। কোনও কারণে চামড়ার নীচের চর্বি লোপ পাওয়াতে চেহারাটা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পড়াইবার ধরনটা ছিল একটু নূতন ধরনের। বাংলা পড়াইতেন। বাংলায় 'রচনা' একটা প্রধান বিষয়। ক্লাশে একটা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "কানাই, গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধে রচনা লিখতে বললে কি কি লিখবে বল।"

কানাই যথাসাধ্য বলিয়া গেল। কোন্ কোন্ মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে, আকাশের কোথায় সূর্য থাকিলে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়, গ্রীষ্মকালের কি কি অসুবিধা, কোন্ দেশে গ্রীষ্মকাল কত দিন থাকে—এই সব।

"তুমি তো আসল কথাই বলছ না। গ্রীষ্মকালের উপকারিতা কি?"

কানাই মাথা চুলকাইয়া বলিল, "গ্রীষ্মকালে স্কুলের ছুটি হয়।"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের মুখ আরও কদর্য হইয়া গেল। তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

"তা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো তোমাদেরই খালি সুবিধা হয়, আর কারও তো হয় না। যাতে সকলের উপকার হয় সেইটেই উপকারিতার মধ্যে ধরতে হবে। গ্রীষ্মকালে আর কি উপকারিতা আছে বল।"

একটি ছেলে বলিল, "গ্রীষ্মকালে নদীর জল, পুকুরের জল, সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। তার থেকে মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়।"

শ্রীনাথ পণ্ডিত ধমকাইয়া উঠিলেন।

"তোমার খুব দূরদৃষ্টি আছে দেখছি। বস। আসল কথাটা কেউ বলছ না কেন ?"

ঘনশ্যাম মাথা চুলকাইয়া বলিল, "গ্রীষ্মকালে আম হয়।"

কথাটা শ্রীনাথ পণ্ডিত যেন লুফিয়া লইলেন।

"হ্যাঁ। এইবার আসল কথাটি বল। গ্রীষ্মকালে আম হয় কত রকম কত সুন্দর। বোম্বাই আম, ল্যাংড়া আম, কিষণভোগ, ভরত ভোগ, ক্ষীরস পাতি। কামড়ে খাও, চুষে খাও, শুধু খাও, দুধ দিয়ে খাও, ক্ষীর দিয়ে খাও—"

শ্রীনাথ পণ্ডিত বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। চেয়ারের উপর বসিয়া দুলিতেন।

"গ্রীষ্মকালে আর কি ফল হয়—"

"লিচু—"

"হ্যাঁ—লিচু, লিচু। ইয়া বড় বড় রসে ভরা লিচু। যেমন রং, তেমনি খেতে—"

শ্রীনাথ পণ্ডিতের চোখ বুজিয়া যাইত। মনে হইত সত্যই বুঝি তিনি একটা লিচু মুখে পুরিয়াছেন।

"কোথাকার লিচু সবচেয়ে ভালো বলতো—"

কেহই বলিতে পারিত না।

"মজঃফরপুরের। মজঃফরপুরের লিচুর তুলনা নেই। যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। সাইজ বড়, ছোট্ট আঁটি। তোমাদের পীর-বাবার পাহাড়ের সামনে যে জাম গাছ তার জাম খেয়েছ কখনও ?"

একাধিক বালক উত্তর দিল, "খেয়েছি—"

"কি রকম খেতে ?"

"ভালো—"

"ভালো বললে কিছুই বলা হয় না। বল—তোফা। ইয়া বড় বড় গুবরে পোকার মতো চেহারা, শাঁসে ভরতি।"

এইভাবে শ্রীনাথ পণ্ডিত বিভিন্ন ঋতুর 'উপকারিতা' পড়াইতেন। বর্ষাকালের উপকারিতা কি ? আম কাঁঠাল বিশেষ করিয়া সিপিয়া ও শুকুল আম। শরৎকালের উপকারিতা তাল, বড় বড় তাল। তাহার পরই পুজো। পুজোয় কত প্রকার সুখাদ্য খাইবার সুযোগ আসে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতেন। শরৎকালে ইলিশ মাছেরও প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষ করিয়া ভাদ্র মাসে। এই প্রসঙ্গে পদ্মার ইলিশের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন তিনি। হেমন্তকালের উপকারিতা কি ? অনেকেই জানিত না। শ্রীনাথ বলিয়া দিতেন, কমলালেবু। বড় বড় কমলালেবু বাজারে আসে তখন। শীতকালে ? মাছ। বড় বড় রুই, কাতলা, মৃগেল মাছে বাজার ভরিয়া যায়। চিংড়িও অনেক। গলদা চিংড়ির বর্ণনা গদ্‌গদ ভাষায় করিতেন। বসন্তকালে ? সজিনা ডাঁটা, আর কচি আমের সমারোহ। চচ্চড়ি আর কচি আমের ঝোল কত খাইবে খাও না।

ভুগোলও পড়াইতেন তিনি। কোন স্থান কিসের জন্য বিখ্যাত তাহা পড়াইতে হইত। কিন্তু তাঁহার বিবরণ পুস্তকের বিবরণের সহিত মিলিত না। বহরমপুর কিসের জন্য বিখ্যাত ? সিল্কের জন্য নয়, ভালো পানতোয়ার জন্য। বর্ধমান ? মহারাজার

জন্য নয়, সীতাভোগ, মিহিদানার জন্য। মালদহের মটকার জন্য তাহাকে মনে করিয়া রাখিবার দরকার নাই। মটকা আরও অনেক জায়গায় হয়। মালদহ প্রণম্য আমের জন্য এবং খাজার জন্য। শান্তিপুরকে মনে রাখিতে হইবে শাড়ির জন্য নয়, সর-ভাজার জন্য। দেওঘরকে প্যাঁড়ার জন্য, বৈদ্যনাথের জন্য নয়। আমাদের দেশে শিব প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে গিজগিজ করিতেছে। এই জন্যই কাশীর আসল মাহাত্ম্য তাহার বেগুনে, পেয়ারায় এবং ল্যাংড়া আমে, বিশ্বনাথে নয়। ভাগলপুরের তসরের কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাগলপুরের বালুসাই আর জরদালু আমের তুলনা মেলে কি? কে বলিল লক্ষ্ণৌ শহর জরির কাজের জন্য বিখ্যাত? লক্ষ্ণৌ শহরের গৌরব তাহার খরমুজ, তরমুজ এবং দশেরি আম। মন্দারে মধুসূদন আছেন বটে। কিন্তু মন্দারের জল যে একবার খাইয়াছে সে কি মন্দারকে ভুলিবে কখনও? শ্রীনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টিকোণ বাস্তবধর্মী ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। ধার্মিকও ছিলেন তিনি। শরীরং আদ্যং খলু ধর্মসাধনং এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোনও ধর্মই পালন করা যায় না, আর শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপকরণ খাদ্য, সুখাদ্য। একবার মনিহারীর হাটের উপর এক সন্ন্যাসী আসিয়া বক্তৃতা দিতে ছিলেন। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা সন্ন্যাসীটির, কোটরগত চক্ষু, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। বক্তৃতায় তিনি বলিতেছিলেন —ব্রহ্মচর্যই আসল। ব্রহ্মচর্য না করিলে শরীর টিকিবে না। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীনাথ পণ্ডিত উঠিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক বাণী। কিন্তু আমি একটি সাধারণ ছোট কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। ব্রহ্মচর্যই করুন, অথবা ল্যাম্পট্যই করুন, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে। না খাইলে শরীর টিকিবে না।"

শ্রীনাথ পণ্ডিত নিজে কিন্তু ভালো খাইতে পাইতেন না। স্কুলের ষোল টাকা বেতন পাইবামাত্র তাহা বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খগেন মোয়ারের বাড়িতে। বিনিময়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া তাঁহাদের জমিদারি সেরেস্তায় কাগজপত্র তাঁহাকে লিখিতে হইত। সেখানে খাওয়া বিশেষ সুবিধার ছিল না। ডাল ভাত এবং একটা ভাজা এবং ক্বচিৎ কখনও একটা শাকসব্জীর তরকারি। তাঁহারা অবশ্য রোজই 'দহি' দিতেন। কিন্তু তাহাতে এত ধোঁয়া-গন্ধ যে শ্রীনাথ পণ্ডিত তাহা খাইতে পারিতেন না।

একদিন অবশ্য তিনি ভাল খাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের জমিদার ফুদ্দি সিংয়ের বাড়িতে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে। বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন তিনি। কলিকাতা শহর হইতে রাঁধুনী এবং ময়রা আসিয়াছিল।

মনিহারী গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং স্কুলের মাস্টার পণ্ডিতরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীনাথ পণ্ডিত সকলের সহিত মহা-উৎসাহে গেলেন সেখানে। হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন, নবাবগঞ্জ মনিহারী হইতে মাত্র দুই মাইল। কিন্তু ফিরিলেন তিনি চারিজন লোকের স্কন্ধে। আহারের পরই তাঁহার ভেদবমি শুরু হয়। তাঁহার খাওয়ার বহর দেখিয়া সকলের নাকি তাক লাগিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় তাঁহার জিনিসপত্রাদি লইতে আসিয়াছিল। তাঁহার মুখে জানা গেল শ্রীনাথ পণ্ডিত এককালে বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন।

বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন। বাধ্য হইয়া তাই এই চাকুরিটি লইয়াছিলেন।

পুচ্ছা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন বোধহয় ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। মনিহারী গ্রামে এখন যাঁহারা বাস করিতেছেন তখন তাঁহারা কেহ ছিলেন না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কোনও ইতিহাস নাই। অত্যাচারিত নিপীড়িত লোকেরা লুপ্ত হইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় একথাও নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। মানুষের স্মৃতিতে ক্বচিৎ কখনও বাঁচিয়া থাকে তাহারা। মুখে মুখে তাহাদের কাহিনী অমর হয়। অনেক সময় সত্য রূপকথায় পরিণত হয়। কে জানে তেপান্তরের মাঠের গল্প, ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নময় মোহ নিদ্রা, সোনার কাঠি রুপার কাঠির কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কস—রাজপুত্রের গল্প এসব সত্য ইতিহাসেরই রূপান্তর কি না।

আমি এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম আমাদের গাড়োয়ান পুচ্ছার মুখে। তাহার আকৃতি দেখিলে তাহার কথা কেহ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিবে না। কুচকুচে কালো চেহারা। রোগা, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া থাকে। গাড়ির গরু দুইটার সহিত ঝুঁকিয়া কথা বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত দেহটার ঝোঁকই সামনের দিকে হইয়া গিয়াছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল কদম-ছাঁট। নাপিত পাইলে একেবারে মুড়াইয়া কাটিয়া ফেলে। লোচন-নাপিত ছাড়া আর কাহারও নিকট সে চুল কাটাইত না। কুৎসিত চেহারা লোচনেরও। গলায় প্রকাণ্ড গল-গণ্ড, একটা চোখ ছোট, আর একটা বড়। বেশ বড়, মনে হইত এখনই বুঝি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু তাহার একটি প্রধান গুণ ছিল। জীবন্ত খবরের কাগজ ছিল সে। আশপাশের সমস্ত গ্রামের নিখুঁত সত্য খবর তাহার কাছে মিলিত। তাহার নিকট মাথাটি পাতিয়া দিয়া পুচ্ছা চোখ বুজিয়া চুল কাটাইত এবং গল্প শুনিত। লোচনের বাক্য বেদবাক্য ছিল তাহার কাছে। পুচ্ছার চেহারার আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহার দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে সামান্য সামান্য পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। মনে হইত দুইটি মুক্তার পুঁতি কে লাগাইয়া দিয়াছে যেন। একদিন পুচ্ছাকে বলিয়াছিলাম, পিঁচুটি মুছিয়া ফেল। পুচ্ছা রাজী হইল না, বলিল, লোচন মুছিতে মানা করিয়াছে। বলিয়াছে, চোখের বাহিরের কোণে ওইরকম পিঁচুটি জমিলে চোখের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা হইয়া যায়। পুচ্ছা বা লোচন আফিং, গাঁজা বা কোকেন খায় না। স্বভাবতই তাহারা কল্পনা-প্রবণ। তাহারা যে একেবারেই নেশা করে না, তাহাও নয়। খৈনি খায়। পুচ্ছা বেশী কল্পনা-প্রবণ। সে যদি লিখিতে পড়িতে জানিত, কিংবা ছন্দ মিলাইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কবি-খ্যাতি জুটিত তাহার ভাগ্যে। কিন্তু তাহার বিরাট কল্পনা সত্ত্বেও সে গাড়োয়ানই রহিয়া গেল। তাহার পিঠ-ভরা দাদ ছিল। কাঁধ হইতে কোমর পর্যন্ত। গাড়ি হাঁকাইতে হাঁকাইতে সে কাঁধ দুইটা নাড়াইত মাঝে মাঝে। তাহার পর হঠাৎ গাড়ি

থামাইয়া বলিত—ভাগ্, ভাগ্ আব্। পালা, পালা এবার। বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া পিঠ চুলকাইতে থাকিত। প্রথম প্রথম আমি বুঝিতে পারিতাম না, ব্যাপারটা কি। দাদের সহিত কথা কহিতেছে কেন? একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম তাহার দৃষ্টিভঙ্গী কবিজনোচিত। পিঠের দাদকে সে দাদ বলিয়াই মনে করে না। তাহার বদ্ধ ধারণা, তাহার পিঠে লাল পরী এবং নীল পরী আসিয়া নাচে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে বলিয়া পিঠে গোল গোল দাগ। ডাক্তাররা যাহাকে রিং-ওয়ার্মের রিং বলিয়া মনে করেন, পুচ্ছার মতে তাহা পরীর পায়ের দাগ। তাহাদের পায়ে নাকি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নখ আছে, সেইজন্যই তাহারা যখন নাচে তখন সমস্ত পিঠটা চুলকাইয়া ওঠে। নৃত্য উদ্দাম হইলে পুচ্ছা আর সহ্য করিতে পারে না, বলিয়া ওঠে, 'ভাগ্, ভাগ্ আব্' এবং লাঠি দিয়া পিঠ চুলকাইতে থাকে।

যে গল্পটি বলিতে যাইতেছি, এই পুচ্ছার মুখেই সেটি শুনিয়াছিলাম। খুব সম্ভবত ইহা ইতিহাসসম্মত সত্য নয়, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে পুচ্ছার কোনও সন্দেহ নাই। সে যাহা বলিয়াছিল তাহার মতে তাহা খাঁটি সত্য।

অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রে গরুর গাড়ি করিয়া ফাঁসিয়া-তলার মাঠে যাইতেছিলাম। সেখানে আমাদের কিছু জমি ছিল এবং সে জমিতে মকাই বোনা হইয়াছিল। মকাই শুধু মানুষের খাদ্য নয়, শৃগালেরও খাদ্য। কচি মকাই খাইতে তাহারাও ভালবাসে। অন্তত, পুচ্ছা তাই বলে। মকাই-ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দিবার জন্য পুচ্ছা রোজ গরুর গাড়ি চড়িয়া যাইত। একদিন আমিও তাহার সঙ্গী হইলাম।

'ফাঁসিয়া-তলা' এবং তাদের কাছে 'কাটাহা' এই দুইটি স্থানই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পূর্ণিয়ার নবাব শওকত্ জঙ্গের সহিত সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধ হইয়াছিল ওই 'কাটাহা' প্রাঙ্গণে। কাটাকাটি হইয়াছিল বলিয়া স্থানটার নাম 'কাটাহা'। কাটাহাতে একটি প্রাচীন তালগাছ ছিল, তাহার গায়ে গোলা-গুলির দাগও দেখা যাইত। এই যুদ্ধে শওকত্ জঙ্গ পরাজিত হইয়াছিলেন। পূর্ণিয়া জেলার মণি এখানে হারিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামটার নামও মনিহারী হইয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি। ফাঁসিয়া-তলায় যে অশ্বত্থগাছটি আছে সেই গাছেই শওকত্ জঙ্গের বন্দী সৈন্যদের ফাঁসি দিয়াছিলেন সিরাজদ্দৌল্লার সেনাপতি মোহনলাল। এই কারণেই স্থানটা ফাঁসিয়া-তলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ-সব ঐতিহাসিক কাণ্ড-কারখানা অনেকদিন হইল চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুচ্ছার মতে চুকিয়া যায় নাই। সে মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না রাত্রে ওই অশ্বত্থগাছের ডাল হইতে মড়া ঝুলিতে দেখিয়াছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যাহারা বলে ওগুলো বাদুড় তাহারা বাদুড় চেনে না। শুধু ঝোলে না, মাঝে মাঝে আর্তনাদও করে। যাহারা মনে করে উহা শৃগালদের সম্মিলিত কলরব তাহাদেরও বুদ্ধির উপর পুচ্ছার তাদৃশ আস্থা নাই।

অন্ধকারে মাঠের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতেছিল। সামনে পিছনেই বিরাট দুইদিকে মাঠ। মাঠে পড়িতেই পুচ্ছা আমাকে কথা বলিতে মানা করিয়া দিল। এই বিরাট মাঠটা সে নিঃশব্দে পার হইতে চায়। এই মাঠ দেখিয়া হঠাৎ আমার 'চামা' মাঠের কথা মনে পড়িয়া গেল। সেখানে নাকি একটা প্রেতিনী মাথায় আগুনের মালসা লইয়া উদ্দাম নৃত্য করে। পুচ্ছা বলিয়াছিল একদিন আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে।

ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুচ্ছা, আমাকে চামা-মাঠে কবে নিয়ে যাবে?"

পুচ্ছাও নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলে, "যেদিন কাঠ আনতে টালে যাব সেইদিন নিয়ে যাব, যদি মাইজি তোমাকে যেতে দেন—"

"মাকে তুমি বোলো না। আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে চলে যাবো—।"

সহসা পুচ্ছা চাপা কণ্ঠে তর্জন করিয়া উঠিল, "চুপ।"

চুপ করিয়া গেলাম।

তাহার পর পুচ্ছা আমার কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "সামনে দেখো। সেই যোগলালের ঘরটা দেখা যাচ্ছে—।"

সামনে চাহিয়া দেখিলাম পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার। আর কিছুই চোখে পড়িল না।

"কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো।"

"ভাল করে দেখ। চোখ দুটো বড় বড় করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো, দেখতে পাবে।"

বিস্ফারিত নয়নে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দেখিতে পাইলাম, এক জায়গায় অন্ধকারটা একটু গাঢ়তর। ওইটেই কি যোগলালের ঘর? পুচ্ছাকে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। পুচ্ছাও ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "হাঁ। একটি কথা বোলো না। চুপ করে থাকো।"

পুচ্ছা গাড়িটাকে অনেক দূর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম, যোগলালের ঘরের কাছে সে যাইতে রাজী নয়। সেই জায়গাটা যখন পার হইয়া গেলাম তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "যোগলাল কে?"

পুচ্ছা খানিকক্ষণ কোনও উত্তরই দিলে না। মনে হইল, সে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছে। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে যাহা বলিল তাহা রূপ-কথা। অন্তত, আপনারা তাহাই মনে করিবেন।

বহুকাল আগে এই মাঠে যোগলাল বলিয়া একটি গরীব লোক বাস করিত। লোকটি গরীব, কিন্তু অনেক রকম তন্ত্র-মন্ত্র জানা ছিল তাহার। দেখিতে সুদর্শন ছিল না। কালো রং, মুখটা কুমীরের মুখের মতো। ছোট ছোট চোখ। গা-ময় লোম। কিন্তু তাহার বউটি ছিল পরমা সুন্দরী। লোকে বলিত মন্ত্রবলে সে বউকে উড়াইয়া আনিয়াছে এবং তন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গেল ছত্তর সিং। পুরা নাম ছত্রপতি সিংহ। সে ছিল এ অঞ্চলের জমিদার। যথেচ্ছাচারী জমিদার। শুধু জমিদারই ছিল না সে, সুদখোর মহাজনও ছিল। জমিজমা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দিত। সুতরাং এ অঞ্চলের অনেক লোকই কেনা গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল তাহার। সকলকেই প্রায় মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল। যোগলাল তন্ত্র-মন্ত্র লইয়া থাকিত, রোজগার করিত না। বলিত, পয়সার পিছনে ছুটিলে তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা বিঘ্নিত হয়। ফলে, কিছুদিন পরে তাহাকেও ছত্তর সিংয়ের কবলে পড়িতে হইল। কারণ, অন্ন-বস্ত্রের জন্য তাহাকে টাকা কর্জ করিতে হইত। ছত্তর সিং অবশেষে তাহার বাড়িটিও গ্রাস করিল। ঋণের পরিমাণ নাকি পাঁচশত টাকার কাছাকাছি হইয়াছিল। কিন্তু সে আর একটি প্রস্তাবও করিল যোগলালের কাছে। বলিয়া পাঠাইল, সে যদি তাহার রূপসী পত্নী সুখিয়াকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়,

তাহা হইলে ঋণের একটি পয়সাও আর দিতে হইবে না। শুধু তাহাই নয়, তাহার বাকি জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও ছত্তর সিং লইবে।

যোগলাল বলিল, সুখিয়া যদি স্বেচ্ছায় যাইতে চায় যাক্ আমার আপত্তি নাই। সুখিয়া কিন্তু গেল না। তখন ছত্তর সিং একদিন লোকজন পাঠাইল সুখিয়াকে জোর করিয়া আনিবার জন্য। লোক-লস্কর সিপাহী শান্ত্রী আসিয়া তাহার বাড়ি ঘেরাও করিল। কিন্তু সুখিয়া ও যোগলালের নাগাল তাহারা পাইল না। তাহারা দুইজনেই ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছিল। মন্ত্রের জোরে ঘরের খিল এমন ভাবে আঁটিয়া বসিয়াছিল যে, অনেক ধাক্কাধাক্কি অনেক গুঁতাগুঁতিতেও খুলিল না। তখন তাহারা যাহা করিল তাহা ভয়ঙ্কর। ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। সকলের ধারণা হইল, সুখিয়া ও যোগলাল পুড়িয়া মরিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে বুঝি। কিন্তু তাহা যে হয় নাই ইহার প্রমাণ দুই বৎসর পরে পাওয়া গেল। ছত্তর সিং খুব ঘটা করিয়া যোগলালের ভিটার উপর বাড়ি বানাইয়াছিল একটি। বাড়ি নয়, অট্টালিকা। আগাগোড়া পাকা, কাচের বড় বড় জানলা। সেই বাড়িতে সে গৃহপ্রবেশ করিল এক বাঈজি লইয়া। সেইদিনই রাত্রেই লোমহর্ষক কাণ্ডটি ঘটিল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া ঘরে খিল লাগাইয়া শুইয়া আছে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, ছাতের উপর দুইটা লাল রঙের সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, এ কি—ঘরের দেওয়ালেও বেড়াইতেছে! সাপ নয়, আগুনের শিখা। লক্‌লক্ করিয়া লক্ষ লক্ষ শিখা সারা বাড়িময় ঘুরিতেছে। কাচের জানালাগুলো লালে লাল হইয়া গেল। ছত্তর সিং বাঈজিকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। ঘরের কপাট খুলিল না। যোগলালের মন্ত্রবলে কপাট আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। পরদিন সকালে দেখা গেল অট্টালিকা নাই, ভস্মস্তূপ পড়িয়া আছে। তাহার পরই প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। ভস্মস্তূপও উড়িয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে পুচ্ছার পিতামহ একদিন দেখিতে পাইল অন্ধকারের মধ্যে যোগলালের ঘর আবার মূর্ত হইয়াছে। অন্ধকারেই উহা দেখা যায় এবং যাহার চোখ আছে সেই দেখিতে পায়।

আমি পুচ্ছাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করি নাই। দুইজনেই নীরবে গাড়িতে বসিয়াছিলাম। গাড়ির চাকা দুইটা হইতে আর্তনাদের মতো শব্দ উঠিতেছিল মাঝে মাঝে।

পুচ্ছার মৃত্যুর পর আমরা পুচ্ছার ভাগনা মাদারিকে বাহাল করিয়াছিলাম। তাহার মুখেও একদিন ছত্তর সিংহের গল্প শুনিয়াছি। দিবালোকে একদিন কাটাহার মাঠ দিয়া যাইতেছিলাম। মাদারি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, এই মাঠে এককালে আমাদের পূর্বপুরুষরা থাকিতেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পূর্বপুরুষ?"

"না, ঠিক আমার নয়, আমার মামার পরদাদার (প্রপিতামহের) বাড়ি ছিল এখানে।"

"কার, পুচ্ছার?"

"জি। ছত্তর সিং জমিদার তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল!"

গল্পটা মনে পড়িল তখন।

বলিলাম, "ছত্তর সিংও এখানে একটা বাড়ি বানিয়েছিল নাকি? সে বাড়িও আপনাআপনি পড়ে যায়?"

মাদারি বিস্মিত হইল।

বলিল, "না, সে সব তো কিছু হয়নি।"

তৃতীয় পুরুষ

কথাগুলি শুনিয়া মহেন্দ্র কিছু বলিল না। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ঈষৎ বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, ঈষৎ ব্যয়িত আনন যাহা প্রকাশ করিল তাহাই যথেষ্ট। মহেন্দ্র মিতবাক ব্যক্তি, সহজে কথা বলে না।

তাহার পিতা যোগেন্দ্র (যোগীন) তিনদিনের ছুটি লইয়া ঘোঘা গিয়াছিল, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে। 'বহু' (বউ) আসে নাই। শুধু তাহাই নয়, মহেন্দ্রের শালা বিষণ্ণ ভাব-ভঙ্গীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে আর আসিবেও না। সংবাদটা শুধু নিদারুণ নয়, ভয়াবহ। মহেন্দ্র তাহার একমাত্র পুত্র। শেষে কি তাহাকে নির্বংশ হইতে হইবে? মহীনের যদি একটা পুত্র (কিংবা কন্যাও) থাকিত তাহা হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত। সেটাকে আটকাইয়া রাখিলে 'বহু' এমন ভাবে বাপের বাড়ি বসিয়া থাকিতে পারিত না। নাড়ীর টানেই তাহাকে আসিতে হইত। দুই দুইবার তাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াওছিল, কিন্তু দুইবারই অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। রক্তে দোষ আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইতেছিল, এমন সময়, 'বহু' একদিন পলাইয়া গেল। তাহার পর হইতে আর আসিতেছে না। যোগীন একবার ভাগিনেয়কে আর একবার তাহার এক দূর-সম্পর্কের দাদাকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এবার সে নিজে গেল, তাহাতেও কিছু হইল না। মহেন্দ্রর শালারা একরকম স্পষ্টই বলিয়া দিল বোনকে তাহারা পাঠাইবে না। যোগীন যদি থানা-পুলিস বা পঞ্চায়েত করিতে চায় করুক। তাহাদের যাহা বক্তব্য তাহা তাহারা সেখানেই বলিবে। কথাটা যদি খাওয়াদাওয়ার পূর্বে বলিত তাহা হইলে যোগীন সেখানে অন্নগ্রহণই করিত না। অভুক্ত চলিয়া আসিত। কিন্তু কথাটা তাহারা যখন ভাঙিল তখন যোগীন ভর-পেট খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রচুর দই, চিঁড়া, আম এবং কলা। যোগীন আত্মসম্মানী লোক। যাহারা তাহাকে এমনভাবে অপমান করিল তাহাদের দেওয়া দই চিঁড়া আম কলা সে হজম করিবে? কখনই না। 'হরগিজ নেহি'। সে গলায় আঙুল দিয়া সমস্ত বমি করিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাদের উঠানেই। তাহার ক্ষীণ আশা ছিল এই নাটকীয় কাণ্ডের পর তাহারা হয়তো মিটমাট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সেদিক দিয়া তাহারা গেলই না। ঘোঘার বাজারের কাছাকাছি আসিতেই পুরাতন বন্ধু মিঠাই-লালের সহিত দেখা হইল। মিঠু ঘোঘাতেই একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়াছে আজকাল। মিঠু আসল কথাটা প্রকাশ করিল। সে বলিল উহার (মহীনের) শালাদের বদ্ধধারণা যে দুবুরীর (মহীনের স্ত্রী) যে দুই-দুইবার গর্ভপাত

হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য মহীনই দায়ী। দুবুরীর রক্তে যে দোষ পাওয়া গিয়াছে তাহাও মহীনের জন্য। মহীনের দুষ্ট রক্তই দুবুরির রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। এই জন্যই সে পলাইয়া আসিয়াছে এবং এই জন্যই ছবিলাল (মহীনের আর এক শালা) দুবুরিকে আর পাঠাইতে চাহিতেছে না। ঘোঘা হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন মহীনের রক্তও পরীক্ষা করা উচিত। খবরটা শুনিয়া যোগীনের চক্ষু চড়ক গাছ হইয়া গিয়াছে। মহীনের রক্ত খারাপ? ইহা তো অসম্ভব। মনিহারী গ্রামে কে না জানে যে যোগীনের বংশ নিষ্কলঙ্ক? তাহাদের চরিত্র খারাপ হইলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তাহারা কি তিনপুরুষ কাজ করিতে পারিত? যোগীনের বাবা জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর প্রিয় ভৃত্য ছিল। জগন্নাথ পূর্বে ঘোড়া 'লাদিত' অর্থাৎ একটা বেটো ঘোড়ার পিঠে নানারকম জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। একবার জগন্নাথ বর্ষায় জলে আপাদমস্তক ভিজিয়া জ্বরে পড়ে। জ্বর শেষে নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল। যমে-মানুষে লড়াই করিয়া ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে বাঁচান। ইহার পর ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে আর ঘোড়া লাদিতে দেন নাই। বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বাড়িতেই থাক। তোমার ঘোড়াটাও আমার হাতায় চরিয়া বেড়াক। তুমি যতটুকু কাজ করিতে পার কর, আর যদি না পার বসিয়া থাক। ডাক্তারবাবু ঘোড়াটার জন্য তাহাকে বারোটা টাকা দিয়েছিলেন। সে যুগে এই দামই যথেষ্ট ছিল। জগন্নাথ ঘোড়াটারই তদারক করিত। তাহার সামনের পা দুইটি ছাঁদিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং সে ফড়িংয়ের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়াইত। জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারির বারান্দায় বসিয়া কানে দেশলাইকাঠি ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে সেটি ঘুরাইত এবং মাঝে মাঝে ঘোড়াটির দিকেও চাহিয়া দেখিত। ঘোড়া ফুল-বাগানের বেড়ার ধারে গেলে, কিংবা হাতার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে জগন্নাথ দেশলাইকাঠিটি কান হইতে বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত এবং গাছের একটা শুকনো ডাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিত—"হেট্ হেট্ হেঁই হেঁই।" ইহাতেই কাজ হইত। ঘোড়াটা বুঝিত যে সে স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আবার স্বস্থানে আসিয়া চরিতে আরম্ভ করিত। এইভাবে শুইয়া বসিয়া জগন্নাথের দিন কাটিতেছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে কোনও কাজের ভারও দেন নাই। কিন্তু তিনি লোক চিনিতেন এবং ইহা জানিতেন যে মানুষ বরাবর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কিছুদিন পরে দেখা গেল জগন্নাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাগান পরিষ্কারে মন দিয়াছে। বাগান লইয়া কিন্তু তাহাকে বেশীদিন থাকিতে হইল না। ডাক্তারবাবুর শিশু পুত্র বল্টুবাবুর সহিত তাহারা ভাব হইয়া গেল।

বল্টুবাবু একদিন ঘোড়াটি দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, "ঘো। কাল ঘো?"

জগন্নাথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "খোকাবাবুর—"

"আমাল ঘো?"

"হ্যাঁ, তোমারই।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বল্টুবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কাল ঘো?"

"তোমার।"

"আমাল ঘো?"

"হ্যাঁ, তোমারই তো।"

"আমাল? আমাল ঘো!"

কথাটা যেন বল্টুবাবুর বিশ্বাসই হয় না।

"চড়বে? এস, চড়িয়ে দিই।"

জগন্নাথ সত্য সত্যই বল্টুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিল। সেইদিন হইতেই শুরু হইল জগন্নাথের নূতন কাজ। সে প্রত্যহ বল্টুবাবুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া হাতার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুকে বলিয়া একটি রঙীন 'জিন' এবং রঙীন লাগামেরও ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ইহার পর জগন্নাথ বল্টুবাবুর খাস চাকর হইয়া গেল। রাত্রে বল্টুবাবু জগন্নাথের কাছেই শুইত। ঘুমাইয়া পড়িবার পর গভীর রাত্রে জগন্নাথ তাহাকে বাড়ির ভিতর দিয়া আসিত।

বহুবার-শ্রুত এই ঘটনা যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। এ সব ঘটিয়াছিল প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে। তখন যোগীনের জন্মও হয় নাই। কিন্তু গল্পটা সে এতবার শুনিয়াছে যে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের চোখে যেন দেখিয়াছে সব। সে যখন বল্টুবাবুকে দেখিয়াছে তখন তাহার বয়স ত্রিশের উপর। কিন্তু কল্পনায় সে শিশু বল্টুবাবুকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।

আর একটা গল্প যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। জগন্নাথেরই গল্প। জগন্নাথ যে কত বড় দৃঢ়-চরিত্র কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিল তাহারই কাহিনী। একবার সে দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। বাহিরে বৈঠকখানায় কয়েকজন ভদ্রলোক অতিথি আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার পথে একটা পোড়ো চালা ছিল। সেই চালার বাতায় বোলতার চাক ছিল একটা। হঠাৎ সেখান হইতে কয়েকটা বোলতা উড়িয়া আসিয়া জগন্নাথের গালে, কপালে, চিবুকে কামড়াইয়া ধরিল। অন্য লোক হইলে চায়ের পেয়ালা দুইটা ফেলিয়া দিত। কিন্তু জগন্নাথ কিছুই করিল না। চায়ের পেয়ালা যথাস্থানে পেঁছাইয়া দিয়া তাহার পর বাহিরে আসিয়া মুখ হইতে বোলতাগুলোকে হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ ফুলিয়া তাহার যে চেহারা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সাতদিন কোনও কাজ করিতে পারে নাই। চোখ দুইটা একেবারে বুজিয়া গিয়াছিল। জ্বরও হইয়াছিল খুব।

একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই যোগীনের এত কথা মনে হইতেছিল। এরকম লোকের বংশে যাহার জন্ম তাহার কি চরিত্র খারাপ হইতে পারে? মহীনের রক্তেও দোষ আছে এ কথা তাহারা বলিল কি করিয়া? তাহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

কিন্তু এখন আসল যে প্রশ্নটির সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন সেটি হইতেছে—করা যায় কি! এই জটিল জালকে ছাড়ানো যায় কি করিয়া! যোগীনের জীবনে সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান এতদিন যে ব্যক্তিটি করিয়াছে তাহার নিকট যাওয়া ছাড়া উপায় কি! মণিবাবুর কাছেই যাইতে হইবে।

মণিবাবু বল্টুবাবুর পুত্র এবং যোগীনের মনিব। আইনত ইহাই তাহাদের সম্পর্ক। আসলে কিন্তু যোগীন মণিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সেই আসলে মালিক। পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে যোগীন মণিবাবুর দক্ষিণ হস্ত। কারণ আছে। মণির যখন জন্ম হয় তখন যোগীনের বয়স দশ এগারো বৎসর। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র সে, সুতরাং মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়াই সে ডাক্তারবাবুর আঙিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার

পর তাহার কাজও জুটিয়া গেল। মণিবাবুকে সে দেখাশোনা করিতে লাগিল। তাহার কাজ হইল মণিবাবুকে কোলে লইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ানো। সেই মণিবাবু এখন বড় হইয়াছে বিষয়ের মালিক হইয়াছে, তাহার বউ আসিয়াছে। একটি খোকাও হইয়াছে। সবটাই যেন যোগীনের কৃতিত্ব। সুতরাং যোগীন মণিবাবুর ঠিক চাকর নয়। যোগীন বাড়ির লোক। তাহার যাবতীয় খরচ মণিই বহন করে। তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচ মণিই দিয়াছিল। বছর দুই পরে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে মাইজির (মণির মায়ের) জেদে। বিবাহের সমস্ত খরচ মণির। মহীনের মাকে মাইজী পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সোনার হার পরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার গলায়। মহীনও এই বাড়ির উঠানে খেলাধুলা করিয়া মানুষ হইয়াছে। যোগীনের ইচ্ছা ছিল সে যেমন মণিকে কোলে করিয়া বড় করিয়াছে, মহীনও তেমনি মণির খোকা বাবুনকে বড় করুক। কিন্তু মণিই তাহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল আজকাল যুগ বদলাইয়াছে, হাওয়া বদলাইয়াছে, মহীনকে লেখা পড়া শিখিতে হইবে। তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ফল যাহা হইয়াছে তাহা যোগীনের অন্ততঃ মনোমত নয়। একটি বাবু তৈয়ারি হইয়াছে। গোঁফ কামায়। দিনরাত মচর মচর করিয়া পান চিবাইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া সিগারেটও খায় সম্ভবত। চুলের বেশ বাহার। ফুলেল তেল মাখে। প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট পরিয়া বেড়ায়। তা ছাড়া দেহে-মনে পৌরুষ বলিয়া কিছুই নাই। কথা বলিতে পারে না। বকিলে ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে অবশ্য এবং মণিবাবুর সুপারিশে স্কুলের একটা মাস্টারিও জুটিয়াছে কিন্তু যোগীন এ সবে সন্তুষ্ট নয়। নিজের বউকে যে দাবাইয়া রাখিতে পারে না সে কি একটা মানুষ? স্নান করিতে রোজ একঘণ্টা লাগে, সাবান ঘষিতেছে তো ঘষিতেছেই। টর্চ রিস্টওয়াচ এসেন্স রুমাল এই সব লইয়াই আছে।

যোগীন গোপনে একজন উকিলের পরামর্শ লইল, মহীনের আবার বিবাহ দেওয়া যায় কি না। উকিল বলিলেন, আজকাল আইন বড় কড়া। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করা চলে না। ডিভোর্স করাও সহজ নহে। যোগীন জানিতে চাহিল ডিভোর্স না করিয়াই যদি বিবাহ দেওয়া যায়, কি হইবে? উকিল গম্ভীরভাবে বলিলেন, আইনত সাজা হওয়ার কথা। তাহা যদি নাও হয়, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সব সন্তানাদি হইবে তাহারা জারজ বলিয়া গণ্য হইবে। বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না। যোগীন অবাক!

মহীনের বন্ধু শ্যামলাল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, বউ আসছে না কেন? ছেড়ে দিলে নাকি তোকে!" মহীন কোন উত্তর দেয় না। ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে কেবল। তাহার চোখ দুইটা কেবল একটু বড় বড় হইয়া যায়। চোখেই যেন রাগ প্রকাশ পায় তার। মুখে কিন্তু কিছু বলে না।

২

অবশেষে মণিকে সব খুলিয়া বলিতে হইল।

মণি গম্ভীর লোক, সব শুনিল, কোন মন্তব্য করিল না। কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়াও রহিল না। মহীনকে লইয়া ভাগলপুরে চলিয়া গেল। সেখানে এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তাহার রক্ত দিয়া আসিল পরীক্ষা করিবার জন্য। মহীনের নিকট ভিতরের আসল খবরটিও জানিয়া লইল। তাহার পর গেল ঘোঘা।

৩

কোথা দিয়া কি হইল তাহা যোগীন বুঝিতে পারিল না। সে সবিস্ময়ে দেখিল মণি 'বহু'কে লইয়া আসিয়াছে এবং 'বহু'র সঙ্গে আসিয়াছে একটি 'রেডিও'। 'রেডিও'র জন্যই নাকি 'বহু' পলাইয়াছিল। ঘোঘায় তাহাদের বাড়িতে রেডিও আছে যোগীনের মনে পড়িল। নগদ সাড়ে চারশত টাকা ব্যয় করিয়া মণি 'রেডিও'টি 'বহু'কে উপহার দিয়াছে।

৪

দিন তিনেক পরে শ্যামলাল মহীনকে বলিল, "যাক, তোর বউ এসে পড়ল তাহলে। কি হয়েছিলো বলতো ?" মহীন হিন্দীতে যাহা উত্তর দিল, তাহা অদ্ভুত। বলিল, "হাম্‌রা বিল্লী, হাম্‌কো বোলে গা মেঁও ?" ইহার অর্থ শ্যামলাল ঠিক বুঝিতে পারিল না। আমরাও পারি নাই।

৫

আরও দিন চারেক পরে ভাগলপুরের ডাক্তারেরও চিঠি আসিল। মহীনের রক্তেও দোষ আছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিল মণি।

যোগীন তো অবাক।

রামু ঠাকুর

মনিহারীঘাটের প্রায় ক্রোশখানেক পশ্চিমে খেয়াঘাট। মনিহারী ঘাট হইতে যে জাহাজ ছাড়ে তাহা একেবারে সক্রিগলির ঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের সক্রিগলি যাওয়া দরকার, কিংবা সক্রিগলিতে ট্রেন ধরিয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন তাঁহারাই সাধারণত জাহাজে যান। সক্রিগলিতে ঘাট-ট্রেন ধরিয়া সাহেবগঞ্জ জংশনে যাওয়া যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র। জাহাজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মনিহারীতে একটি খেয়াঘাট আছে গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ পারের অনেকের জমি গঙ্গার ঠিক ওপারে আছে, তাহারা প্রত্যহ সেখানে কাজ করিতে যায়। অনেকে

আবার চর পার হইয়া পায়ে হাঁটিয়া সোজা-পথে সাহেবগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হয় বাজার করিবার জন্য। ইহাতে তাহাদের ভাড়া কম লাগে, সময়েরও সংক্ষেপ হয়। ভোরে বাহির হইলে সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারে। মালপত্র বহিয়া আনিবার জন্য অনেকে সঙ্গে ঘোড়াও লইয়া যায়। সুতরাং জাহাজে যাওয়া অপেক্ষা নৌকায় যাওয়াই অনেকের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। খেয়াঘাটের এপারেও বালির চর, ওপারেও তাই। বালির চরের উপরই পায়ে-হাঁটা পথ হইয়া গিয়াছে একটা। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন সে পথ লুপ্ত হইয়া যায়, নূতন পথ সৃষ্ট হয় আবার।

ওপরে খেয়াঘাটে এই পথের ধারেই রামু ঠাকুরের দোকান। তাহার গলায় একগাছা ময়লা পৈতা আছে, সুতরাং মনে হয় সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয়ও দেয় সে। কিন্তু সে বাঙ্গালী, কি বিহারী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটি ভাষাই অনর্গল বলিতে পারে। যখন বাংলা বলে তখন তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন 'ঠেট্' হিন্দীতে, বা 'ছেকাছেনি' ভাষায় সে কথা কহিয়া ওঠে তখন তাহাকে বিহারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা শক্ত। রামু ঠাকুরের ঠিক পরিচয় কেহ জানে না। কাহাকেও নিজের কথা সে বলে নাই, বলিতে চায় না। তাহার একমাত্র পরিচয়, সে 'রামু ঠাকুর'। গঙ্গার ওই ধু ধু চরে নিজের ছোট দোকান ঘরটিতে সে একা বাস করে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার দুই বার মাত্র দেখা হয়। যখন খেয়া পারাপার করে তখন। অনেক যাত্রী তাহার দোকানে তখন যায়। রামু ঠাকুরের দোকানটি খাবারেরই দোকান। সাধারণ খাবারই রাখে সে। চিঁড়া, মুড়ি, রামদানার লাড্ডু, ছাতু, গুড়, নুন, লঙ্কা। গুড়ে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে, ঝোলা গুড় আর ঢেলা গুড়।

দইও মাঝে মাঝে রাখে। দিরা হইতে লছমনিয়া গোয়ালিনী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দই দিয়া যায়। ক্রোশ দুই দূরে চরের মধ্যে তাহাদের বাথান আছে। প্রায় শতখানেক মহিষ আছে সেখানে। লছমনিয়ার বাবা শিউগোবিন গোয়ালা সেই বাথানের মালিক। সেখানে যে দই হয় তাহার অধিকাংশই চলিয়া যায় সাহেবগঞ্জের বাজারে। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত হইলে লছমনিয়া তাহা রামু ঠাকুরকে দিয়া যায়। নগদ দাম চায় না, বলে, 'বেঁচি কে দিহ'—অর্থাৎ বেচে দাম দিও। লছমনিয়া আসে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো। কবে আসিবে কিছুই ঠিক থাকে না, হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়ে। বড় ভালো লাগে রামু ঠাকুরের। যেদিন সে আসে রামু ঠাকুর অনেক আগে বুঝিতে পারে। দূর চরের দিগন্তে তাহার লাল শাড়িপরা মূর্তিটি দেখা যায়। আরও কাছে যখন আসে তখন দেখা যায় মাথায় ঝুড়িটি। ঝুড়িতে শুধু দুধের কেঁড়ে এবং দইয়ের মালসাই থাকে না, তাহার কাপড়-জামাও থাকে। তেলও থাকে এক শিশি, নারিয়েল তেল, নারিকেল তেল। বাম হাতে মাথার ঝুড়িটি ধরিয়া ডান হাত দুলাইতে দুলাইতে আসে। আর একটু কাছে আসিলে তাহার হাতের 'মেঠিয়াও' (বালা) দেখা যায়। আসল রূপার, রোদ লাগিয়া চকচক করে। মেঠিয়ার ইতিহাস রামু ঠাকুর শুনিয়াছে। তাহার স্বামী বিক্রম তাহাকে লুকাইয়া কিনিয়া দিয়াছিল নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন লুকানো থাকে নাই, থাকা সম্ভবও নয়,—ইহা লইয়া তাহার শাশের (শাশুড়ী) কি রাগ, ভৈসুরের (ভাসুরের) কি বকাবকি। লছমনিয়ার শুধু 'মেঠিয়া'ই নাই, পৈঁছি, হাঁসুলি, নাকছবি, মলও আছে। এ সব সে

অবশ্য পাইয়াছিল বিবাহের সময়। যখন আসে তখন বক্-বক্ করিয়া অনেক গল্প করে লছমনিয়া। অধিকাংশ গল্পই শ্বশুর বাড়ির গল্প। তাহার এখনও 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। শ্বশুর বাড়ির লোক বার বার খবর পাঠাইতেছে, কিন্তু বাবুজি এখন তাহাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইতে চাহিতেছে না। লছমনিয়ার আশংকা শেষে এই লইয়া একটা মারপিট না হয়। শ্বশুর, ভৈসুর দুইজনেই দাঙ্গাবাজ লোক। ক্ষেতের সীমানা লইয়া গাঙ্গোতাদের সহিত হরদম লাঠিবাজি চলিতেছে। লছমনিয়া প্রথমেই আসিয়া হাঁক দেয়—'চাচা, ল, উতারো'—কাকা, নাও, নামাও এটা। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া দেয়। তাহার পর শাড়ির আঁচল দিয়া মাথার ঘামটা মুছিয়া ফেলে সে। মুছিয়া বসিয়া পড়ে প্রায় হাঁটু অবধি শাড়িটা তুলিয়া। বেশ বাহারে শাড়ি পরিয়াই প্রতিবার আসে। লাল রংই বেশী পছন্দ, লালের উপর হলুদ রঙের ফুলকাটা ছাপা শাড়ি। বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, গঙ্গার হাওয়ায় কানের পাশের হাল্কা চুলগুলি উড়িতে থাকে। রামু ঠাকুর তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া মালসা সুদ্ধ দইটা ওজন করিতে বসে। যাহা ওজন হয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাহা। কিন্তু লছমনিয়া শুনিয়াও শোনে না, গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া ওঠে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়িয়া যায়। টুকরি হইতে শাড়ি, গামছা, জামা এবং তেলের শিশি বাহির করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রামু ঠাকুরের দিকে চাহিয়া হাসে একবার, তারপর দূরের ঝাউ-ঝোপের দিকে চলিয়া যায়। ওখানে স্নানের ঘাট আছে একটা—এবং সবচেয়ে সুবিধা কয়েকটা ঝাউয়ের ঝোপ ঘাটটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। ফেরে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। কাচা কাপড়-জামা মাথায় করিয়া লইয়া আসে। লছমনিয়া সব জিনিসই মাথায় করিয়া লইতে ভালবাসে। আসিয়াই দোকানের সামনে বসিয়া হুকুম করে—'দ', খানা দ। রামু ঠাকুর চারটি রামদানার লাড্ডু বাহির করিয়া আনে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায়। তাহার পর কাঁসার একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া রাখে। লছমনিয়া কোনও কথা বলে না, নিবিষ্ট চিত্তে খায়। যখন খায় তখন রামু ঠাকুর একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার গালে কানের পাশে ছোট একটি নীল শিরা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। গৌর বর্ণের পট-ভূমিকায় সুন্দর দেখায়। ওই নীল শিরাটি লছমনিয়ার মুখের বৈশিষ্ট্য। খুব কম মেয়ের মুখে দেখা যায়। রামদানার লাড্ডু চারটি শেষ করিয়া সে আলগোছে খানিকটা জল খাইয়া ফেলে। তাহার পর খানিকটা জল লইয়া 'কুল্লা' (কুলকুচু) করে। ফের আবার খানিকটা জল আলগোছে খায়। এটাও লছমনিয়ার বৈশিষ্ট্য। জল খাইতে খাইতে মাঝখানে একবার 'কুল্লা' করিয়া লয়। সব শেষ করিয়া লছমনিয়া বলে,—'চলি অব'—এবার চলি। টুকরি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়। সোজা চলিয়া যায়, একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়ও না। যতক্ষণ দেখা যায় রামু ঠাকুর দেখে। ভাবে, আবার কবে আসিবে কে জানে। বাথানে দই বেশী না হইলে তো আর আমাকে মনে পড়িবে না। রামু ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনে লছমনিয়া একটা প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু একমাত্র নয়। অন্য আকর্ষণও আছে কয়েকটি, কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, তাহার দোকানে খাবারও খায় না। একটি সাপ গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপার হইতে এপারে আসে। মধ্যে মধ্যে এপারের চরেও তাহাকে দেখা যায়, বালির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-

বাঁকিয়া চলিয়াছে। সম্ভবত শিকারের সন্ধানে আসে। দিরার চরে ছোট ছোট পাখী অনেক। সাপটা যখন এপারে আসে রামু ঠাকুর কখনও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে নাই। অনুসরণ করিয়াছে কি করে দেখিবার জন্য। কিন্তু একদিনও দেখিতে পায় নাই। সাপ কিছু দূরে গিয়াই মরীচিকার মতো বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় আকর্ষণ প্রকাণ্ড একটা ঘড়িয়াল। চারদিক যখন নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া যায় তখন ঘড়িয়ালটা তাহার নাকের অগ্রভাগটুকু জলের উপর বাহির করিয়া ভাসিতে থাকে। তাহার পর প্রায় তাহার সমস্ত দেহটাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে জলের উপর। প্রখর রৌদ্রালোকে গঙ্গার তরঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘড়িয়ালের আবির্ভাব ও তিরোভাব রামু ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িলেই রামু ঠাকুর গঙ্গার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ কোনদিন ঘড়িয়ালটার দেখা না পাইলে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার তৃতীয় আকর্ষণ কতকগুলো পাখী। দুই জাতের দুই রকম মাছরাঙ্গা পাখী রোজ আসে। একটার গায়ে অনেক রকম রং—নীলেরই প্রাধান্য বেশী। আর একটা সাদার উপরে কালোর মিহি কাজ। দুইটাই চমৎকার। ঝাউগাছের উপর বসিয়া থাকে গঙ্গার উপর একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া। তাহার পর ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাদায়-কালোয় পাখীটা উড়িয়া উড়িয়াও বেড়ায়। মাঝ গঙ্গার উপর শূন্যে মাঝে মাঝে স্থির হইয়া থামিয়া যায়। পাখা দুটি তখন নাড়িতে থাকে কেবল, তাহার পর সহসা জলে ঝাঁপাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। কখনও মাছ পায় কখনও পায় না। কিন্তু ক্লান্তি নাই। রামু ঠাকুর নিজের দোকানের কাছে গঙ্গার জলে দুই-তিনটা ছোট ছোট ডাল, একটা শুকনো বাঁশ পুঁতিয়া দিয়াছিল, যদি উহারা তাহার উপর আসিয়া বসে। কিন্তু একদিনও বসে নাই। তাহার কাছে কেহ বসিতে চায় না। গাছের ডালগুলো আর বাঁশটাও মা গঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। মাছরাঙ্গারাই যদি না বসিল ও আবর্জনা থাকা না থাকা সমান। মাছরাঙ্গা ছাড়া আর এক রকম পাখী গঙ্গার উপরে ওড়ে। সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। এপার-ওপার করে না, গঙ্গার স্রোত ধরিয়া ওড়ে। একবার এদিকে যায় আবার ওদিকে। মাছরাঙ্গার মতো কোথাও কখনও স্থির হইয়া উঁচু জায়গায় বসে না। বসে দূরে চড়ায় বালির উপর। অনেক সময় দল বাঁধিয়া। রামু ঠাকুর একবার তাহাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কাছাকাছি গেলেই উড়িয়া যায় এবং ক্রমাগত উড়িতে থাকে। সহজ সাবলীল কি সুন্দর ওড়ার ভঙ্গী। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দেখিতেও সুন্দর, সারা দেহটা ঈষৎ ধূসর সাদা, মাথার উপরে কালো টুপির মতো, ঠোঁট হলদে রঙের। পা দুইটি লাল। ল্যাজটা ফিঙে পাখীর ল্যাজের মতো দ্বিধাবিভক্ত। লোকে বলে গাংচিল। কিন্তু চিলের মতো দেখিতে নয়। এই চরে রামু ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয় আর একদল পাখী। কয়েকটা কাক, শালিক, ফিঙে আর নীলকণ্ঠ। এরা সব ওপার হইতে আসে আর সারাদিন বালির চরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। রামু ঠাকুর কাক আর শালিকগুলোর সহিত ভাব করিয়াছে। মুড়ি ছড়াইয়া দিলে উহারা আসে, কিন্তু ফিঙে আর নীলকণ্ঠ আসে না।

প্রতিদিন দুইবার খেয়া-পারাপার হয়, তখন নির্জন চর খানিকক্ষণের জন্য মুখরিত চঞ্চল হইয়া ওঠে, তাহার পর সব চুপচাপ। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই মুখচেনা আছে,

কিন্তু প্রায় কাহারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নাই। যাত্রীদের নিকট যে লোকটি পারানি আদায় করে, সেই লোকটিই মাঝি। যাত্রীদের সহিত সে-ও যাতায়াত করে। এপারে তাহার নিজের বাড়ি, ওপারে শ্বশুর বাড়ি। ইহারা কেহ কেহ রামু ঠাকুরের দোকানে খায়। ইহার বেশী আর সম্পর্ক নাই।

খেয়া-পর্ব শেষ হইয়া গেলে রামু ঠাকুর কিছুক্ষণ দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর সে যাহা করে তাহা অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয় সে। তাহার পর গঙ্গা হইতে তুলিয়া তুলিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটি মাখে, বিশেষ করিয়া দুই উরুর উপর ঘষিয়া ঘষিয়া মাখে। তাহার পর আসিয়া রোদে বসিয়া থাকে, আর সূর্য প্রণাম করে। গায়ের সমস্ত মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন গঙ্গায় নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। ইহার জন্যই সে নির্জন চরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ একদিন একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। চর ভাঙিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া হাজির হইল তাহার দোকানের সামনে। তাহার কপালে প্রকাণ্ড সিন্দুরবিন্দু, হস্তে ত্রিশূল। রামু ঠাকুর একটু ভড়কাইয়া গেল। সন্ন্যাসী হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

"ওরে, নৌকো কখন ছাড়বে ?"

"সন্ধ্যের পর।"

"সমস্ত দিন এখানে বসে থাকতে হবে ?"

"তা ছাড়া উপায় কি—"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে ?"

"আছে—"

"তুই তো দেখছি ভক্ত লোক। সন্ন্যাসীকে ভালো করে খাওয়া তাহলে—"

"কি খাবেন বলুন—"

"ভাল করে ময়ান দিয়ে লুচি কর। মুখরোচক করে আলুর দমও কর খানিকটা। তারপর হয় হালুয়া, না হয় গোটাকতক রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

"আমি ওসব দিতে পারব না।"

"তাহলে সরু চিঁড়ে, ভাল দই, কিছু কলা আর গোটাকয়েক প্যাঁড়া দে। ওতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে—"

"তা-ও নেই ঠাকুর। আমার দোকান খুব ছোট।"

"কি আছে তোর দোকানে ?"

"কিছু শুকনো মুড়ি আছে। গুড়ও দিতে পারি একটু—"

"নেই গুড়-মুড়ি নেহি খায়েঙ্গে।"

ক্রোধ-ভরে সাধু চলিয়া গেল। চর ভাঙিয়া দূরের ঝাউ-বনের ওপারে অন্তর্ধান করিল। ক্ষুধার্ত সাধু রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামুঠাকুর মনে মনে ভয় পাইল একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। সাধু যাহা চাহিতেছে তাহা যে তাহার নিকট নাই। রামুর স্নানাহার হইয়া গিয়াছিল, সাধু না আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইত, কিন্তু সাধু আসাতে ঘুমের আমেজ কাটিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল

সে একাকী। ঘড়িয়ালের নাকটা ধীরে ধীরে দেখা গেল। দুইটি গাংচিল স্বচ্ছন্দ লীলায় গঙ্গার উপর উড়িতেছিল, স্রোতের জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিতেছে যেন। ঘড়িয়ালটার কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দুই জনেই একটু উপরে উড়িয়া গেল। রামু ঠাকুরের মনে পড়িল তাহার মেয়েকে। রুণু এখন কত বড় হইয়াছে? লছমনিয়ার মতোই হইবে। তাহাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কি? কে জানে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া চরের বালিও উড়িতে শুরু করিল। একটু পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল সে।

"এ-দোকানদার, এ-দোকানদার, উঠো—"

রামু ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

"দেও, খানে দেও—"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"ভুখ লাগলে সে সাধু মুড়ি ভি খায়। দেও—"

গঙ্গাজলে ভিজাইয়া ঢেলা গুড়-সহযোগে সাধু প্রচুর মুড়ি খাইল। বস্তুত রামু ঠাকুরের দোকানের যত মুড়ি সব সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—"তেরা উপর খুব প্রসন্ন হুয়া। এক পঞ্চমুখী শংখ তে কা দেঙ্গে। কন্যাকুমারী সে লায়া হ্যায়। দাম লাগে কা পাঁচ রুপেয়া। মগর শ রুপেয়া খরচ কর্ নে সে ভি ইহ নেহি মিলে গা। হুঁ—"

গেরুয়া ঝোলা হইতে বাদামী রঙের শাঁখ বাহির করিল একটি। শাঁখটির সর্বাঙ্গে গাঁট-গাঁট। ইহা ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য রামু ঠাকুরের চোখে পড়িল না।

"সাধুবাবা, পাঁচ টাকা তো আমি দিতে পারব না। অত টাকা আমার নেই, আমি গরীব মানুষ।"

"কেতনা দে সকে গা—"

"আট আনার বেশী পারব না।"

"আচ্ছা লে লে। তু ভক্ত হ্যায়। লে লে—"

"এ শাঁখের উপকারিতা কি সাধুবাবা?"

"ঘর মে রহ্ নে সে মঙ্গল হোগা। বিমারি হোনে সে বিমারি ছুট যায়ে গা—"

"অসুখও সেরে যাবে?"

"জরুর—"

একটু পরেই খেয়া-ঘাটের মাঝি আসিল। অন্যান্য কয়েকটি যাত্রী, কয়েকটি ছাগল এবং দুইটি মালবাহী ঘোড়াও জুটিল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। রামু ঠাকুর একা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার মেঘে তখনও রং লাগিয়া আছে, শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহা অদ্ভুত। পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর ঘষিতে লাগিল। দুই উরুতেই সাদা সাদা গোল গোল দাগে ভরতি। চিমটি কাটিলে লাগে না। কুষ্ঠ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিল,

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসিতে দিও না। তোমার মেয়েকে কোলে করিও না। এ রোগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সহজে আক্রান্ত হয়। অনেকদিন ঔষধ খাইয়াছিল, কিছু হয় নাই। একজন সাধু উপদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যহ গায়ে গঙ্গামাটি মাখিয়া সূর্য পূজা করিবে, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিবে। নিষ্ঠাভরে যদি করিতে পার, সারিয়া যাইবে কুষ্ঠ। দশ বৎসর পূর্বে রামু ঠাকুর বাড়ি হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন চরের খেয়াঘাটে বাসা বাঁধিয়াছে। সাধুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কই? উপকার হইয়াছে কি?

পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর প্রাণপণে ঘষিতে লাগিল। ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবু ছাড়িল না। ঘষিতেই লাগিল।

হাঁস

সুরেনের বয়স বছর কুড়ি। ভালো ছেলে। ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে ভালো ভাবে বি-এ পাস করেছে। সুন্দর, বলিষ্ঠ গঠন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় সেকালের ক্ষত্রিয় যেন একালে এসে জন্মেছে। নির্ভীক মুখের ভাব, উৎসুক চোখের দৃষ্টি, সমস্ত চেহারায় পবিত্রতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার জীবনের একমাত্র সাধ সে মিলিটারিতে যাবে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতার মান রক্ষা করবে সে তার ক্ষাত্রবীর্য দিয়ে। সেইভাবে তৈরি করেছে নিজের দেহকে, মনকে। সকালে উঠেই ডাম্বেল মুগুর ভাঁজে, বিকেলে খেলাধুলো করে। পড়ে সেই সব বই— যাতে বীরত্বের কথা আছে। আইভানহো, কেনিল্‌ওয়ার্থ, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, আনন্দমঠ এই ধরনের বই পড়তে ভাল লাগে খুব।

সুরেনের বাবা একজন বড় অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন সুরেন ভালো ভাবে বি-এ পাস করলে তাকে বন্দুক কিনে দেবেন একটা। বন্দুক রাখতে হলে পাস চাই। পাসের ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছিলেন একজন বড় পুলিস অফিসার মিস্টার ঘোষাল, সুরেনের পিতৃবন্ধু। হাতে বন্দুক না থাকলে কি সৈনিক হওয়া যায়?

সুরেন অবশ্য এর-তার বন্দুক নিয়ে হাতটা আগেই ঠিক করেছিল। হাতের লক্ষ্য ভালোই হয়েছিল তার। কিন্তু পরের বন্দুক তো সর্বদা পাওয়া যায় না। নিজের সুবিধামতও পাওয়া যায় না। তাই অনভ্যাসের জন্য হাতের লক্ষ্য মাঝে মাঝে বেঠিক হয়ে পড়ে। সে আশায় আশায় ছিল কবে নিজের বন্দুকটি পাবে। বন্দুক পাবে বলেই সে ভালো করে পড়াশোনাও করেছিল। কারণ সে জানত বাবার কথার নড়চড় হয় না। সে যদি অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করতে পারে, বাবা নিশ্চয়ই তাকে বন্দুক কিনে দেবেন।

তারপর সে মিলিটারিতে ঢোকবার জন্যে দরখাস্ত করে দেবে। তখন আশা করি মিলিটারি স্কুল থেকেই সে প্র্যাকটিস করবার জন্যে বন্দুক পাবে একটা। কিন্তু তবু নিজের আলাদা বন্দুক থাকায় আলাদা গৌরব।

বাবা তাঁর কথা রাখলেন। কিনে দিলেন তাকে একটা বন্দুক। রাইফেল নয়, সাধারণ বন্দুক। রাইফেল রাখবার অনুমতি কর্তৃপক্ষ দিলেন না।

দুই

বন্দুক যেদিন পেল সে, সেদিন তার আনন্দের আর সীমা রইল না। ঘুমই হল না রাত্রে। বন্দুকের প্রথম শিকার কি হবে! তার ইচ্ছা বাঘ, ভালুক বা ওই জাতীয় কোন হিংস্র জানোয়ার শিকার করা। কিন্তু সে সব তো কলকাতার আশেপাশে পাওয়া যাবে না। তারা যে সব জঙ্গলে থাকে, সে সব জঙ্গলে বাবা-মা, বিশেষ করে মা যেতে দেবেন কি? মা তাকে সর্বদা আটকে আটকে আগলে আগলে বেড়ান এটা সে পছন্দ করে না। হয়তো মায়ের জন্যেই শেষ পর্যন্ত তার মিলিটারিতে যাওয়া হবে না।

পরদিন সকালেই বন্ধু সমর এসে হাজির।

"তুই বন্দুক কিনেছিস শুনলুম?"

"হ্যাঁ।"

"চল তাহলে বাদাতে যাওয়া যাক। ওখানে খুব হাঁস পড়ছে আজকাল।"

"হাঁস?"

"হ্যাঁ রে, খুব বড় বড় হাঁস। গীজ—"

"গীজ কি রকম হাঁস?"

"বেশ বড় সাদা হাঁস, মাথায় কালো দাগ আছে।"

"বেশ—চল—"

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুই বন্ধু।

বাদা প্রকাণ্ড জায়গা। অনেক ঘুরতে হল তাদের। বড় হাঁসের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। ছোট ছোট পাখি অনেক, তাদের সুন্দর চেহারা, অদ্ভুত রং। তাদের মারতে ইচ্ছে হল না। ছোট ছোট হাঁস ছিল এক জায়গায়। অনেকগুলো ছিল। "ওই-গুলোকেই মার"—সমর ফিস ফিস করে বললে। ফিস ফিস করে বলার উদ্দেশ্য তারা খুব কাছেই ছিল। জোরে কথা বললে হয়তো উড়ে যেত। সুরেন কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, মনে মনে কিসের প্রতীক্ষা করছিল যেন সে। সে যেন ভাবছিল—স্পষ্ট করে যদিও কিছুই ভাবছিল না—কিন্তু আভাসে তার মনে হচ্ছিল অসম্ভব বোধ হয় সম্ভব হবে, সাদা হাঁস পাওয়া যাবে। অকারণ একটা গুলি করে এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে তার কেমন যেন ইচ্ছে হল না। তার যেন মনে হল বন্দুক গর্জন করে উঠলেই সব যেন পণ্ড হয়ে যাবে। বলল, "না, ওগুলোকে মারব না। চল আরও ঘোরা যাক। ওই দিকটায় চল যাই—"

ডানায় অদ্ভুত শব্দ করে উড়ে গেল ছোট হাঁসের দল। সুরেনের মনে হল সাদা হাঁসকে খবর দিতে গেল বুঝি তারা।

আরও অনেক ঘুরতে হল। তারপর সন্ধ্যার একটু আগে অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। সাদা হাঁস পাওয়া গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত, সুরেনের যেন মনে হল নীল সরোবরের মাঝখানে বসে আছে হাঁসটা। বাদার ঝোপ-জঙ্গল যেন কিচ্ছু নেই। সমস্ত পরিষ্কার

হয়ে গেছে যেন মন্ত্রবলে। নীল সরোবর মূর্ত হয়েছে একটি আর তার মাঝখানে বসে আছে সাদা হাঁস। ধবধবে সাদা। তুষারশুভ্র।

সাধারণত হাঁসেরা দল বেঁধে থাকে। এ কিন্তু একা রয়েছে। আর একটা জিনিসও একটু অন্য রকম মনে হল। নীল সরোবরের মাঝখানে এ বেশ নিশ্চিন্তভাবে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পিঠের পালক পরিষ্কার করছে। একটুও ভয় ডর নেই। বেশ সপ্রতিভভাবে নির্ভয়ে বসে আছে। সুরেন খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। এমন হাঁস সে আগে দেখে নি। মাথার কাছে কালো দাগ নেই তো। সব সাদা। তারপর হঠাৎ হাঁসটা সুরেনকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সুরেনের হাতে বন্দুক দেখে সে যেন বুঝতে পারল সুরেন তাকে মারতে এসেছে। বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল আরও খানিকটা। অন্য হাঁস হলে পালাত। কিন্তু এ এগিয়ে আসছে। সুরেনের আত্মসম্মান আহত হল যেন হাঁসের এই স্পর্ধায়। স্পর্ধা ছাড়া আর কি! তার হাতে বন্দুক দেখেও এগিয়ে আসছে! ···দড়াম করে ফায়ার করে দিলে সে। হাঁসটা উড়ল না, নড়ল না, স্থির হয়ে বসে রইল। কিন্তু মরলও না। সুরেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তার সাদা বুক থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তবু মরে নি। সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল যখন হাঁসটা ভেসে ভেসে তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে একেবারে ডাঙার কাছে চলে এল। সমর ফিস ফিস করে বলল—ধরে ফেল্, ধরে ফেল্। এই কথা শুনে হাঁসটা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠল এবং সুরেনের পায়ের কাছে এসে মুখ তুলে দাঁড়াল। ভাবটা, ধরবে? ধর না।

হাঁসটাকে ধরেই নিয়ে গেল তারা। পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল। খুব ভারী। সুরেন প্রথমে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার হাত ভেরে গেল। এ-হাত ও-হাত করে কিছুতে আর বইতে পারে না। সমরও বইল খানিকক্ষণ। কিন্তু তারও ওই অবস্থা। বেশীক্ষণ বইতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে পড়েছিল তারা। ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

বাড়িতে হাঁসটাকে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল সুরেন। তাকে কাটতে মায়া হচ্ছিল তার। সমর কিন্তু নাছোড়। সে হাত পা নেড়ে সুরেনকে বোঝাতে লাগল।

"না কেটে করবি কি তুই? পুষবি? ও হাঁস কি পোষ মানবে? খাবেও না কিচ্ছু। না খেয়ে খেয়ে মরে যাবে শেষে একদিন। তার চেয়ে এখুনি সাবড়ে দেওয়া যাক। রেয়ার হাঁস। এর রোস্ট যা হবে তা চমৎকার।"

"কাটবে কে? আমি পারব না।"

"তোর কাটবার দরকার কি। আমাদের বাবুর্চী ঝক্সু মিঞা এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ। তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি—"

তার পরদিন ঝক্সু মিঞা এল ছুরি নিয়ে। হাঁসের ঘর তালাবন্ধ ছিল। ঝক্সু এসে তালা খুলল। সুরেন চলে গেল দোতলায়। অমন সুন্দর হাঁসটাকে ঝক্সু ছিন্নভিন্ন করবে এ মর্মান্তিক দৃশ্য সে দেখতে পারবে না।

একটু পরে ঝক্সুর গলা শোনা গেল।

"বাবু, বাবু, হাঁস কোন্ ঘরে আছে? এই ঘরে তো কিচ্ছু নেই—"

সুরেন নেমে এল।
"এই ঘরেই তো ছিল—"
"কই—"
সুরেন অবাক্ হয়ে গেল। হাঁস অন্তর্ধান করেছে।

একটু পরে সুরেন আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। তার ঘরে সরস্বতীর যে ছবিখানা টাঙানো ছিল সে ছবিতেও হাঁস নেই। হাঁসের জায়গাটা খালি।

তিন

সেই দিনই রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখল সুরেন। সেই হাঁসটা যেন তার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর সুরেনের খুব কাছে এসে বলল, "কই আমাকে মারতে পারলে? আমাকে মারা যায় না। আমি যে মা সরস্বতীর বাহন। মায়ের সমস্ত ভার যে আমিই বহন করি। আমি ভাষা—"
"আমার ছবিতে তুমি ছিলে?"
"ছিলাম বইকি।"
"আসব বইকি। তোমাকে ছেড়ে আমি কতক্ষণ থাকতে পারি? আমি যে তোমার ভাষা। তোমাকে একটু ভয় দেখাচ্ছিলুম খালি—"
পরদিন সকালে উঠে সুরেন দেখল হাঁস তার ছবিতে ফিরে এসেছে।

চার

এর দিনকতক পরে শিলচরের নিদারুণ খবরটা কাগজে বেরুল। মিলিটারির গুলিতে এগারোজন ভাষা-সত্যাগ্রহী প্রাণ দিয়েছে। ভাষা-সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালিয়েছে মিলিটারি? যাদের কাজ সত্য-শিব-সুন্দরকে রক্ষা করা?
সে ঠিক করে ফেলল এ মিলিটারিতে আর সে যাবে না। যদি দেশে কোনও দিন এমন মিলিটারি হয় যারা কেবল অন্যায়ের অসত্যের বিরুদ্ধে লড়বে তখন সে যাবে। এখন নয়।
সে এম-এ ক্লাসে ভরতি হয়ে গেল।

কুতুবমিনার

আমার নূতন বৈবাহিক মহাশয়ের পল্লীনিবাস গোপালবাটিতে আসিয়া আমাদের মনিহারীর বাড়ির কথা মনে পড়িতেছে। কেন জানি না বিশেষ করিয়া কুতুবুদ্দিনকেই আজ মনে পড়িল। বহুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। সে বিখ্যাত লোকও নয়, তবু তাহারই স্মরণে আজ কিছু লিখিলাম।

কুতুব আমাদের বাড়ির চাকর ঠিক ছিল না, কিন্তু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে কাজ করিতে আসিত। ঘরামির কাজই প্রায় করিত। আমাদের বাড়ি খড়ের চালের। সেই চাল মেরামত করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার ডাক পড়িত। অন্য সময়ও তাহার কাজ ছিল। আমাদের চাষের জমি যখন কোপানো হইত তখনও ডাক পড়িত কুতুবের। কোড়নের কাজ করিতে সে অদ্বিতীয় ছিল। দুপুর রোদে কোদাল হাতে সে ক্রমাগত মাটি কোপাইতে পারিত। মাঝে মাঝে কোদালের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া 'কোম্‌মর'টা 'সিধা' করিয়া লইত, তাহার পর আবার কোপাইতে শুরু করিত।

বিশাল চেহারা ছিল তাহার। কুচকুচে কালো রঙ, মুখে মন্‌-মহেশ দাড়ি। আমার সহিত তাহার বিশেষ ভাব ছিল। কারণ আমার বাহন ছিল সে। মাঝে মাঝে সে আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া বেড়াইয়া আনিত। আমি তাহার কাঁধে বসিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া থাকিতাম, আমার পা দুইটি তাহার বুকের উপর দুলিত। গ্রামের বাহিরে গিয়া সে কখনও ঘোড়ার অনুকরণে ছুটিত, ঘোড়ার ডাকও ডাকিত। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করিতে করিতে একছুটে সে বারুইদের আমবাগানটা পার হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে তাহার শখ হইতে জমিদারদের হাতীর নকলে গজেন্দ্রগমনে চলিতে হইবে। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া ঠিক হাতীরই নকল করিত সে। নিজে মাহুতও হইত। মাহুতের বোলও বাহির হইত তাহার মুখ হইতে। 'ধেৎ' 'বিরি' 'আগৎ' প্রভৃতি হস্তি-বোধ্য ভাষা বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগমনে বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িত সে।

একটা বদনাম ছিল তাহার। সকলে বলিত সে নাকি চোর। সিঁধেল চোরদের দলে সে নাকি চ্যাম্পিয়ন ছিল একজন।

ছিল কি না জানি না, এসব ব্যাপারে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনা জানি তাহাই বলিতেছি।

একবার আমাদের ঘর ছাওয়া হইতেছে, প্রায় জন কুড়ি ঘরামি কাজ করিতেছে, তাহার মধ্যে কুতুবও আছে। হঠাৎ মা আবিষ্কার করিলেন তাঁহার গলার সোনার হারটা পাওয়া যাইতেছে না। তিনি স্নানের ঘরে হার খুলিয়া স্নান করিয়াছিলেন, তাহার পর হারটা আনেন নাই। যখন মনে পড়িল গিয়া দেখেন স্নানের ঘরে হার নাই।

চতুর্দিকে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল ঘরামিদের মধ্যেই কেহ লইয়াছে। কুতুবের উপরই অনেকের বেশী সন্দেহ হইতে লাগিল।

এমন সময় হাজির হইল রামপীরিত্‌ সিপাহী। স্থানীয় জমিদারের বিশ্বস্ত রক্ষক, দোর্দণ্ড প্রতাপ। যাহা খুশি তাহা করিতে পারে, তাহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রামপীরিত্‌ বাবাকে খুব ভক্তি করিত, মাকেও। মাঈজির হার চুরি

গিয়াছে ? তাহার নাকের নীচের গোঁফে একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। বাবাকে সে আশ্বাস দিল—বন্‌কা গিদড় ভাগে গা কি ধর ! বনের শিয়াল কোথা পালাইবে। সমস্ত ঘরামিগুলিকে সে উঠানে একত্রিত করিল—তাহার পর সংক্ষেপে বলিল—মাইজির হার চুরি গিয়াছে। তোমরা লইয়াছ কিনা তাহা আমি জানি না। কিন্তু হারটি তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। যদি না পার তাহা হইলে তোমাদের শরীরের একটি হাড়ও আস্ত রাখিব না। এই দেখ। সে তাহার তৈলপক্ক গঁ্যাট্টা গোঁট্টা বাঁশের লাঠিটি তুলিয়া দেখাইল।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফল হইল না। দশদিন কাটিয়া গেল, হার পাওয়া গেল না।

ইহার পর মায়ের সহিত কুতুবের একদিন দেখা হইল। মা তাহাকে বলিলেন, "বাবা, আমার শাশুড়ীর দেওয়া হারটা কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম, ওইটে দিয়ে তিনি বিয়ের সময় আমার মুখ দেখেছিলেন, কি করে যে হারিয়ে গেল !"

কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তার পরদিন মায়ের হারটি আনিয়া দিল। বলিল, ওই ঝোপটার ভিতর পড়িয়াছিল। সায়দ্‌ কোই কৌয়া তৌয়া গিরায়া হোগা। হয়তো কাকে-টাকে ফেলে দিয়েছিল।

ইহার পরদিন যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত। দেখা গেল কুতুবুদ্দিন অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। সর্বাঙ্গে কালসিটে দাগ। কে বা কাহারা যেন উহাকে প্রচুর প্রহার করিয়াছে।

ইহার পর আমাদের বাড়িতে আর একবার চুরি হইয়াছিল। এবার সিঁধ কাটিয়া চুরি। চোরেরা অনেক বাক্স তোরঙ্গ বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক মূল্যবান কাপড় জামা গহনা হারাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একেবারে সর্বনাশ হইয়াছিল আমার।

পুজার সময় মামা আমাকে যে দম-দেওয়া রংচঙে টিনের মোটরটি কিনিয়া দিয়াছিলেন সেটিও একটি বাক্সের মধ্যে ছিল। চুরির দিন সাতেক পরে কুতুবের সহিত দেখা হইল। তাহাকে বলিলাম, কুতুব জানো, আমার সেই মোটরটা চুরি হয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কুতুব তখন কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার পরদিন সে আমাকে মোটরটি আনিয়া দিল। বলিল, কই, মোটর তো চুরি হয় নি। ওই ঝোপের ধারে পড়েছিল। সায়দ্‌ কোই কৌয়া তৌয়া গিরায়া হোগা।

এ ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিটিল না। ওই মোটরের 'ক্লু' ধরিয়া পুলিস অবশেষে সমস্ত দলটাকেই ধরিয়া ফেলিল। পুলিশের হাতে নাকি প্রচুর মার খাইয়াছিল কুতুব।

কিন্তু ব্যাপার এখানেও শেষ হয় নাই। দিনকয়েক পরে যে সংবাদ জানা গেল তাহা নিদারুণ। কুতুবকে কে যেন খুন করিয়া গিয়াছে। রাত্রে সে মাঠে শুইয়াছিল, কে যেন তাহার গলাটা কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। চোরের দল ঘর-ভেদী বিভীষণকে বাঁচাইয়া রাখা নিরাপদ মনে করে নাই।

গোপালবাটির শান্ত শ্যামল পরিবেশে বসিয়া বহুকাল পরে কুতুবের স্মৃতিকে ঘিরিয়া আমার মধ্যে যে মিনার আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেও যদি কুতুবমিনার আখ্যা দিই তাহা হইলে কি ঐতিহাসিকেরা আপত্তি করিবেন ?

বৈকুণ্ঠ বাগল

বৈকুণ্ঠ বাগল বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়। অন্তত বছর পাঁচেক বড় তো বটে। আমার বড়দাদার তিনি সহপাঠী ছিলেন। দেখিলে কিন্তু মনে হয় আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি অনেক ছোট। আমার দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, এমন কি ভুরুও আর কালো নাই। কিন্তু বাগলদার একটি দাঁত পড়ে নাই, চুল দাড়ি ভুরু মিশকালো। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নানা ঘাটের জল খাইয়াছি, এখনও খাইতেছি, বিপর্যস্ত হইয়া যখনই বাগলদার কাছে গিয়াছি তিনি সাহায্য করিয়াছেন। আমার জীবন-কাহিনী অনেকটা বহু-বিচিত্র ছিটের মতো। একটু তফাত আছে, ছিটের প্যাটার্ন একটা কাপড়ে এক রকমই থাকে। কিন্তু আমার জীবনে ছিটের প্যাটার্ন একরকম নয়। মনে হয় নানারকম ছিট জুড়িয়া জুড়িয়া আমার জীবনের কাহিনী-কন্থা আমার ভাগ্যদেবতা সকৌতুকে প্রস্তুত করিয়াছেন। কত রকম চাকরি আর ব্যবসা যে করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমার কথা থাক, বাগলদার কথাই বলি। বাগলদা আমাকে স্নেহ করিতেন। আমি সব সময় তাঁহার স্নেহের মর্যাদা রাখি নাই, একাধিকবার টাকা ধার লইয়া ফেরত দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু বাগলদার স্নেহ তাহাতে নিষ্প্রভ হয় নাই।

বাগলদা সেকেলে মানুষ। বিলাসিতার ধার ধারেন না। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই। থান কাপড় পরেন। বাড়িতে খড়ম আর বাহিরে চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন পাদুকা পছন্দই করেন না, মুখে মিশমিশে কালো গোঁফদাড়ির জঙ্গল।

আমি যখন জুতার দোকান করিয়াছিলাম তখন বাগলদাকে চটিজুতা তো দিয়াছিলামই, একজোড়া চকোলেট রঙের গোঁফওলা পামশুও গছাইয়াছিলাম। পামশুর কথা বলিতে বাগলদা বলিলেন, "জানিসই তো আমি ও-সব পরি না।"

"পরুন না একজোড়া, দেখি—"

জোর করিয়া পরাইয়া দিলাম, পায়ে ঠিক ফিট করিয়া গেল।

"এ নিয়ে আমি কি করব—অন্য খদ্দের পাচ্ছিস না?"

"না। গোঁফওলা পামশু আজকাল পছন্দ করে না কেউ। কুড়ি টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম তখন, ওর গোঁফটার কথা ভাবি নি—"

"তবে দে—"

বাগলদা পামশুজোড়া লইয়া গেলেন। কিন্তু এক দিনও সেটা পরেন নাই। মাস দুই পরে তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখি তাকের উপর জুতা-জোড়া সযত্নে রাখা আছে। বাগলদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "ও দুটো আমার ভারী কাজে লেগেছে।"

"কি কাজে?"

"ও দুটোর ভিতর টুকিটাকি জিনিস রাখি। ছুঁচসুতো, ছুরি, ছোট কাঁচি, নস্যির ডিবে, দেশলাই,—চমৎকার কাজে লেগেছে আমার।"

ইহার কিছুদিন পরে একটা সেফটি রেজর কোম্পানীর এজেন্ট হইয়াছিলাম।

বাগলদার সহিত দেখা হইলে বলিলাম, "বাগলদা, এবার আর আপনাকে আমার খদ্দের করতে পারব না—"

"কেন, কি করিস আজকাল ?"

"সেফটি রেজার বিক্রি করি।"

"কই, কেমন দেখি ?

প্ল্যাস্টিকের চমৎকার বাক্সে চকচকে সেফ্‌টি রেজারটি দেখাইলাম।

"দাম কত ?"

"সাড়ে সাত টাকা।"

"আচ্ছা, দিয়ে যা একটা।"

বাগলদা সেটাকে পেপার-ওয়েট হিসাবেই ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন।

ইহার পর আমি 'রেডিও'র এজেন্ট পদে বাহাল হই। একটা রেডিও বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ কিছু কমিশন থাকিত। বাগলদার কাছে গেলাম।

"বাগলদা, একটা রেডিও কিনুন না।

"রেডিও নিয়ে কি করব ? তোমার বউদি তো বদ্ধ কালা। আমি নিজের লেখা-পড়া আর পুজোটুজো নিয়ে থাকি। ছেলেমেয়েরা কেউ এখানে থাকে না। কে রেডিও শুনবে ?"

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমি দালাল, তবু একবার চেষ্টা করিলাম।

"আপনারা যদি কেউ না কেনেন, তাহলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। অকুল পাথারে ভাসছি দাদা, পরশু দিন আবার একটা মেয়ে হয়েছে।"

"কত দাম ?"

"বেশী নয়, পাঁচ শ' পঁচাত্তর টাকা আর সেলস ট্যাক্স।"

বাগলদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, দিয়ে যাস একটা।"

রেডিও দিবার মাসখানেক পরে বাগলদার সহিত দেখা হইয়াছিল।

"কি দাদা, কেমন চলছে রেডিও ?"

"ওটাতে ভারী উপকার হয়েছে ভাই। ভাঁড়ারঘরে লাগিয়ে দিয়েছি ওটা। চালিয়ে দিলে ইঁদুর আরশোলা সব পালায়। চমৎকার!"

বাগলদার স্মিত মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

হর্ষ ডাক্তার

আমার জন্মভূমি মনিহারী গ্রামে একদা হর্ষ ডাক্তার আসিয়াছিলেন। আমার বাবা মনিহারী হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করিলে হর্ষবাবু সদর হইতে আসেন বাবার অবর্তমানে হাঁসপাতালের ভার লইবার জন্য। আমি মনে করি তাঁহার পদধূলিস্পর্শে মনিহারী গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। মনিহারীর লোকেরা তাঁহাকে চেনে না। তিনি মাত্র সাতদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। অমন

রিলিভিং ডাক্তার কত আসিয়াছেন গিয়াছেন, লোকের মনে কেহ দাগ কাটেন নাই। আমার মনেও হয়তো কাটিতেন না, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার শেষজীবনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ডাক্তারি পাস করিয়া আমি যেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিবার জন্য বসি সেখানেই হর্ষবাবুও রিটায়ার করিবার পর প্র্যাকটিস করিতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই আলাপ হইল এবং কথাসূত্রে যখন বাহির হইয়া পড়িল যে আমার বাল্যকালে মনিহারী গ্রামে বাবার জায়গায় তিনি সাতদিনের জন্য কাজ করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এমন উচ্ছ্বসিত সাদরে আমাকে আহ্বান করিলেন যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। তিনি একেবারে সোজা আমাকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া হাঁক দিলেন, "ওগো শুনছ, মনিহারী হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছে। কি সুন্দর ছেলে দেখ। বস বাবা বস।"

একটি হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসিলাম। একটু পরেই তাঁহার গৃহিণী একটি ডিশে দুইটি সন্দেশ ও জল আনিয়া দিলেন। স্ত্রীর মাথায় আধ-ঘোমটা, পরিধানের শাড়িটি আধময়লা।

"চা কর, চা কর, আমাকেও এক কাপ দিও বুঝলে।"

গৃহিণী মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দেখিলাম ডাক্তারবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। দুইটি অবিবাহিতা মেয়েও কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যেই একজন আমাদের চা আনিয়া দিল।

"প্রণাম কর। এইটি আমার মেজ মেয়ে। বড়টা একটু কুনো গোছের, সাধ্যপক্ষে কারো সামনে বেরুতে চায় না। শৈলিকে পাঠিয়ে দে।"

"দিদি তরকারি কুটছে।"

মেয়েটি চলিয়া গেলে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কটি ছেলেমেয়ে আপনার ?"

"হয়েছিল এগারোটি। তিনটি মারা গেছে। আটটি আছে। এদেরও শরীর ভালো নয়। সব ক্রনিক্ ডিসেণ্ট্রি। কি করব বলুন, চিকিৎসার ত্রুটি করি নি, কিন্তু সারতে চায় না। এরা ঠিক ঠিক ওষুধও খায় না। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে যে সব পথ্য দেওয়া উচিত তাও সব সময় জোটাতে পারি নি। সুতরাং সারছে না। সব কটারই হাড় জিরজিরে, গলার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। কি করব বলুন।"

সন্দেশ দুটি শেষ করিয়া জলটা খাইয়া ফেলিলাম। ঘরের তৈরি গুড়ের সন্দেশ, খুব ভালো লাগিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাত-মুখ মুছিতেছি হর্ষবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এখানে একটা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে যাস নি ? কি যে তোদের আক্কেল।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না না, তোয়ালের দরকার নেই।"

"আপনার দরকার নেই তা জানি, কিন্তু এদের তো একটা খেয়াল থাকা উচিত।"

একটু পরেই ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে শৈলবালা দুই কাপ চা লইয়া কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল। মেয়েটি সত্যিই রোগা, রং কালো, দেখিতে সুশ্রী নয়। তবে সারা দেহে আসন্ন যৌবনের একটা কমনীয়তা আছে। চা দিয়াই সে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু চায়ে একটা চুমুক দিয়া উৎসুক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি চুমুক দিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন লাগছে চা-টা ?"

"ভালোই তো—"

মোটেই ভালো নয়, অতি রাবিশ চা। ওই স্যাণ্ডেলের দোকান থেকে কিনেছি। ওজনে কম দেয়, জিনিস অতি খারাপ, দাম বাজারের থেকে বেশী, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙ্গালী। ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, কোথাও চাকরি জোটে নি, পরের কাছ থেকে চেয়ে-আনা খবরের কাগজ পড়ে কাঁকড়ার মতো হাত পা নেড়ে রাজা-উজির মারে। অসংখ্য দোষ, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙালী।"

হর্ষ ডাক্তার ক্রোধভরে ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া চা-টা এমনভাবে খাইতে লাগিলেন যেন ঔষধ খাইতেছেন। তাহার পর বলিলেন, "ওর ঠিক দোষও নেই। বাজারে সব চা-ই খারাপ। আট টাকা পাউণ্ডের নীচে ভালো চা পাওয়া যায় না, কিন্তু তা কেনবার সামর্থ্য নেই।"—তাহার পর বলিলেন, "এক মহা ভুল করেছি সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়িটা কিনে। মনে হল শেষ বয়সে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা হবে। প্র্যাকটিস্ যদি ঠিক থাকত তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো সামলে যেতাম। মেয়ের বিয়ের খরচ, ছেলেদের পড়বার খরচ রোজগারই করে ফেলতাম হয়তো। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকেই ডিপ্রেশন এসে গেল। লোকের হাতে পয়সা নেই, ডাক্তার ডাকবে কোথা থেকে। যারা ডাকছে তারা ফি দিতে পারে না, অনেক সময় ওষুধও কিনতে পারে না।"

ডাক্তারবাবুর বড় মেয়েটি একটি ডিশে করিয়া কিছু ভাজা মসলা দিয়া গেল।

তিনি ভাজা মসলা মুখে ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তার উপর এক কাল ব্যাধি শরীরে ঢুকেছে। প্র্যাকটিস করবার সামর্থ্যও কমে আসছে ক্রমশ—"

"কি ব্যাধি?"

"রেনাল কলিক। যখন হয় তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করি। মরফিন নিতে হয়।"

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মেয়েরাই বুঝি বড়?"

"হ্যাঁ। সংসারের ভার নেবার মতো ছেলে কেউ তৈরি হয় নি এখনও। বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম, প্রথমে গোটাকতক মেয়েই হয়ে গেল। তারপর ছেলে। বড়ছেলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে।"

"একটি মেয়েরও বিয়ে দেন নি?"

"দিতে পারি নি। ওইতো চেহারা দেখলেন। কারো পছন্দ হয় না। একজনের পছন্দ হয়েছে, সে নগদ দশ হাজার টাকা চায়। কোথা পাব বলুন। সুতরাং 'যা হবার হবে' এই সূত্রটুকুই ধরে দার্শনিক হয়ে বসে আছি।"

এইভাবেই হর্ষ ডাক্তারের সহিত সেদিন পরিচয় শুরু হইয়াছিল। তাহার পর পরিচয় ক্রমশ গাঢ়তর হইয়াছে। কলিকের ব্যথা হইলে এখন আমিই গিয়া তাঁহাকে রাত্রে মরফিন ইনজেকশন দিয়া আসি। আমি যদি তাঁহার স্বজাতি হইতাম তাহা হইলে আমিই তাঁহার বড় মেয়ে শৈলিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভার কিছু লাঘব করিতাম। অসবর্ণ বিবাহে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হর্ষবাবুর ছিল। তিনি কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমাদের স্বজাত হতে তাহলে তোমার সঙ্গেই শৈলির বিয়েটা অনায়াসে হতে পরেত। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি বদ্যি—"

আমি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, "অসবর্ণ বিবাহ তো আজকাল প্রায়ই হয়।"

"তা জানি। কিন্তু তোমার বাবা মা বেঁচে আছেন, তাঁদের মনে কষ্ট দিতে চাই না।

তাছাড়া এসব ব্যাপারে চিরাচরিত পথ ত্যাগ করতে ভয় হয়। যারা ত্যাগ করেছে তারা দেখি প্রায়ই অসুখী। অবশ্য এর থেকে কিছু প্রমাণিত হয় না। যারা অসবর্ণ বিবাহ করে নি তাদের মধ্যেও অনেকে অসুখী। কিন্তু তোমার বাবা মার মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করতে চাই না। যে পাত্রটি দশ হাজার টাকা চাইছে, তার এখনও বিয়ে হয় নি। আবার চিঠি লিখেছি তাদের। বাড়িটা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। আমার এক ধনী রোগী আশ্বাস দিয়েছেন। হয়ে যাবে সব—"

তখন বোধ হয় রাত্রি একটা।

হর্ষবাবুর চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল: "শিগগির চলুন, বাবু কলিকের ব্যথায় ছটফট করছেন।"

তাড়াতাড়ি গেলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমার ব্যাগে মরফিনের একটা নতুন প্যাকেট আছে। তার থেকেই একটা অ্যামপুল (ampule) বার করে নাও।"

ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম নামজাদা এক কোম্পানীর আনকোরা নতুন একটি প্যাকেট রহিয়াছে। তাহা হইতেই একটি অ্যামপুল বাহির করিয়া ডান হাতের উপরের দিকে ডেল্‌টয়েড্ মাস্‌লের (deltoid muscle) উপর ইনজেকশনটি দিলাম। দিয়াই চলিয়া আসিলাম। মরফিন দিলেই উনি ঘুমাইয়া পড়েন, আশা করিলাম সেদিনও পড়িবেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আবার তাঁহার চাকর আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল।

"বাবুর যন্ত্রণা কমে নি। যেখানে ইনজেকশন দিয়েছেন সেখানটাও খুব ব্যথা করছে। আপনি আর একবার চলুন।"

গেলাম।

হর্ষবাবু বলিলেন, "ওহে, এ যে হিতে বিপরীত হল দেখছি। কলিক কিছু কমে নি, হাতটাও ব্যথা করছে। তুমি এ হাতে আর একটা দিয়ে দাও। ওতে মরফিনের strength বোধ হয় কম আছে।"

এত তাড়াতাড়ি উপর্যুপরি মরফিন দেওয়া অনুচিত। তাই একটু ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু হর্ষবাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আরে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, মরফিন নেওয়া অভ্যাস আছে আমার, কিছু হবে না।"

দিয়া দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে চাকরটা আবার আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

"ব্যথা কিছু কমে নি, আরও বেড়েছে, আপনি শিগগির আসুন।"

গিয়া দেখিলাম ডান হাত বাঁ হাত দুইটাই বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। লালও হইয়াছে বেশ। মরফিন ইনজেকশন আগেও অনেক দিয়াছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। মরফিনের পথে না গিয়া এবার অন্য পথে হর্ষবাবুর চিকিৎসা করিলাম। ভগবানের দয়ায় সুফলও ফলিল। দুই হাতের ফোলাটা কিন্তু কমিল না। দুই হাতেই অ্যাবসেসের (abscess) মতো হইয়া মাংস পচিয়া বাহির হইতে লাগিল। হর্ষবাবু প্রায় মাসখানেক শয্যাগত রহিলেন এবং তাঁহার হাত দুইটি একেবারে অকর্মণ্য না হইলেও বেশ দুর্বল হইয়া পড়িল। আমি বেশ লজ্জায় পড়িয়া গেলাম। হর্ষবাবু

হয়তো ভাবিতেছেন আমি ইনজেকশন দিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি নাই তাই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে। হঠাৎ একদিন আমার সন্দেহ হইল, ইনজেকশনের ঔষধের মধ্যেই কোন গোলমাল নাই তো! একটি অ্যামপুল বাহির করিয়া কেমিক্যাল একজামিনের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। উত্তর যাহা আসিল তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। অ্যামপুলে মরফিন নাই, আছে সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid)! অবিলম্বে সেই কোম্পানীর কর্তাকে চিঠি লিখিলাম। কেমিক্যাল একজামিনারের সার্টিফিকেটের নকল এবং তাঁহাদের প্যাকেটের নম্বর পাঠাইয়া দাবী করিলাম—অবিলম্বে যদি খেসারতের ব্যবস্থা না করেন আপনাদের নামে মকর্দমা করিব। কর্তা তারযোগে জানাইলেন, হর্ষবাবুকে লইয়া চলিয়া আসুন। আপনারা যাহা বলিবেন তাহাতেই আমরা রাজি হইব।

হর্ষবাবুকে বলিলাম, "চলুন, শৈলির বিয়ের টাকাটা আদায় করে আনি।"

"হ্যাঁ চল। ভগবান দয়া করেছেন।"

কোম্পানীর কর্তা আমাদের রাজ-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আপনার যে কষ্ট হয়েছে তার জন্যে আমরা বিশেষ লজ্জিত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপনারা খেসারত স্বরূপ যা চাইবেন তা আমরা এখুনি দিয়ে দেব। তবে একটি অনুরোধ আছে, কথাটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।"

আমরা পরামর্শ করিয়াই গিয়াছিলাম। হর্ষবাবু পনেরো হাজার টাকা দাবী করিলেন। ম্যানেজার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন, তাহার পর পনেরো হাজার টাকার একটি চেক লিখিয়া দিলেন।

সবিনয়ে আর একবার বলিলেন, "অনুগ্রহ করে কথাটা গোপন রাখবেন।"

আমরা আপিস হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় এক নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এক ছোকরা আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল এবং আমরা দাঁড়াইবামাত্রই সে হর্ষবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, "আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।"

হর্ষবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমি প্যাকার। যে প্যাকেটে মরফিনের বদলে সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে সে প্যাকেট আমিই প্যাক করেছিলাম। আমার চাকরি গেছে। আমার একঘর ছেলেমেয়ে, বিধবা মা, বিধবা বৌদি, অপোগণ্ড ভাই, ভাগনা—আমার ওই চাকরির উপরই সবার নির্ভর। আমার চাকরি গেলে এতগুলো প্রাণী মারা যাবে। দয়া করুন আমাকে।"

ছোকরা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হর্ষ ডাক্তার বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

আবার আমরা সেই কোম্পানীর আপিসে ফিরিয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে হর্ষ ডাক্তার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"তুমি কি কাণ্ড করেছ তা জান? আমার দুটো হাতই জখম হয়ে গেছে।"

"আমি কি করব। আমাকে যা প্যাক করতে দিয়েছে, আমি তাই প্যাক করেছি। আমার বিদ্যেই বা কি, বিশ্বাস করুন আমি জেনে কিছু করি নি। যা পেয়েছি তাই প্যাক করেছি।"

আপিসে গিয়া ডাক্তারবাবু ম্যানেজারকে চেকটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "এই গরীবের চাকরিটি খাবেন না। এইটুকুই আমি চাই। আমার যা হবার তা তো হয়েছে, গরীবের অভিশাপ আর কুড়োতে চাই না।"

আপিস হইতে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পথে আমাকে বলিলেন, "থ্যাংক ইউ—"

"হঠাৎ আমাকে থ্যাংক ইউ কেন।"

"তুমি আমাকে এই মহত্ত্বটা আস্ফালন করবার সুযোগ দিলে বলে।"

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভিখারীটা

ভিখারীটা একজন বড়লোকের দাওয়ায় বসেছিল। রোদে কাঠ ফাটছিল চতুর্দিকে। পিচের রাস্তাগুলো গরমে নরম হয়ে গিয়েছিল। বেচারা এই রোদে আর হাঁটতে পারছিল না। হেঁটেও লাভ হত না কিছু। এই দুপুরে সকলের বাড়ির কপাট বন্ধ। কে তাকে ভিক্ষা দেবে। হাঁকাহাঁকি করলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে সবাই। ভাত খেয়ে ঘুমের সময় তো এটা, এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। সকাল থেকে অনেক হেঁটেছে বেচারা, কিন্তু বেশী কিছু পায় নি সে। আজকাল নয়া পয়সার যুগ নয়া পয়সাই দেয় সবাই। দু'মুঠো ছাতু খেতে গেলেও চার আনা পয়সা চাই। এক নয়া পয়সা ভিক্ষা পেলে পঁচিশটা নয়া পয়সা চাই। পঁচিশ জন সহৃদয় লোকের দেখা পাওয়া কি সহজ আজকাল? এই সবই ভাবছিল বেচারা বসে বসে। লোকটা বুড়ো। অস্থি-চর্মসার চেহারা। পরনের কাপড়টা ময়লা, শতছিন্ন। এত ছোট যে উরুত দুটোও ঢাকে নি ভাল করে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি। ছোট ছোট কোটরগত চোখ। এর সঙ্গে বেমানান কিন্তু তার পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া বটে, কিন্তু ভাল চামড়ার। তার আভিজাত্যের চিহ্ন এখনও তার সর্বাঙ্গে বর্তমান। একজন ধনী যুবক জুতো জোড়া দান করেছিল তাকে কিছুদিন আগে। দয়াপরবশ হয়ে ততটা নয়—যতটা তার শু র‍্যাক (shoe rack) খালি করবার জন্যে। তার জুতো রাখবার জায়গায় আর স্থান ছিল না। ও জুতো বিক্রিও করা যেত না, তাই দানই করতে হয়েছিল।

ভিখারীটা ঢুলছিল বসে বসে। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল।

"পোলিশ, পোলিশ—"

ভিখারী দেখলে একটা রোগা ছেলে জুতো পালিশের সরঞ্জাম ঘাড়ে করে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"পোলিশ, পোলিশ—"

চারিদিক উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। রাস্তায় কেউ নেই। এই রোদে কে জুতো পালিশ করাতে বেরুবে? কি বোকা। হাসল ভিখারীটা।

"এই শোন—"

ছোঁড়াটা এগিয়ে কাছে আসতেই ভিখারীটা যা বলল তা অবিশ্বাস্য।

"আমার এই জুতোটা পালিশ করে দে।"

"তুমি জুতো পালিশ করাবে?"

একটা ব্যাঙ্গের হাসি ফুটি-ফুটি করতে লাগল ছোঁড়ার চোখের দৃষ্টিতে।

"হ্যাঁ করাব—"

"চার পয়সা লাগবে।"

"দেখি।"

"হ্যাঁ, আছে আমার কাছে। পালিশ করে দাও জুতোটা—নাও, আগেই দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিন সারা সকাল ঘুরে ছ'টি নয়া পয়সাই রোজগার করেছিল সে।

ছোঁড়াটা জুতো পালিশ করতে লাগল।

অর্ধ-নিমীলিত নয়নে স্মিত মুখে ছোঁড়াটার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল ভিখারীটা। কল্পনা করছিল। বছর খানেক আগে তার ছোট ছেলে নুলিয়া পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে নাকি এখন কলকাতার রাস্তায় জুতো পালিশ করে বেড়ায়। নুলিয়ার মুখের সঙ্গে এ ছেলেটার মুখের কোনও সাদৃশ্য নেই। ভিখারীটার কিন্তু মনে হচ্ছিল আছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে ছেলেটার মুখের দিকে। ছোঁড়াটা মুচকি মুচকি হাসছে। নুলিয়াও ওই রকম হাসত।

নিত্য চৌধুরী

মনিহারীর নিত্য চৌধুরীকে ইদানীং যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার কৈশোর মূর্তি কল্পনা করিতে পারিবেন না। নিত্য বেঁটে ছিল, কিন্তু বুড়া বয়সে তাহার রং যত কালো হইয়া গিয়াছিল তত কালো সে ছেলেবেলায় ছিল না, রোদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার রং কালো হইয়া যায়। এখন যাঁহারা তাহার মাথায় কদমছাঁট সাদা চুল দেখিয়াছেন তাঁহারা যদি ষাট বৎসর পূর্বে তাহাকে দেখিতেন তাহা হইলে তাহার মাথার অ্যালবার্ট তেড়ি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। বুড়োবয়সে অনেকে তাহার গলায় তুলসীর মালা দেখিয়াছেন, ইহাও হয়তো অনেকে জানেন যে সে ঘোরতর বৈষ্ণব ছিল, যে বাড়িতে মাছ-মাংসের সংস্রব আছে সে বাড়িতে সে জলস্পর্শ করিত না। কিন্তু ছেলেবেলায় তাহার গলায় তুলসীর মালা থাকিত না, থাকিত একটি রঙীন কম্‌ফর্টার, আর সে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে আসিয়া মুরগীর ডিম খাইয়া যাইত।

নিত্য চৌধুরীর বাবার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সে আলগা-ধরনের বন্ধুত্ব। সমাজের সর্বত্র প্রচলিত সেই ধরনের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে আত্মিক কোন যোগ হয় নাই। হওয়া সম্ভবই ছিল না। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী ডাক্তার এবং নিত্য চৌধুরীর বাবা ছিলেন অত্যাচারী জমিদারের কর্মচারী। শোনা যায় দুষ্ট এক প্রজাকে শাসন করিবার জন্য জমিদারের আদেশে তিনি রাত্রে তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করেন। বাড়ির লোক কেহ মরে নাই বটে কিন্তু এক-গোয়াল গরু পুড়িয়া গিয়াছিল।

এ ধরনের লোকের সহিত বাবার আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের পারিবারিক একটা সম্প্রীতি ছিল। বাবা যখন প্রথম মনিহারীতে আসেন তখন নিত্য চৌধুরীর বাবাই তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য কৃতজ্ঞতারও একটা বন্ধন ছিল।

নিত্য আমার সঙ্গে পড়িত। পাঠশালায় তারাপদ পণ্ডিত তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। এ ব্যাপার আজকালও হয়। বড় অফিসার বা মিনিস্টারের ছেলেমেয়েরাও বিদ্যালয়ে আজকাল বিশেষ একটা অনুগ্রহের পরিবেশে চলা-ফেরা করে। নিত্য ক্লাসে শৌখিন কাপড় জামা পরিয়া জামাইয়ের মতো বসিয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতেন না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার একটা অভিনয় করিতেন মাত্র। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই করিতেন কিন্তু তাহার উত্তরের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। নিত্য প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পাস করিয়া যাইত। নিত্যর মা পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়মিতভাবে সিধা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার ধারণা ঘুষ না দিলে কোন-কিছুই এ বাজারে সুসম্পন্ন হয় না। তিনি গ্রামের পোস্ট-মাস্টারকে, ডাক্তার-বাবুকে, দারোগাকে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু উপহার পাঠাইতেন। কাহাকেও দুধ, কাহাকেও দধি, কাহাকেও বা মাছ। গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ছিল, দুইটিতেই তিনি পুজা পাঠাইতেন। গ্রামে একটি পুজ্য অশ্বত্থগাছ, একটি পুজ্য নিমগাছ এবং একটি পুজ্য বটগাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের তলায় সিঁদুরমাখানো বিষ্ণুমূর্তি, গণেশমূর্তি, শিবমূর্তি প্রভৃতি স্তূপীকৃত হইয়া থাকিত। অনেকেই সেখানে গিয়া গঙ্গাজল ঢালিতেন। নিত্যর মায়েরও ইহা একটি দৈনন্দিন কর্ম ছিল। তিনি নবরূপী বা প্রস্তররূপী কোনও ক্ষমতাবান ব্যক্তিকেই অবহেলা করিতেন না।

প্রত্যহ সিধা পাওয়া সত্ত্বেও তারাপদ পণ্ডিত কিন্তু নিত্যর সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। মাঝে মাঝে কেবল বলিতেন, তুমি হাতের লেখাটা পাকা কর, আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চাররকম অঙ্ক ভাল করিয়া শিখিয়া ফেল। ইতিহাস, ভূগোল, আকাশতত্ত্ব এসব তোমার পড়িবার দরকার নাই। ওসব তোমার কাজে লাগিবে না।

নিত্য একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন পণ্ডিতমশাই?

তারাপদ পণ্ডিত উত্তর দিয়াছিলেন, তোমার গোঁফের রেখা দেখা গেলেই তুমি জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকিবে এবং পটোয়ারি হইবে। সুতরাং হাতের লেখা এবং যোগ বিয়োগ গুণ ভাগটা পাকা কর। মাথায় যদি ঢোকে শুভঙ্করীটাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, নিত্য চৌধুরী শেষ পর্যন্ত জমিদারি সেরেস্তায় পটোয়ারির পদেই বাহাল হইয়াছিল। তাহার বেতনের কথা শুনিলে এখন অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না, অনেকে হয়তো হাসিবেন। নিত্য প্রথমে মাসিক আট আনা বেতনে বাহাল হইয়াছিল। তাহার বাবার বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু তাহারা যে ঠাটে থাকিত তাহা এখন সহস্রমুদ্রাবেতন-ভোগীরা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাহাদের হাজার বিঘা জমি ছিল। গোয়ালভরা গরু ছিল। বাথানে অনেক মহিষ থাকিত, বাড়িতে বেশ বড় একটি চন্দনা ছিল, ছাগল যে কত ছিল তাহার গণনা কেহ করিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি নিত্য আমার সহপাঠী ছিল। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই

নিত্যর সহিত আমার কতটা যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বলা হয় না। ছেলেবেলায় নিত্যই আমার প্রধান সঙ্গী ছিল। পাঠশালার ছুটি হইয়া গেলে তাহার সহিতই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই আকর্ষণের একটা কারণও এখন বুঝিতে পারি। ছেলেবেলা হইতেই নিত্যর খবর সংগ্রহের বাতিক ছিল। সারাজীবন ইহাই তাহার অবসর-বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সারাজীবন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম খবর সংগ্রহ করিত। ছেলেবেলায় এই খবরগুলিই আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিত। খবরের টানেই তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

একদিন সে আসিয়া বলিল, "জাহাজঘাটে কয়লা ঠাকুর এসেছেন দেখতে যাবি ? চল—"

"কয়লা ঠাকুর আবার কি !"

"সে একজন বড় সন্ন্যাসী। খালি কয়লা খেয়ে থাকে। তাই জাহাজঘাটে-ঘাটে ঘোরে। রাত্রে যখন ধ্যান করে তখন টিকিটা খাড়া হয়ে যায় আর তার ডগা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। জাহাজের নল থেকে যেমন বেরোয় তেমনি। এতদিন সক্রিগলি ঘাটে ছিল, কাল এখানে এসেছে। যাবি ?"

এমন একটা আশ্চর্য সন্ন্যাসীকে দেখিবার লোভ সংবরণ করা শক্ত। গেলাম জাহাজঘাটে। জাহাজঘাট আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় দুই মাইল। হাঁটিয়াই গেলাম। জাহাজঘাটে চারিদিকেই কয়লা। একটা কয়লার স্তূপের কাছে ক্ষীণকায় মসীকৃষ্ণ একটি লোককে দেখাইয়া নিত্য বলিল—এই কয়লাবাবা। তাহার মাথায় একটি সরু টিকিও আছে দেখিলাম। আমি সভয়ে আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম, কই, টিকি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না তো। নিত্য বলিল, সব সময় বেরোয় না। রাত বারোটার সময় যখন ধ্যান করেন তখন বেরোয়। তখন টিকিটাও খাড়া হয়ে যায়।

জাহাজঘাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এজন্য মায়ের কাছে বকুনি এবং বাবার কাছে কানমলা খাইলাম। নিত্যর জন্য এরূপ নির্যাতন আমাকে প্রায়ই সহ্য করিতে হইত।

একদিন নিত্য বলিল, "আলোর সাঁপ দেখেছিস ?"

নিত্য অকারণে যেখানে সেখানে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া দিত। সাপকে সাঁপ এবং ইতিহাসকে ইতিহাঁস বলিত।

"আলোর সাপ ? না, দেখি নি তো !"

"আমি দেখেছি।"

"কোথায় ?"

"আমাদের বাগানে রাত একটার সময় গেলে তুইও দেখতে পাবি। আকাশ থেকে সে সাঁপ মাটিতে নামে, তারপর আবার আকাশে চলে যায়। ইয়া মোটা সাঁপ।"

বড়ই বিস্মিত হইলাম।

"কিন্তু আমি তো ভাই অত রাত্রে বাড়ি থেকে যেতে পারব না।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। মা তোকে আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবে। তারপর রাত্রি দশটার সময় ফাগুয়া তোদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে দেবে যে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস, সকালে বাড়ি যাবি। আমরা দুজন বাইরে শোব। তারপর ঠিক সময়ে বাগানে চলে যাব।"

তাহাই হইল। গভীর রাত্রে উঠিয়া আমরা আলোর সাপ দেখিতে গেলাম। দেখিলাম বেশ মোটা সাপ। আকাশের এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া সমস্ত আকাশটায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর হঠাৎ মিলাইয়া গেল। স্টীমারের সার্চলাইট পূর্বে কখনও দেখি নাই। অনেকদিন পরে জানিয়াছি নিত্য যাহা দেখাইয়াছিল তাহা স্টীমারের সার্চলাইট। তখন রাত্রি একটার সময় একটা বড় স্টীমার সার্চলাইট ফেলিয়া দূরের গঙ্গা দিয়া যাইত।

এই ধরনের চমকপ্রদ খবরের টানে নিত্যর সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। অনেকবার সে আমাকে ঠকাইয়াছে। একবার বলিল, কাজিগ্রামে একজনের বাড়িতে ভালো বিলাতী কুকুরের বাচ্ছা হইয়াছে। গেলেই একটা বাচ্ছা পাওয়া যাইবে। গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা নেড়ী কুত্তির পিছু পিছু একপাল বাচ্ছা ঘুরিতেছে। বাড়ির মালিককে বলিবামাত্র সে সানন্দে গোটা দুই বাচ্ছা আমাকে গছাইয়া দিল। বাড়িতে আসিয়া বাবার নিকট মার খাইলাম। মা বাচ্ছা দুইটাকে অবিলম্বে দূর করিয়া দিলেন।

আর একটা খবরের কথাও মনে পড়িতেছে। নিত্য একদিন আসিয়া বলিল, আমাদের বাড়িতে একদল বেদে এসেছিল। তাদের কাছে একটা অদ্ভুত খবর শুনলাম। ছাগলের দু'কানে যদি দুটো চটিজুতো পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আর নড়ে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কিছুদিন আগে বাবা বেশ ভালো একজোড়া চটি কিনিয়াছিলেন। বাসনা হইল ওই চটি দিয়া একদিন নিত্যর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। পরের রবিবারেই সুযোগ মিলিয়া গেল। বাবা দুপুরে আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহার চটি দুইটি সহজেই সরাইতে পারিলাম। দুপুরবেলা আমাদের বাগানে অনেক ছাগল আসিত। গেট বন্ধ করিয়া একটা বলিষ্ঠ খাসি ধরিয়া ফেলাও অসম্ভব হইল না। নিত্য আর আমি দুইজনে মিলিয়াই সহজে তাহা পারিলাম। নিত্য খাসিটাকে ধরিয়া রহিল, আমি তাহার দুই কানে বাবার নূতন চটিজোড়া পরাইয়া দিলাম। খাসির শিং দুইটা বড় থাকাতে সুবিধা হইল। চটি দুটা পরাইয়া দেওয়া মাত্র খাসিটা কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে জীবনে আর কখনও বোধ হয় পড়ে নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে আমরা তাহাকে আর ধরিয়া নাই সেই মুহূর্তেই সে ছুট দিল। খাসির ওরকম ছুট আমি অন্তত দেখি নাই। ঘোড়াকে হার মানাইয়া দিল। চটি দুটা মাথায় লইয়াই সে ছুটিতেছিল, আমরাও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলাম। নিত্যর খবর যে নিতান্তই ভুয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বাবার চটিজোড়া তো উদ্ধার করিতে হইবে। বনবাদাড় পার হইয়া মাঠামাঠি খাসিটা ছুটিতে লাগিল। আমরাও ছুটিতে লাগিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, নিত্যর পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে সে বসিয়া পড়িল।

আমি ছুটিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ছুটিবার পর ছাগলটার কান হইতে একপাটি চটি পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়টা লইয়া সে একটা অড়হর ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একপাটি চটি হাতে করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম। বাবা তখনও ঘুমাইতেছিলেন, ভাগ্য ভাল ছিল, ধরা পড়িলাম না। বাবা উঠিয়া চটিটি খুঁজিলেন, তাহার পর অনুমান করিলেন বোধ হয় কুকুরে লইয়া গিয়াছে।

নিত্যকে তাহার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এরকম একটা বাজে খবর আনিয়া মিছামিছি আমাকে হয়রান করিল কেন।

"বেদেরা আমাকে বললে যে—"

"যে যা বলবে তুই বিশ্বাস করবি?"

"তুমিও তো বিশ্বাস করলে।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যদি এসব খবর না আনতাম তুমি কি আমার কাছে আসতে? আমার সঙ্গে ঘুরতে?"

আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া করুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে কেউ আসে না ভাই। আমি দেওয়ানজির ছেলে বলে বোধ হয় সবাই আমাকে ঘেন্না করে।"

দেখিলাম তাহার চোখে জল টলটল করিতেছে।

গ্রামের পড়া শেষ করিয়া আমি শহরে চলিয়া যাই। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ি আসিতাম। কখনও অন্যত্র যাইতাম। নিত্যর সহিত অনেকদিন দেখা হয় নাই। একবার হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। শুনিলাম নিত্যর বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়েও হইয়াছে। নিত্য প্রায় রোজই আমার কাছে আসিতে লাগিল। দেখিলাম সে এখনও খবর ফেরি করিতেছে, কিন্তু এবার খবরগুলি অন্যরকম। কিছুদিন আগে নিত্য পাটোয়ারির পদে বাহাল হইয়াছিল, তাই খবরগুলি প্রায়ই জমিজমা সংক্রান্ত। রামকে হয়তো বলিল, শ্যামের বিষয় এবার নীলামে উঠিবে। অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে। শ্যামকে বলিল, রামের উপর মালিকের ভালো ধারণা নাই, আমাকে বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে উহাকে দূর করিয়া দাও। দেখিলাম এই ধরনের নানারূপ মিথ্যা খবর চালাচালি করিয়া গ্রামে সে বেশ একটা প্রতিপত্তি জাহির করিয়াছে। আমাকে বলিল, তোমাদের রঘুনাথ দিয়াড়ার জমি সেধু মণ্ডল খানিকটা চাপিয়া লইয়াছে। চল গিয়া দেখিয়া আসি। আমি থাকিতে অবশ্য তোমার জমি কেহ দাবাইয়া লইতে পারিবে না। তবু যদি দেখিতে চাও চল। আমি আর গেলাম না।

ইহার পর নিত্যর সহিত যখন দেখা হইয়াছিল তখন আমি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম নিত্য একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল সব সাদা, খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। একটিও দাঁত নাই, দুই পাটি বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া দেখাইল। তখন দেখিলাম তাহার খবর-সংগ্রহ করিবার বাতিক ঠিক আছে। কিন্তু এবার দেখিলাম খবরের ফর্দ অন্য রকম। সে মৃত্যু সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে। আমার সহিত দেখা হইতেই বলিল, 'তুমি এতদিন পরে এলে, গ্রামের অনেক লোকের আর দেখা পাবে না। অনেকেই পটল তুলেছে। গনোরি, ভিখন সিং, বিজুবাবু, কালী সিং, রাজু পাটোয়ারি, তুরীটোলার বর্ষতিয়া—সব মরে গেছে। ভাদো মুন্সী শুয়েছে। তার ছেলেরা কাটিহার থেকে বড় ডাক্তার ডেকেছিল, তারা বলে গেছে বাঁচবার কোনও আশা নেই। তুমি কি একবার দেখবে, চল না?"

চিকিৎসার জন্য নহে, ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। মৃত্যু-পথযাত্রী ভাদো মুন্সী আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও কথা বলিলেন না। দিন দুই পরে নিত্য

আর একটি খবর আনিল। হরিবোল সাহার নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। নিত্যই নাকি তাহার দুই ছেলেকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছে। আমি কি তাহাকে দেখিতে যাইব? আমি আর গেলাম না। শরীরটা সেদিন খুব ভাল ছিল না। নিত্য চলিয়া যাইবার একটু পরেই তাহার ভাই আসিল। নানা কথার পর আমাকে আস্তে বলিল, নিত্যর কথায় আমি যেন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া না বেড়াই। উহার উদ্দেশ্য কেবল ফপরদালালি আর বাহাদুরি করা। শুনিলাম নিত্যর ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নাই। তিন ভাই পরস্পরের ঘোর শত্রু। আর একদিন নিত্য আসিয়া বলিল, বেচুবাবু কণ্ট্রাক্টারের এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? নিত্য বলিল, গত এক মাস হইতে বেচুবাবু শয্যা লইয়াছেন, প্রতিমুহূর্তেই সকলে আশঙ্কা করিতেছেন এই বুঝি তিনি গেলেন। কিন্তু তিনি যাইতেছেন না। প্রাণবায়ু কিছুতেই বাহির হইতেছে না। নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। পরশুদিন তাঁহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, সকলে ভাবিল এই বোধ হয় শেষ। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমাকে এক গ্লাস জল দাও। তাঁহার ছেলেরা পূর্ব হইতেই কাঠ খাটিয়া প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বেচুবাবু মরিতেছেন না। অবশেষে কাঁটাক্রোশের প্রবীণ কবিরাজ 'কানুহাই' মিশিরকে ডাকা হইয়াছে। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন আজ রাত্রে নিশ্চয় মরিবে। দেখিলাম বেচুবাবুর ছেলেরা উঠানে বসিয়া কাঠ কাটিতেছে। কিন্তু বেচুবাবু এখনও মরেন নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া কাঠ কাটার শব্দ শুনিতেছেন।

সেবার আসিয়া যে কয়দিন ছিলাম নিত্যকে এই ধরনের খবর সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিলাম। অনেক দূরে দূরে গ্রামের মৃত্যুসংবাদও সে সংগ্রহ করিয়া আনিত।

মাত্র কয়েকদিন হইল এবার মনিহারী আসিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম নিত্য আসিবে, কিন্তু আসিল না। হঠাৎ তাহার ভাই আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে দাদা। আপনি আজকের দিনটা কোনরকমে পার করে দিন। আজ শনিবার অমাবস্যা, আজ যদি নিত্য মরে সমস্ত পাড়াটা খারাপ হয়ে যাবে।"

"কি হয়েছে নিত্যর?"

"পক্ষাঘাত হয়েছে, গত পনর দিন বিছানায় পড়ে আছে, আজ খুব বাড়াবাড়ি, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে। আজকের দিনটা ওকে বাঁচিয়ে দিন দাদা—"

এখানে আসিয়া অনেকের সহিতই দেখা হইয়াছিল। কেহই তাহার কথা বলে নাই। যে নিত্য কত লোকের অসুখ লইয়া মাথা ঘামাইত, দেখিলাম তাহার জন্য কেহই মাথা ঘামাইতেছে না। তাহার ভাই ঘামাইতেছে, কিন্তু অন্য কারণে।

নিত্যকে দেখিতে গেলাম। সে আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহাকে একটা ইনজেকশন দিলাম। যে কারণেই হোক শনিবারটা টিকিয়া গেল। মারা গেল রবিবার সকালে।

শ্মশানে তাহার চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন বলিল—"এ সব খবর যদি না আনতাম, তুমি কি আমার কাছে আসতে?"

আজবলাল

আজবলাল শর্মার নামটা বিহারী ছাঁদের হইলেও আসলে সে বাঙালী। তাহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারী মার্কা নাম রাখিলে চাকুরীর সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া মতিলাল পুত্রের ওই নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু এ দূরদর্শিতা শেষ পর্যন্ত সুফল প্রসব করে নাই। কারণ গোড়াতেই গুটি কাঁচিয়া গেল। আজবলাল কৈশোরেই স্থানীয় থিয়েটার পার্টিতে পাণ্ডা হইয়া উঠিল। পড়াশোনা করিত না। গোঁফ গজাইয়া গেল, কিন্তু আজবলাল ক্লাশ ফাইভের উর্ধে উঠিতে পারিল না। সুতরাং ভালো চাকুরির আশা আর রহিল না, টিঁকিয়া গেল কেবল আজবলাল নামটা।

আজবলালের লেখাপড়া বেশীদূর হয় নাই বটে, কিন্তু সে বেশ কাজের লোক। বলিষ্ঠ গঠন তাগড়া সাঁওতালের মতো চেহারা। খুব খাটিতে পারে। সব রকম কাজ জানে, শুধু থিয়েটারে নয়, গৃহস্থালীর কর্মেও সুনিপুণ। রান্নাবাড়া হইতে শুরু করিয়া সাধারণ গৃহস্থের যাবতীয় কাজ সে একা সামলাইতে সক্ষম। বাজার করে, ঘর ঝাড়ু দেয়, মসলা পেশে, চা করে, সাবান কাচে, সব রকম ফাইফরমাশ খাটে এমন কি দরকার পড়িলে জুতা বুরুশও করিয়া দেয়। অথচ বদন সর্বদাই প্রফুল্ল। সুরথ-পত্নী আকাশ-যাত্রা না করিয়াই আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। বস্তুত এ-যুগে এরূপ সর্বকর্মপারঙ্গম ভৃত্য সত্যই দুর্লভ। সুরথবাবু তাহাকে খুব যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজবলালের একটি দোষ এবং একটি দুর্বলতা ছিল। যুধিষ্ঠির অথবা বুদ্ধদেব আসিয়া চাকরের কাজ করিবেন ইহা আশা করা অন্যায়। সাধারণ মানুষের দোষ-দুর্বলতা থাকিবেই। আজবলালের দোষ সে নিজেকে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সমপর্যায়ের মনে করিত। অসংকোচে তাঁহাদের আলাপের মাঝখানে 'ফোড়ন' দিয়া ফেলিত। হয়তো গানের কথা হইতেছে, আজবলাল বলিয়া বসিল—যাই বলুন আঙুরবালার গানের তুলনা হয় না। রাজনীতি, সাহিত্য, সব ক্ষেত্রেই তাহার নিজস্ব মতামত ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তাহা সে ব্যক্ত করিয়া ফেলিত। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার আদর্শ পুরুষ ফজলুল হক আর সাহিত্যে পাঁচকড়ি দে। বড়দের কথার মাঝখানে ফোড়ন দিত বলিয়া সুরথবাবু মাঝে মাঝে তাহাকে খুব বকিতেন। আজবললে তাহাতে রাগ করিত না, ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিত। আজবলালের দুর্বলতাটি ছিল মাছ-মাংসের সম্বন্ধে। বিশেষ করিয়া মুর্গির মাংস পাইলে সে বিগলিত হইয়া পড়িত। বাড়িতে যেদিন মুর্গি হইত সেদিন ডবল ভাত খাইত আজবলাল। কিন্তু মুর্গির বাজারে আজকাল আগুন লাগিয়াছে। সে আগুনে মুর্গিরা পুড়িলে ভালো 'রোস্ট' হইত। কিন্তু সে আগুন মুর্গিদের স্পর্শ করে না, পোড়ায় গরীব খাদ্যরসিকদের। তবু সুরথবাবু মাঝে মাঝে মুর্গি কিনিতেন। আজবলাল সেগুলি নিজ হস্তে কাটিয়া কুটিয়া সোল্লাসে রান্না করিত।

সেবার একটা অভাবনীয় সুযোগ ঘটিয়া গেল। উকিল-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ভার পড়িল সুরথবাবুর উপর। তিনদিনব্যাপী অধিবেশন। ও অঞ্চলের অধিকাংশ উকিলই মুসলমান বলিয়া এবং হিন্দু উকিলরাও সকলেই মুর্গি-ভোজনেচ্ছু

অনুমান করিয়া সুরথবাবু প্রচুর মুর্গি কিনিয়া ফেলিলেন। খাসির মাংস এবং পাকা মাছ তো ছিলই, কিন্তু বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল মুর্গির। সুরথবাবু প্রায় মুর্গিমেধ যজ্ঞেরই আয়োজন করিলেন।

আজবলাল আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহার উপরই সুরথবাবু রাঁধিবার সমস্ত ভার দিয়া দিলেন।

ইহার পরই কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেল যে বিনা-মেঘেও বজ্রপাত হয়। কোথাও কিছু নাই, আজবলালের নামে এক পোস্টকার্ড আসিয়া উপস্থিত। তাহার বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত লিখিতেছে—'গতকাল আমাদের এ অঞ্চলে এক ভীষণ 'বাস' এক্সিডেণ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার বাবা মতিলালবাবু তাহাতে মারা গিয়াছেন। তুমি পারো তো ছুটি লইয়া পত্রপাঠ চলিয়া এস।'

আজবলাল অগ্নি-গর্ভ দৃষ্টিতে পোস্টকার্ডটির দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরথবাবু কিন্তু তাহাকে ছুটি দিলেন না। বলিলেন, "তোমার উপর নির্ভর করেই এত বড় ব্যাপারের আয়োজন করেছি। এখন তুমি চলে গেলে অকুল পাথারে পড়ব যে শেষ মুহূর্তে। আগে খবর গেলে কলকাতা থেকে রাঁধুনী আনাতাম। কিন্তু এখন তো সময় নেই। এর জন্যে আমাদের ফাণ্ড থেকে তোমাকে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে তিন দিনের জন্য ত্রিশ টাকা তো দেবই, আরও কিছু বেশী দেব আমার নিজের পকেট থেকে। তুমি ভালয় ভালয় কাজটি উদ্ধার করে দাও।"

আজবলালকে রাজী হইতে হইল। তাহার দাড়ি ও নখ বাড়িতে লাগিল, লোভ দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, সংযমের বাঁধ কিন্তু সে ভাঙিতে দিল না। হাজার হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে।

সুরথবাবুর স্ত্রী তাহার জন্য আলাদা হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতে লাগিলেন। মটর ডাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ আহার করিয়া বেচারী মাছ-মাংস-মুর্গি রাঁধিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিল। রান্নার গন্ধে মাঝে মাঝে সে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল, এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল গোপনে এক-আধটা মুর্গির ঠ্যাং চুষিয়া দেখিলে ক্ষতি কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামলাইয়া গেল। হিন্দুধর্মের কঠোর বিধানই জয়ী হইল।

ভোজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজবলাল কুলিদের দিয়া বাসন মাজাইতেছে, এমন সময় বাহিরে শোনা গেল—"আজু আজু—বাড়ি আছিস—আজু—।"

এ কি! কার কণ্ঠস্বর!

আজবলাল বাহিরে গিয়া দেখিল তাহার পিতা মতিলাল সশরীরে দণ্ডায়মান।

মতিলাল বলিলেন, "শুনলাম লক্ষ্মী তোকে খবর দিয়েছে যে আমি মরে গেছি। একের নম্বর পাজি শালা। ওরা ষোড়শী থিয়েটার করছে, তোকে দিয়ে জীবানন্দের পার্ট করাতে চায়। খবরটা শুনে আমি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম।"

আজবলাল স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত মতিলালের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এলেই যদি দুদিন আগে আসতে পারলে না?"

রঙের খেলা

এক

পলাশ, অশোক, কৃষ্ণচূড়া, কোকনদ, জবা, রঙ্গন, ক্রিমসন্ গ্লোরি, টকটকে লাল-ডালিয়া, শোণিত-শোভা চন্দ্রমল্লিকা আর দুপহর চন্দ্রিকা সবাই হঠাৎ ভীড় করে এল লাল দোপাটির সঙ্গে। নবারুণের উজ্জ্বল লাল আলো তাদের উপর পড়ল। লজ্জিত নববধূর আরক্তিম কপোলের আভা আর চেলাঞ্চলের আভাস দুলে উঠল যেন চকিত চমকে। দোলের উৎসব ফাল্গুনের প্রগল্ভতায় সহসা যেন মূর্ত হল। লালে লাল হয়ে গেল মনের আকাশ। ছড়িয়ে পড়ল অজস্র আবীর, কুঙ্কুম, আর সিন্দুরের অসংযত প্রলাপ। আগুন লেগে গেল।

···প্রথম দর্শন।

দুই

এর পর বাজল আশাবরী।

অকুণ্ঠ আশার অসীম প্রত্যাশা। উন্মুখ আগ্রহে লাল রূপান্তরিত হল কমলা রঙে। অগ্নিশিখায় জ্বলতে লাগল কমলা-রঙের কিরণ-কলাপ। শ্রাবণ সন্ধ্যাকাশের বর্ণ-বহুলতায় যে কমলা রঙ অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকে লালের সঙ্গে, যা উড়ে উড়ে বেড়ায় কচিৎ-পথ-ভুলে-আসা চঞ্চল প্রজাপতির ক্ষণভঙ্গুর লঘু ডানায় ভর করে, ল্যাসিয়া গোলাপের অর্ধস্ফুট কুঁড়িতে যার স্বপ্ন,—সেই রং। আশার আশাবরীতে বাজতে লাগল সেই রঙের আকুতি। মনে হল যেন কমলা রঙের কুয়াশা নামছে চারদিকে। নওরং পাখীদের ঝাঁক এসেছে কি? তাদের কমলা রঙের বুক যেন দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কমলা রঙের ঝরনা ঝরছে। বেজে চলেছে আশাবরী। লাল কমলা রঙে হারিয়ে গেছে।

আবার সে এসেছিল।

দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে।

তিন

সোনালী আলোর বান ডেকেছে।

শরতের রোদের সঙ্গ বিগলিত স্বর্ণের এ কি অপূর্ব শোভা। গলাগলি করে হাসছে কলকে ফুলের দল। ওদের অঙ্গের এ কনক-দ্যুতি তো আগে চোখে পড়ে নি। ও কি, ওরা এসেছে? হলদে গোলাপ ওফেলিয়া আর লন্‌স্‌ডেল? কি হাসি ওদের মুখে। মনে হচ্ছে গোলাপ নয় যেন, মানুষ। কি আনন্দ, কি আনন্দ। স্বর্ণ-পক্ষ প্রজাপতিরা গান ধরেছে কাজল-গৌরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। শুধু কাজল-গৌরী নয়, ক্যানারিও এসেছে অসংখ্য। শিস দিচ্ছে তারা। সোনা পাখীর ঝাঁকও নামছে।

সোনার মেঘ নামছে যেন। সুরে সুরে ভরে যাচ্ছে দশ দিক। রঙের সোনায়, সুরের সোনায়, গানের সোনায়, প্রাণের সোনায় স্বর্ণময় হয়ে গেল অন্তর-বাহির।

চিঠি এসেছে তার।

সুবাসিত, সরল, অনাড়ম্বর।

পড়ে প্রথমে অবাক হল, তারপরে আনন্দে ভরে উঠল বুক।

চার

সবুজে সবুজ।

কোথা ছিল এত সবুজ এতদিন। ফার্ন-পাতার কারুকার্যময় সবুজের সঙ্গে আরও যে কত সবুজের সমারোহ। তমাল, তাল, কাঁঠাল, বট, ক্যাক্‌টাস্‌, করবী, চাঁপা, শিরীষ, আরও কত—সবার পাতার সবুজ এসে মিশেছে সেই চিরন্তন সবুজে যা বহন করে জীবন্ত প্রাণের বাণী, যার কণ্ঠে যৌবনের গান, বা অকুতোভয়, যা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর, যা আরও চায়। আরও, আরও, আরও···।

সবুজের কুঞ্জবনে এসেছে টিয়া চন্দনার দল, এসেছে হরবোলা, এসেছে বাঁশপাতি। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আর একখানি চিঠি, এটিও খুলে পড়ল সাগ্রহে।

এটিও সুবাসিত।

পাঁচ

নীল শাড়ি পরা মেয়েটি এল তারপর।

আকাশ-নীল শাড়ি। চোখের তারা দুটিও নীলাভ। খোঁপায় দুলছে নীলাঙ্গিনী অপরাজিতা। কি অদ্ভুত হাসি তার মুখে, চাপা হাসি। হঠাৎ মনে হল, নীলনদের স্রোতে উজান বেয়ে নীল মেঘের বজরা থেকে নামল নাকি ক্লিওপেট্রা সহসা? চোখের দৃষ্টিতে চকমক করছে চাপা হাসির ঝলক।

"নমস্কার—"

"নমস্কার। আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক।"

"চেনবার কথা নয়। নতুন এসেছি আমরা এ পাড়ায়। মাত্র সাত দিন। আপনাদের বাড়ির পাশেই আছি।"

"ও—"

"আচ্ছা, আপনার নামও কি মল্লিকা বসু?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো।"

"আমিও মল্লিকা বসু। আমার দুখানা চিঠি বোধ হয় পিওন ভুল করে আপনাকে দিয়ে গেছে। বিকাশদার চিঠি—"

"ও, হ্যাঁ। আমি ভাবছিলুম কার চিঠি।"

গলাটা কেঁপে গেল একটু।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে এনে দিল চিঠি দুখানি।

"ধন্যবাদ—"

চিঠি দুটি নিয়ে চলে গেল সে নীলের ঢেউ তুলে।...নীল, নীল, নীল—নীল সাগর থই থই করছে চারিদিকে। বিষের মতো নীল, বেদনার মতো নীল, মূর্ছাহত ঠোঁটের মতো নীল।

হাতটা শুঁকে দেখল।

তখন চিঠির গন্ধ লেগে আছে হাতে।

ছয়

নীল ঘন হচ্ছে, জমছে।

শেষে ঘন-নীল।

ঘন নীল সাগর জমাট হয়ে যেন প্রসারিত হয়ে আছে আদিগন্ত। ঘন নীল, স্তব্ধ ভয়ঙ্কর। ওগুলো কি উড়ছে? সোয়ালো পাখীর ঝাঁক। তাদেরও গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘন নীলের বিদ্যুৎকণা। ক্রমাগত উড়ছে, থামছে না। থামবে না।

তারা মোটরে পাশাপাশি চলে গেল তার বাড়ির সামনে দিয়ে। তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুজনেই। দুজনেরই মুখে মুচকি হাসি।

সাত

ঘন নীলের পর বেগুনির পালা।

ঘন-নীলের অন্তরে কি তুষানল জ্বলল? তারই তাপে কি ঘন নীল বেগুনি হয়ে গেল? লাল, হলদে, কমলা, সবুজ কোথায় গেল তারা। কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হল।

সেদিন তারা দুজনেই এল।

হাতে একখানি রঙীন খাম।

খামের উপর লেখা "শুভ-বিবাহ"।

"আসবেন নিশ্চয়। 'ভায়োলেট ভিলা'তে হবে। বেশী দূর নয়। কাছেই। নমস্কার।"

চলে গেল।

আট

তার পর?

সব কালো

চিন্তামণি

কি সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন বিগলিত মুক্তো। মুক্তোর ভিতর আর একটা ছোট বিন্দু। সেটাও ছোট পুঁতির মতো।

মুক্তো থেকে বেরিয়ে এল একটা হাতের মতো, তারপর নিঃশব্দে সমস্ত দেহটা ঢুকে গেল সেই হাতে। আবার হাত বেরুল, আবার সমস্ত শরীরটা এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর দুটো হাত বেরুল, আঁকড়ে ধরল খাদ্য-কণিকাকে। গ্রাস করে ফেলল তারপর। আবার এগিয়ে চলেছে। এঁকে বেঁকে তেবড়ে তুবড়ে যাচ্ছে শরীরটা। কিন্তু থামছে না। তাদের নিরন্তর গতি ব্যাহত হচ্ছে না কোথাও। মাঝে মাঝে বাধার পাহাড় আসছে সামনে, কিন্তু বাধা দিতে পারছে না তাকে, শরীরটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঠিক সে এগিয়ে যাচ্ছে। দুরন্ত কর্মী, এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। খাবার চাই, খাবার, আরও খাবার। তারপর কিছুক্ষণ পরে থেমে যায় সব। নড়ে না, মনে হয় যেন সমাধিস্থ হয়ে আছে। সৃষ্টির আদিতে ভগবান নাকি বলেছিলেন এক আমি বহু হব। এরা তা বলে কি না জানি না, কিন্তু এদের ওই এক দেহ থেকে বহুর জন্ম হয়। এ ভগবান নয়, অ্যামিবা। বাস স্বর্গলোকে বা মানসলোকে নয়, বিষ্ঠালোকে।…এরা যদি মানুষ হত তাহলে কি রকম হত তাদের সমাজ? এখন এদের যৌন-বোধ নেই, তখন কি থাকত? কি রকম হত এদের রাজনীতি? এদের মধ্যেও কি কবির জন্ম হত? আবির্ভাব হত বৈজ্ঞানিকের? যে বৈজ্ঞানিক আজ আকাশে উড়ে চাঁদের নাগাল পেতে চাইছে, এরাও কি তাই হত? সিনেমা থাকত কি এদের? ব্ল্যাক মার্কেট? খুন? রাহাজানি? কিন্তু এসব করে কি আমরা শান্তি পেয়েছি? শান্তি কোথায়? ডাক্তারি পাশ করে অনাহারে বসে আছি মাইক্রোসকোপের সামনে। কি লাভ হয়েছে? শান্তি কই?…শান্তি কই?…

জীবাণুবিদ ডাক্তার চিন্তামণি ধরকে যখন পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁর টেবিলের উপর উল্লিখিত লেখাটি পাওয়া গিয়েছিল।

তিনি পাগলা গারদে সমানে চেঁচাচ্ছেন, "আমি অ্যামিবা হব, অ্যামিবা হব,"—আর ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে অ্যামিবার মতো অঙ্গভঙ্গী করছেন।

ডাক্তার চিন্তামণি ধর সদ্বংশের সুশিক্ষিত সন্তান।

জ্যাঠাইমা

জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়ছে।

জ্যাঠাইমার সামনে খেতে বসলে আর রক্ষা ছিল না। কত রকম যে রান্না করতেন। উচ্ছে ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা, এমন কি মাঝে মাঝে লাউয়ের খোসা-ভাজাও। তাছাড়া সড়সড়ি, চচ্চড়ি, ডালনা, ছেঁচকি, সুক্তো। কি সুন্দর সুক্তই

যে রাঁধতেন। মাছের ঝোলও। কম মসলা দিয়ে তরকারির অমন স্বাদ আর কেউ বার করতে পারত না। নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

যখন স্কুলে পড়তাম, বোর্ডিংয়ে থাকতাম। রামকুমার ঠাকুরের অখাদ্য রান্না খেয়ে ছটা দিন কাটত। রবিবারটা জ্যাঠাইমার ওখানে মুখ বদলাতে যেতাম।

জ্যাঠাইমা আমার নিজের জ্যাঠাইমা নন। বাবার একজন বন্ধুর দাদার স্ত্রী। বাবা তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন, আমরা জ্যাঠাইমা বলতাম। সেই সুবাদে জ্যাঠাইমা।

কিন্তু নিজের জ্যাঠাইমা কি এর চেয়ে বেশী স্নেহময়ী হতেন? মনে হয় না।

সকালে উঠেই চলে যেতাম জ্যাঠাইমার বাড়ি। বাবা বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বলে দিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি আপত্তি করতেন না। রবিবারটা সমস্ত দিনই জ্যাঠাইমার কাছে থাকতাম।

গিয়েই প্রথমে স্নান করতে হত, সাবান মেখে। "ইশ, সারা গায়ে যে পলি পড়িয়ে রেখেছিস। দে তো ঝগড়ু, ভাল করে ঘষে ঘষে ময়লাগুলো উঠিয়ে দে তো।"

ঝাঁকড়া-গোঁফ-ওয়ালা চাকর ঝগড়ু বিশালকায় লোক। কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং স্নেহপ্রবণ।

"আবো, আবো, খোঁকাবাবু, ইধর আবো। নেই নেই, ওই সে নেই করো—"

বাঘের কবলে পড়লে ছাগ-শিশুর যে অবস্থা হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হত। সাবানের ফ্যানা চোখে মুখে নাকে কানে ঢুকে যেত, চোখ জ্বালা করত। কিন্তু ঝগড়ু না-ছোড়। সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গে সাবান না মাখিয়ে সে ছাড়বে না।

স্নান শেষ হলে তারপর মাথা-আঁচড়ানো পর্ব। সেটা জ্যাঠাইমা নিজে করতেন। তাঁর বিশেষ রকম ধারালো একটা সরু-চিরুনি ছিল। বাঁ হাত দিয়ে থুতনিটা চেপে ধরে সজোরে চালিয়ে যেতেন সেটা মাথার জটপাকানো চুলের ভিতর। মনে হত প্রাণ বুঝি এখনই বেরিয়ে যাবে।

"কি করে রেখেছিস মাথাটা? অ্যাঁ? একবারও কি চুলে হাত দিস না।"

আমি একটি কথাই বারম্বার বলতাম, "উঃ, বড্ড লাগছে, ছেড়ে দাও জ্যাঠাইমা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"পায়ে পড়তে আর হবে না। এই দেখ, কি জঞ্জাল পুরে রেখেছিলে মাথায়। নাও, মুখটা ওই তোয়ালেতে পুঁছে খাবে চল।"

খাওয়ার একটা মোটামুটি ফর্দ আগেই দিয়েছি। আমি কি কি ভালবাসতাম তা জ্যাঠাইমা জানতেন। মটর ডালের বড়া ভাজা, সেমুইয়ের পায়েস, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মাছের ফ্রাই—প্রতি সপ্তাহে এর কোনটা না কোনটা হতই। বোর্ডিংয়ে গিয়ে খাওয়ার জন্যে একটা ছোট জারে করে আচার দিয়ে দিতেন। একদিন গিয়ে দেখি লাড়ু করছেন। আমাকে বললেন, কিছু লাড়ু বোর্ডিংয়ে নিয়ে যা। ক্ষিধে পেলে খাবি। আমি বললাম, বোর্ডিংয়ে কি আমি একা খেতে পারি। আমার ঘরে চারজন ছেলে। জ্যাঠাইমা বললেন, তাতে কি হয়েছে, চারজনের মতোই নিয়ে যা। একটা পুঁটুলিতে কুড়িটা লাড়ু বেঁধে দিলেন।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, জ্যাঠাইমার সব দিকে নজর থাকত। আমার জামার বোতাম বসিয়ে দিতেন। কাপড় ছিঁড়ে গেলে নিজে হাতে শেলাই করে দিতেন।

অথচ জ্যাঠাইমা নিঃসন্তান ছিলেন না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল তাঁর। শুধু তাঁর নয়, তাঁর জায়েদেরও। তাছাড়া বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত লেগেই থাকত। সকলেরই সেবা করতেন জ্যাঠাইমা। একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সর্বদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরত। জ্যাঠাইমার একটু আদর, একটু মনোযোগ সকলেরই চাই। আর সেটুকু তিনি দিতেন সবাইকে। কারও নাকটা মুছিয়ে দিচ্ছেন, কাকেও জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, কারও গা থেকে বা ঝেড়ে দিচ্ছেন ধুলো।

জ্যাঠাইমা মাঝে মাঝে মনিহারীতে যেতেন আমাদের বাড়ি। কত জিনিস, কত রকম অবিশ্বাস্য জিনিস যে নিয়ে যেতেন, তার ঠিক নেই। নতুন কুলো, ধামা নানা আকারের, একঝুড়ি পাহাড়ী আম, আমচুসি, আমসত্ত্ব, কলা, নেবু—অর্থাৎ তখন হাতের কাছে যা পেতেন তাই নিয়ে যেতেন। কুলো আর ধামা প্রায়ই নিয়ে যেতেন, ওখানে যে হাট হত সে হাটের কুলো আর ধামার নাম ছিল। জ্যাঠাইমা আর একটা জিনিসও আনতেন—টোপা কুল। আর আতা। পাহাড়ী আতা।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে আর একটা স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। কাঁথা। এখন পুরোনো কাপড় অনেকে বিক্রি করে দিয়ে শৌখিন বাসনপত্র কেনেন। জ্যাঠাইমা তা দিতেন না। তিনি পুরোনো কাপড় জমিয়ে জমিয়ে কাঁথা তৈরি করতেন। কাঁথা করে বাড়ির জন্যে তো রাখতেনই, বিতরণও করতেন অনেককে। আমার কাছে তাঁর দেওয়া একটা কাঁথা বহু দিন ছিল।

আমি যেদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আসি সেদিন জ্যাঠাইমার বাড়িতে আমার স্পেশাল নেমন্তন্ন হয়েছিল। আমি যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি, এটা যেন তাঁরই বিশেষ কৃতিত্ব। সকালে যখন গেলাম আশা করেছিলাম জ্যাঠাইমার হাসি-মুখ দেখব। গিয়ে কিন্তু দেখলুম, তিনি কাঁদছেন। আমাকে দেখে তাঁর কান্না যেন আরও উথলে উঠল। আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর ভাঙাগলায় বললেন, "কালই তো তুই চলে যাবি। তোকে আর তো দেখতে পাব না বাবা। জ্যাঠাইমাকে মনে থাকবে তো ?"

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, থাকবে।

কিন্তু থাকে নি।

দুই

পরবর্তী জীবনে আমাকেও নানা উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। আই. এস্‌-সি. পড়তে পড়তেই কঠিন অসুখে পড়ি। সেরে উঠতে প্রায় ছ মাস লাগল। তারপরই আমার বাবা মারা গেলেন। আমিই বড় ছেলে, সংসারের ভার আমার ঘাড়ে পড়ল। নিজের পড়া বন্ধ করে প্রাইভেট ট্যুশনি করে সংসার চালাতে লাগলাম। বাবা বড় চাকরি করতেন, তাঁর প্রফিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা যখন হাতে এল তখন অর্থাভাব খানিকটা ঘুচল। আমি আবার পড়া আরম্ভ করলাম। বি. এস্‌-সি. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপদ। প্রেমে পড়ে গেলাম। সাধারণ প্রেম নয়, গভীর পাকা প্রেম। মেয়েটিকে বিয়ে করতে হল। অসবর্ণ বিবাহ। মা বউকে বাড়িতে নিলেন না। আমার পড়ার খরচও বন্ধ হল। এই সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটা নামজাদা

মাসিক পত্রিকায় আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়ে গেল এবং তা বহু রসিকজনের প্রশংসা লাভ করল। বায়রনের যেমন হয়েছিল, আমারও তেমনি হল অনেকটা—

I rose one morning and found myself famous :—

এর পর আর কলেজে না গিয়ে মাসিকপত্রের আপিসগুলিতে যাতায়াত শুরু করলাম। পসার জমে গেল, আয়ও হতে লাগল কিছু কিছু। মনে শান্তি ছিল না কিন্তু। আমার যে ছেলেটি হয়েছিল, সেটি পোলিও রোগে আক্রান্ত হল। তাকে নিয়ে বোম্বে গিয়ে থাকতে হল অনেকদিন। তবু বাঁচল না সে। শোকার্ত হয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। আমার স্ত্রী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। দু হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে যন্ত্রণাহত পশুর মতো চীৎকার করত। ঘুমের ঘোরেও বিড়বিড় করে বলত—মায়ের অভিশাপ, মায়ের অভিশাপ। সে ও শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। এই সব নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে ফেললাম একটা। খ্যাতি আরও বাড়ল। টাকার অভাব রইল না, কিন্তু মনের শান্তি ছিল না একেবারে। দ্বিতীয় বার বিয়ে করলাম। এইসব সাংসারিক ঝঞ্ঝাট তো ছিলই, সাহিত্যিক জীবনের ঝঞ্ঝাটও কম ছিল না। যাঁরা বড় শহরে সাহিত্যিক আবর্তের মধ্যে আছেন তাঁদের অবিদিত নেই যে সে-জীবনের জটিলতাও কিছু কম নয়। রসের বাজারেও 'তেজী মন্দী' আছে, সেখানেও নানারকম চক্রান্ত সর্বদা ওত পেতে থাকে, সেখানেও প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে হানা দিয়ে না বেড়ালে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় না। সেখানেও স্থানে স্থানে 'চণ্ডীমণ্ডপ' আছে এবং সাহিত্যিকরাও নিছক পর-নিন্দা পর-চর্চা করে থাকেন সেখানে। এই সাহিত্যিক সমাজেও প্রচ্ছন্ন শত্রুর সংখ্যা কম নয়। যিনি নমস্কার করে হেসে হেসে আপনার সঙ্গে কথা কইছেন, তিনি যে একটু আগেই আপনার শ্রাদ্ধ করছিলেন, তা প্রথম প্রথম বোঝা যায় না। কিন্তু একটু অভিজ্ঞতা হলেই যায়। সাহিত্য-সমাজেও রাজনীতি আছে এবং সে-রাজনীতির দাবা খেলায় স-মনস্ক না থাকলে অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়।

এই সব নিয়েই ছিলাম।

জ্যাঠাইমার কথা মনে ছিল না।

তিন

প্রায় পঁচিশ বছর পরে।

নবীনগঞ্জ কলেজে এক সাহিত্যিক সভায় সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ পেলাম। নবীনগঞ্জেই আমার স্কুল জীবন কেটেছে, সেইখানেই জ্যাঠাইমা ছিলেন। খবর পেয়েছিলাম জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর কৃতী ছেলেরা জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেদের। নবীনগঞ্জ শহরও বদলে গেছে। পিচ ঢালা রাস্তা, নিওন লাইট, বড় বড় নূতন বাড়ি, সে নবীনগঞ্জকে আর চেনবার উপায় নেই।

যেসব লোকজনকে দেখলাম তাদের মধ্যে পুরোনো চেনামুখ একটাও দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম সভা শেষ হলে কোনও পুরোনো লোককে খুঁজে পুরোনো দিনের কথা আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু সভার কর্মসূচী এত দীর্ঘ যে সভা শেষ হতে প্রায় রাত্রি দশটা বেজে গেল। আমার অভিভাষণটাও বেশ লম্বা হয়েছিল।

যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা একটা হোটেলে করেছেন। আমার ট্রেন রাত বারোটায় ছেড়ে যায়, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে হোটেলের দিকে অগ্রসর হলাম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হোটেল। কলেজের প্রিন্সিপাল বললেন, 'এখানে সব রকম খাবার পাওয়া যাবে। ওরা মেনুটা দিয়ে যাচ্ছে, আপনি কি কি খাবেন দাগ দিয়ে দিন। বিলটা আমরা দিয়ে দেব।' মেনু এল। পোলাও পাঁচ টাকা প্লেট, ভাত দু' টাকা, রুটি প্রত্যেকটি চার আনা, ফাউল কাটলেট্ প্রতিটি দেড় টাকা, মটন কাটলেট প্রতিটি বারো আনা, মাংস এক প্লেট দু' টাকা, মুর্গির মাংস এক প্লেট চার টাকা, নিরামিষ তরকারি প্রতি প্লেট আট আনা। পুডিং এক প্লেট দু' টাকা। আরও নানারকম খাবারের ফর্দ ছিল। আমি কয়েকটাতে দাগ দিয়ে দিলাম।

খেতে খেতে একটি ছোকরাকে বললাম, "এই পাড়াতেই বোধ হয় আমার জ্যাঠাইমার বাড়ি ছিল—সেটা কোথায় বলতে পার?"

ছোকরা বললে, "আপনার জ্যাঠামশায়ের নাম কি বলুন তো—"

"যোগেন মুকুজ্যে—"

"এইটেই তো তাঁর বাড়ি। তাঁর ছেলেরা বিক্রি করে দিয়েছিল। সে বাড়ি ভেঙে-চুরে এই পাঞ্জাবীরা হোটেল করেছে এখানে—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

জ্যাঠাইমার বাড়ি হোটেল হয়েছে!

এখানে প্রত্যেক খাবারের জন্যে দাম দিতে হয়!

"খাচ্ছেন না যে—"

"না, আর খাব না, পেট ভরে গেছে।"

হারিয়ে গেছে

প্রথমেই চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় এলাম! মাথার উপর নীল গলির মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি! সামনে সবুজ থামের মতো। রঙীন ওই জিনিসটা কি, উড়ছে,...অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সে। এ কোথায় এলাম!

তারপরই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কোট-প্যাণ্ট-পরা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, ঘন ভ্রূ, তাতেও পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। গোঁফ দাড়ি কামানো। বেশ বলিষ্ঠ ভারী মুখ। গম্ভীর রাশভারী চেহারা। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো চেহারা মোটেই নয়। সবাই ভয়ই করে তাঁকে। জেলা-জজ তিনি।

এর কিন্তু মনে হল ও তার খেলার সাথী হবে বোধ হয়। চোখাচোখি হলেই ছুটে আসবে তার কাছে।

জজ সাহেব কিন্তু দেখতেই পেলেন না তাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্রাশ চালাতে লাগলেন। তারপর 'টাই'টা বাঁধতে লাগলেন নানা মুখভঙ্গী করে।

ঝন ঝন ঝন ঝন করে ফোনটা বেজে উঠল।

"হ্যালো, কে—ও মিস্টার বোস, গুডমর্নিং—"

"হ্যাঁ আজ সেই ফাঁসির কেসটার রায় বেরুবে। কি হবে তা আগে থেকে বলতে পারব না। মাপ করবেন।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভ্রুকুটিকুটিল মুখে চাপা কণ্ঠে বললেন, "পাজি কোথাকার।"

সে অবাক হয়ে ভাবছিল—ও বাবা, এ যে বড্ড রাগী দেখছি। আমার সঙ্গে ভাব হলে কিন্তু অত রাগ চলবে না, সে আমি ঠিক করে নেব।

সে আশা করতে লাগল চোখাচোখি হলেই ওর সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে। ও, ওই গম্ভীর জজটা, তখন খেলা করবে তার সঙ্গে। ও কে? ওকে কি দেখেছি কখনও? ভাবতে লাগল সে। তারপর অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্নের একটা ছবি জেগে উঠল মনে। একটি বালক পল্লীর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি ছোট ফুল দেখে সবিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ল—কি সুন্দর! এ কি সেই ছেলেটি? হ্যাঁ, সেই ছেলেটিই। সব মনে পড়ে গেল তার।

"হুজুর, মোটর স্টার্ট নেহি লেতা।" চাকরটি সেলাম করে এসে খবর দিলে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন জজ সাহেব: "ওই নতুন ড্রাইভারটাকে দূর করে দাও। জমীরকে ডেকে আন—"

চাকরটি সেলাম করে চলে গেল। এইবার জজ-সাহেব জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। চোখাচোখি হল।

"নকু, নকু, নকু—"

বজ্র-গর্জনে চেঁচিয়ে উঠলেন জজ-সাহেব।

চাকর নকু এসে দাঁড়াল।

"জানলার কোণে জঙ্গুলে গাছ জন্মেছে, দেখতে পাও না? পরিষ্কার করে দাও এক্ষুণি।"

নকু ফুল সুদ্ধ বুনো গাছটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

ফ্লু

প্রথমে মাথাব্যথা থেকে শুরু হল। তারপর পর পর কয়েকটা হাঁচি। হেঁচে মাথাটা পরিষ্কার হল না। রগের কাছে আর দুই ভ্রুর মাঝখানে ব্যথা আরও জমে বসল যেন। অসহায় বোধ করতে লাগলাম। জানি কোনও উপকার হবে না তবু নস্যি নিলাম। আবার হাঁচ। এবার তপতী এল। মনে হল যেন আরাম পেলাম একটু। রোদও ঢুকল একটু জানলা দিয়ে। পড়ল তপতীর শাড়ির লাল পাড়ে আর গালের উপর। মনে হল আমার মনের আকাশও একটু রঙীন হয়ে উঠল যেন।

"আপনি হাঁচছেন কেন বারবার ? কি হল ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটা বড় ব্যথা করছে।"

নিজের হাত দিয়েই রগ দুটো টিপে ধরলাম।

"আমি টিপে দেব ?"

"না থাক, তোমাকে আর কষ্ট দেব না।"

একটু হেসে তপতী বললে—"এতে আর কষ্টের কি আছে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব ভাল মাথা টিপতে পারি। দাদারও মাথা ধরে মাঝে মাঝে। আমি মাথা টিপে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। নিন, শুয়ে পড়ুন। চোখ বুজে থাকতে হবে। অমন করে চেয়ে আছেন কেন ?"

শুয়ে চোখ বুজলাম।

তপতী মাথা টিপতে লাগল।

বিকেলবেলা বেশ জ্বর হল।

তপতীই টেম্পারেচার নিয়ে বললে—"বেশ জ্বর হয়েছে আপনার। প্রায় ১০৩-এর কাছাকাছি। ডাক্তার ডাকবেন ? কে আপনার ডাক্তার ?"

ডাক্তারের নাম আর ফোন নম্বর বলে দিলাম।

তপতী পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করতে লাগল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। তপতীর গলার স্বর যেন কাকাতুয়ার স্বরের মতো। মানসচক্ষে তার মাথার উপর একটা ঝুঁটিও যেন দেখতে পেলাম, ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছে উত্তেজনাভরে আর তার ভিতর দেখা যাচ্ছে গোলাপী রঙের আভা। অত কি কথা কইছে ডাক্তারের সঙ্গে! আলাপ আছে নাকি! হাসছে মাঝে মাঝে!

"না না, আমি এমনিই বেড়াতে এসেছি। উনি আমার দাদার বন্ধু তো। ওঁর মা ? ভালই আছেন। তবে উনি তো চোখে দেখতে পান না, কানেও শুনতে পান না। হ্যাঁ, মায়ের দাই আমি আসবার আগেই ফিরে এসেছে। তা না হলে তো আমি মহা মুশকিলে পড়ে যেতুম। ছটুকু চাকরটা অবশ্য খুব কাজের।" অকারণে আবার একটা কথা মনে হল। বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বর কেমন ?

তপতী ফিরে এসে বললে—"ডাক্তারবাবু একটু পরেই আসছেন। লোকটিকে বেশ ভালই মনে হল। মায়ের খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, এই শীতেই ওর ছানি কেটে দেবেন। আচ্ছা, ওর কি বিয়ে হয়েছে ? আমার বন্ধু রুণুর একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাঁর নামও অমৃত সেন।"

"না, এঁর বিয়ে হয় নি।"

পাশ ফিরে শুলাম। রগের শির দুটো দপ দপ করতে লাগল। মনে হল সর্বাঙ্গ যেন কে চিবুচ্ছে।

ডাক্তার সেন একটু পরে এলেন।

বললেন, "ফ্লু হয়েছে। একটা মিকচার দিয়ে যাচ্ছি। চার ঘণ্টা অন্তর খাবেন। আর তিন দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। কম্‌প্লিট রেস্ট।" তারপর তপতীর দিকে

চেয়ে হেসে বললেন, "আপনিও আপনার রুমালে ইউক্যালিপটাস ছড়িয়ে নিন। শুঁকবেন মাঝে মাঝে, রোগটা ভারি ছোঁয়াচে।"

মনে হল ডাক্তার সেন একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে চাইলেন তপতীর দিকে।

ভাই সমর,

তপতী দার্জিলিং থেকে তোমাদের ওখানে গেছে। ওকে তোমার কেমন লাগছে? বুঝতেই পারছ কেন একথা লিখছি। বোনটিকে সৎপাত্রে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু সৎপাত্র কোথায়? কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখ ভাই। ইতি—

নরেন

চিঠি নয়, স্বপ্ন। এ রকম স্বপ্ন দেখার মানে?

মাথাটা আবার টিপ টিপ করছে।

"ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু।"

মাথা দুলিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল তপতী।

নিপুণভাবে ওষুধটি শিশি থেকে ঢেলে নিপুণভাবে খাইয়ে রঙীন তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিলে।

বড় দুর্বল বোধ করছি।

সন্ধ্যার পর গলার ভিতরটা যেন কুটকুট করতে লাগল।

"তপতী—"

"কি?"

"না, থাক—"

"কি বলুন না?"

"গলার ভিতরে টর্চ দিয়ে দেখবে? বড্ড কুটকুট করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে—থাক, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে।"

"না না, তাতে কি। আমার কিছু হবে না। কিন্তু দেখে আমি কিছু বুঝব কি! আচ্ছা দেখছি—"

টর্চ নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ দেখল তপতী।

"লাল দেখছি কেবল—"

"লাল?"

হঠাৎ কেমন যেন একটা প্রেরণা পেলাম।

"মেণ্ডলস্ পিগমেণ্ট গলায় লাগিয়ে দাও তো। ও ঘরের তাকে আছে শিশিটা। ছোট্ট শিশি।"

একটি চমৎকার তুলি বানিয়ে নিয়ে এল তপতী।

"হাঁ করুন। পিছন দিকের লাল জায়গাটায় লাগিয়ে দেব তো?"

"হ্যাঁ, ভিতরের দিকে। যেখানে খুশি লাগাও—"

নিজেরই মনে হল কথাগুলো অসংলগ্ন হচ্ছে।

সত্যিই বেশ ভাল করে লাগিয়ে দিলে পিগমেণ্টটা।...বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

তার পরদিন সত্যিই নরেনের চিঠি এল।

ভাই সমর,

তপতীকে চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দাও। তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। জামা কাপড় গয়না কেনার সময় তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কোনমতেই যেন ওখানে আর দেরি না করে। ভালবাসা জেনো। মাকে প্রণাম দিও।

—নরেন

পরদিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাথা গলা বুক সব পরিষ্কার।

কোথাও ব্যথার লেশ নেই।

যাবার সময় তপতী যখন প্রণাম করতে এল—বললাম, "আশীর্বাদ করি সুখী হও।"

চুলুহা

আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের মনিহারীর বাড়িতে চুলুহা নামে এক চাকর ছিল। তাহার প্রবল প্রতাপে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। এমন কি চোরেরা পর্যন্ত। ইহার কথা অন্য কোথাও লিখিয়াছি কিনা মনে নাই। লিখিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই, মহাপুরুষদের জীবনী একাধিক বার লেখা চলে।

চুলুহাকে মহাপুরুষ বলিতেছি কারণ সে শক্তিমান ছিল। একবার একটা চোর আমাদের বাড়িতে ধরা পড়ে। চুলুহা তাহার বাঁ পা ধরিয়া বনবন করিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহাকে ফেলিয়া দিল তখন সে রক্তবমি করিতেছে। বাবা ভয় পাইয়া গেলেন।

"এ কি করলি চুলুহা, যদি মরে যায়?"

"মরে যায়, পুঁতে দেব। কিন্তু ও শালা মরবে না। ও আমার ভাই মুলুক, বাড়ি থেকে পালিয়েছিল অনেক দিন আগে। ওর মোড়া কাল দেখেই চিনেছি ওকে।"

মুলুক মরে নাই। দুই একদিন আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া আবার সরিয়া পড়িয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে আমাদের বাড়িতে আর চোরের উপদ্রব হয় নাই।

লম্বা চওড়া বিশাল চেহারা ছিল চুলুহার। এক সের চালের ভাত খাইত। আধ সের ছাতু জলখাবার। আমাদের চাষের জমিতে চুলুহা কাজ করিত। মাটি কোপাইত, লাঙল দিত, জঙ্গল পরিষ্কার করিত, পাহারা দিত। বাবা খুব ভালবাসিতেন চুলুহাকে। ভালবাসিতেন তাহার সরলতার জন্য।

একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বাহিরে দুইজন ভদ্রলোক অতিথি আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া বাবার সহিত গল্প করিতেছেন। চুলুহা বাড়ির ভিতর ছিল। মা তাহাকে বলিলেন, "দাঁড়া, খাবার দিচ্ছি, বাইরে যে দু'জন বাবু এসেছেন তাঁদের দিয়ে আয়।"

মা দুটি প্লেটে করিয়া হালুয়া দিলেন।

একটু পরেই চুলহা খালি প্লেট দুটি লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"মাইজি, আবার দিন—"

"আরও চাইছেন ওঁরা ?"

"না, ও দুটো আমি খেয়ে ফেলেছি। বড় লোভ লাগল। লোভ-লাগা জিনিস কি কাউকে দিতে আছে ? পেটের অসুখ করবে যে।"

"তুই কি কুকুর না কি। যা পাবি সামনে খেয়ে ফেলবি ?"

"হাঁ, আমি কুকুরই তো। বুল ড—গ।"

চোখ বড় বড় করিয়া ব্যায়ত আননে সে বুলডগের অভিনয় করিল। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে এক ভদ্রলোক ভীষণদর্শন একটা বুলডগ লইয়া আসিয়াছিলেন।

"বেরো মুখ-পোড়া, বেরো তুই—"

চুলহা কিন্তু নড়িল না।

"আর খাব না। কান মলছি।"

সত্যই সে নিজের কান দুইটা ধরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চুলহার আর একটা ছবি মনে পড়িতেছে। সেদিন আমাদের বাগান পরিষ্কার করানো হইতেছিল। বাগান আমাদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে। একটু পরে দেখিলাম দুইটা প্রকাণ্ড কলাগাছ আমাদের বাড়ির দিকে চলিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে দেখিলাম তিনটা। আরও কাছে আসিলে দেখা গেল কলাগাছ তিনটার মধ্যে চুলহা রহিয়াছে। সে একটা কলাগাছ পিঠে দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছে এবং দুইটাকে বুকের উপর জাপটাইয়া ধরিয়া আছে। সেই অবস্থায় সে সোজা বাড়ির সামনে গিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"মাইজি, থোড় এনেছি—"

মা বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওকি, কেটে আনতে পারিস নি ? গন্ধমাদন বয়ে এনেছিস। হনুমান কোথাকার !"

চুলহা মহানন্দে খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

চুলহা টাইট জিনিস পরিতে ভালবাসিত। হাটে যখন গেঞ্জি কিনিত তখন সবচেয়ে যে গেঞ্জিটা তাহার টাইট হইত সেইটাই কিনিত সে। অনেক সময় গেঞ্জি পরিয়া সে ভাল করিয়া হাত নামাইতে পারিত না। গেঞ্জি বেশীদিন টিঁকিত না। কিন্তু চুলহা তাহা গ্রাহ্য করিত না। জুতাও তাই। মহিষের চামড়ার টাইট জুতা কিনিয়া রেড়ির তেলে ভিজাইয়া রাখিত এবং মাঝে মাঝে পা ঢুকাইয়া দেখিত অবাধ্য জুতা শায়েস্তা হইয়াছে কি না।

প্রতিদিন দেখিত আর খিক্ খিক্ করিয়া হাসিত। চুলহা মাকুন্দ ছিল, তাহার হাসি শিশুর হাসি বলিয়া মনে হইত।

তাহার পর চুলহা একদিন অন্তর্ধান করিল।

সকলে বলিল সে বেশী রোজগারের আশায় অন্যত্র গিয়াছে। সম্ভবত কোন বড় শহরে বা বন্দরে।

দুই

পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু সুখ হারাইয়াছি। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, চাকরি নাই। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শহরের একটা গলিতে একতলা একটা নোংরা বাসায় বাস করি। আমার স্ত্রী একাধারে চাকর-চাকরানী রাঁধুনী ও ধোপানীর কাজ করে। আর আমি আমার ডিসপেনসারিতে প্রত্যহ গিয়া ভ্যারাণ্ডা ভাজি। রোগী কখনও জোটে কখনও জোটে না। এ অবস্থায় সকলের সাধারণত যাহা হয় আমারও তাহাই হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহাকে হাত দেখাইতাম, জানিতে চাহিতাম ভাগ্যোদয় কবে হইবে। অনেক সাধু অনেক রকম আশ্বাস দিত, একটাও ফলিত না।

"ব্যোম্ ভোলানাথ, কুছ মিলে বাবা—"

রোগা লম্বা আবক্ষ-গোঁফদাড়ি সমন্বিত জটাজুটধারী এক সাধু আসিয়া হাজির হইল একদিন। গায়ে আলখাল্লা।

"কুছ্ ভিক্ছা মিলে বাবা—"

"হাত দেখে যদি কিছু বলতে পার, দেব কিছু। হাত দেখতে জান?"

"জানি।"

সাধু ভিতরে আসিয়া গম্ভীরভাবে বসিল এবং আমার করতল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর কপাল দেখিল। বাল্যকালে সুবোধ বালক ছিলাম না, কপালে একটা কাটা দাগ ছিল।

"ই দাগ কেইসা হুয়া?"

বলিলাম ছেলেবেলায় আমাদের চুলুহা বলিয়া একটি চাকর ছিল। সে আমাকে দুই হাতে তুলিয়া ছুঁড়িয়া দিত, তাহার পর লুফিয়া লইত। একদিন আমারই দোষে হাত ফসকাইয়া গিয়াছিল, কারণ আমি নিজেই লাফাইয়া নামিব ঠিক করিয়া অন্যদিকে লাফ দিয়াছিলাম। মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাই, কপাল কাটিয়া যায়।

সাধু বলিল, "খুব শুভ লছ্ছন্। আপকা আজই কুছ রুপিয়া মিল যায়েগা।"

তাহার পর সাধু জিজ্ঞেস করিল—আমার বিবাহ হইয়াছে কি না। সন্তানাদি কয়টি।

বলিলাম, "মাত্র এক বছর বিয়ে হয়েছে। ছেলেপিলে হয় নি এখনও।"

সাধু বলিল সে আমার স্ত্রীরও হাত দেখিতে চায়। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি লইয়া গেলাম। বাড়ির বাহিরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া ভিতরে গেলাম স্ত্রীকে খবর দিতে।

দেখিলাম স্ত্রী তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া মসলা পিষিতেছেন।

সংক্ষেপে বলিলেন, আমার এখন মরবার সময় নেই। ওসব সাধু-ফাধুদের উপর আমার বিশ্বাসও নেই।"

স্ত্রীর কথায় বিস্মিত হইলাম। ইহারাই ভারতের নারী! সাধুতে বিশ্বাস নাই!

বাহিরে আসিয়া আরও বিস্মিত হইতে হইল। দেখি জটা দাড়ি-গোঁফ আলখাল্লা সব খুলিয়া রাখিয়া টাইট-গেঞ্জি-পরা একটা লোক বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"আমি চুলহা। আমাকে চিনতে পারিস নি তো!"

"চুলহা! কোথায় ছিলি এতদিন!"

সাধু হয়ে ঘুরছিলাম। অনেক টাকা কামিয়েছি। সব তোকে দেব। ভাল করে একটা ওষুধের দোকান কর। আমি বাকি জীবনটা তোর কাছেই থাকব।"

তাহার পর আমার মুখের দিকে মিটি মিটি চাহিয়া বলিল, "ভাবছিস, এই রাক্ষসকে খাওয়াবো কি করে? আজকাল খেতে পারি না। একবেলা খাই—চারটি রুটি আর ডাল। নিজের হাতে বানিয়ে নেব।"

বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

চুলহা আমার কাছে বহুদিন ছিল। ঘরের সব কাজ করিত। তাহার দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা দিয়া বড় ডিসপেনসারি করিয়া সত্যই আমার অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কাল সে মারা গিয়াছে। মনে হইতেছে দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম।

জন্মান্তর

অলকাপুরীর আদুরে আর খামখেয়ালী রাজকুমারের মনে সুখ নেই। সে যে কি চায়, কি পেলে যে তার সুখ হবে তা সে নিজেও জানে না। কেবল খুঁতখুঁত করে। ঐশ্বর্যের অভাব নেই, বিলাস অফুরন্ত, কিন্তু তবু তার মনে হয় কি যেন নেই যার অভাবে সবই ফিকে হয়ে গেছে।

কি সে জিনিস? ধরতে পারে না রাজকুমার।

রোদের আলো-ঝলমল পোশাক দুদিন পরেই খারাপ লাগে, তখন তৈরী হয় জ্যোৎস্নায় তৈরী নূতন পরিচ্ছদ। তা-ও পুরনো হয়ে যায় কয়েকদিন পরে।

তাদের বাগানে পারিজাত ফোটে, ফোটে আরও অসংখ্য রকমের ফুল, গান করে বিচিত্রবর্ণ অনেক পাখি, তাদের অপূর্ব গানে ঝংকৃত হয় ঝরনার আনন্দ। স্বর্গের অপ্সরীরা খেলা করতে আসে রাজকুমারের সঙ্গে। তাদের রূপ, তাদের হাসি, তাদের লীলায়িত নৃত্য-ভঙ্গী চমৎকার। তাদের কেউ যেন প্রজাপতি, কেউ রঙিন ফানুস, কেউ অপরূপ-কান্তি ভ্রমর। দুদিন পরেই কিন্তু রাজকুমার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কিছু ভালো লাগে না তার। ম্রিয়মাণ হয়ে ভাবে—সবই একঘেয়ে। কতদিন এসব আর ভালো লাগে।

রাজকুমারের পরিচারক সহচর ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাজকুমারের মলিন মুখ দেখে। চেষ্টা করে তাকে নূতন পরিবেশে নিয়ে যেতে। নূতন রকম গান, নূতন রকম দৃশ্য, নূতন কিছু করবার চেষ্টা করে সে। কিছুদিন কুমারের মনের প্রসন্নতা ফিরে আসে। কিন্তু তা বরাবর থাকে না। আবার সে যেন কেমন উদাস হয়ে যায়।

একদিন সে নদীর তীরে বসে আকাশের দিকে চেয়েছিল। পাশে সহচর বসে বাঁশিতে বাজাচ্ছিল একটা মন-মাতানো সুর। সুরটা নূতন ধরনের। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে রাজপুত্র শুনছিল সেই সুর। খুব ভাল লাগছিল।

"কোথায় এ সুর শিখলে সহচর ? চমৎকার তো।"

"পার্বতী পাহাড়ে এক কিন্নর আছেন। তিনিই শিখিয়েছেন ”

"চমৎকার !"

বাঁশি থামিয়ে সহচর বললে, "তিনি সাধারণ কিন্নর নন, তিনি সাধক। তাঁর গানে পাথর গলে জল হয়। তিনি গান গেয়ে পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করেন, ফুলও তাঁর গান শুনে পাখি হয়ে যায়। অদ্ভুত গুণী।"

হঠাৎ রাজকুমার বলে ওঠে, "দেখ দেখ, আকাশে কি কাণ্ড হচ্ছে !"

সহচর চোখ তুলে দেখল আকাশে বিরাট একটা মেঘের প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। সাত মহলা প্রাসাদ। বড় বড় খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিনারেট সব আছে তাতে।

রাজকুমার বললে, "আমাদের স্ফটিকের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ। আহা, আমি যদি ওই রকম মেঘের প্রাসাদে বাস করবার সুযোগ পেতুম।"

মেঘের প্রাসাদ ক্রমশ রূপ বদলাতে লাগল। তার গম্বুজ, মিনার, মিনারেটগুলো যেন বেঁকে বেঁকে যেতে লাগল ক্রমশ। দেখতে দেখতে সেগুলো হয়ে গেল ঠিক হাতির শুঁড়ের মতো। প্রাসাদ গেল মিলিয়ে, মনে হতে লাগল একদল বিরাট বিরাট হাতি যেন জড়াজড়ি করে শুঁড় তুলে আনন্দ করছে। হাতির দলও রইল না। ক্রমশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব। খানিকটা হল প্রকাণ্ড হাঁস, খানিকটা কুমীর, কিছু কিছু অংশ টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল নীল আকাশে বরফের দ্বীপের মতো। খানিকটা হয়ে গেল পেঁজা-তুলোর বিরাট স্তূপ।

সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রাজকুমার। তার মন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল মেঘের সঙ্গে। তারপর সে সহচরের দিকে ফিরে বলল, "ভাই, মানুষ হয়ে সুখ নেই। মেঘ হয়েই সুখ।"

"কেন ?"

"মেঘ কেমন বদলাতে পারে। প্রাসাদ থেকে হাতির দল হয়ে যেতে পারে অনায়াসে। তারপর হাঁস, কুমীর—কত কি। আহা, যদি মেঘ হতে পারতুম ! নিস্তার পেতাম এই একঘেয়ে জীবন থেকে।"

তারপর হঠাৎ সে উঠে বসল। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সহচরের মুখের দিকে।

"তুমি এখনি বললে না পার্বতী পাহাড়ের সেই কিন্নর গান গেয়ে পাথরকে জল করে দেয়। পাখিকে ফুলে রূপান্তরিত করে। সে কি আমাকে মেঘ করে দিতে পারবে ?"

"তা তো জানি না। খামখেয়ালী মানুষ, কি করবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত।"

"চল এক্ষুনি যাই তাঁর কাছে।"

আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল রাজকুমার।

"এখন ? তিনি থাকেন পার্বতী পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা গুহার ভিতর। গুহার সামনে খানিকটা জায়গা আছে, সেইখানে এসে বসেন মাঝে মাঝে আর গান করেন। এখন গেলে সেখানে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তোমার বাবা মা ভাববেন না ?"

"মা বাবাকে একটা খবর দিয়ে যাই চল। মল্লিনাথকে বলে যাই আমরা শিকারে বেরুচ্ছি, ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে, বাবা মা যেন না ভাবেন।"

মল্লিনাথ বাগানের মালী।

তাই হল। তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে পার্বতী পাহাড়ের উদ্দেশে

দুই

পার্বতী পাহাড়ে ওঠা সহজ নয়। সোজা খাড়াই ভেঙে উঠতে হয় পাথর আঁকড়ে আঁকড়ে। পায়ে চলার পথ নেই, কারণ পার্বতী পাহাড়ে কেউ ওঠে না। যে কিন্নর ওখানে থাকেন তাঁর ভয়ে কেউ যায় না সেখানে। পাহাড়ের আশে-পাশে কয়েকটা পাহাড়ী ছাগল দেখা যায়। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। বেশ বলিষ্ঠ বড় ছাগল। জনশ্রুতি ওরা নাকি মানুষ ছিল, কিন্নর ওদের ছাগল করে দিয়েছেন। ওরা আগে ডাকাত ছিল, ছাগল হয়ে ওদের স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন বেশ শান্তশিষ্ট।

কিছুদূরে উঠে রাজকুমার আর সহচর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। হাত পা আর যেন চলছে না। দুজনে দুটো পাথরের উপর বসে হাঁপাতে লাগল। আশ্চর্য, একটু পরেই দুজনের কাছে দুটো ছাগল এসে দাঁড়াল। বেশ বলিষ্ঠ এবং বড়, প্রায় টাট্টু ঘোড়ার মতো। তারা এসে কাছে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল তাদের দিকে। যদিও কথায় তারা কিছু বলল না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? আমাদের পিঠে চড় না। পেঁৗছে দেব তোমাদের কিন্নরের কাছে।"

রাজকুমার এবং সহচর চাইল পরস্পরের দিকে। দুজনের মনেই ছাগলদের নীরব আমন্ত্রণ পেঁৗছেছে বোঝা গেল। কালবিলম্ব না করে ছাগল দুটোর পিঠে চড়ে বসল দুজনে।

পার্বতী পাহাড়ের শিখরের কাছে যখন পেঁৗছল তারা, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা সবিস্ময়ে দেখল যে গুহাটার ভিতর কিন্নর থাকেন সেই গুহাটার ভিতর থেকে আলো বেরুচ্ছে। আলো আর গান। গানই অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলেছে যেন। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু গুহার সামনে স্বচ্ছ দিনের আলো। ছাগল দুটো গুহার একটু দূরেই নামিয়ে দিল তাদের। গুহার খুব কাছাকাছি আর গেল না তারা। সম্ভবত যাওয়ার সাহস হল না।

তিন

গুহার সামনে গিয়ে রাজকুমার আর সহচর সেই আলোকিত স্থানটায় চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার-গলানো অদ্ভুত সুর ভেসে আসছে ভিতর থেকে। কখন যে তাদের চোখ বুজে গেছে, কখন যে তারা কৃতাঞ্জলি হয়েছে তা তারা নিজেরাই জানে না।

অনেকক্ষণ পরে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হল, "কে তোমরা, কি চাও?"

রাজকুমার চোখ খুলে দেখল সৌম্যকান্তি এক দিব্যপুরুষ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, পদ্মপলাশ নয়ন থেকে করুণাময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সমস্ত শরীর থেকে বেরুচ্ছে অপরূপ আলোর জ্যোতি। এই অনবদ্য আবির্ভাবের দিকে চেয়ে রাজকুমার রুদ্ধবাক্ হয়ে গেল।

সহচর বললে, "প্রভু, ইনি অলকাপুরীর রাজকুমার। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও এঁর জীবনে কোন সুখ নেই। তাই ইনি মেঘ হতে চান। এঁর বিশ্বাস সতত পরিবর্তনশীল মেঘরূপে ইনি জীবনের পূর্ণ স্বাদ পাবেন।"

কিন্নর বললেন, "বেশ। মানুষকে মেঘে পরিণত করতে হলে প্রথমে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে হয়। আমি মন্ত্রবলে বাঘকে ডাকছি, সে আগে তোমাদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করুক। তারপর আমি তার থেকে মেঘ সৃষ্টি করব।"

এই বলে তিনি শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে এক স্তব আওড়াতে লাগলেন গম্ভীর কণ্ঠে। স্তব থামতে না থামতেই এক বিরাটকায় ভীষণ বাঘ এসে সামনে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে ছুটে পালাল সহচর। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বাঘের মুখে পড়তে হবে তা সে ভাবে নি।

রাজকুমার কিন্তু নড়ল না। স্থির হয়ে বসে রইল সে।

কিন্নর বললেন, "বাঘের মুখে নিজেকে সমর্পণ কর।"

"আমি প্রস্তুত হয়েই আছি, বাঘকে আদেশ দিন সে আমাকে ছিন্নভিন্ন করুক।"

হঠাৎ কিন্নর হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। বাঘ অন্তর্ধান করল।

তখন তিনি কুমারকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার সাহস দেখে খুশী হয়েছি। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। তুমি পদ্মাসনে ভাল করে বসে মেঘের চিন্তা কর। আমি গান গাইছি।"

রাজকুমার পদ্মাসনে বসে মেঘের চিন্তা করতে লাগল। কিন্নর যে গান ধরলেন তা অপূর্ব। তা আকাশের গান, হাওয়ার গান, মুক্তির গান, ব্যাপ্তির গান।

রাজকুমার ক্রমশ মেঘে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে চলে গেল। ভাসতে লাগল সেখানে। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রদের আলো গায়ে লাগল। রামধনু মূর্ত হল তাকে ঘিরে। অসীম মুক্তি অনাবিল আনন্দের আভাস পেল রাজকুমার।

ক্রমশ অন্য মেঘেদের সঙ্গে ভাব হল।

স্তর, স্তূপ, পালক, কোদালে-কুড়ুলে, রঙিন, কালো, বরফের মতো সাদা—নানারকম মেঘ ভেসে ভেসে এল তার কাছে। শুনল তার কাহিনী। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

বললে, "মানুষ ছিলে, মেঘ হয়েছ! এ কি তোমার পাগলামি!"

"আমি আকাশে থাকতে চাই।"

"আকাশে কি বেশী দিন থাকতে পারবে? জল হয়ে ঝরে পড়তে হবে পৃথিবীতে। পৃথিবীর সেই জল সূর্যের তাপে আবার বাষ্প হয়ে যাবে। আবার মেঘ হবে তুমি। এই একঘেয়ে জীবন চলবে চিরকাল।"

শুনে অবাক্ হয়ে গেল রাজকুমার।

মানুষের জীবনের মতো মেঘের জীবনও তাহলে একঘেয়ে!

চার

রাজকুমার যেদিন জল হয়ে পৃথিবীতে নামল সেদিন এক অদ্ভুত বর্ষার দিন। ঝর ঝর করে রাজকুমার ঝরে পড়ল এক গরিব কৃষকের আঙিনায়।

সবটা এক জায়গায় পড়ল না।

খানিকটা মাটিতে শুষে গেল, খানিকটা পড়ল একটা ভাঙা হাঁড়িতে, খানিকটা পড়ল পিছনের পুকুরে।

যেখানেই পড়ুক রাজকুমারের মন কিন্তু ঘুরতে লাগল কৃষকের কুটীরকে কেন্দ্র করে। দেখত সকালে উঠে দীনু (কৃষকের নাম) বাসী ভাত খেয়ে লাঙল কাঁধে নিয়ে চলে যেত মাঠে। তার বউ পারুল ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ঘর নিকোত, উঠোন ঝাড়ু দিত, গোয়াল পরিষ্কার করত, ঘুঁটে দিত, ঢেঁকিতে পাড়ও দিত মাঝে মাঝে। তারপর উনুন জ্বেলে রান্না করতে বসত। সর্বদা ব্যস্ত।

আর তার ছেলে কানু, পাঁচ ছ'বছর বয়স, কিন্তু সেও সর্বদা ব্যস্ত। ধুলো কাদা নিয়ে খেলা করছে, কাগজে নেকড়ার ফালি বেঁধে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, একটা নেকড়ার বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে, মায়ের কাছ থেকে মার খাচ্ছে, বকুনি খাচ্ছে—কিন্তু তার আনন্দের সীমা নেই। বাড়ির গাই বুধীর একটা বাচ্চা হয়েছে, তার সঙ্গে বড় ভাব। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে যায়। একদিন পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে গেল। কিন্তু তবু সে সদানন্দময়।

এ জীবন রাজকুমার আগে কখনও দেখে নি, দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

পাঁচ

পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসতে লাগল তার।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল, সূর্যের তাপ বাড়তে লাগল।

আবার সে মেঘ হয়ে চলে গেল আকাশে। কত দেশের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াল, কত দেশে জল হয়ে নামল আবার। সাহারার মরুভূমিতেও একবার গিয়ে পড়েছিল। কয়েক ঘণ্টা ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ ছিল চেরাপুঞ্জীতে।

আফ্রিকার জঙ্গলের অভিজ্ঞতাও আছে।

মিসিসিপি, গঙ্গা, অ্যামাজন নদীর স্রোতে সে গা ঢেলে অনেক দিন বেড়িয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বিরাট পৃথিবীর বিশাল বিচিত্র রূপের অনন্ত শোভাও দেখেছে সে। তার মেঘের শরীর জল হয়ে গলে পড়ে, সেই জল আবার মেঘ হয়। এই করে অনেক দিন কেটে গেল। একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। তার শরীর বদলায় কিন্তু মন বদলায় না।

একদিন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল মেঘরূপে যে গিরিশৃঙ্গের উপর সে রয়েছে সেটা পার্বতী পাহাড়ের শৃঙ্গ। আর একটু নীচে নেমে সে কিন্নরের গুহাটাও দেখতে পেল। দেখল গুহার সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বসে কিন্নর বীণা বাজাচ্ছেন। সুরের ফুলকিতে ভরে গেছে চারিদিক।

আর একটু নেমে এসে রাজকুমার বললে, "প্রভু, মেঘজীবন থেকে আমাকে মুক্তি দিন। এ রকম ভেসে ভেসে বেড়াতে আর ভালো লাগছে না।"

বীণাবাদন থেমে গেল।

"বেশ! আবার কি অলকাপুরীতে ফিরে যাবে?"

"না, আমি বাংলাদেশের সেই কৃষকের ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাতে চাই।"

ছয়

গভীর রাত্রি।

কৃষকের বউ হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। তারপর কৃষককে ঠেলে ওঠাল।

"ওগো শুনছ। বাইরে কচি ছেলের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখ দিকি—"

কৃষক আলো জ্বেলে বাইরে এসে দেখল একটি অনিন্দ্যকান্তি শিশু তাদের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে শুয়ে কাঁদছে।

"কার ছেলে! কোথা থেকে এল!"

কৃষকের বউ বললে, "আহা, আগে ঘরে নিয়ে যাই চল। ওর ক্ষিধে পেয়েছে, শীতে কাঁপছে।"

বুকে করে কৃষক-বউ নিয়ে গেল তাকে ঘরের মধ্যে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না ছেলে কার।

কৃষকের বউ বললে, "আমি বুঝতে পেরেছি এ কে। আমার কানুই ফিরে এসেছে আমার কাছে।"

মাস দুই আগে কানু কলেরায় মারা গিয়েছিল।

বিরজুর মা

মনিহারী গ্রামের বিরজুর মাকে মনিহারী গ্রামবাসীদের এখন মনে আছে কিনা জানি না, কেননা, মানুষের স্মৃতি বড় ক্ষণজীবী। স্বার্থের সম্পর্ক যাহার সহিত যতক্ষণ থাকে, মানুষ তাহাকে ততক্ষণ মনে রাখে। স্বার্থের সম্পর্ক ফুরাইলেই মানুষ ভুলিয়া যায়, ইহাই নিয়ম।

বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে যখন আসিত তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী নয়। সে ছিল গয়লানী। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়া বেড়াইত। সারা গ্রামে দুধ দিয়া বেড়াইত সে। যখনই আসিত সঙ্গে একটা না একটা ছেলে বা মেয়ে থাকিত। কখনও কালো, কখনও ফর্সা, কখনও বেঁটে, কখনও লম্বা। কারো নাকে সিক্নি, কারো চোখে পিঁচুটি, কারো মাথায় তেল নেই, কারো মুখের কোণে ঘা। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। আমার মায়ের স্বভাব ছিল, ছেলে-মেয়েদের অসুখ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, মা বিরজুর মায়ের ছেলে-মেয়েদের কোনো না কোনো ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আমাদের বাড়িতেই অনেক দুধ হইত। বাহির হইতে দুধ কিনিবার দরকার ছিল না। তবু বিরজুর মা একপোয়া দুধ আমাদের বাড়িতে দিত। মা বলিতেন, তোর কালো গাইয়ের দুধ দিয়ে যাস্ একপোয়া করে। মায়ের বোধ হয় আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে ঘুটে ঠুকিয়া দিত। তাহার সহিত যে ছেলে বা মেয়ে আসিত তাহারাও ঠুকিত।

বিরজুর মার চেহারা আমার বেশ মনে আছে। সে বেঁটে লোক ছিল। ঘাড়টা ডানদিকে একটু হেলিয়া থাকিত। কালো রং ছিল। একটা চোখে তারার মাঝখানে সাদা দাগ ছিল একটা। কোনকালে ঘা হইয়াছিল হয়তো। বিরজুর মায়ের কিন্তু আর একটা যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাহার কণ্ঠস্বরে উদারা মুদারা তারা এই তিনটি গ্রামই সমানভাবে বাজিত। যখন যে গ্রামে ইচ্ছা সে কথা কহিতে পারিত। যখন কাহাকেও সদুপদেশ দিত তখন তাহার কণ্ঠে বাজিত উদারা, সাধারণ কথাবার্তার সময় মুদারা, আর ঝগড়া করিবার সময় তারা। যখন চুপি চুপি বসিয়া মায়ের কাছে পরনিন্দা করিত তখনও মনে হইত যেন তারায় তাহার কণ্ঠ বাজিতেছে। মনে হইত, একটা ভ্রমর যেন দ্রুতছন্দে গুনগুন করিয়া চলিয়াছে।

বিরজুর মাকে চিরকাল একরকমই দেখিয়াছি। তাহার বয়স কত হইতে পারে তাহা কোনদিন ভাবি নাই। মোটামুটি ধারণা ছিল, বিরজুর মা আমার মায়ের বয়সী হইবে। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে, আমার সে ধারণা বদলাইয়া গেল। বিরজুর মা একদিন ফিস ফিস করিয়া মায়ের কাছে নালিশ করিল যে, তাহার বড় ব্যাটা হকরু কাল তাহাকে মারিয়া তাহার রুপার মেঠিয়া (বালা) দুইটি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু (আমার বাবা) যেন তাহাকে ডাকিয়া একটু শাসন করিয়া দেন। বাবা হকরুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি হকরুকে আগে দেখি নাই। তাহার চেহারা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম। তালগাছের মতো লম্বা, কালো আর ষণ্ডা। শালপ্রাংশু মহাভুজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরজুর মার ছেলে! অবাক হইয়া গেলাম।

বাবা তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন।

"তুমি বিরজুর মাকে মেরে তার মেঠিয়া নিয়ে গেছ কেন?"

হকরু প্রথমেই নিজের নাক কান মলিয়া ফেলিল।

"ভগবান জানে হুজুর। আমি ওর মেঠিয়া কেড়ে নিই নি। ওই আমাকে বলেছিল গরু কেনবার সময় দেবে। কাল পোখমন সিংয়ের বাচ্ছাটা কিনলাম, ও মেঠিয়া দেবে বলেছিল বলেই দর করেছিলাম, কিন্তু কেনবার সময় যখন চাইতে গেলাম তখন বললে, আমি মেঘুকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তখন বাক্স খুলে দেখলাম। দেখি, রয়েছে মেঠিয়া। আমাকে মিছে কথা বলছে। তখন আমি নিয়ে গেলাম। তখন আর না নিয়ে করি কি? গোখমন সিংয়ের সঙ্গে কথা তখন পাকা হয়ে গেছে।"

বিরজুর মা কাছেই চোখে কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল, "ও আজকাল আমাকে মোটেই মানে না। ওর বৌয়ের কথায় চলে, আমার কথা একেবারেই শোনে না।"

বাবা ধমকাইয়া উঠিলেন।

"এ কি কথা! মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া! যাও, এক্ষুনি পায়ে ধরে মাপ চাও।"

হকরু বাবার কথা অমান্য করিল না। তাহার লম্বা দেহ নত করিয়া বিরজুর মায়ের পায়ে হাত দিতে গেল। বিরজুর মা বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল। কারণ সে যখন মুখ হইতে কাপড় সরাইল, দেখা গেল তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

"হয়েছে হয়েছে, আর পা ধরতে হবে না। বাবু যা বললে তা মনে রেখো।"

মনে হইল তাহার হাসির সঙ্গে যেন গর্বও মিশিয়াছে।

হকুরু চলিয়া গেল। বিরজুর মা আড়ঘোমটা টানিয়া বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মেঠিয়া আমি ওকেই দিতাম। কিন্তু ও আমার কথা শোনে না কেন। দেখলাম, আমাকে লুকিয়ে বউকে একখানা রঙীন শাড়ি কিনে দিয়েছে। এর মানে কি?"

বাবা ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন, "না, আর ওসব করবে না।"

বিরজুর মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের কাছে বসিয়া ভোমরার মতো গুনগুন করিতে করিতে হকুরুর বউয়ের নিন্দা করিতে লাগিল। বউটা নাকি অত্যন্ত পাজি। প্রায়ই লুকাইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। হকুরু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছু পিছু ছোটে। আর জিনিসপত্র ভাঙে কত! শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে? মাসে দুই তিনটা করিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলে। কাপড়ে প্রায়ই খোঁচ দেয়। মাথাটা যেন কাকের বাসা। তেল দেয় না। উহার বাবা নিমু গোয়ালাও নাকি ওই রকম লক্ষ্মীছাড়া ছিল। তাড়ি খাইয়া দিনরাত পড়িয়া থাকিত। বিরজুর মা ওই মেয়ের সঙ্গে হকুরুর বিবাহ দিতে চাহে নাই। কিন্তু হকরু না-ছোড়। মেয়েটার রং ফর্সা কিনা, আর যখন তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

অনেকদিন পরে কথাটা আমার মনে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স একটু বাড়িয়াছে।

বিরজুর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, সবাই তোমাকে বিরজুর মা বলে, কিন্তু তোমার ছেলে বিরজুকে তো একদিনও দেখি নি। সে কোথা?"

"সে মরে গেছে খোকাবাবু। যে বছর গাঁয়ে 'হায়জা' (কলেরা) হয়েছিল, সেই বছর আমার বিরজু চলে গেল। কি ভালো ছেলে যে ছিল!"

বিরজুর মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের উদগত অশ্রু মুছিয়া বলিল, "সবই উপর-ওলার মর্জি খোকাবাবু!"

বিরজুর মা বেহারী, তাহার সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা হইত। কিন্তু সে যে আমাদের পর, একথা কখনও মনে হয় নাই। তাহাকে নিজের লোক বলিয়াই জানিতাম। আমার জন্য সর, চাঁছি, মিঠাই, পেয়ারা, কত কি যে লইয়া আসিত।

মাকে বলিত, "এও আমার আর এক ব্যাটা—"

পুজার সময় প্রতিবারই আমার জন্য একটা রঙীন 'কুর্তা' (জামা) কিনিয়া আনিত। আমাকে সেটা নিজে হাতে পরাইয়া ঠাকুর দেখাইয়া আনিত। দেখিতাম, একপাল ছেলে-মেয়ে তাহার পিছু পিছু ঘুরিতেছে। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। মেলায় সে সকলকেই কিছু না কিছু কিনিয়া দিত। আমাকেও কতবার মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছে। কোন বার গণেশ, কোন বার মহাদেব, কোন বার বা শ্রীকৃষ্ণ।

বিরজুর মার সম্বন্ধে আর একটা স্মৃতিও মনের মধ্যে জাগিয়া আছে।

তখন আমার বয়স বোধ হয় বছর দশেক। ফাঁসিয়াতলায় আমাদের কিছু জমি ছিল। রোজই শুনিতাম, সেখানে নাকি খুব ভালো মটর হইয়াছে। সাধ হইল, মাঠে বসিয়া গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মটরশুঁটি খাইব। জানিতাম, বাবাকে কিংবা মাকে বলিলে তাঁহারা রাজী হইবেন না। তাই এক রবিবার দুপুরে বাবা মা ঘুমাইবার পর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির তো হইয়া পড়িলাম, কিন্তু ফাঁসিয়াতলা কোন্

দিকে ? রাস্তা জানা ছিল না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিলাম। চারিদিক সবুজে সবুজ। শীতের রোদে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। দুপুর বেলা, মাঠে বিশেষ কোনও লোক নাই, অনেক দূরে টঙের উপর একটা পাহারাদার বসিয়া আছে। এমন একটা লোক পাইলাম না, যে আমাকে বলিয়া দেয় ফাঁসিয়াতলা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা ? আলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাইয়া গেলাম। দুইদিকে সবুজ, মাঝখানে একটা সরু ফিতার মতো পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। চলিয়াছি তো চলিয়াছি। খানিকক্ষণ পরে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা সবুজ বোঝা আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার নীচে পা দুইটাও দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর দেখিলাম, পিছনে পিছনে একটি ছোট ছেলেও আসিতেছে।

আমার কাছাকাছি আসিয়াই বোঝাটা থামিয়া গেল। বোঝার ভিতর হইতে বিরজুর মা কথা কহিয়া উঠিল।

"এ কি খোকাবাবু! তুই এখানে ?"

"আমি ফাঁসিয়াতলা যাব। রাস্তা কোন্‌দিকে বলে দে তো।"

"আমি তো ফাঁসিয়াতলা থেকেই আসছি। সেখানে আমারও এক টুকরো জমি আছে। তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন এই রোদে ?"

"মটরশুঁটি খাব।"

"তার জন্যে অত দূরে যাবার দরকার কি। আমার বোঝাতেই তো মটরশুঁটি আছে। চল্, ওই গাছতলায় বসবি চল্। এখানে বড় রোদ।"

দূরে একটা বটগাছ ছিল। বিরজুর মা সেইখানে আমাকে লইয়া গেল। গাছের তলায় বোঝাটা ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তাহার পর সেই ছেলেটাকে বলিল, "মটরশুঁট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দে খোকাবাবুকে।"

সেদিন সেই দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া বিরজুর মায়ের দেওয়া প্রচুর মটরশুঁটি খাইয়াছিলাম। এ স্মৃতিটি মনে সঞ্চিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে বিরজুর মা বলিল, "আর খেতে হবে না। বেশী খেলে পেট ব্যথা করবে। মাইজি তখন বকবে আমাকে।"

"মাকে তুই যেন বলে দিস্ না।"

"দেব না ? আমাকে কি দিবি বল্ ?"

"আমি আবার কি দেব!"

"একটা চুম্মা দে!"

হঠাৎ বুড়ি বিরজুর মা আমার গলা জড়াইয়া আমাকে চুম্বন করিল।

"তুই বাড়ি ফিরে যেতে পারবি তো ?"

"তোর সঙ্গে যাব।"

"আমি এখন বাড়ি যাব না। আমাকে এখন বাজারে যেতে হবে। এগুলো বেচব না ? আচ্ছা দাঁড়া, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সেই ছোট ছেলেটাকে বলিল, "ওই ও দিককার ক্ষেতে রেশমি ঘাস কাটছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ছেলেটা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেশমি কে?"

"আমার বেটি।"

একটু পরে রেশমি আসিল। ফর্সা লম্বা একটা মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়।

"খোকাবাবুকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আয়।"

"চল—"

রেশমির সহিত বাড়ি ফিরিলাম।

বছর দশেক পরে বিরজুর মার যেদিন মৃত্যু হইল তখন আমাদের কলেজের ছুটি ছিল। দেখিলাম, বিরজুর মার শবের পিছনে গ্রামসুদ্ধ লোক চলিয়াছে। সব বয়সের লোক। একপাল ছেলে-মেয়ে। সকলে আকুলভাবে কাঁদিতেছে।

সেইদিনই সত্যটা জানিতে পারিলাম। বিরজুর মায়ের বিবাহ হয় নাই। সে চির-কুমারী ছিল। বিরজুর বাবার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়া শেষে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। বিরজুর বাবার অন্যত্র বিবাহ হয়। তাহারই প্রথম সন্তান বিরজু। বিরজুর মা আর বিবাহ করিতে চাহে নাই। বিরজুর বাবা বিরজুকে তাহারই কোলে তুলিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার নাম বিরজুর মা। তাহার আসল নামটা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার আসল নাম ছিল সোহাগ।

দুর্যোধন কাকা

আমরা সকলেই তাঁহাকে দুর্যোধন কাকা বলিয়া ডাকিতাম। আমরা সকলে, মানে, আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। গ্রামের লোকেরা কেহ তাঁহাকে দুর্যোধন কেহ দুর্যোধনবাবু বলিত। অনেকে তাঁহাকে কম্পাউণ্ডারবাবু বলিয়াও ডাকিত। দুর্যোধন কাকা আমার বাবার কম্পাউণ্ডার ছিলেন। বাবার সহিত দুর্যোধন কাকার যে সম্পর্ক ছিল তাহা আজকালকার মৌখিক ভদ্রতার দিনে দেখা যায় না। 'গভীর' আখ্যা দিলেও তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। দুর্যোধন কাকা আমাদের বাড়ির লোক ছিলেন। দোষ করিলে বাবা তাঁহাকে বকিতেন। যতদূর মনে পড়ে প্রায়ই তাঁহাকে বকুনি খাইতে দেখিতাম। এই ছবিটি প্রায়ই চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে, বাবা তাঁহাকে খুব বকিয়া চলিয়াছেন, আর দুর্যোধন কাকা মাথা হেঁট করিয়া বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুর্যোধন কাকা বাবার হাতে একাধিকবার মারও খাইয়াছেন। এ সব সত্ত্বেও দুর্যোধন কাকা আমরণ আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কোনও কারণে তিনি যে আমাদের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন ইহা আমরা ভাবিতে পারিতাম না। নিরক্ষর দুর্যোধন কাকাকে বাবা মানুষ করিয়া কম্পাউণ্ডার পদে বাহাল করিয়াছিলেন। এ ঋণ দুর্যোধন কখনও ভোলেন নাই। বলিতেন, এ ঋণ শোধ করা যায় না।

দুর্যোধনের যে দোষের জন্য বাবা তাঁহাকে বকিতেন, তাহা বাবার ভাষায়

'ফপরদালালি'। দুর্যোধন কাকা নিজেকে মনিহারী গ্রামের গার্জেন মনে করিতেন। হয়তো কোন প্রজার নিকট জমিদারের গোমস্তা খাজনা লইয়া 'চিঠা' (রসিদ) দেয় নাই, তাহার হইয়া দুর্যোধন কাকা জিয়াগঞ্জ নিবাসী জমিদারের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় পত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। হয়তো গ্রামের দারোগা কাহারও নিকট ঘুষ লইয়াছে, খবর পাইবামাত্র দুর্যোধন কাকা উপরওলার নিকট বিরাট দরখাস্ত লিখিয়া প্রত্যেকের নিকট সহি লইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। কাহারও অসুখ হইলে তো কথাই নাই দুর্যোধন কারণে-অকারণে চার পাঁচবার সেখানে যাইবেনই। তাহার বাড়ির লোকদের শিখাইয়া দিবেন কি করিয়া সাবু বা বার্লি করিতে হয়। তাহারা যদি বলিত 'ওসব আমরা জানি', দুর্যোধন কাকা ধমকাইয়া উঠিতেন, জান না, যা বলছি মন দিয়ে শোন। রামধনের সহিত যদুয়ার বিবাদ হইল, দুর্যোধন কাকা কাহার কতটা দোষ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেলেন। নায়েব মহাশয়ের মেয়ের বিয়ের সময় বরযাত্রীরা কিছু অভদ্রতা করিয়াছিল, দুর্যোধন কাকা ইহার প্রতিবাদে বরকর্তার নিকট একটি ডেপুটেশন লইয়া হাজির হইলেন। শুদ্ধ ভাষায় বলিলেন, আমরা কন্যাপক্ষ বলিয়া অন্যায় অভদ্র ব্যবহার মানিয়া লইব না। ভদ্রলোকের নিকট আমরা ভদ্রতাই প্রত্যাশা করিব। ইহা লইয়া মহা হৈ-হুজ্জত হইয়াছিল এবং দুর্যোধন কাকা বাবার নিকট প্রচুর বকুনি খাইয়াছিলেন। এ ধরনের কাজে মাতিলে আর কিছু না হোক প্রচুর সময় নষ্ট হয়। সময় নষ্ট করা বাবা মোটেই পছন্দ করিতেন না। দুর্যোধন কাকাকে বলিতেন পরোপকার করা ভালো। কিন্তু নিজের কাজ ক্ষতি করে পরের চরকায় তেল দিতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। যদি কেবল পরোপকার করেই জীবন কাটাতে চাও, গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসী হও গিয়ে। দুর্যোধন কাকা বাবার দিকে পিছন করিয়া অধোবদনে সব শুনিয়া যাইতেন, কোনও উত্তর দিতেন না।

দুর্যোধন কাকা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের তিন ভাইকে পড়াইতেন। আমরা তিনজন পাশাপাশি বসিতাম। দুর্যোধন কাকা আমাদের সামনে চাপটালি খাইয়া বসিতেন এবং বলিতেন, পড়ো। তিনজনকেই জোরে জোরে পড়িতে হইত। দুর্যোধন কাকা তিন দিকেই কান রাখিতেন। কেহ যদি একটু ভুল বলিত তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিতেন। তখন প্রতিবছর টেক্সট বুক বদল হইত। দুর্যোধন কাকা যে টেক্সট বুক পড়িয়াছিলেন আমাদেরও তাহাই পড়িতে হইত। দুর্যোধন কাকার আগাগোড়া সব কণ্ঠস্থ ছিল। ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, রয়াল রীডার, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তাঁহার কাছে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। শুধু আমাদের সম্বন্ধেই নয় গ্রামের প্রত্যেক ছেলের সম্বন্ধেই তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন। কে পড়ায় ফাঁকি দিয়া ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়াইতেছে, কে স্কুল কামাই করে, দুর্যোধন কাকা সমস্ত খবর রাখিতেন এবং স্কুলের শিক্ষকদের এ বিষয়ে সচেতন করিবারও চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার আর একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একবার ঘোষবাবু নামে একটি রেলের কর্মচারী মনিহারীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দুই তিনটি বড় বড় মেয়ে ছিল। মেয়েগুলি উজাড় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের যুবকদের মধ্যে বেশ একটি চাঞ্চল্যও দেখা দিল। ক্রমশ স্কুলের ছেলেরাও সেই হুজুগে মাতিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রেলের বড় সাহেব ডি. টি. এস. স্টেশন-পরিদর্শনে

আসিলেন। তখন তাঁহারা সাধারণত 'সেলুন' গাড়িতে চড়িয়া আসিতেন। তিনি সেলুনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একদল লোক তাঁহার গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। দুর্যোধন কাকা ডেপুটেশন লইয়া আসিয়াছেন। গাড়ির দরজা খুলিয়া সাহেব বাহির হইয়া আসিতেই দলের নেতা দুর্যোধন কাকা আগাইয়া দিয়া সেলাম করিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইল। ইংরেজিতেই হইল, আমরা তাহার বাংলা মর্মানুবাদ দিতেছি।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কি চান আপনারা?"

"আমরা এই গ্রামের লোক। মহা বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে বাঁচান। আপনি দয়া না করিলে সমস্ত গ্রাম উৎসন্ন যাইবে।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"ঘোষবাবুর তিনটি 'সোমত্ত' মেয়ে গ্রামে বড়ই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। আইনত তাহাদের কিছু বলিবার উপায় নাই। আপনি যদি ঘোষবাবুকে বদলি করিয়া দেন আমরা বাঁচি। আপনার এ দয়ার জন্য আমরা চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

এরকম একটা সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিবে ইহা সাহেবের কল্পনাতীত ছিল। এক মাসের মধ্যেই ঘোষবাবু বদলির অর্ডার পাইলেন। যাইবার পূর্বে ঘোষবাবু আসিয়া বাবাকে বলিলেন, আপনার কম্পাউণ্ডার দুর্যোধনের জন্যই আমাকে এমন একটা ভাল স্টেশন হইতে চলিয়া যাইতে হইতেছে। দুর্যোধন কাকাকে বাবা আবার একটা বকুনি দিলেন এবং দুর্যোধন কাকাও বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

দুর্যোধন কাকার আর একটা বাৎসরিক কর্তব্য ছিল। এজন্য বাবার নিকট তিনি একদিনের ছুটি লইতেন। মনিহারী গ্রামের মাইনর স্কুলের পরীক্ষা প্রতিবৎসর পূর্ণিয়া জিলা স্কুলে হইত এবং পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইত পূর্ণিয়ারই একটি কাগজে। যেদিন ফলাফল বাহির হইবে সেদিন দুর্যোধন কাকা খুব ভোরের ট্রেনে পূর্ণিয়া চলিয়া যাইতেন এবং সেখান হইতে কাগজখানা কিনিয়া সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরিয়া আসিতেন। ডাক-যোগে কাগজ পেঁছিতে অন্ততঃ দুই তিন দিন দেরি হইত, এ দেরি দুর্যোধন কাকা সহ্য করিতে পারিতেন না। মনিহারী স্কুল হইতে যে সব ছেলে পাস করিয়াছে তাহাদের নামের নীচে লাল করিয়া কালির দাগ দিয়া কাগজখানা আস্ফালন করিতে করিতে তিনি স্টেশন হইতে আসিতেন। স্কুলের ছেলেরাও অনেকে তাঁহার মুখ হইতে টাটকা খবর শুনিবে বলিয়া স্টেশনে যাইত। ছবিটা এখনও আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। দুর্যোধন কাকা কাগজটা হাতে করিয়া মাথার উপরে তুলিয়া আছেন এবং একপাল ছেলে সেটা দেখিবে বলিয়া তাঁহার খোশামোদ করিতেছে। তিনি কাগজটা কাহারও হাতে দিতে চাহিতেন না। তিনি সোজা গিয়া সেটা হেডমাস্টার মশাইয়ের হাতে আগে দিতেন। স্কুলের ফল যেবার ভালো হইত সেবার তিনি গিয়াই হেডমাস্টার মশাইকে প্রণামও করিতেন। কিন্তু ফল খারাপ হইলে আর রক্ষা ছিল না। বলিতেন, আমি দেয়াশালাই আর কেরোসিন কিনিয়া দিতেছি স্কুলে গিয়া আপনারা স্বহস্তে আগুন ধরাইয়া দিন। আপদ চুকিয়া যাক। বাপমায়ের বুকের-রক্ত-জল-করা টাকায় আপনাদের বেতন দেওয়া হয়, আর আপনাদের এই কীর্তি! ছি, ছি, ছি, ছি!

আপনারা শিক্ষক, না কসাই? রক্ষক, না ভক্ষক? সারা গ্রামে মহা হৈচৈ পড়িয়া যাইত। শিক্ষকদের অপমান করিয়াছেন বলিয়া দ্বর্যোধন কাকাকে বাবার নিকট আর একপ্রস্থ বকুনি খাইতে হইত। স্কুলের কোন ছেলে পরীক্ষায় ভালো ফল করিলে দ্বর্যোধন কাকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। মনে আছে একবার তিনি প্বর্ণিয়া হইতে একজোড়া ভালো কাপড় এবং এক হাঁড়ি ভালো রসগোল্লা লইয়া ট্রেন হইতে নামিলেন। স্টেশনে যে ছেলেরা ছিল তাহাদের বলিলেন, যতীন কই? সে জেলার মধ্যে ফাস্ট হয়েছে। তার জন্যে আমি কাপড় আর মিষ্টি এনেছি।

বর্তমান য্বগের অত্যন্ত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক সমাজে বাস করিয়া মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো দ্বর্যোধন কাকার কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তাঁহাকে লইয়া হাসাহাসি করিতাম, আজ ব্বঝিতেছি তিনি কত বড় ছিলেন।

তাঁহার শেষজীবনে একটা ঘটনা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করি। আমার ভাই টুল্বকে তিনি খ্বব ভালবাসিতেন। টুল্ব তখন প্বর্ণিয়া জেলার কসবা ডিসপেনসারির ডাক্তার।

বৃদ্ধ দ্বর্যোধন কাকা একবার তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি, চোখে ভালো দেখিতে পান না। মাথারও একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি ভুল করিয়া কসবার আগের স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন এবং সেখানকার ডিসপেনসারির ডাক্তারের বাসায় গিয়া টুল্ব টুল্ব বলিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিলেন। একটি চাকর বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে বলিলেন, বল দ্বর্যোধন কাকা এসেছে। ডাক্তারবাব্ব বাসাতেই ছিলেন, তিনিই বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি টুল্বকে চিনিতেন।

বলিলেন, "টুল্ববাব্ব তো কসবায় থাকে। এখান থেকে ৪।৫ মাইল দ্বরে। আচ্ছা, আমি ওদিকে যাব এখনি, আপনাকে পেঁৗছে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাব্ব মোটরে দ্বর্যোধন কাকাকে তুলিয়া লইলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টুল্ববাব্বরা আপনার কে হন, আপনি তাঁদের কোনও আত্মীয় নাকি?"

দ্বর্যোধন কাকা উত্তর দিলেন, "না, রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। সে হিসাবে ওরা আমার কেউ নয়।"

তাহার পর একট্ব থামিয়া বলিলেন, "কিন্তু ওরাই আমার সব।"

পতান্থ পাগলা

আমার ছেলেবেলায় পতান্ব পাগলা মনিহারী গ্রামে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রাণী ছিল। প্রাণী কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আকৃতিতে মন্বষ্য হইলেও আচার-ব্যবহারে সে পশ্বর মতোই ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, ঝাঁকড়া ঘন ভ্রূ দ্বটি যেন ঝ্বঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ছোট ছোট খোপাটে চোখ দ্বইটির ভিতর কি আছে। টিকোলো নাক। থ্বতনি নাই বলিলেই হয়। ম্বখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি, ম্বখে সর্বদা একটা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সর্বদাই যেন

সে একটা মজা দেখিতেছে। মজাটা যে কিসের তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারিত না। হয়তো দূরে একটা ছাগল চরিতেছে, পতানু তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হয়তো হাসির বেগ বাড়িয়া গেল, তখন মুখে হাত চাপা দিয়া খুকখুক করিয়া হাসিতে লাগিল। এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

পতানুর মা আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার মুখে তাহার পাগলামির আদি ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। তাহার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বছর তখন তাহাকে 'রিক্রুটে' ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখনকার দিনে বিদেশে কাজ করিবার জন্য এদেশ হইতে কুলি চালান দেওয়া হইত। এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া রিক্রুটিং অফিসাররা তাহাদের নিকট হইতে টিপসই লইয়া তাহাদিগকে কখনও সিংহল, কখনও কেনিয়া, কখনও বা আর কোথাও চালান করিয়া দিত। প্রায় এসব কুলি আর বাড়ি ফিরত না। পতানু কিন্তু বছর দশেক পরে ফিরিয়াছিল। এমন অবস্থায় ফিরিয়াছিল যে তাহার মাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। মাথার চুল নাই, অথচ একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ, আসিয়া প্রথমেই সে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আঙুল দিয়া সভয়ে কেবল বলিয়াছিল, 'চুপ' আর কোনও কথা বলে নাই, খাইতে দিলে খায় নাই পর্যন্ত। কোণে উবু হইয়া বসিয়াছিল সমস্ত রাত। তাহার পরদিন সকালে তাহাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সাতদিন সে গা ঢাকা দিয়া রহিল। কোথায় গেল কেহই কোন পাত্তা করিতে পারিল না।

অষ্টম দিন রাত্রে গ্রামের চৌকিদার রহমান পাহারা দিতে বাহির হইয়া হঠাৎ 'ভূত' 'ভূত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নায়েব মশাইয়ের বাড়িতে উঠিয়া পড়ে।

নায়েবমশাই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রহমান থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"কি ব্যাপার রহমান ?"

"ভূত হুজুর। স্বচক্ষে দেখলাম ওই প্রকাণ্ড গামহার গাছ থেকে নামল। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে নাংগা—"

সেই রাত্রেই পতানু ধরা পড়িল আবার। দিনের বেলা সে বড় গামহার গাছের মগডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে, গভীর রাত্রে চুপি চুপি নামিয়া আসিত।

সকলের পরামর্শ অনুসারে ইহার পর পতানুকে বাঁধিয়া রাখা হইল। বেশী দিন নয়, মাত্র দুইদিন বাঁধিয়া রাখার পর পতানু গোপ দার্শনিক হইয়া গেল। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। সে হৃদয়ঙ্গম করিল—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। বিদ্রোহ করে লাভ নেই। ইহার পর হইতে তাহার মুখের হাসিটা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখনও সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে একটা ন্যাকড়া তাহার কোমরে জড়ানো থাকিত বটে, কিন্তু প্রায়ই থাকিত না। থাকিত কেবল দাড়িটা।

সে উঁচু জায়গায় উবু হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের বাড়ির সামনে যে হাট বসিত, সেই হাটতলার পূর্ব ও পশ্চিম কোণটা বেশ উঁচু। আর একটা উঁচু জায়গা ছিল পোস্টাফিসের সামনে, আর একটা পীরবাবার পাহাড়ের কাছে। ইহারই

কোনও একটাতে পতানু ভোরবেলা আসিয়া বসিত। বসিয়া আপন মনেই হাসিয়া যাইত। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিত, তাহার পর উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা উঁচু জায়গায় গিয়া বসিত। সেখানেও ওই, কিছু একটা দেখিয়া হাসি। হয়তো একটা ছেঁড়া কাগজ, বা একটা ছেঁড়া জুতা। এইসব দেখিয়াই খুশিতে মশগুল হইয়া থাকিত পতানু।

আর সে পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

একদিন কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিল। পতানু গোয়ালা পোস্টাফিসের সামনে উঁচু জায়গায় বসিয়া ধাড়ি সার দোকানের দিকে চাহিয়াছিল। ধাড়ি সা হালুয়াই, মানে ময়রা। সে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। একটু পরেই স্টীমারের যাত্রীরা এদিক দিয়া যাইবে, তাহার সদ্যভাজা 'পুরি'র একটিও পড়িয়া থাকিবে না। ধাড়ি সা রোজই ইহা করে, পতানুও রোজই বসিয়া দেখে। কিন্তু সেদিন পতানুর মনস্তত্ত্বে কি যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল জানি না, সে সোজা উঠিয়া ধাড়ি সার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আমার লুচি খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে লুচি দাও।"

ধাড়ি সা তো অবাক।

বলিল, "ভাগ পাগলা। লুচি খাবি? পয়সা আছে?"

পতানুর পয়সা ছিল না সত্য, কিন্তু যাহা ছিল তাহা পয়সার চেয়ে প্রবল। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাহার।

সে সোজা দোকানে উঠিয়া গেল ও বারকোশশুদ্ধ লুচিগুলো নামাইয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া খাইতে লাগিল। ধাড়ি সা বাধা দিতে গিয়ে পড়িয়া গেল প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া। তাহার পর সে চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পতানুকে সহজে কাবু করা গেল না। সে সমস্ত লুচিগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া মিষ্টান্নও খাইতে লাগিল। তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া সহজে কেহ তাহার নিকট ভিড়িল না।

সে খাইতে খাইতে চোখ পাকাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "খবরদার—"

তাহাকে পুলিসে যখন হাসপাতালে লইয়া আসিল তখন তাহার হাতে ও কোমরে দড়ি। শোনা গেল, পতানু ধাড়ি সার দোকানের পরাত দিয়াই কয়েকটি লোককে জখম করিয়াছে। আমার বাবাই তখন হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সে যুগে উন্মাদ পাগলের যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি করিলেন। ব্যবস্থাটি বড় ভয়ানক। পতানুকে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া চার-পাঁচজন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে ধরিয়া রহিল। বাবা একটা মোটা গুনছুঁচ দিয়া তাহার ঘাড়ের মাংসে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া একটা মোটা সুতা পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বদমায়েশী করলেই সুতোটা ধরে টানবে।" ভয়ানক চিকিৎসা। এই চিকিৎসার গুণেই কিন্তু পতানুর দুর্দান্ত ভাবটা কাটিয়া গেল। কিছুদিন আর সে ঘরের বাহির হইল না। মাস-দুই পরে দেখিলাম আবার একদিন সে হাটতলার উঁচু জায়গাটায় উবু হইয়া বসিয়া আছে। ঘাড়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতাটাও আর নাই। ভাবিলাম তাহার সহিত গিয়া একটু কথা বলি। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। পতানু কানে হাত দিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন্।"

ব্রিন্‌ডাইন্? এ আবার কি ভাষা।

পতানু ক্রমাগত বলিয়া চলিল—"ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্, ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্, ডাক্তারবাবু ব্রিন্‌ডাইন্।" যতক্ষণ দম রহিল ততক্ষণ বলিল।

আমি আর আগাইতে সাহস করিলাম না। পরে দেখিলাম এই 'ব্রিন্‌ডাইন' শব্দটা পতানুকে পাইয়া বসিয়াছে। রোজই সে কোথাও না কোথাও বসিয়া, 'ব্রিন্‌ডাইন' করিতেছে। তবে নামটা রোজ এক নয়। কোন দিন ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন্, কোন দিন দারোগাবাবু ব্রিনডাইন, কোন দিন বা নায়েববাবু ব্রিনডাইন।

কিছুদিন পরে একটা পাগলা মহিষের উপদ্রবে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহিষটা কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা গেল না। সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উন্মত্ত ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইত তাহাকে আক্রমণ করিত। মহিষ বাহির হইয়াছে রব উঠিলেই সবাই ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিত।

পতানু একদিন পোস্টাফিসের সামনে বসিয়া 'ব্রিনডাইন' করিতেছিল। হঠাৎ পাগলা মহিষটা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল। পতানু কিন্তু পলাইল না। লাফাইয়া গিয়া পাগলা মহিষের শিং দুইটা ধরিয়া ফেলিল সে। দুই পাগলে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু যমের বাহনের সহিত যুদ্ধে মানুষের পরাজয় অনিবার্য। পতানু ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। মহিষ শিং দিয়া তাহার পেটটাই ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে সে বলিয়া গেল—"পাগলা ভঁইস ব্রিনডাইন।"

অনেকদিন পরে একটি রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে কাজ করিতেন। কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন আমার বাড়ি মনিহারী, তখন বলিলেন যে মনিহারী গ্রামের এক পতানু তাঁহাদের চা বাগানের কুলি ছিল। লোকটা চা বাগানের সাহেব মালিককে এক ঘুষিতে ভূশায়ী করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, "সাহেবটা পাজিও ছিল মশাই। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। কথায় কথায় বলত—Bring dowu the whip. তার বাড়িতে দোতলার উপর একটা শঙ্কর মাছের ল্যাজ দিয়ে তৈরী চাবুক ছিল। সেইটে দিয়ে সপাসপ চাবকাত কুলিগুলোকে।"

কে জানে পতানুর 'ব্রিনডাইন'—ইংরেজি Bring down কথার অপভ্রংশ কি না।

অঙ্কের বাইরে

আমার মঙ্গলা গরুর অনেক গুণ। তাকে দু' মাসের রেখে তার মা চন্দন অকস্মাৎ মারা গিয়েছিল। তখন থেকেই আমরা তার সেবার ভার নিয়েছি। অনেকে বলেছিলেন, ওটাকে বিক্রি করে দাও। ওকে খাইয়ে বড় করে ওর দুধ পেতে অন্তত বছর চারেক দেরি। দৈনিক যদি এক টাকা করেও খরচ ধর তাহলে মাসে তিরিশ টাকা, বছরে তিন শ যাট টাকা, চার বছরে চোদ্দ শ চল্লিশ টাকা। এ ছাড়া একটা চাকরের খরচও ধর। খুব কম করে ধরলেও সে খরচও প্রায় ওই রকম। অর্থাৎ ওকে পুষে বড় করে ওর দুধ খেতে হলে অগ্রিম প্রায় হাজার তিনেক টাকা খরচ করতে হবে। তারপর কত দুধ দেবে তার ঠিক নেই, না-ও দিতে পারে। বিধু সেনের গরুটা তো বাঁজাই হল শেষ

পর্যন্ত। বেচে দাও, বেচে দাও ওটাকে। অনেক হিতৈষীই নানা ভাষায় এই মত ব্যক্ত করলেন। মুংলির কাছে গেলাম, সে গালটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার আদর খেতে লাগল। আর ছোট্ট জিভটা বারবার বার করে আমার হাতটা চাটতে লাগল। তার সরল চোখের দৃষ্টি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আমি যে তাকে বিক্রি করে দিতে পারি এ শঙ্কার আভাসও সেখানে নেই। আমি যখন সরে এলাম তখনও সে গলা বাড়িয়ে রইল আর একটু আদর খাবার জন্য। তার এই ছবিটাই এখন বারবার মনে পড়ছে—দড়িটা টান করে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে আদরের প্রত্যাশায়।

দুই

মঙ্গলাকে বিক্রি করি নি।

দেখা গেল গণিতজ্ঞ হিতৈষীদের হিসাবও নির্ভুল নয়। মঙ্গলার বয়স যখন তিন বৎসর তখনই সে মাতৃত্ব অর্জন করে ফেলল। আর তার জন্যে আলাদা চাকরও রাখতে হয় নি। আমার বাড়ির চাকর দুর্গাই দেখাশোনা করত ওর। ওকে লালন পালন করতে কত খরচ হয়েছিল সে হিসাব আর করি নি। শুধু তাই নয়, ও যখন দুধ দিতে শুরু করল তখন এত অবাক হয়ে গেলাম যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খরচের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, ওইটুকু গরু রোজ পাঁচ সের দুধ দিতে লাগল মশাই। কলাইয়ের ডাল, ব্যাসন, তিসির খোল, কলে-কাটা খড়, চোকর সবুজ ঘাস প্রভৃতিতে যা খরচ হতে লাগল তা অনেক। কিন্তু অঙ্ককে আর আমল দিলাম না। মনে হল ও রোজ যা দিচ্ছে তার দাম অন্তত পাঁচ টাকা, আর যা খাচ্ছে তা নিশ্চয় পাঁচ টাকার চেয়ে কম। এটা আন্দাজ, হিসাব করি নি।

একনাগাড়ে বারো মাস দুধ খাওয়ালো মঙ্গলা। শুধু আমরা নয়, পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব চাকরবাকর সবাই দই, ছানা, ক্ষীর, সন্দেশ খেলাম। চায়ের স্বাদ আর রং যা হত তা অপূর্ব ও অবর্ণনীয়।

কিন্তু গরু যত ভালোই হোক বরাবর দুধ দেয় না। এক বছর পরে দুধ দেওয়া বন্ধ করল মঙ্গলা।

গৃহিণী বললেন—এখন আর ডাল, ব্যাসন, চোকর খাইয়ে লাভ কি। দোকানে অনেক বিল জমেছে।

তাই হল। কিন্তু ওকে রোজ সন্ধ্যের সময় যে এক বোঝা সবুজ ঘাস এনে দিতাম সেটা বন্ধ করলাম না। রোজই ফেরবার সময় এক বোঝা সবুজ ঘাস নিয়ে আসতাম মোটরের কেরিয়ারে।

দুধ কিনতে হচ্ছিল। রোজ আড়াই টাকা। মঙ্গলা এক ফোঁটা দুধ দিচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরে মোটর থেকে নেবেই দেখি মঙ্গলা গলা বাড়িয়ে এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোটরের শব্দ পেলেই রোজই এগিয়ে আসে, ঘাসের আশায়। সেদিন কিন্তু ঘাস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। বললাম, "মুংলি, আজ ঘাস আনতে ভুলে গেছি। কাল এনে দেব—।"

মুংলি ঘাড়টা নেড়ে কান দুটো চট্‌পট্ করে ফোঁস করে আওয়াজ করলে একটা। সরল না, গলা বাড়িয়ে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কি করি, মোটর ঘুরিয়ে আবার গেলাম বাজারে। বাজার মাইলখানেক দূরে। বেশ বড় এক বোঝা সবুজ ঘাস নিয়ে এলাম।

দেখলাম মঙ্গলা ঠিক তেমনিভাবে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাস পেয়ে মহা খুশী। মচর মচর করে খেতে লাগল। একবার আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। স্নিগ্ধ সুন্দর চোখের দৃষ্টি।

জানি মঙ্গলা এখন দুধ দেবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সে আমাকে যা দিল তা দুধের চেয়ে অনেক বেশী, তা অমৃত।

নমো-যন্ত্র

বিকট গর্জন ক'রে একটা 'বাস' দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সিংহ এসে গর্জন করলে বন্দুক বার করতুম, মানুষ এসে গর্জন করলে তাকে থামতে বলতুম, কিন্তু 'বাসকে' কিছু বলা যাবে না। সমানে গর্জন করতেই লাগল।

বিজ্ঞানের দাপটে মানব-সভ্যতাই বিব্রত হয়ে পড়েছে। আমার বুড়ো মামাটা মরলে কিছু টাকা পাওয়া যেত, কিন্তু মামা মরবে না। এতো ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে যে মানুষের মৃত্যুর হারই না কি কমে গেছে। বুড়োরা আর মরছে না। পৃথিবীতে স্থানাভাবের খবর রোজই পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্যায় কাতর হ'য়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে জন্ম-নিরোধ-পন্থা বার করেছেন। তা যে মানবসভ্যতাকে আবার কি প্যাঁচে ফেলবে কে জানে। এমনি তো দেখছি যাদের জন্ম-নিরোধ করা উচিত তারা কিছু করছে না। করছে বড়লোকেরা বিলাস আর বদমায়েশির সুবিধা হবে ব'লে। কিছুদিন থেকে ষণ্ডাকৃতি নিঃসন্তান, বা কম-সন্তান মহিলারা সমাজের উপর যে ছায়াপাত করেছেন, তাতো আশঙ্কাজনক। বিজ্ঞানের কোনটাই বা ভালো। রেডিও হ'য়ে আমরা গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। রেডিওতে কোন বড় গুণী হয়তো গান গাইছেন বা বড় পণ্ডিত বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমরা রেডিও খুলে তার সামনে বসে হাসাহাসি গাল-গল্প করছি। তাঁদের গান বা বক্তৃতা শুনছি না। যদি কষ্ট ক'রে তাঁদের নাগাল পেতে হ'ত তাহলে কি আমরা এ বেয়াদপি করতাম? ফোনের কথাই ধরুন। স্বস্তিতে বসতে দেয় কি? ফোন বাজলেই 'হ্যালো' বলে সাড়া দিতেই হবে। রামা শ্যামা যেই হোক, সে ফদর ফদর ক'রে যত বাজে কথা বলুক আপনাকে শুনে যেতে হবে। ফোনের দাপটে বিশ্রাম, শান্তি সব বিসর্জন দিতে হয়েছে আমাদের। ট্রেন, ট্রাম, মোটর আমাদের সুখ-সুবিধার চেয়ে অসুখ-অসুবিধাই বেশী করেছে সব খতিয়ে যদি দেখা যায়। আগে যাঁরা হেঁটে তীর্থে যেতেন তাঁরা যে মনোভাব নিয়ে যেতেন এখন আমরা তা যাই কি? আমাদের ক্রমশ অমানুষ করে ফেলছে এই যন্ত্রগুলো। সব আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে বলে আমরা নিষ্ঠা ভুলেছি, তপস্যা ভুলেছি। তপস্যা করি এখন টাকার। এরোপ্লেন? এরোপ্লেন আমাদের আব্রু নষ্ট করেছে, শান্তি হরণ করেছে, আমরা সর্বরা সশঙ্কিত হয়ে আছি আকাশ-পথে ওই বুঝি শত্রু এসে মাথার উপর বোমা ফেলল। পারমাণবিক বোমার কথা শুনলে

তো পেটের মধ্যে হাত পা সেঁদিয়ে যায়। পরমাণু-বিজ্ঞান মানব-সভ্যতাকে শেষ পর্যন্ত যে কোন ভাগাড়ে নিয়ে যাবে কে জানে।

দুয়ারে কড়া নড়ল।

'স্বদেশ' কাগজের সম্পাদক গণেশ গুড়গুড়ি এসে প্রবেশ করলেন।

"কি গুড়গুড়ি মশাই, এত রাত্রে?"

"আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। চাকরিটা গেল। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এখন কি যে করব বুঝতে পারছি না।"

"কি রকম? হঠাৎ চাকরি গেল কেন?"

চীৎকার করে উঠলেন গুড়গুড়ি মশায়।

"প্রগতি, প্রগতি, বিজ্ঞানের প্রগতি। দুটো মেশিন বেরিয়েছে, নিউক্লিয়ার মেশিন। অদ্ভুত কাণ্ড দাদা। একটা মেশিনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা যা খুশি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে আধঘণ্টা বসে থাকুন। একটু পরেই ছোট একটি কার্ড বেরিয়ে আসবে, তাতে লেখা থাকবে 'চলতে পারে' কিংবা 'অচল'। আমি যে সব গল্প কবিতা এতদিন অমনোনীত করেছিলাম ওই মেশিন তার সবগুলোকে মনোনীত করেছে। দ্বিতীয় মেশিনটা আরও আশ্চর্যজনক। একগাদা ভুল প্রুফ ঢুকিয়ে দিন তার মধ্যে, বতাম টিপে দিন একটা, একটু পরেই সংশোধিত ছাপা প্রুফ বেরিয়ে আসবে। আমাদের মালিক ওই দুটো মেশিনই কিনেছেন আর আমাকে নোটিশ দিয়েছেন। কয়েকটি সাব-এডিটরেরও চাকরি গেছে। ওই মেশিনে দুটোই এখন কাগজ চালাবে। আমাদের আর দরকার নেই। আমি এখন কি করি বলুন তো। আপনার তো পাটের ব্যবসা আছে, দিন না একটা কিছু জুটিয়ে—"

বললাম, "আমি পাটের ব্যাবসা তুলে দেব ভাবছি। ওদেশে মেশিনে ওরা যে রকম আর্টিফিশাল পাট তৈরি করছে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য আমার নেই।"

গুড়গুড়ি মশায় হুহু ক'রে কেঁদে ফেললেন। তাঁর আবক্ষ বিলম্বিত দাড়ি বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল।

"আপনিও ব্যাবসা তুলে দেবেন? তাহলে আমাদের আর রইল কে। যাই তাহলে অবিনাশবাবুর কাছে। শুনেছিলাম তিনি একজন অভিজ্ঞ 'টুকিয়ে'র সন্ধান করছেন। যে মেয়েটি তাঁর লেখা টুকত সে না কি প্রেম ক'রে সরেছে।"

বললাম, "অবিনাশবাবু আর 'স্টেনো' রাখবেন না, তিনি একটা টেপরেকর্ডার কিনেছেন।"

"ও, তাই নাকি? তাহলে—"

কি বলব ভেবে পেলাম না।

গুড়গুড়ি মশায় ব্যায়ত আননে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এক্সচেঞ্জে একটা নাম লিখিয়ে রাখি। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

গুড়গুড়ি মশায় চ'লে গেলেন।

আমি কিন্তু হাঁপটি ছাড়তে পারলাম না। দুয়ারের কড়া আবার নড়ে উঠল। এই কড়া আর কলিং বেলও বিজ্ঞানের কীর্তি! চারিদিকে বিজ্ঞানের দৌরাত্ম্য!

"আসতে পারি?"

"আসুন, আসুন—"

বিজ্ঞানের অধ্যাপক কুলদাবাবু প্রবেশ করলেন।

"আরে মশায়, বিজ্ঞানের আর একটা অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শুনেছেন?"

"সবই তো অদ্ভুত। কোনটার কথা বলছেন?"

"'ফেরি' বলে যন্ত্রটার নাম শোনেন নি? যন্ত্র নয়, মিরাক্‌ল! দু-হাজার টাকার টিকিট কিনে সে যন্ত্রের মধ্যে আপনার কোনও মৃত আত্মীয়ের নাম লিখে ছেড়ে দিন সে যন্ত্রকে। যন্ত্র বোঁ ক'রে আকাশে উড়ে যাবে আর একদিন পরে আপনার মৃত আত্মীয়কে সশরীরে এনে হাজির করবে। একটা 'ফেরি'তে পাঁচজন আসতে পারে। মেশিনটার দাম দশ কোটি ডলার। এক হিসেবে সস্তাই বলতে হবে। বম্বের একজন বিজনেস ম্যাগনেট কিনে এনেছেন যন্ত্রটা। রোজ দশ হাজার টাকা কামাচ্ছেন। প্রফেসর গাউফক-রাউটন (Gowfok Routon) 'ফেরি'র সম্বন্ধে আজ বক্তৃতা দিচ্ছেন সায়ান্স কলেজে। যদি যেতে চান সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে, আমি সেখানেই যাচ্ছি—"

কুলদাবাবু কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে শ' পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। এখনও শোধ দেননি। মাঝে মাঝে এসে আমাকে নানা সভায় নিয়ে যেতে চান। একটু মাখামাখি ক'রে অন্তরঙ্গতা করবার চেষ্টা আর কি।

বললাম, "না, যাব না। শরীরটা ভালো নেই তেমন।"

কুলদাবাবু চলে গেলেন। পরমুহূর্তে চমকে উঠতে হল।

"কিরে হাবা, চিনতে পারিস" একি, কার কণ্ঠস্বর! আমি জ্যোতির্ময় পুরকায়স্থ, ছেলেবেলায় আমার ডাক নাম যে হাবা ছিল একথা তো বেশী লোক জানে না।

কাছে আসতে হকচকিয়ে গেলাম।

"কে, পাঁচা? তুই—"

"হ্যাঁ, বিশ বছর আগে হাতুড়ে রামু ডাক্তারের ইনজেকশনের খোঁচায় পটল তুলে-ছিলাম। 'ফেরি'র দৌলতে আবার সশরীরে ফিরে এলাম।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ বম্বে গিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তার পুরোনো স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছে। আর ভয় নেই ব্রাদার, ইহলোক-পরলোকে 'ফেরি' চলতে শুরু করেছে। এবার সবাই ফিরে আসবে। মহাত্ম দুরাত্মা, সব!"

আমি নির্বাক হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম।

"একটু কিন্তু মুশকিলে পড়েছি ভাই। সাহায্য করবি?"

"কি সাহায্য?"

"কোথাও বাড়ি পাচ্ছি না। তোর তো প্রকাণ্ড বাড়ি। থাকতে দিবি কিছুদিন?"

"তোর স্ত্রী যে বাড়িতে থাকত, সেটার কি হল?"

"দু'বছর বাড়িভাড়া বাকি পড়াতে বাড়িওলা তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। ব্যাপার কি হয়েছিল শোন্ তাহলে। আমি মারা যাবার পর আমার স্ত্রী বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ক্রিশ্চান হয়ে মিস্টার গোমেসকে বিয়ে করেছিল। আমার চারটি মেয়ে হয়েছিল, গোমেসেরও চারটি হয়েছে। তারপর হল ঝগড়া। চুলোচুলি, লাঠালাঠি। ডিভোর্স হয়ে গেল শেষে। এরপর আমার স্ত্রীর মাথায় ব্রেন-ওয়েভ এল একটা। গয়না-গাঁটি বিক্রি ক'রে বম্বেতে গিয়ে আমাকে আবার স্মরণ করলেন তিনি। না ক'রে

করবে কি, আটটা মেয়ে নিয়ে সে প্র্যাকটিক্যালি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। আমি এসে পড়লুম। সব দেখে শুনে তো ভাই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়েছে। কিন্তু আফটার অল, আমি ভাই ভদ্রলোক, যার সঙ্গে একদিন সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলাম তাকে রাস্তায় ফেলে তো পালাতে পারি না। তুই অন্তত মাসখানেক আমাকে থাকতে দে। আমি যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি ইতিমধ্যে।"

বললাম, "এক হিসেবে তুই যো রেফিউজি। রে ফিউজি ক্যাম্পে চলে যা না।"

"আমি আর কোথাও যাব না। এইখানে বসলুম।"

এই বলে সে আমার সোফায় বসে পড়ল।

"ওগো তোমরা চলে এসো না। হাবা আমার বাল্যবন্ধু—"

পাঁচু-গৃহিণী আটটি মেয়ে নিয়ে প্রবেশ করলেন। আমি ঘামতে লাগলাম। বুকের ভিতর কেমন যেন একটা যন্ত্রণাও হতে লাগল।

ভগবান কিন্তু দয়া করলেন। যন্ত্রণার অবসান হল। ঘুমটা ভেঙে গেল।

আর একটা কথা

'খুব সাজগোজ করেছ দেখছি। সোনালি রোদের পটভূমিকায় চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু কোথা যাচ্ছ জান?'

'না সে কথা তো ভাবিনি। তুমি জেনেছ না কি, তোমার তো জানা উচিত। এ পথে তুমিই তো আগে এসেছ, আমি তো এই সবে বেরুলাম। বেরুতে হয় তাই বেরুলাম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তাতো জানি না। সত্যি বলতে কি জানবার ইচ্ছাও নেই তেমন। আমি যে রূপ আর রঙের বাইরে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে সুরভির পশরা নিয়ে সবার দৃষ্টির সামনে আসতে পেরেছি এইই যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। চলছি সামনের দিকে। কোথায় গিয়ে পৌঁছব জানি না। তুমি জেনেছ না নাকি।'

'মনে হচ্ছে জেনেছি। কিন্তু সেকথা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে না। কনে হচ্ছে কথাটা পেড়েই ভুল করেছি।'

'কেন?'

'তুমি যে নূতন। তোমাকেও একদিন বিবর্ণ পুরাতনের দলে গিরে ভিড়তে হবে এ কথা এখন নাই শুনলে—'

আকাশে প্রকাণ্ড একটা সাদা মেঘ ভাসছিল বিরাট একটা দৈত্যের মতো। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত দৈত্যটা যেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পৃথিবীর দিকে। মনে হ'ল তার মুখে যেন একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল একথা শুনে।

'শুনলেই বা। যাত্রাপথের শুরুতেই জেনে রাখা ভালো কোথায় যাচ্ছি।'

'আমাকে দেখলেই আন্দাজ করতে পারবে খানিকটা। তোমার মতো আমারও রূপ ছিল একদিন, আমিও একদিন বর্ণের হিল্লোলে মদিরতা বিকীর্ণ করেছি, আমার সৌরভ আর মধুও একদিন পাগল করেছিল কত মধুকরকে। কিন্তু আজ আমার দিকে দেখ।'

'দেখছি তো। তোমার বেশ বেশ-বাস বিস্রস্ত, মলিন, শিথিল। কিন্তু মুখের

হাসি তো কমেনি। তাই মনে হচ্ছে আমারই স-গোত্র তুমি। আমাদের মুখের হাসি কখনও মুছে যায় না। কিন্তু সত্যই কি তুমি জেনেছ এ যাত্রার শেষ কোথায়? আমাকে বল না।'

'শেষ মরণে। মরণেরই ছায়া নেমেছে আমার সর্বাঙ্গে। কাল আর আমি থাকব না, অবলুপ্ত হ'য়ে যাব।'

'আমারও ওই পরিণাম?'

'সকলেরই।'

সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলটির মুখে শঙ্কার ছায়া নামল।

ভীত কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল মরণোন্মুখ ফুলটির দিকে।

পরদিন।

খুব ভোরে পূর্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। গান ধরেছে 'সদ্য-জাগ্রত' পাখীরা। আলোর আভাসে আর গানে চতুর্দিক পরিপূর্ণ।

পুরাতন ফুলটির পাপড়ি একে একে ঝরছে। তখনও কিন্তু তার মুখ-ভরা হাসি। নূতন ফুলটিকে সে যাবার সময় ডাক দিয়ে বলে গেল—ভয় পেও না। পূর্বাকাশে ওই দেখ মরণ এসেছে। দেখ, দেখ, কি অপরূপ সে। আজ আর একটা কথা জেনেছি, কাল সেটা জানতাম না। এই মুহূর্তে বুঝলাম এই শেষ নয়, আর একটা শুরু। ওই উষা-রঞ্জিত আকাশ আমার নব যাত্রাপথের স্বর্ণ-তোরণ। চললাম নূতন পথে।'

শেষ পাপড়িটি ঝ'রে গেল।

মনু

রমেন যখন শ্মশান থেকে ফিরল তখন অনেক রাত হয়েছে। পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। রমেনের মনে হ'ল, মা ঘুমিয়েছে কি? কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত বাড়িটাই যেন মূর্তিমান শোকের মতো মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। বাড়িরও কি শোক হয়? আমাদের মতো তারও কি সুখ দুঃখ আছে? তার মা-হারা মেয়ে মনুই তো বাড়িটার প্রাণ ছিল। মনু আজ চলে গেল। বাড়িটাও কি প্রাণহীন হ'য়ে গেল সে জন্য? এই ধরনের খাপছাড়া একটা চিন্তার ঝড় বয়ে গেল রমেনের মনে। বাইরেও একটা খাপছাড়া গোছের ঝড় উঠল। সামনের বাগানের গাছগুলোর ডালপালা সহসা আকুল হয়ে হাহাকার করতে লাগল যেন। ওরাও তো চিনত মনুকে।

......রমেন আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে উঠল। যেন চোর। বারান্দায় একটা হাতলহীন চেয়ার ছিল। তার উপরই বসল সে নিঃশব্দে। তারপর পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে দিলে। পকেটে হাত ঢুকিয়েই বসে রইল সে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল চিতার ছবিটা। মনুর চিতার নয়। মনুর ছোট্ট দেহ, ছোট্ট চিতা, বেশীক্ষণ সময় লাগেনি, অগ্ন্যুৎসবেরও বিশেষ সমারোহ হয়নি—সেটার কথা মনে হচ্ছিল না রমেনের। সে কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টাই করছিল

সে। আর একটা চিতার কথা মনে হচ্ছিল তার। ধনী জমিদার মহাজন এবং ব্যাংকার সুখলাল শেঠের চিতার ছবিটাই মনে ফুটে উঠছিল তার। সুখলাল শেঠও আজই মারা গেছেন। চন্দনকাঠ আর ঘি দিয়ে পোড়ান হয়েছিল তাঁকে। সঙ্গে তিন দল কীর্তনীয়া এসেছিল। সরগরম হয়ে উঠেছিল শ্মশান। সুখলাল শেঠ কিন্তু যখন চিতায় উঠলেন, তখন আর পাঁচজনের মতোই উঠলেন। উলঙ্গ, নিরলঙ্কার। হাতে সামান্য আংটিটি পর্যন্ত ছিল না। এইটে খুব ভালো লেগেছিল রমেনের। এইটে যেন তার মনে জোর যোগাচ্ছিল। পকেটের ভিতর মুঠোটা শক্ত ক'রে বসে রইল রমেন।

…ঝড়টা যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ থেমেও গেল। হঠাৎ অনড় হয়ে গেল সামনের বাগানের গাছপালাগুলো। এতে রমেনের ভয় পেল একটু। তার মনে হল গাছপালাগুলো অবাক হয়ে তাকেই দেখছে। অস্বস্তি হতে লাগল। গাছ-গুলোর হঠাৎ-থেমে-যাওয়া স্থির ভঙ্গী ক্রমশঃ অসহ্য মনে হতে লাগল তার। চোখ বুজে বসে রইল সে। চেষ্টা করতে লাগল সেই মহাশূন্যতার মাঝে নিজেকে নিয়ে যেতে যেখানে ইহজগতের কোন রকম স্পন্দন পেঁছিয় না। এতে সে ঠিক কৃতকার্য হ'ল কি না তা বলা শক্ত। কিন্তু সে পকেটের মধ্যে হাতটা মুঠো ক'রে চোখ বুজে বসে রইল।

…অনেকক্ষণ বসে ছিল। যখন চোখ খুলল তখন চাঁদ উঠেছে। সামনের বাগানের গাছগুলোর সে উৎসুক, অবাক, হঠাৎ-থেমে-যাওয়া ভাব আর নেই। তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। রমেনের মনে হ'ল ব্যাঙের হাসি। তার ভয় ঘুচল খানিকটা। হোক ব্যাঙের হাসি, তবু হাসি তো। এর পরই কিন্তু যা ঘটল তাতে চমকে উঠল রমেন। ভয়ানক চমকে উঠল। চাঁদ উঠেছিল বলে সামনের বাগানের এক কোকিল তাকে অভ্যর্থনা জানাল—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু। কিন্তু রমেনের মনে হল যেন বলে উঠল—উহু, উহু, উহু উহু। ভয়ানক কথা! এর ঠিক পরেই রমেন যা দেখল তা-ও ভয়ংকর। জ্যোৎস্নার একফালি আলো এসে পড়েছিল গোয়ালের সামনে। রমেনের মনে হ'ল, জ্যোৎস্নার স্বল্পালোক সত্ত্বেও সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল একটি ছোট মেয়ে গোয়ালের সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল খিড়কি দুয়ারের দিকে। তারপরই বাগানের সব পাখীগুলো ডেকে উঠল একসঙ্গে। যেন বলে উঠল—হয়েছে, হয়েছে, মজাটা খুব জমেছে এইবার। পাখীর ডাকে রমেন এসব কথা শুনল কি ক'রে! আশ্চর্য। কিন্তু স্পষ্ট শুনল সে। বজ্রাহতবৎ বসে রইল।

…একটু পরে আবার সংবিৎ ফিরে এল তার। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগল। ঘরের ভিতর তার মা কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন। মনুর গলা কি? পরমুহূর্তেই তার মা কপাট খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

"মনু, মনু, শোন, কোথা গেলি! ফিরে আয়।"

বারান্দায় বেরিয়েই রমেনকে দেখতে পেলেন তিনি।

"তুই কখন ফিরেছিস? আশ্চর্য কাণ্ড বাবা, মনু এখুনি এসেছিল। সে বললে, ঠাকুমা তুমি আমার হাতের বালা দুটো খুলে নিতে বারণ করেছিলে। ওরা কিন্তু খুলে নিয়েছে। সত্যি খুলে নিয়েছিল?

রমেন কোন উত্তর দিতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল চেয়ার থেকে। আলগা হ'য়ে গেল হাতের মুঠো। পকেট থেকে সোনার বালা দুটো বেরিয়ে পড়ল।

মুণ্ড সমস্যা

॥ ১ ॥

ফুটকা গ্রামের দারোগা সর্বেশ্বর প্রসাদ বিরাট একটা চুরির তদন্ত শেষ ক'রে ভেবেছিলেন একটু আনন্দ করবেন। কিন্তু ভগবান তাঁর অদৃষ্টে সেদিন সুখ লেখেন নি। সর্বেশ্বর ঠিক করেছিলেন শিকারে যাবেন। ছোট দারোগাকে ডেকে তিনি বললেন, "ওহে বড়বাবু, আজ আমাকে একটু ছুটি দেবে?" ছোট দারোগাকে তিনি বড়বাবু বলে ডাকতেন। ছোট দারোগা মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন সর্বেশ্বরবাবুর দিকে।

"কোথাও যাবেন না কি?"

"হ্যাঁ, শিকারে। মাত্র একরাত্রি বাইরে থাকব। শুনেছি 'মেঝেন' নদীর ধারে যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা আছে তার ঠিক নীচেই একটা বাঘ রোজ জল খেতে আসছে। বোংগা সর্দার খবরটা পরশুই দিয়ে গেছে আমাকে। ভাবছি আজই শার্দুল-প্রবরের সঙ্গে মোলাকাত করব। ভোরের দিকে আজ চাঁদও উঠবে। ভাবছি ওই অশ্বত্থ গাছেই রাতটা কাটাব।"

"একলাই যাবেন?"

"দোকলা নিয়ে শিকার হয় না। বোংগা হয়তো আসবে। ওর দোষ বড্ড বেশী ফিসফিস করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা বলে।"

তারপর একটু হেসে বললেন, "তুমি ফৈজু গাড়োয়ানটাকে খবর পাঠিয়ে দাও। সন্ধের সময় যেন গাড়িটা নিয়ে আসে তার। আমার বাইকটার চাকা দুমড়ে গেছে কাল—"

"আচ্ছা—"

এমন সময় চৌকিদার এসে খবর দিল—"পুকুরধারে একটা মড়া প'ড়ে আছে হুজুর। কে যেন ছুরি মেরে গেছে। মুণ্ডটাও নেই।"

বাঘ-শিকার মাথায় উঠল।

সর্বেশ্বর প্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠে ছুটলেন পুকুরের দিকে। গিয়ে দেখলেন বিরাট লাসটা পড়ে আছে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। পিঠের উপর একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ হ'য়ে আছে, মাথাটা নেই। সর্বেশ্বর প্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মনে হ'ল যদিও মুণ্ডটা নেই, তবু যেন লোকটাকে চিনতে পারছেন একটু একটু। তাঁর সঙ্গে দু'জন কনেস্টেবল গিয়েছিল। তাদের একজনকে বললেন, "ডান হাতটা তোলো তো।"

ডান হাতটা তুলতেই সর্বেশ্বর প্রসাদ ঝুঁকে দেখলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

"বাঁ হাতটা তোল।"

আবার ঝুঁকলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। ঝুঁকেই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"যাক্, পেয়ে গেছি।"

উলকি দিয়ে লেখা 'আলিজান' নামটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই আলিজানকে অনেক দিন থেকেই খুঁজছিলেন তিনি। যোগেন গোয়ালার কুমারী মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছিল লোকটা মাসখানেক আগে। সর্বেশ্বর প্রসাদ একটু দুঃখিত হলেন। আলিজানের মৃত্যুর জন্য নয়। আলিজানকে তিনি যদি জীবন্ত ধরতে পারতেন তাহলে তাঁর চাকরিতে কিছু উন্নতি হতো। এখন হবে না। যে লোকটা ওকে খুন করেছে তাঁর মতে সে একটা সৎকার্যই করেছে। আলিজান একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ছিল। কিন্তু আইন সে কথা শুনবে না। আইনের চক্ষে এ ধরনের সৎকার্যও খুন ব'লে গণ্য হবে। খুনী ধরা পড়লে বিচারে তার ফাঁসীও হবে হয়তো।

লাশটাকে সদর হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে আবার থানায় ফিরলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। গিয়ে শুনলেন আর একটা খুনের খবর এসেছে।

"আর একটা?"

"জি হুজুর। এটা মেয়েছেলে। মণিবাবুর বাগানে প'ড়ে আছে, হুজুর।"

আবার যেতে হ'ল সর্বেশ্বর প্রসাদকে।

বাগানটা পুকুরের পাড়ে। বাগান পুকুর দুইই মণিবাবুর। সর্বেশ্বর গিয়ে দেখলেন এ মেয়েটা চিৎ হয়ে আছে। এরও বুকে ছোরা বেঁধানো। তিনি যোগেন গোয়ালাকে থানায় ডেকে পাঠালেন। আর যে ক'টা দাগী গুণ্ডা ছিল ও অঞ্চলে তাদের গ্রেফতার ক'রে আনতে হুকুম দিলেন। এই রুটিন। মণিবাবুকেও ডাকতে হ'ল, কারণ তাঁর বাগান এবং পুকুরের ধারেই লাশ পাওয়া গেছে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যা পাওয়া গেল তা-ও একটু বিস্ময়জনক। আলিজানের রিপোর্টটাই বেশী বিস্ময়জনক। আলিজানের মুণ্ডটা না কি কোনও শাণিত অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়নি। মুচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। আলিজানের মতো তাগড়া লোকের মুণ্ডটা ছিঁড়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিপোর্টটা পড়ে সর্বেশ্বর হাসলেন একটু। তারপর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন।

"মানুষের মুণ্ড কি ছিঁড়ে নেওয়া সহজ ডাক্তারবাবু। ও কি ফুল, যে টপ ক'রে ছিঁড়ে নেবে কেউ?"

"আমি তো তা বলিনি কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। ওখানকার মাস্‌ল, নার্ভ, আর্টারি, ভেন্‌, হাড় দেখে মনে হ'ল শার্প ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দিয়ে কাটা হয়নি। মনে হয় কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। অবশ্য ব্লাণ্ট (blunt) কোন ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দিয়ে ওরকম হ'তে পারে। যেমন ধরুন, লোহার ডাণ্ডা, বা হাতুড়ি। খোঁজ করে দেখুন, আমার যা মনে হয়েছে তাই লিখেছি। আপনার থিয়োরি কি—"

সর্বেশ্বর প্রসাদ বললেন, "মেয়েটা যোগেন গোয়ালারই মেয়ে। যোগেন তাকে আইডেন্‌টিফাইও করেছে। আলিজান ওকেই নিয়ে পালিয়েছিল। সুতরাং মনে হয় আলিজানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এ কাজ করেছে।"

"সম্ভবত।"

ডাক্তারবাবুর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার খুব ঝোঁক। তাঁর মনে হ'ল শার্লক হোমস, পইরো বা চেস্টারটনের সেই পাদরী ডিটেকটিভ থাকলে এ সমস্যার ঠিক সমাধান করতে পারত। এরা কি পারবে?

বললেন "কোন ভালো ডিটেকটিভকে খবর দিন—"

"দিয়েছি। মুশকিল হয়েছে ক্ষুরধারবাবু বিলেতে গেছেন।"

"ক্ষুরধারবাবু আবার কে?"

"তিনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্রফেসারি করেন। অঙ্কের প্রফেসার। তিনি অনেক সময় আমাদের অনেক সমস্যা সমাধান ক'রে দেন।"

"ক্ষুরধার? নাম শুনিনি তো।"

"ওইটে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছেন। তাঁর আসল নাম মুকুল দত্ত।"

"ও মুকুল দত্তের নাম শুনেছি বই কি। খুব বিদ্বান লোক। তাঁর এ শখও আছে না কি?"

"খুব। ফুলবিবি মার্ডার কেসটার 'ক্লু' তো তিনিই ব'লে দিয়েছিলেন।"

"তাঁকে চিঠি লিখুন।"

"আজই লিখব।"

॥ ২ ॥

পুলিসের তদন্ত-বিভাগে যত রকম কৌশল এবং অস্ত্র ছিল সবই ব্যবহৃত হল একে একে। শেষপর্যন্ত দুটো কুকুরও এল। কিন্তু খুনের কোনও কিনারা হ'ল না। ক্ষুরধার বিলেত থেকে চিঠি লিখলেন ঃ

প্রিয় সুরেশ্বরবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আপনি যে সব খবর পাঠিয়েছেন তা অধিকাংশই বাজে খবর। আসল দুটি দরকারি খবর দেননি। মেয়েটির সম্বন্ধে আরও খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখছি—আলিজানের মুণ্ডের ক্ষতটা clean cut নয়। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করেছেন কেউ যেন মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। রেললাইনে কাটা পড়লে অনেক সময় ওই রকম হয়। হ'তে পারে, আলিজানের পিঠে ছুরি মেরে প্রথমে তাকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তাকে রেললাইনের উপর ফেলে রেখে আততায়ীরা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তার উপর দিয়ে ট্রেন চ'লে গিয়ে মুণ্ডটা যখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তখন তারা ধড়টাকে এনে পুকুরপাড়ে ফেলে পালিয়েছে। উদ্দেশ্য পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। আপনি বলতে পারেন রেলে কাটা পড়লে কি রেলের ড্রাইভার জানতে পারত না? সে কি কোন খবর দিত না? দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকালকার ড্রাইভারদের ব্যাপার দেখছেন তো কাগজে। রোজই অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে। সবাই প্রায় অমনোযোগী। তাছাড়া গভীর রাত্রে স্টেশন থেকে দূরে যদি কোন লোকের গলাটি শুধু রেলের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে ড্রাইভার অনেক সময় টেরও পায় না। সুতরাং কাছে-পিঠে রেললাইনের ধারে খোঁজ করুন, কোন মুণ্ড পাওয়া যায় কি না। যদি না পাওয়া যায় তাহলে ধ'রে নিতে হবে হয় যারা খুন করেছে তারা মুণ্ডটা সরিয়েছে, কিংবা কোন জন্তুজানোয়ারে সেটা নিয়ে গেছে। মুণ্ড যদি না পাওয়া যায় তাহলে আর একটা সম্ভাবনার কথাও মনে রাখবেন। হত্যাকারীরাই যদি মুণ্ড সরিয়ে থাকে তাহলে কেন সরিয়েছে এ প্রশ্নটারও মীমাংসা করতে হবে। খুব সম্ভবত প্রতিশোধ কামনা। ছিন্নমুণ্ড হয়তো উপহার দিয়েছে

কাউকে। মেয়েটির সম্বন্ধেও কিছু অনুসন্ধান করবেন। আপনি লিখেছেন মেয়েটির বিবাহ হয়নি। জানা দরকার তার অন্য কোনও প্রণয়ী ছিল কি না। মনে রাখবেন এটা খুব দরকারী খবর।

আমার দেশে ফিরতে এখনও দেরি আছে। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

ক্ষুরধার

সর্বেশ্বর প্রসাদ রেললাইনের আশপাশে অনেক খোঁজ করালেন, কোনও মুণ্ড পাওয়া গেল না। যোগেন গোয়ালার মেয়ের সম্বন্ধেও যে সব খবর পেলেন তার একটিও আশ্বাসজনক নয়। প্রত্যেকেই বলল, মেয়েটি খুব ভালো ছিল। গুণ্ডা তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার কোনও দোষ ছিল না। সর্বেশ্বর প্রসাদ সন্দেহবশত যাদের গ্রেফতার করেছিলেন তাদের ছেড়ে দিতে হ'ল একে একে। ব্যাপারটা ক্রমশ ধামা-চাপা প'ড়ে গেল।

এইবার সর্বেশ্বর প্রসাদ একদিন ঠিক করলেন মেঝেন নদীর ধারে যে বাঘটা জল খেতে আসছে রোজ রাত্রে, তার সঙ্গে একবার মোকাবিলা করবেন।

সেদিনও ভোর রাত্রে চাঁদ ওঠবার কথা। নদীর ঠিক ধারেই যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা আছে, সন্ধ্যে থেকেই সেখানে গিয়ে বসতে হবে। বোংগা সর্দার কদিন আসেনি। তবু তাকে খবর পাঠালেন যে তিনি সন্ধের পরই সেখানে পৌঁছবেন। সে-ও যেন আসে।

॥ ৩ ॥

ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটার ঘন পত্রগুচ্ছের আড়ালে নিস্পন্দ হ'য়ে বসেছিলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। বোংগা আসেনি। বোংগা সাঁওতাল, তাঁর খুব বাধ্য। সে না আসাতে একটু অবাক হয়েছিলেন সর্বেশ্বর প্রসাদ। একটু পরেই অন্ধকারকে স্পন্দিত করে শুরু হ'ল ঝিল্লীধ্বনি। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে ঝাঁঝর বাজাচ্ছে কে যেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে এই একঘেঁয়ে একটানা শব্দ শুনতে লাগলেন সর্বেশ্বর। শিকার করতে হ'লে ধৈর্য চাই। একটু পরে একটু বৈচিত্র্য এল। কোঁক্ কোঁক্ ক'রে শব্দ হ'তে লাগল একটা। সর্বেশ্বর ভাবলেন সাপে বোধহয় ব্যাং ধরেছে। তিনি পক্ষীতত্ত্ববিদ্ হলে বুঝতে পারতেন ওটা একরকম প্যাঁচার ডাক। ছোট ছোট কুটুরে প্যাঁচা। খানিকক্ষণ এই ডাক চলল। তারপর থেমে গেল। তারপর একদল তীক্ষ্ণকণ্ঠ ঝিল্লী আসরে নামল। তাদের স্বর অনেকটা সানাইয়ের ছোট ছোট আওয়াজের মতো। মনে হয় অন্ধকারের গায়ে যেন ছুরি মারছে। তারপর হু হু ক'রে হাওয়া উঠল একটা। আকুল হয়ে উঠল অশ্বত্থ গাছের ডালপালাগুলো। তারপর হঠাৎ থেমে গেল হাওয়াটা। মনে হ'ল প্রকৃতি হঠাৎ যেন থমকে গেল, কি যেন মনে পড়ে গেল তার। তারপর এল গোটাকয়েক বাদুড়, গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল। সর্বেশ্বর বাবুর একটু একটু গা ছমছম করছিল। কিন্তু সহসা চমকে উঠলেন। গাছের উপরে কারা যেন কথা বলছে।

"ভাই ফাতিমা, আলিজানকে তোমার এতো ভালো লেগেছে কেন বল তো।"

"ওই আলিজান নামটার জন্যেই প্রথমে তাকে ভালো লাগে। ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাস পড়েছিলাম যে! ফতিমা-আলিজানের গল্প পড়নি তুমি? সেই যে কাঠুরে—"

"না। আমি কোন বইই বিশেষ পড়িনি। আমি তোমাকে দেখেই পাগল হয়েছি ফাতিমা। কিন্তু তুমি তো আমার দিকে একবারও ফিরেও চাইছ না ফতি। আলিজান যখন তোমাকে ফেলে ওই গয়লানী মেয়েটাকে নিয়ে পালাল তখন তুমি গলায় দড়ি দিলে। আমিও দিলুম। তারপর থেকে সর্বদাই তোমার পিছু পিছু ঘুরছি। তুমি বলেছিলে ওদের শাস্তি দিতে, তা-ও দিয়েছি। তুমি বলেছিলে আলিজানের মুণ্ডটা তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে হয়েছে, তোমার সে ইচ্ছাও পূর্ণ করেছি। মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তোমার কবরখানায় রেখে এসেছি। কিন্তু তবু তো তুমি আমার দিকে ফিরে চাইছ না।

"আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি আলির মুণ্ডটা আমার কবরে রেখে এসেছ বটে, কিন্তু তবু কোন আনন্দ হচ্ছে না। কবরে পড়ে আছে আমার ক'খানা হাড়। বুঝতে পারছি ওই হাড় আমি নই—"

"দেখ ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না—"

হঠাৎ উপরের ডালপালাগুলোতে ভীষণ আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেল। মনে হ'ল একটুকরো ঝড় যেন উপরের ডালগুলোকে ঝাঁকাচ্ছে।

সর্বেশ্বর প্রসাদ আর গাছে বসে থাকতে পারলেন না। দুড় দুড় ক'রে নেবে পড়লেন।

তার পরদিন সকালেই তিনি হোসেনপুর কবরখানায় গেলেন। গিয়ে দেখলেন সত্যিই একটা কবর থেকে খানিকটা মাটি যেন খোঁড়া হয়েছে। সেটা আরও খোঁড়ালেন তিনি। যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল। দেখলেন একটা কঙ্কাল একটা পচা মুণ্ডকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে আছে।

বোংগা সর্দার এসে বলল—ওই গাছটায় ক'দিন থেকে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে বলে তার বউ তাকে আসতে দেয়নি।

পোস্টকার্ডের গল্প

"তুমি আমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছ কেন। আমার বড় লজ্জা করে।"

"লজ্জা আবার কি। পর-স্ত্রীকে তো লিখিনি, নিজের স্ত্রীকেই লিখেছি।"

"রাণীর স্বামী তাকে চিঠি লেখে। কি সুন্দর খাম, কেমন রঙীন কাগজ, কেমন ভুরভুরে গন্ধ। সবুজ কালী দিয়ে কত বড় চিঠি লিখেছে দেখলুম।"

"তাতে কি হয়েছে। রঙীন খামে বড় চিঠি লিখলেই কি বেশী ভালোবাসা দেখানো যায়? পোস্টকার্ডেও সাঁটে অনেক কথা বলেছি আমি। তুমি হয়তো বুঝতে পার নি। পড় তো চিঠিটা—"

গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা হইতেছিল। যুবতী বধূ ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে পোস্টকার্ডটি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

"কল্যাণীয়াষু, তুমি মনে করছ অনেক দূরে চলে এসেছি। দুমকা আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে বটে। কিন্তু সত্যি কথা আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি ভালো করে খুঁজে দেখো। চাকরির চেষ্টায় বিদেশে বেরুতেই হবে, উপায় কি। এখনও কিন্তু চাকরি জোটাতে পারিনি। চাকরি যদি না-ও জোটে তবু তোমার জন্যে একটা কুলো আর একটা চুপড়ি কিনে নিয়ে যাব। এখানে দেখছি এগুলো তৈরি করে। আমার অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি"—

"কুলো আর চুপড়ি পছন্দ হয়েছে তো ?"

"হয়েছে।"

আসল কথাটা সে কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিল না। গাড়ি ভাড়া, বাস ভাড়ার পয়সা রাখিয়া, হোটেলে খাইয়া, কুলো আর চুপড়ি কিনিবার পয়সা বাঁচাইয়া তাহার হাতে আর খাম কিনিবার পয়সা ছিল না। পোস্টকার্ড কিনিতেই সব পয়সা ফুরাইয়া গেল। একটা বিড়ি পর্যন্ত কিনিতে পারে নাই।

বৃন্ত-চ্যুত

নীল অপরাজিতা ফুলটি চোখ মেলেই দেখতে পেল আর একটি নীল স্বপ্ন তার সামনে হেলেছে দুলছে। তারপর সে স্থির হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর একটি কিশোরের মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের ভাষায় যে কথা সে বলল সে কথা চিরকাল সবাই বলছে।

বলল, "আমি তোমাকে চাই।"

শুধু বলল না, তার চাওয়ার আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল লতা-কুঞ্জে, সোনালি রোদে, পাখীর গানে, হাওয়ার হিল্লোলে। কে এই যাদুকর !

বিস্মিত অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ? আমাকে চাইছ কেন ?"

"আমি আকাশ। আমারই আগ্রহ আজ মূর্তি ধরে কামনা করছে তোমাকে। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

"আমাকে চাইছ কেন ?"

"তুমি যে নীল। আমার সঙ্গে তোমার মিল আছে। আমি মহাশূন্য, আমার সঙ্গিনী কেউ নেই। তুমি আমার সঙ্গিনী হবে চলো।"

"কিন্তু তুমি যে কত বড় আর আমি কতটুকু। আমি কি তোমার সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত ?"

"আমি যে অনেক বড়, এইটেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। আমার শূন্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার দোসর হতে পারে এমন কেউ নেই।"

অপরাজিতা সবিস্ময়ে চুপ করে রইল।

আকাশ আবার বললে, "অনেকে মনে করে সময়ও আমার মতো অনাদি অনন্ত। কিন্তু সেটা ভুল। সময় তোমাদেরই সৃষ্টি। আমারই মাপকাঠিতে তাকে তোমরা মাপ। সময় ব'লে আলাদা কিছু নেই, আমিই সময়। আমার শূন্যতায় সূর্য চন্দ্র

গ্রহ নক্ষত্রের সমারোহ দেখতে পাও, কিন্তু তারা আমার আপনার লোক নয়। তারা পথিকের দল, আমি মহাশূন্য, আমার কেউ নেই, তুমি চল আমার কাছে—"

অপরাজিতা চুপ ক'রে রইল।

আকাশও তার মুখের দিকে চেয়ে রইল আরও খানিকক্ষণ। তারপর বলল "তুমি হয়তো ভাবছ সমুদ্রের কাছে কেন যাইনি। গিয়েছিলাম। সে বলে পৃথিবী ছেড়ে আমি তোমার কাছে যেতে পারব না। সে বলে, বাষ্প হয়ে রোজই তোমার কাছে যাচ্ছি তাতে তোমার মন ভরে না? বললাম, না ভরে না। সে বাষ্প বৃষ্টি হয়ে আবার ফিরে আসে তোমার কাছে। আমি যেমন শূন্য তেমনি শূন্যই থাকি। সমুদ্রই আমাকে তোমার কথা বলেছে। চল, তুমি আমার সঙ্গে।"

"আমি কি ক'রে যাব—"

"এই যে রথ এনেছি তোমার জন্যে—"

হাত তুলতেই মূর্ত হ'ল রথ। অপূর্ব রামধনু-রঙে-রঞ্জিত শাদা মেঘের সুন্দর ফানুস একটি।

অপরাজিতা মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইল রথটির দিকে। এ যে কল্পনাতীত।

"এই রথে চড়ে কোথায় যাব?"

"আমার কাছে। ওই দূরে অনন্ত আকাশে।"

"অতদূরে যেতে পারব কি?"

"নিশ্চয় পারবে। আমার সঙ্গে যাবে তুমি। আমি তোমাকে অমরত্ব দান করব। চল।"

কিশোর বালক তখন হাত বাড়িয়ে ফুলটি তুলতে গেল। বৃন্তে টান পড়তেই আর্তস্বরে বলে উঠল অপরাজিতা—"পারব না, পারব না, পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারব না, বড্ড লাগছে ছেড়ে দাও।

বৃন্ত-চ্যুত ফুল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তিনমুণ্ডী

তাহার সহিত আমার প্রথম দেখা বাজারে। মাংসের বাজার হইতে বাহির হইয়াই যেখানে চাল, ডাল, মশলা, ডিম, তরি-তরকারি প্রভৃতির একটা ছোটখাটো বাজার আছে তাহারই একধারে সে ছোট একটি ডালা লইয়া বসিত। ডালায় থাকিত ডিম। আমার ডিম-ওলা রহিম। ডিমের দরকার হইলে সোজা তাহার কাছেই যাইতাম। সে বাছিয়া, জলে ডুবাইয়া, যত্ন সহকারে ডিমগুলি মুছিয়া, ঠোঙায় পুরিয়া আমার গাড়িতে দিয়া আসিত। সুতরাং অপরের কাছে ডিম লইবার প্রশ্নই আমার মাথায় কখনও জাগে নাই। কিন্তু একদিন জাগিল। হঠাৎ অসময়ে বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। আমাদের তখন খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে। সকালে মাছ মাংস যাহা কিনিয়াছিলাম সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীর নির্দেশে আবার বাজারে ছুটিতে হইল। তখন বেলা দুইটা। গিয়া দেখি মাছমাংসের দোকান উঠিয়া গিয়াছে। রহিমের দোকানও

বন্ধ। মফঃস্বলে কলিকাতার মতো সবসময়ে মাছমাংসের দোকান খোলা থাকে না। মহামুশকিলে পড়িলাম। এমন সময় আমার পরিচিত একটি ঝাঁকা-ওলা কুলি খবর দিল—তিনমুণ্ডীর কাছে ডিম পাইতে পারি। তিনমুণ্ডী কে আবার? রাবণের মাথায় দশটা মুণ্ড ছিল শুনিয়াছি। আজকালকার বাজারে একটা মুণ্ডকেই সামলাইয়া রাখা কঠিন। তিনমুণ্ডী কোথা হইতে আসিল আবার? কুলিটা তখন ওই বুড়িটাকে দেখাইয়া দিল। দেখিলাম একটা মাংস-পিণ্ডের মতো বুড়িটা একধারে বসিয়া আছে। একমাথা তৈলবিহীন রুক্ষ চুল। ঘাড়টাও বাঁকা। মুখটা আকাশের দিকে উঁচু করা। কুলিটাই আমাকে তাহার কাছে লইয়া গেল।

"এই তিনমুণ্ডী ডাক্তারবাবুকে ডিম দে—" বলিয়াই ছোঁড়াটা সরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তুবড়ি ফাটিয়া গেল যেন। গালাগালির তুবড়ি। এত রকম দুর্বোধ্য, অশ্রাব্য, অশ্লীল গালাগালি এত দ্রুত উচ্চারিত হইতে কখন শুনি নাই। একটা বিরাট বিস্ফোরণ হইয়া গেল যেন। খানিকক্ষণ হতবাক হইয়া রহিলাম। গালাগালি শেষ করিয়া বুড়ি হাঁপাইতে লাগিল।

"আমাকে ডিম দে।—ক'টা আছে?"

"সতেরোটা আছে।"

"সবগুলোই দে। ভালো তো ডিমগুলো?"

"সে কথা মুর্গীদের জিগ্যেস কর গে যাও। আমি জানব কি ক'রে। ভালো মন্দ তারা যা পেড়ে দিয়েছে, দিয়েছে, নিয়ে এসেছি—"

"খারাপ ডিম পয়সা দিয়ে নিয়ে যাব কি ক'রে?"

"তুমিই দেখ না, পছন্দ না হয় নিও না।"

"তুমি দেখে দেবে না?"

"আমি পারই না। আমার বেটা যেদিন মরেছে সেই দিন আমার চোখের আলোও নিবে গেছে। তুমিই দেখে নাও। আমি অনর্থক পাপের ভাগী হ'তে পারব না।"

নিরুপায় হইয়া আমি সবগুলিই লইলাম। যে বিচক্ষণ দৃষ্টি থাকিলে কেবল দেখিয়া ভালো ডিম খারাপ ডিম চেনা যায় সে দৃষ্টি আমরাও ছিল না। বুড়ি যখন ডিমগুলি গণিয়া দিতেছিল তখন লক্ষ্য করিলাম বুড়ির কুঁজ আছে, বুকের মাঝখানেও মাথার মতো কি যেন একটা উঁচু হইয়া রহিয়াছে। ছেলেবেলায় ভিটামিনের অভাবে অনেক ছেলেমেয়ের বুকের কাছটা পায়রার বুকের মতো উঁচু হইয়া যায়। ভাবিলাম, হয়তো বুড়িরও তাহাই হইয়া থাকিবে। মোট-কথা 'তিনমুণ্ডী'র তাৎপর্যটা বুঝিতে পারিলাম।

"কিসে ডিম নেবে?"

"ঠোঙা নেই?"

"না। কাপড় পাত না, খুঁটের একধারে বেঁধে দিচ্ছি।"

পাশের মুদির দোকান হইতে একটা ঠোঙা চাহিয়া লইলাম। ঠোঙায় ডিমগুলি পুরিয়া বুড়িকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম।

"আমার কাছে ভাঙানি নেই। ভাঙিয়ে এনে দাও—" রহিমের দোকান খোলা থাকিলে আমাকে এসব দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। সে ভালো ডিম বাছিয়া ঠোঙায় করিয়া ডিম আমার গাড়িতে পেঁছাইয়া দিত। তাহার নিকট ভাঙানির কখনও অভাব হইয়াছে এ কথাও মনে পড়ে না। আবার সেই মুদির শরণাপন্ন হইলাম।

"আমাকে এই পাঁচটাকা ভাঙিয়ে দাও ভাই। দু'এক টাকার খুচরোও করে দাও। আচ্ছা এক বুড়ির পাল্লায় পড়েছি। ও যা রাগী দেখছি, ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতেও ভয় করে—"

"হ্যাঁ, ও সাংঘাতিক বুড়ি। গোখরো সাপ যেন, ফণা তুলেই আছে। মাথায় বোধহয় ঘৃতকুমারীর রস ঘসে, কিন্তু ফল যে বিশেষ হয়েছে তাতে মনে হয় না।"

"ঘৃতকুমারীর রস ঘসে না কি! কি করে জানলে সেটা?"

"ওর মাথায় চাঁদির খানিকটা চৌকোণা ক'রে কামানো। পয়সা দেবার সময় লক্ষ্য করবেন। যারা ঘৃতকুমারীর রস মাথায় ঘসে তারা ওই রকম ক'রে কামায়।"

দাম দিবার সময় লক্ষ্য করিলাম সত্যই বুড়ির মাথার মাঝখানটা কামানো।

॥ ২ ॥

পরদিন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। ব্যাপারটা বেশ গম্ভীর এবং শোকাবহ। আমার বন্ধুর একমাত্র পুত্রটি কিছুদিন আগে মারা গিয়াছে। বন্ধু ধনী লোক। তিনি পুত্রের একটি ছবি ভালো শিল্পীকে দিয়া আঁকাইয়া সেটি একটি মর্মর বেদীর উপর স্থাপন করিয়াছেন। এখন তাহার সম্মুখে একটি রেশমের পর্দা টাঙানো আছে। আমাকে গিয়া সুতা টানিয়া সেই পরদাটি সরাইয়া দিতে হইবে। তাহারই উৎসব। গিয়া দেখিলাম শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘরে ফুলের মালা এবং ধূপধুনার সমারোহ। সভা আরম্ভের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' সুললিত কণ্ঠে গাহিলেন একটি সুবেশা সুন্দরী মহিলা। খুব দরদ দিয়া গাহিলেন। বন্ধুপত্নী একটি গরদের কাপড় পরিয়া একধারে নতমুখে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন। আমি একটি কবিতা পাঠ করিয়া চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলাম। তাহার পর জনৈক শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদ হইতে কিছু পাঠ করিলেন। তাহার পর একটি সুমুদ্রিত ছাপানো পুস্তিকা বিতরিত হইল। তাহাতে আমার বন্ধুপুত্রের একটি ছবি এবং সম্যক পরিচয় ছাপা হইয়াছিল। তাহার পর আর একটি রবীন্দ্র-সংগীতের পর সভা সমাপ্ত হইল। অতঃপর কিছু জলযোগান্তে ডিসপেন্সারিতে আসিয়া দেখি তুমুল কাণ্ড। ডিসপেন্সারির রাস্তার উপরে সেই তিনমুণ্ডী একদল বালকের বাপান্ত করিতেছে। তাহারা বুড়িকে ক্ষেপাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে, বুড়ি চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম ব্যাপারটা আরও মর্মান্তিক হইয়াছে এই কারণে যে বেসামাল হওয়াতে বুড়ির ডিমের ঝুড়িটাও রাস্তায় পড়িয়া গিয়া তাহার প্রায় সবগুলি ডিমই ভাঙিয়া গিয়াছে। বুড়ি খানিকক্ষণ চীৎকার করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া আমার ডিসপেন্সারির বারান্দার উপর বসিল। সেখানে আগেই একটা নাপিত আসিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম বুড়ির সহিত তাহার আলাপ আছে।

"আমার মাথার মাঝখানটা কামিয়ে দিবি? অনেক চুল হ'য়ে গেছে। আজ কিন্তু পয়সা দিতে পারব না, সব ডিমগুলো ভেঙে গেল, দেখলি তো।"

"আমি এখন ধারে কামাতে পারব না, এখনও আমার 'বউনি' হয়নি।"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, "তুই ডাক্তারবাবুর কাছে একটা ওষুধ চেয়ে নে না। এমন সব ভালো ওষুধ আছে যে একবার লাগিয়ে দিলে সব চুল উঠে যাবে, আর হবে না।"

কয়েক মিনিট পরে বুড়ি আমার চেম্বারে ঢুকিয়া মাথা দেখাইয়া ঔষধ চাহিল।

"ওখান থেকে চুল উঠিয়ে দিতে চাইছ কেন? ঘৃতকুমারী লাগাও নাকি ওখানে?"

"ঘৃতকুমারী তোমরা লাগাও গে যাও। আমি লাগাতে যাব কোন দুঃখে।"

"তবে? ওখানকার চুল উঠিয়ে দিতে চাইছ কেন?"

বুড়ি উর্ধ্বমুখে নির্বাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। সহসা লক্ষ্য করিলাম তাহার চোখের দুই কোণ দিয়া জল পড়িতেছে। অবাক হইয়া গেলাম।

"কি হ'ল?"

"কেন ওখানটা কামিয়ে ফেলি তা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে?"

"করব না কেন?"

বুড়ি তখন প্রায় চুপি চুপি বলল, "ওটা আমার ছেলের আসন। সে রোজ আসে আমার কাছে ওইখানে তাকে বসাই। আর কোথায় বসাব বল? বুকের উপর হাড় উঁচু, পিঠে তো কুঁজ। তাই মাথার আসন করে দিয়েছি। চুলে পাছে কুট কুট করে তাই ওটা কামিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। সে কম্বলের আসনে বসতে পারত না, তার জন্যে একটা কার্পেটের আসন কিনেছিলাম—"

"তোমার ছেলে!"

"হ্যাঁ বাবু আমার ছেলে। ওই হতভাগা ছোঁড়াদের পাল্লায় প'ড়ে গাছে উঠেছিল। সেখান থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। সে কিন্তু আসে আমার কাছ। বিশ্বাস কর তুমি। তাই তার জন্যে আসন করে রেখেছি— ।"

বুড়ির সহিত আর তর্ক করিলাম না। বলিলাম, "আচ্ছা, এই ওষুধটা নিয়ে যাও, লাগিয়ে দেখো।"

"এর দাম কত? আমি ডিম দিয়ে দিয়ে এর দাম শোধ করে দেব। এখন কাছে পয়সা নেই।"

"দাম তোমায় দিতে হবে না।"

"সে কি হয়। এর দাম তোমায় নিতেই হবে।"

বুড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সমারোহপূর্ণ যে শোকসভায় কিছুক্ষণ পূর্বে গিয়েছিলাম সহসা সে কথাটাও মনে পড়িল।

তারা

মিনু, জিতু হারু আর ফনুতি সেদিন রাত্রে ছাতের উপর শুয়েছিল মাদুর পেতে। আকাশ ভরা তারা। তারার দিকেই চেয়েছিল সবাই। হঠাৎ মিনু বললে—"আচ্ছা তারাগুলো কি রকম দেখতে লাগছে বলতো।"

জিতু। যেন একরাশ শাদা মার্বেল ছড়িয়ে আছে কালো মেঝের উপর।

হারু। মার্বেল নয়, শাদা পুঁতি।

ফনুতি। যাঃ, ওসব বাজে কবিত্ব করছিস। আমার কি মনে হচ্ছে বলব?

মিনু। বল্।

ফনুতি। আমাদের ওই মোটা কুচকুচে কালো দাইটার সর্বাঙ্গে যদি খোস বেরোয়, তাহলে যেমন দেখতে হয় তেমনি দেখাচ্ছে।

মিনু। ছি, ছি, তোর মনটাই কুৎসিত, তাই ওরকম ভাবতে পারলি।

এমন সময়ে ওদের বড়দা সুরেন এল ছাতে।

মিনু। বড়দা নক্ষত্রগুলোকে কেমন দেখাচ্ছে বলতো—

বড়দা। একরাশ কাবুলী মটর যেন ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে।

হারু। আমার আর একটা উপমা মনে হয়েছে। আকাশে বোধহয় দেয়ালী হচ্ছে, অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়েছে দেবকন্যারা।

বড়দা বি. এস. সি ক্লাসের ছাত্র।—

তিনি বললেন, "ওগুলো প্রদীপ বটে। কিন্তু ছোট ছোট নয়। প্রত্যেকটি বিরাট। বিরাট বিরাট আগুনের গোলা দুলছে—মহাশূন্যে—"

বড়দা নক্ষত্রদের বিজ্ঞান-সম্মত কাহিনী শোনাতে লাগলেন। ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

মিনু স্বপ্ন দেখল যেন একটি তার বয়সী ফুটফুটে মেয়ে তার কাছে এসে ব'সে মুচকি মুচকি হাসছে।

"আমাকে তোমরা কেউ চিনতে পারনি।"

"কে তুমি?"

"আমি তারা। আমি তোমার চোখে আছি।"

ব'লেই সে একটা উল্কার মতো আকাশে উড়ে গেল। মিনুর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল অগণ্য তারা। সবাই মুচকি মুচকি হাসছে তার দিকে চেয়ে।

পুনর্মিলন

॥ ১ ॥

অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। ছবি এককালে আমার সহপাঠী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর বহুদিন দেখা হয়নি। জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দু'জনে দুদিকে গিয়ে পড়েছিলাম, আমি হয়েছিলাম কেরাণী আর সে হয়েছিল ডাক্তার। হঠাৎ একদিন দেখা হ'য়ে গেল রেলস্টেশনে। আমি তাকে চিনতে পারিনি। কাঁচাপাকা একমুখ গোঁফ-দাড়ি, চোখে চশমা, ঢিলেঢালা জামা-পাজামা-পরা লোকটার মধ্যে যে আমার বাল্যবন্ধু ছবি লুকিয়ে আছে তা ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। সে কিন্তু আমায় চিনতে পেরেছিল। আমার জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, তোবড়ানো ভাঙা গাল, নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। সে হঠাৎ আমার সামনে এসে বললে—"কে রে সতু?"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আমি ছবি।"

তারপর দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

"কোথা যাচ্ছিস—"

"লিলুয়া যাব।"

"লিলুয়ায় বাড়ি নাকি?"

"না। ওখানে আমার ভগ্নীপতি থাকেন। রেলে কাজ করেন তিনি।"

"আয় এই বেঞ্চটায় বসা যাক, ট্রেনের এখনও দেরি আছে। আয় একটু গল্প-সল্প করা যাক। তোর চেহারাটা তো বড্ড কাহিল দেখছি।"

বেঞ্চিতে দু'জন পাশাপাশি বসলাম।

বললাম, "গত দশ বৎসর ধ'রে নানা ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগছি। ভাবছি এবার কোথাও চেঞ্জে যাব। আমার ভগ্নীপতি ছুটি নিয়ে পুরী যাচ্ছেন, তাই সেখানে যাচ্ছি, দেখি যদি তাদের দলে জুটে পড়তে পারি। একা চেঞ্জে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, না দৈহিক, না আর্থিক।"

হঠাৎ কথাগুলো ব'লে ফেলে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিলাম। নিজের দৈন্যের কথা অপরকে জানিয়ে লাভ কি।

ছবি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর যা বললে তা অপ্রত্যাশিত।

"আমার মধুপুরে বাড়ি আছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। তুইও চল আমার সঙ্গে।"

অবাক হ'য়ে গেলাম।

"না ভাই। কোনও অচেনা পরিবারের মধ্যে থাকতে চাই না। তুমি আমার বন্ধু হ'তে পার, কিন্তু তোমার পরিবারের লোকেরা আমার বন্ধু নয়, তারা আমাকে গলগ্রহ ভাববে।"

হো হো ক'রে হেসে উঠল ছবি। সে যে অত জোরে হাসতে পারে তা জানতাম না। সমস্ত প্ল্যাটফরমটা যেন গমগম ক'রে উঠল।

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার পরিবার নেই। বিয়ে করিনি। মধুপুরে টুকরাই আমার সব।"

"টুকরা কে—?"

"একটা সাঁওতাল চাকর। তুই আমার সঙ্গে চল, কোনও অসুবিধা হবে না।"

তার আমন্ত্রণে সত্যিই একটা আন্তরিকতার সুর বাজল।

চলে গেলাম তার সঙ্গে।

॥ ২ ॥

মধুপুরে গিয়ে চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ি। চারিদিকে বাগান। তখন শীতকাল। গোলাপ ফুলের হাট বসে গেছে যেন।

ছবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখান থেকে ডাক্তারের বাড়ি কত দূর? আমার মাঝে মাঝে রাত্রে পেটে ব্যথা হয়—।"

"আমিই তো ডাক্তার। এখানে কিছু হবে না তোর। রোজ মুর্গি খা একটা করে। টুকরো রাঁধে ভালো।"

তার বাগানটা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখছিলাম। অনুভব করছিলাম ছবি শুধু ধনী

নয়, শৌখীনও। কত রকম ফুল যে লাগিয়েছে। বাগানের এক কোণে একটা ছোট গাছ দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সর্বাঙ্গে ফুল, প্রত্যেক ফুলে সাদা বেগুনী আর গোলাপী রঙের ছিট। মনে হ'ল একটি কিশোরী মেয়ে যেন ছাপা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

"এটা কি গাছ ছবি—চমৎকার তো?"

"এর নাম আমি জানি না। টুকরা কোথা থেকে বিচি এনে পুঁতেছিল। জংলি গাছ কোন—"

"বিচি পেলে আমিও নিয়ে যেতুম।"

"টুকরাকে বলব—"

মধুপুরে একমাস ছিলাম। আরও থাকতাম, কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে গেল। ওই একমাসেই কিন্তু স্বাস্থের প্রচুর উন্নতি হ'ল। ছবি কোন ওষুধ দেয়নি। ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আমার ব্যথাও আর হয়নি। যাওয়ার দিন ছবি বললে—"সুখাদ্যের অভাবই তোমার আসল রোগ। এখানে যা খেতে ওখানেও তাই খাবে।"

"অত টাকা কোথায় পাব ভাই।"

"আমি দেবো। আমি মাসে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাব।"

"কেন—"

"টাকা আছে আমার। খরচ করতে হ'লে বদ-খেয়ালে খরচ করতে হয়। তা করতে চাই না। তুই আমার বাল্যবন্ধু। এই একমাস ধরে তুই আমাকে যা দিয়েছিস তা আমি কোথাও পাইনি। তা দুর্লভ, তা অমূল্য। যখন ছুটি পাবি তখনই এখানে চলে আসিস"

আমার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে বললে—"ভালো ক'রে খাবি। তুই বেঁচে থাকলে আমারও জীবনের একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। আমার কেউ নেই, আমি একা।"

ছবি আর্তনাদ ক'রে উঠল যেন।

আসবার ঠিক আগে টুকরা আমার হাতে কালো রঙের একটা বিচি এনে দিলে।

"ওই গাছের বিচি বাবু। কোথাও লাগিয়ে দেবেন, গাছ হবে।"

বিচিটি খামে মুড়ে পকেটে রেখে দিলাম।

॥ ৩ ॥

বাড়িতে ফিরেই নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম। দুটো ছেলের জ্বর, গিন্নীর কোমর ব্যথা, গোয়ালার অন্তর্ধান, চিনির অনটন, লাইট খারাপ, সাইকেলের চাকা ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতি দুর্যোগ যেন আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল। আমি আসতেই হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ল। বিচিটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল পনের দিন পরে। তখন জামার পকেটে সেটা আর খুঁজে পেলাম না। চারিদিকে খুঁজলাম কোথাও পাওয়া গেল না।

॥ ৪ ॥

বছর ঘুরে গেল। এর মধ্যে আর মধুপুর যেতে পারিনি। কেরানীর পক্ষে বছরে একবারের বেশী ছুটি পাওয়া যায় না। ছবি কিন্তু প্রতিমাসে নিয়মিত আমাকে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাত। নিতে দ্বিধা করতুম না। গরীব কেরানীর আত্মসম্মান সব সময়ে নিখুঁত নয়। কিন্তু যে জন্য সে টাকাটা পাঠাত সেটা প্রায়ই করা হতো না। অর্থাৎ নিজের খাবার জন্যে ফল, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ কিনতে পারতাম না। তার টাকায় আমার সংসার একটু বেশী সচ্ছল হয়েছিল এই যা। মাঝে মাঝে ভালো ভালো খাবার যে কিনতাম না তা নয়। কিনতাম, কিন্তু সেটা সবাই মিলে খেতুম। এক হিসেবে এটা প্রতারণা হচ্ছিল। কিন্তু গরীব কেরানীরা কি সব সময়ে প্রতারণা-মুক্ত থাকতে পারে? তাদের পরের দানও নিতে হয়, মাঝে মাঝে প্রতারণাও করতে হয়।

তারপর হঠাৎ একদিন বজ্রাঘাতটা পড়ল মাথার উপর। খবর পেলুম, ছবি আত্মহত্যা করেছে। ছুটে গেলুম মধুপুরে। তখন তার শবদেহ দাহ করা হ'য়ে গেছে। যাবার সময় সে নাকি লিখে গেছে—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি সুখী ছিলাম না, তাই আত্মহত্যা করেছি। চিঠিখানা শুনলাম পুলিশের কাছে আছে।

॥ ৫ ॥

মাস দুই পরে ছবির উকিলের একটি পত্র পেলাম। ছবি নাকি তার উইলে আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছে। উকিলের কাছে সে আমার নামে একটি চিঠিও রেখে গিয়েছিল। ব'লে গিয়েছিল তার মৃত্যুর পর চিঠিটি যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উকিলবাবুর চিঠির সঙ্গে শিলমোহর করা আমার চিঠিও ছিল। ছোট্ট চিঠি।

ভাই সতু,

আর ভালো লাগছে না। এবার চললুম। তোর জন্যে দশ হাজার টাকা রেখে গেলুম, ভালো ক'রে খাওয়া দাওয়া করিস। ইতি—

ছবি

টাকার অভাবে আমার বড় মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না। টাকাটা পাওয়াতে তার বিয়ে দিতে পারলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মেজ ছেলে ছুটে এসে বললে—বাবা ওদিককার ওই আস্তাকুঁড়টায় কি সুন্দর একটা ফুলের গাছ হয়েছে দেখবে চল।

গিয়ে দেখি সেই অপরূপ গাছ যা ছবির বাগানে দেখেছিলাম, যার বিচি টুকরা আমাকে এনে দিয়েছিল, সর্বাঙ্গে ফুল ফুটিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। ছবিকেই আবার দেখতে পেলাম যেন।

পোকা

॥ ১ ॥

নিখিলরঞ্জন পোকার শত্রু ছিল। পোকা দেখিলেই মারিয়া ফেলিত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার এই অভ্যাস। মানুষের যেমন মুদ্রা-দোষ থাকে অনেকটা তেমনি। কোথাও পোকা দেখিলে তাহাকে না মারা পর্যন্ত সে স্থির থাকিতে পারিত না। ছেলেবেলা সে বাড়ির আশপাশে ঘুরিত পোকা ধরিবার জন্য। প্রজাপতি বা উড়ন্ত-পোকাদের প্রায়ই ধরিতে পারিত না, ধরিত সেই সব পোকাদের যাহারা পাতার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে। শশা বা ঝিঙের লতায় একরকম গোল গোল লাল পোকা থাকে। নিখিল সেগুলিরই বিশেষ শত্রু ছিল। কিছুদিন পরে কিন্তু আর এক ধরনের পোকার বিরুদ্ধে সে অভিযান শুরু করিল। পোকাগুলি ছাই-ছাই রঙের, সর্বাঙ্গ শক্ত খোলায় আবৃত। চোখ দু'টি নিষ্ঠুর। একটি ছেলে নিখিলকে পোকাটির বিষয়ে জ্ঞান-দান করিল।

"ভয়ানক পাজি পোকা এগুলো। ওদের কান-কটারি পোকা বলে। এরা সুযোগ পেলেই কানে ঢোকে। সাংঘাতিক পোকা"—নিখিল তৎক্ষণাৎ পোকাটিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল। এবং তাহার পর হইতেই ওই পোকা দেখিলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিত। কত পোকা যে মারিয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বস্তুত বাল্যে এবং কৈশোরে পোকা-নিধনই তাহার একমাত্র ব্যসন (hobby) ছিল।

॥ ২ ॥

নিখিলরঞ্জন যখন কলেজে পড়িতে গেল তখন তাহার এই ব্যসনে খানিকটা ছেদ পড়িয়াছিল। কারণ পাড়াগাঁয়ে পোকার যত প্রাদুর্ভাব কলিকাতা শহরে তত নয়। কলিকাতার মানুষরাই পোকার মতো চারিদিকে কিলবিল করিতেছে। তবু মাঝে মাঝে দেখা যাইত, রাত্রে নিখিলরঞ্জন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলির দিকে ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া আছে। রাস্তার আলোগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পোকার ভীড়। কিন্তু সেগুলি তো নাগালের বাহিরে। নিখিলরঞ্জন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার মেসে ফিরিয়া যাইত। একদিন সহসা অনুভব করিল, তাহার কামিজের ভিতর একটা পোকা ঢুকিয়াছে, পিঠের দিকে সড়সড় করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি কামিজটা খুলিয়া ফেলিল, দেখিল পোকই, সেই ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা। সঙ্গে সঙ্গে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। আরও মাসখানেক পরে যাহা ঘটিল তাহা একটু অদ্ভুত। নিখিলরঞ্জন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। গামছাটি নিজের হাতে কাচিয়া শুকাইতে দেয়। পরিষ্কারভাবে নিজের বিছানা নিজেই করে। মশারিটা ঝাড়িয়া স্বহস্তে টাঙায় সেটি রোজ। একদিন রাত্রে শুইয়া আছে, চোখে ঘুমটি সবে লাগিয়াছে, এমন সময় তাহার মনে হইল ঘাড়ের নীচে কি যেন সুড়সুড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া টর্চ জ্বালিল। কিছু দেখিতে পাইল না প্রথমে। তাহার পর বালিশ উল্টাইয়া দেখিল,

একটা পোকা তর-তর করিয়া পালাইতেছে। ছাই-ছাই রঙের সেই পোকা! পোকাটার কেমন যেন একটা স্পাই-স্পাই ভাব। এদিক ওদিক ক্রমাগত লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল, সহজে তাহাকে ধরা গেল না। কিন্তু নিখিল ছাড়িবার পাত্র নয়। পোকাটাকে অবশেষে সে ধরিয়া ফেলিল এবং তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। মরিবার সময় পোকাটা অদ্ভুত শব্দ করিল একটা। 'কিঁ—চ্'। শব্দটা ছুঁচের মতো নিখিলের কানে গিয়া বিঁধিল। ইহার পরই সে চোখ তুলিয়া দেখিল, মশারির চালে আর একটা পোকা রহিয়াছে। নিখিলের মনে হইল, কেমন যেন ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই উড়িয়া গিয়া তাহার কপালে আঘাত করিয়া অন্যত্র বসিল। নিখিলের মনে হইল পোকাটা যেন আক্রমণ করিল তাহাকে। রুখিয়া উঠিল সে। কিন্তু হাত বাড়াইয়া যে-ই পোকাটাকে ধরিতে যায়, অমনি সে সরিয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পোকা পারিবে কেন। খানিকক্ষণ পরে নিখিল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং দুই আঙুল দিয়া পিষিয়া মারিল। এ পোকাটাও শব্দ করিল—'কিঁ—চ'। নিখিল দেখিল ঘরের ছাতে কয়েকটা পোকা বসিয়া রহিয়াছে। নিখিলের মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সে বিছানা হইতে বাহির হইয়া ঝাঁটা হাতে টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। পোকাগুলি মেঝেতে পড়িবামাত্র লাফাইয়া নামিয়া যতগুলিকে পারিল পা দিয়া পিষিয়া মারিল। প্রত্যেক পোকাটাই মরিবার আগে অন্তিম আর্তরব করিল—'কিঁ—চ্'। সব পোকাগুলোকে নিখিল মারিতে পারে নাই। একটা পোকা জানালা দিয়া উড়িয়া গেল।

কিন্তু ইহার পর হইতে নিখিল লক্ষ্য করিল, ওই ছাই-ছাই পোকাগুলো যেন তাহার পিছু লইয়াছে। রোজই দেখিতে পায়—হয় ঘরের কোণে, না হয় বইয়ের শেলফে, না হয় আর কোথাও একটা না একটা বসিয়া আছে। নিখিল অবশ্য দেখিলেই মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করে, দুই একটা সরিয়া পড়িতেছে। আবার একদিন মশারির ভিতর দুইটা পোকা দেখা দিল। নিস্তার অবশ্য পাইল না, কিন্তু নিখিল চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল, উহাদের একটা মতলব আছে। মরিবার সময় 'কিঁ—চ্' করিয়া যে শব্দটা করে তাহা শব্দতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া কি অন্য পোকাদের খবর দেয়? নিখিল সর্বদা সতর্ক-দৃষ্টি হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিল। একদিন সে সবিস্ময়ে দেখিল তাহার ক্লাসে ডেস্কের উপরও দুইটা পোকা বসিয়া আছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।…হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে দারুণ যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙিয়া গেল তাহার। কানের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা। কানের ভিতর প্যাঁচ-কসের মতো কি যেন চালাইয়া চলিয়াছে কে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কানে খানিকটা স্পিরিট ঢালিয়া দিল। স্টোভ জ্বালাইবার জন্য এক শিশি মেথিলেটেড স্পিরিট হাতের কাছেই থাকিত। তবু যন্ত্রণা থামে না। তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল বেচারা। সকালে ডাক্তার কানের ভিতর হইতে একটা মরা বড় পোকা বাহির করিলেন। ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা!

ইহার পর নিখিলের খরচ বাড়িয়া গেল। কানে গুঁজিবার জন্য তুলা কিনিতে লাগিল। রাত্রে শুইবার সময় কানে তুলা তো দিতই অনেক সময় দিনেও দিত। তাছাড়া, পোকা তাড়াইবার যে সব ঔষধ আজকাল বাজারে বাহির হইয়াছে সেগুলিও

কিনিত সে। নিজের বিছানায়, বসিবার জায়গায়, বইয়ের শেল্‌ফে, ঘরের কোণে কোণে, প্রায়ই সর্বত্রই সেই ঔষধ ছিটাইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু তবু সে লক্ষ্য করিত, ঔষধের নাগালের বাহিরে ছাই-ছাই রঙের পোকারা হয় ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে, কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বলা বাহুল্য, নিখিল পারতপক্ষে তাহাদের রেহাই দিত না। ধরিতে পারিলেই পিষিয়া ফেলিত। কেহ গণিয়া দেখে নাই, কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নিখিল তাহার সারাজীবনে কয়েক সহস্র পোকাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তবু পোকা আসিতেছে। নিখিল কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না।

॥ ৩ ॥

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। নিখিলের কর্মজীবন শুরু হইয়াছে। বি. এ. পাশ করিবার পর কোথাও সে চাকরি জুটাইতে পারে নাই। অবশেষে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের পয়সায় সে চাল-ডালের ব্যবসাতে নামিয়াছে। সেদিন সে মাল খরিদ করিবার জন্য গুসকরায় যাইতেছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন একটি সম্পূর্ণ খালি থার্ড ক্লাস কামরা পাইয়া গেল। কামরাটিতে উঠিয়া সে সব জানালাগুলি তুলিয়া দিল। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছিল। আজকাল সে কানের তুলা প্রায় খোলেই না। দুই কানেই তুলা গোঁজা ছিল। কামরায় কেহ নাই দেখিয়া, সে পোকা-প্রতিষেধক একটা ঔষধ বাহির করিয়া সেটা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর বিছানা বাহির করিয়া সেটাও ভালো করিয়া ঝাড়িয়া একটা বেঞ্চে বিছাইয়া ফেলিল। হাতঘড়িতে দেখিল রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিল এইবার শুইয়া পড়া যাক। ঔষধটা আর একবার ছিটাইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—না, একটি পোকাও কোথাও দেখা যাইতেছে না। পোকার সম্বন্ধে সে বরাবরই সচেতন আছে। লক্ষ্য করিয়াছে, একটু অসাবধান বা অন্যমনস্ক হইলে সেই ছাই-ছাই রঙের পোকারা তাহার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করে। শুইবার পূর্বে নিখিল কামরার জানালাগুলো আর একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। না, সব ঠিক আছে। কোথাও ফাঁক নাই। শুইয়া পড়িল।

'কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্—'

নিখিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই পোকার আওয়াজ না? চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পোকা তো একটাও নাই। কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দটা কিন্তু ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ পোকার অন্তিম আর্তনাদ যেন সহসা একযোগে মূর্ত হইয়া উঠিল তাহার মানসপটে। ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হইল তাহা। একটু পরেই নিখিল অনুভব করিল—ছররার মতো কি যেন তাহার চোখে মুখে সবেগে লাগিতেছে। একটা আধটা নয় অসংখ্য ছররা। দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল। কিন্তু হাতেও ছররা আসিয়া লাগিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণা। হাত সরাইয়া ফেলিতে হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে তখন দেখিবার চেষ্টা করিল ছররার মতো কি ওগুলো। কিন্তু কোন কিছুই তাহার হাতে ঠেকিল না। কামরার বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার।

'কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্—কিঁচ্'

আর্তনাদের শব্দটা যেন উল্লাসের ধ্বনিতে পরিণত হইল। তাহার মনে হইল

মুখটা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। সহসা দুই চোখে যেন দুইটা ছররা আসিয়া লাগিল। পড়িয়া গেল সে। তাহার পর অনুভব করিতে লাগিল, কে যেন কানের তুলা টানিয়া বাহির করিতেছে। মনে হইল, নাকের ভিতর দিয়া কি যেন ঢুকিতেছে। ইহার পরেই নিখিল জ্ঞান হারাইল। সকালে তাহার মৃতদেহটা যখন ট্রেনে পাওয়া গেল কি ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারিল না। ডাক্তার বলিলেন, 'শকে' মৃত্যু হইয়াছে।

বাবা

প্রভুরাম চক্রবর্তী প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারিতে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত কি না তাহা জানা নাই, কিন্তু এ কথাটা সুবিদিত ছিল যে হিন্দু-মুসলমান দুই দলই তাঁহার জমিদারিতে শান্ত হইয়া থাকিত। টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। টুঁ শব্দ হইলে বজ্রগর্জনে তিনি তাহা থামাইয়া দিতেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। প্রভুরাম নিজের একমাত্র সন্তান প্রণতির যখন বিবাহ দিলেন তখন সদ্বংশ এবং কৌলীন্যের উপরই নজর দিয়েছিলেন বেশী। সেই জন্য অনেক দেখিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারেই তিনি জামাতা-নির্বাচন করিলেন। জামাতা বিদ্বান এবং শিক্ষক। জামাতার পিতা ছিলেন সেকালের সদরবালা। প্রচুর যৌতুক এবং স্বর্ণালংকার সহ কন্যাটিকে তিনি বরেনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেকালের নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ এবং একশত ভরি গহনা একালের লক্ষাধিক টাকারও বেশী। সদরবালা সুরেন্দ্রনাথ এবং তৎপত্নী রোহিণীবালা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তাঁহাদের আর একটা বড় আশাও অবশ্য নেপথ্যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রণতি যখন প্রভুরামের একমাত্র সন্তান তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অত বড় জমিদারিটাও তাঁহাদের হাতে নিঃসন্দেহে আসিয়া যাইবে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুত্রবধূ প্রণতিকে সাধ্যাতিরিক্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল মানুষ অঙ্ক কষিয়া যাহা ঠিক করে অনেক সময় বিধাতার বিধানের সহিত তাহার হুবহু মিল হয় না। দুইটি ঘটনার দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হইল। প্রভুরাম চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন মাথার শির ছিঁড়িয়া মারা গেলেন। দেখা গেল তিনি একটি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এক ট্রাস্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যেন সম্পত্তির সমস্ত আয় হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-নিবারণ-কল্পে খরচ হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক। প্রণতির স্বামী বরেন সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল। তাহার চাকরি তো গেলই, তাহার চিকিৎসার জন্য সাংসারিক ব্যয়ও বাড়িতে লাগিল। সদরালা মহাশয় একদিন হিসাব করিয়া দেখিলেন সর্বসাকুল্যে তাঁহার বর্তমান মাসিক আয় মাত্র আড়াইশত টাকা। পুত্রের বিবাহে পণস্বরূপ যে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া কলিকাতায় একটুকরা জমি কিনিয়াছেন। আশা ছিল জমিদারিটা পাইলে বাড়ি করাইবেন। কিন্তু সে আশা মরীচিকার মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রণতির শাশুড়ি কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিলেন প্রণতিকে। তিনি

গৃহিণী পাখা হাতে কর্তাকে খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাত-গ্রস্ত কোমরে অদৃশ্য পায়ের লাথি খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিদারুণ ব্যাপার। মস্তকচ্ছ সদরালা উঠানে বাহির হইয়া আসিলেন। শুনিতে পাইলেন গৃহিণী আর্তনাদ করিতেছেন—"আর মেরো না, আর মেরো না—না, ছেড়ে দাও গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!"

কিন্তু পা কোথা! পা যে দেখা যায় না। প্রভুরাম চক্রবর্তীর হুঙ্কার শোনা গেল।

"শিগ্গির আমার মেয়েকে মিহি শাড়ি পরিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে দাও, তা নাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি।"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি। আর মেরো না। কোমরটা ভেঙ্গে গেছে—"

গৃহিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বাহিরের বারান্দায় প্রণতিও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, "আমার ওই তাঁতের কাপড়টা তাড়াতাড়ি প'রে নাও। চল তোমাকে খেতে দিচ্ছি। উঃ, এ-কি কাণ্ড!"

মিহি তাঁতের শাড়ি পরিয়া প্রণতি আহার করিল।

সদরালা ও তাঁহার গৃহিণী রোহিণীবালা অতঃপর যাহা করিলেন তাহা হাস্যকর, কিন্তু ইহা না করিয়াও উপায় ছিল না। তাঁহারা উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া ছাতের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বেয়াই আমাদের বড় ক্ষিধে পেয়েছে, এবার খাব? আর কখনও তোমার মেয়ের অযত্ন আমরা করব না। আমাদের মাপ কর—"

শূন্য হইতে উত্তর আসিল—"খাও। আর আমারও খাবার ব্যবস্থা কর। আমার ভাত বেড়ে তোমাদের তুলসীতলায় রেখে এস, সেখান থেকেই আমি খেতে পারব।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি একথালা ভাত ও সবরকম তরকারি তুলসীতলায় সাজাইয়া দিলেন।

"ওই কটি ভাতে আমার কি হবে? আমি একসের চালের ভাত খাই—"

"আর তো ভাত নেই, তাহলে চড়িয়ে দিই—"

"দাও—"

কিছুক্ষণ পরে একসের চালের ভাত ও তদুপযুক্ত তরিতরকারি তুলসীতলায় রাখা হইল। নিমেষের মধ্যে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। খালি থালা ও বাটিগুলি পড়িয়া রহিল কেবল।

আহারান্তে প্রভুরাম চক্রবর্তী জ্ঞাপন করিলেন, "আমি এখন এইখানেই থাকব ঠিক করেছি। নিয়মিত আমার খাবার জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন।"

শুনিয়া সদরালা-দম্পতীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধু কানা জিতু ভট্চাজের শরণাপন্ন হইলেন। বাধ্য হইয়াই হইলেন, কথাটা বাহিরে প্রচার হোক এ ইচ্ছা তাঁহাদের মোটেই ছিল না।

কানা ভট্চাজ পরামর্শ দিলেন—ওঝা ডাকা হোক। একটি ভালো ওঝার ঠিকানাও বলিয়া দিলেন তিনি। তাহার সহিত চুক্তি হইল ভূত বিদায় করিতে পারিলে তাহাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং একজোড়া তাঁতের ধুতি দিতে হইবে। তাছাড়া এক সের তেজপাতা চাই। তেজপাতাটা পোড়াইতেই হইবে। তেজপাতা পোড়ার ধোঁয়ায় ভূত না কি পালায়। নির্দিষ্ট দিনে ওঝা আসিয়া নিজের চতুর্দিকে সিঁদুর দিয়া একটা গণ্ডি

দিল এবং তাহার মধ্যে বসিয়া তেজপাতা পোড়াইতে পোড়াইতে মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ফল যাহা হইল তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ওঝার নাকের উপর প্রভুরাম চক্রবর্তী একটি ঘুষি মারিলেন এবং তাহার টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া উঠানের উপর এক আছাড় দিলেন। ওঝা উঠিয়াই চোঁ চা দৌড় দিল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত! পরদিন তাঁহার এক পত্র আসিল—"উনি সামান্য ভূত নন। উনি দুর্ধর্ষ একগুঁয়ে দানব। আমি উঁহাকে ঘাঁটাইতে পারিব না। ক্ষমা করিবেন।"

পরদিন প্রভুরামের নূতন আদেশও জারি হইল।

"রোজ রোজ শাক-পাতা খাওয়াচ্ছেন কেন। চালটাও খুব মোটা। আজ পেশোয়ারি চালের ভাত এবং মাংসের কোর্মা খাব। কাল ভালো রুই মাছ কিনে আনবেন।

সদরালা করজোড়ে উত্তর দিলেন, "বেহাই, আমি বড় গরীব হ'য়ে পড়েছি। মাছ মাংস খাবার পয়সা নেই। যে চাল কিনছি তারই মণ সাঁইত্রিশ টাকা। এর চেয়ে বেশী দাম দিয়ে চাল কি ক'রে কিনব? ছেলেটি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না। স্ত্রীর গহনা বিক্রি ক'রে ফেলুন। আমি যে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলাম সে টাকা কোথা?"

"তা দিয়ে কলকাতায় এক টুকরা জমি কিনেছি—"

"বিক্রি করে ফেলুন জমি। মোটকথা কাল থেকে ওই খাবার চাই।"

সত্যই সদরালা গৃহিণীর কিছু অলংকার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, প্রভুরামের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া চলিতে লাগিল। মাছ মাংস পোলাও কালিয়া দই মিষ্টি ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া তাঁহারা তুলসীতলায় প্রত্যহ প্রভুরামকে ভোগ দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, না দিলে তাঁহাদের জীবন সংশয়। দুর্ধর্ষ দানবের মায়া-দয়া নাই।

একদিন গভীর রাত্রে সকলে যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখন প্রণতি বাহিরের ঘরে আসিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বাবা—"

"কি—"

"তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। তুমি এবার এদের রেহাই দাও, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কষ্ট আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—"

"তোর জন্যেই তো এত সব করছি—ওরা তোকে যে অবস্থায় রেখেছিল—"

"সেই অবস্থাতেই আমি সুখী ছিলাম বাবা। এই আমার অদৃষ্ট, তুমি আর কি করবে। এখন তুমি যা করছ তাতে আমি ভালো খেতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি অমন কোরো না।"

"তুই বলছিস আমি চলে যাব?"

"তাই যাও।"

দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। ছাতের খানিকটা কাটিয়া উড়িয়া গেল। প্রণতি সেই ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা তাহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছে।

শব্দ শুনিয়া সদরালা ও তাঁহার পত্নীও আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

"কিসের শব্দ হ'ল বৌমা?"

"বাবা চ'লে গেলেন।"
"কি করে বুঝলে ?"
"ওই যে দেখুন না।"
নক্ষত্রটি তখনও সকৌতুকে হাসিতেছিল।

অমৃত

খুব ভোরে আমি যখন ট্রেন হইতে নামিলান তখন আশা করি নাই যে নামিয়াই বুবুকে দেখিতে পাইব। যদিও অনেকদিন পরে দেখিলাম তবু তাহার কপালের কাটা দাগটা দেখিয়া তাহাকে চিনিতে অসুবিধা হয় নাই। বেনারসে আমার এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় কয়েকদিন ছিলাম। তাহারই মুখে শুনিয়াছিলাম বুবু এখানে টিকিট-কলেক্টর হইয়া আছে। বুবুকে দেখিতেই এখানে আসিয়াছি, ঠিক দেখিতে নয়, পরীক্ষা করিতে। বুবু যে আমাকে চিনিতে পারিবে সে আশঙ্কা ছিল না। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়ার পাগড়ি, মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি এবং চোখে গগল্‌স থাকাতে অনেকে আমাকে পাঞ্জাবি মনে করে। আমি বাংলা ছাড়া আরও কয়েক রকম ভাষাও জানি। হিন্দু, উর্দু, গুরুমুখী মহারাষ্ট্র, গুজরাটিতে কথাবার্তা বলিতে পারি। সুতরাং বুবুর কাছে ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। আজকাল আমি আত্মগোপন করিয়াই বেড়াই। আমার সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে। জানি আমার সে পরিচয় লোকের উপহাসের খোরাক জোগাইবে। আমি যে একদা কানাইলাল, উল্লাসকরের বন্ধু ছিলাম, অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, বন্দেমাতরমের সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ যে একদিন আমার গুরু ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দকে যে একদা আমি দেবতাজ্ঞানে পুজো করিয়াছি —আমার এ পরিচয়ের কি এখনও কোনও মূল্য আছে ? আমি জানি, নাই। তাই আত্মগোপন করিয়া বেড়াই। যেদিন দেশমাতৃকার বুকে খড়্গ হানিয়া হিন্দুস্থান পাকিস্থান হইল সেইদিনই আমি ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। স্ত্রী বহুদিন আগে মারা গিয়াছিলেন। ছিল একটিমাত্র পুত্র, সে মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। আমার শ্বশুরমহাশয় ছিলেন একজন রায়বাহাদুর, আমার শ্যালক বড় পুলিশ অফিসার। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না যে আমার পুত্র আমার সঙ্গে মানুষ হোক। মিথ্যাকথা বলিয়াছিল বলিয়া আমার ছেলেকে আমি একদিন চাবকাইয়াছিলাম। সেইদিনই আমার শ্যালক আসিয়া তাহাকে লইয়া যান। তাহার পর আর সে ফিরিয়া আসে নাই।

সন্ন্যাসীরা এদেশে এখনও খাইতে পায়। আমি সন্ন্যাসী বেশেই দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের দ্রুত অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি এখনও আমাদের দেশ গণতন্ত্রের উপযোগী হয় নাই। আমার অন্তরের হাহাকার, আমার লাঞ্ছিত আত্মসম্মানের মর্মন্তুদ বেদনা আমি কাহাকেও জানাই নাই। কাহারও করুণা বা অনুকম্পা আমি চাহি না। সত্যের ক্ষুরধার পথে একক যে যাত্রা আমি শুরু করিয়াছিলাম তাহা এইবার বোধহয় শেষ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া পার্থিব দুঃখ-কষ্টের উর্ধ্বে উঠিয়া কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বর্গরাজ্য একদিন এই পৃথিবীতেই নামিয়া আসিবে। তখন আর কোনও দুঃখ থাকিবে না।

আমি কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও মনকে ব্রহ্মে নিবদ্ধ রাখিতে পারি নাই। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা, আমাদের ছল-চাতুরী, আমাদের নেতাদের ভণ্ডামি, সাহিত্যিকদের অধঃপতন আমার মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইয়াছে আমিই দণ্ডদাতা হইব। মা কালীর সম্মুখে বুকের রক্ত দিয়া লিখিয়া একদিন গুরুর কাছে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম—দেশকে উদ্ধার করিব। দুষ্টের দমন করিবার জন্য যদি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয় তাহাও দিব। পরাধীনতার পঙ্ক হইতে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইবে। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষণ অন্ধকারে একদিন যাত্রা করিয়াছিলাম। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছি কি? এই চিন্তা মাঝে মাঝে আমাকে উন্মাদপ্রায় করিয়া তুলিত। ভাবিতাম আমিই দণ্ডদাতা হইব। কিন্তু যাহা ভাবি তাহা করিতে পারি কই! ইহাই তো আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। আমরা বাক্যে বীর, হয়তো চিন্তার বীর, কিন্তু কর্মে বীর নই। কর্মক্ষেত্রে আমরা কেবল কেরানী, কেরানী ছাড়া আর কিছু নই। আমার প্রথম যৌবনে লর্ড কার্জনের সবুট পদাঘাত আমাদের মনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে, যে পরিবেশে মরণ-বিজয়ীর দল একদা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশকে পরাধীনতার পঙ্ক হইতে ··না, এ সব কথা আর লিখিব না। বড় কষ্ট হইতেছে। যাহা লিখিব বলিয়া এখানে এই অজানা গ্রামের প্রান্তে অপরিচিত পরিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি সেই কথাটাই লিখিয়া ফেলি।

একটা পোড়ো বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছি। একটু দূরে দেখিতে পাইতেছি রঙীন-ছাপা-শাড়ি-পরা একটি মেয়ে জিলাপী ভাজিতেছে। আর তাহার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি শিশু। ওই মেয়েটিরই ছেলে বোধ হয়। ছেলেটি বরাবর পিছন হইতে মেয়েটির বগলের নীচে মুখ ঢুকাইতে চাহিতেছে। স্তন্য পান করিতে চায়। মেয়েটি রাগিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ছেলেটি পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পাশের একটা সজিনা গাছে দুইটা কাক বসিয়াছিল। তাহারাও কা কা কা কা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে। ময়রার দোকানের নীচে কয়েকটা চড়াই পাখী ও শালিকও ছিল, লক্ষ্য করিলাম তাহারাও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েটি হঠাৎ জিলাপীর কড়াই নামাইয়া ফেলিল, তাহার পর ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। মেয়েটির বয়স মনে হইল বেশী নয়। এইটিই বোধহয় প্রথম সন্তান। লক্ষ্য করিলাম ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি তাহাকে স্তন্যদান করিতেছে। নিজের শাড়ি দিয়া ছেলেটির আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিয়াছে। কেবল ছোট ছোট পা দুইটি বাহির হইয়া আছে। ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট আঙুলগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কি আনন্দেই দুধ খাইতেছে সে। না, সময় নষ্ট হইতেছে। লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ করি। যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ আসিয়া পড়িতে পারে। আমি যে একবারের জন্যও দণ্ডদাতা হইতে পারিয়াছি, অন্তত একবারও যে আমি আমার বিবেকের আদেশ মান্য করিয়াছি, এই কথাটা আমি লিখিয়া যাইতে চাই।

···বেনারসে রাজীবের সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এককালে একজন নিষ্ঠাবান টেরারিস্ট ছিল। হঠাৎ দেখি সে প্রকাণ্ড একটা দামী মোটরে বসিয়া আছে। মুখখানা একটু ভারী হইয়াছে, চুলেও পাক ধরিয়াছে, কিন্তু চেহারা বদলায় নাই। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার কামানো থাকাতে তাহার যৌবনের মুখচ্ছবিটাই যেন দেখিতে পাইলাম। চিনিতে কষ্ট হয় নাই। আমি আগাইয়া গিয়া নিজের পরিচয় দিতে সে-ও আমাকে চিনিতে পারিল। শুধু তাই নয়, সমাদরে গাড়িতে তুলিয়া লইল। দেখিলাম সে বেশ বড়লোক হইয়াছে। শুধু কাশীতে নয়, কলিকাতায় এবং বম্বেতেও তাহার ফলাও ব্যবসা চলিতেছে। আমাকে বাড়িতে লইয়া গেল। প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি, চারিদিকে প্রকাণ্ড হাতা। হাতায় চমৎকার বাগান। বড় বড় গোলাপ, বড় বড় ডালিয়া, বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা। রাজীবের বাড়িতে এক সপ্তাহ ছিলাম। ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম সে একজন কালোবাজারী। সে নিজেই আমাকে সব খুলিয়া বলিল একদিন। তাহার পর হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"তুইও আমার সঙ্গে চলে আয়। রাস্তায় রাস্তায় টো টো ক'রে ঘুরে মরছিস কেন? যদি রাজি থাকিস আমার বম্বের দোকানটার ভার তোর উপর দিতে পারি।"

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। যখন মুখ দিয়া কথা সরিল তখন বলিলাম, "রাজীব, তুই কালোবাজারী হয়েছিস একথা তোর মুখ থেকে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না।"

রাজীব হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল —"আমাদের দেশে এখন সবই কালোবাজার। যা দিনকাল পড়েছে তাতে এদেশে সৎপথে চলা যায় না। এদেশে প্রত্যেকে অসাধু হতে বাধ্য। আমাদের সে যুগের ইতিহাস এখন স্মৃতিমাত্র। সে স্মৃতিটুকুও এরা মুছে দিতে চাইছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আমি স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রেখেছি এখনও। দেখবি?"

একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া লোডেড রিভলবার বাহির করিল একটা।

"বারীনদা এটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রোজ এটাকে একবার প্রণাম করি। এ নিয়ে আর কিছু করা যাবে না এ যুগে। যা করা যাবে তাই করছি। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে। সেকেলে বিবেক একালে অচল। ফেলে দে ওটাকে। আবার নূতন ক'রে গীতা পড়। দেখবি কোন কাজই খারাপ নয়, যদি নির্বিকারভাবে করতে পারিস। টাকা না থাকলে এ যুগে কিছু করা যায় না। টাকা রোজগার ক'রে দেশের কাজেই সেটাকে দিয়ে দাও না। টাকা কিন্তু রোজগার করতে হবে। আমরাই তো এককালে ডাকাতি করেছি, মনে নেই?"

সেদিনই কথা প্রসঙ্গে সে বুবুর খবরটা আমাকে বলিয়াছিল। বুবুর ঠিকানাও দিয়াছিল। বুবু ঘুসখোর, বুবু মাতাল, বুবু চরিত্রহীন।

কথাটা শুনিয়াই আমার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। হয়তো ইহা আমার অহঙ্কার, হয়তো দুর্বুদ্ধি,······।

সেইদিন রাত্রেই রিভলবারটি চুরি করিয়া লুকাইয়া বেনারস ত্যাগ করিলাম।

ট্রেন হইতে নামিয়াই বুবুকে দেখিতে পাইলাম। তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই বুঝিতে পারিলাম সে মদ খাইয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বাবাজী, টিকিট আছে তো?"

"টিকিট তো নেই। আমি সন্ন্যাসী লোক, টিকিট কেনবারপয়সা কোথায় পাব।"

আমার টিকিট ছিল, কিন্তু আমি বুবুকে পরীক্ষা করিতেছিলাম।

"টিকিট নেই? তাহলে ওই বেঞ্চে বস গিয়ে। পুলিস তোমার ব্যবস্থা করবে।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। হ্যাঁ, কাটা দাগটা ঠিক আছে। আমারই চাবুকের আঘাতে কপালটা কাটিয়া গিয়াছিল।

বলিলাম, "কিছু পয়সা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন বাবু।"

"কত পয়সা দেবে?"

একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলাম, "এর বেশী তো নেই।"

বুবু হাত বাড়াইয়া সিকিটি লইল।

"আচ্ছা যাও—"

পরমুহূর্তেই রিভলভারটা গর্জন করিয়া উঠিল। আমার বংশের শেষ প্রদীপটি সবল ফুৎকারে নিজেই নিবাইয়া দিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম।

লেখা শেষ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম। বুবুর রক্তাক্ত চেহারাটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তে পুলিশের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। বোধহয় একটু ঘুম আসিয়াছিল। খুট করিয়া শব্দ হইল। চোখ খুলিয়া দেখিলাম পুলিশ নয়। সেই মেয়েটি তাহার শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাতে একটি শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটি জিলাপী। ঠোঙাটি আমার পায়ের কাছে রাখিয়া সে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন ঠাকুর। বড্ড ভোগে—"

মনে হইল স্বয়ং দেশমাতৃকা যেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

মৃত্যুর অতি সন্নিকটে আসিয়া অমৃতের সন্ধান মিলিয়া গেল।

ঠাকুমা

॥ ১ ॥

পুত্রের বিবাহ দিয়া শিবশঙ্করবাবু দশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু পৌত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। মনে একটা দুঃখ লইয়াই তিনি মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে দুঃখ অনুভব করিতেন তাহা অপেক্ষা শতগুণ দুঃখ বাজিত তাঁহার স্ত্রী বিজয়ার বুকে। দশ বৎসর বিবাহ হইয়া গেল অথচ একটা ছেলে হইল না—বংশ লোপ হইয়া যাইবে যে। পুত্রবধূ লক্ষ্মী সত্যই রূপে গুণে লক্ষ্মী, তবু তাহার বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা আক্রোশ জমাইয়া উঠিত। কিছুতেই তাহার প্রতি তিনি যেন প্রসন্ন হইতে পারিতেন না। বধূটি যথাসম্ভব সসঙ্কোচে বাস করিত সংসারে। ইহা তো:

তাহার দোষ নহে। কপালের দোষ। অকরুণ ভাগ্য-বিধাতার এ অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার তো নাই।

শিবকিঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিজয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি আমার জীবনের সব সাধ পূর্ণ ক'রে দিয়েছ, এমন কি লণ্ডনের স্যাকরার তৈরি হার ব্রেসলেটও পরিয়েছ আমাকে। কোনও দুঃখ পাইনি জীবনে। কোনও সাধ অপূর্ণ রাখনি আমার। জীবনে একটি সাধ কেবল পূর্ণ হ'ল না। কিন্তু তা পূর্ণ করবার ক্ষমতা তো তোমার নেই। কারো নেই। ভবিতব্য!"

শিবকিঙ্কর মৃদু হাসিয়াছিলেন কেবল। কোনও উত্তর দেন নাই।

॥ ২ ॥

শিবকিঙ্করের মৃত্যুর দুই মাস পরে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। লক্ষ্মী সন্তান-সম্ভাবা হইল। প্রথমে কেহ বিশ্বাসই করিতে চায় না। স্থানীয় ডাক্তার বলিলেন —এখনও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। চতুর্থ মাসে লক্ষ্মীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল। একজন বড় ডাক্তার দেখিলেন। তিনি বলিলেন লক্ষ্মী সত্যই অন্তর্বত্নী। বিজয়া আগেই বাড়িতে শাঁখ বাজাইয়া দিলেন। মহাসমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠানো হইয়া গেল। লক্ষ্মীর কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মা এত কাণ্ড করিতেছেন শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হইয়া যায়। সে নিজেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে এ অসম্ভব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইবে। একটা অসম্ভব স্বপ্নকে কেন্দ্র করিয়া সকলের আশা ক্রমশ রঙীন হইতে রঙীনতর হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্মীর স্বামী বিজনবাবু নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও গোপনে গোপনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

॥ ৩ ॥

যথাকালে শিশু ভূমিষ্ট হইল।

বাড়ির সকলে যে আনন্দে অভিভুত হইলেন তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু বিজয়া শুধু আনন্দিতই হইলেন না, বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার একটু ভয়ও হইল।

আঁতুড় ঘরে সাধারণতঃ সব শিশুই অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়া থাকে। কিন্তু এ শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

বিজয়া ঝুঁকিয়া তাহার মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিলেন, "কি দাদু, কি দেখছ?"

বলিয়াই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। শিশুর চোখে শিবকিঙ্করের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি নীরবে যেন তাঁহাকে বলিল, তোমার এ সাধও আমি পূর্ণ করিলাম।

বিজয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। আর একটা জিনিসও তাঁহার চোখে পড়িল। শিবকিঙ্করের দক্ষিণ গণ্ডে যে কালো তিল ছিল এ শিশুর গণ্ডেও তাহা রহিয়াছে। রোমাঞ্চিত কলেবরে তিনি নবজাতকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

॥ ৪ ॥

ইহার পর হইতে পাঁচ বছর যাহা ঘটিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। লক্ষ্মী খোকনকে প্রসব করিয়াছে বটে, কিন্তু খোকনকে মানুষ করিয়াছেন বিজয়া। খোকন চব্বিশ ঘণ্টা তাহার ঠাকুমার কাছে থাকিত। যখন দুধ খাইবার সময় হইত তখন তাহাকে মায়ের কাছে দিতেন। দুধ খাওয়া শেষ হইলেই আবার তাহাকে ঠাকুমার বুকে ফিরিয়া যাইতে হইত। ঠাকুমার স্নেহ খোকনকে অক্টোপাসের মতো জড়াইয়া ধরিয়াছিল। খোকন ঠাকুমার সহিত ঘুমাইত, উঠিত, বসিত, গল্প করিত, বেড়াইতে যাইত। ঠাকুমাই তাহার সব। ঠাকুমা তাহাকে মায়ের কাছে ঘেঁসিতে দিতেন না। লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকিত। নিজের ছেলে অথচ কাছে যাইবার উপায় নাই। শাশুড়ি সর্বদা আগলাইয়া আগলাইয়া বেড়াইতেছেন।

॥ ৫ ॥

আরও বছর দুই কাটিল। ঠাকুমার নয়নমণি হইয়া খোকন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। লক্ষ্মীও এখন লক্ষ্য করিল যে খোকনের মুখভাব অনেকটা শিবকিংকরের মতো। একদিন সে আড়াল হইতে শুনিল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন,—

"দাদু, আমাকে তোর পছন্দ হয় ?"

"হ্যাঁ খুব, কেন ?"

"আমাকে বিয়ে করবি ?"

খোকন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"তোমাকে বিয়ে করতে যাব কেন ? তুমি তো বুড়ী, মাথার চুল পাকা—"

"আমি বাইরে বুড়ী রে। ভিতরে ভিতরে আমি তোর বয়সী। আমার ছবি দেখবি ?"

বিজয়া উঠিয়া গেলেন এবং নিজের ট্রাংকের ভিতর হইতে প্রাচীন একটি অ্যালবাম বাহির করিয়া আনিলেন। এ অ্যালবাম লক্ষ্মী কখনও দেখে নাই।

"এ কিসের অ্যালবাম মা ?"

"আমার বাপের বাড়ির অ্যালবাম। আমার ছেলেবেলার দু'একটা ছবি আছে। দাদুকে দেখাই।"

অ্যালবাম খুলিয়া একটি ছবি তিনি দেখাইলেন। চার পাঁচ বছরের একটি খুকী হাসিমুখে চাহিয়া আছে। ছবিটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবু চেহারাটা বেশ স্পষ্ট আছে। লক্ষ্মীর মনে হইল, চোখের দৃষ্টি কি প্রখর।

॥ ৬ ॥

কিছুদিন পরে বিজয়া অসুখে পড়িলেন। জ্বর আর কাসি। বিজয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই চিরকাল অভ্যস্ত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাধির আর উপশম হয় না। শেষে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেই হইল। তিনি বলিলেন,

যক্ষ্মা হইয়াছে। তখন যক্ষ্মার সুচিকিৎসা ছিল না তেমন। মৃত্যুই তখন যক্ষ্মার অনিবার্য পরিণতি ছিল।

বিজয়া কাসিতেছিলেন, খোকন তাঁহার সামনে বসিয়াছিল। ডাক্তারবাবু একদিন লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার ছেলেকে ওঁর বিছানায় যেতে দেবেন না। রোগটা ছোঁয়াচে।

লক্ষ্মী বিবর্ণ মুখে চুপ করিয়া শুনিল। কিন্তু সে জানিত শাশুড়ি খোকনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত থাকিতে পারিবেন না। তবু সে একদিন বলিল, "ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন খোকনকে আপনার বিছানায় না বসতে দিতে। রোগটা নাকি ছোঁয়াচে।"

"তোমার ডাক্তারবাবু কিছু জানে না। ওর ওষুধ আর আমি খাব না। ওকে আর আসতে হবে না।"

সেদিন হইতে বিজয়া সব ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

॥ ৭ ॥

একদিন লক্ষ্মীর কানে গেল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন, "দাদু, তুই আমার সঙ্গে যাবি ?"

"কোথায়।"

"আমি যেখানে যাব।"

"তুমি কোথায় যাবে ?"

"সে আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবি।"

"তুমি যাবে কেন ? তুমি যাবে না।"

"আমাকে যেতেই হবে। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোকেও যেতে হবে।"

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না।

"কি সব অলুক্ষণে কথা বলছেন মা—"

বিজয়া ইহার উত্তরে কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রিণীর মতো জ্বলিতে লাগিল।

মাসখানেক পরেই বিজয়া মারা গেলেন।

॥ ৮ ॥

মৃত্যুর পর দিনই খোকন জ্বরে পড়িল। সাতদিন পরেই মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিল। ডাক্তারবাবু আসিলেন। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কোনও আশা দিতে পারছি না। গ্যালপিং থাইসিস। ভগবানকে ডাকুন। আমাদের যা করবার সব করেছি।"

সেদিন বর্ষণ-মুখরিত অন্ধকার চতুর্দিকে। খোকন একটু ভালো আছে। লক্ষ্মী

তাহার গায়ে হাত দিয়া শুইয়া আছে। চোখ বোজা, কিন্তু ঘুমায় নাই। খোকনের বাবার টুরের চাকরি। তিনি দুইদিন আগে মুঙ্গেরে চলিয়া গিয়াছেন।

"দাদু—"

বিজয়ার কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মী তড়াক করিয়া বসিল। সামনের কপাটটা বন্ধ। তাহার ওপার হইতে শব্দটা আসিল।

"দাদু—"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া ফেলিল। সম্মুখে আবছা অন্ধকারে দেখিল বেণীদোলানো ছোট একটা ফ্রক পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখে প্রখর দৃষ্টি, মুখে হাসি।

"দাদু, আয়—"

লক্ষ্মী সভয়ে দেখিল খোকনও উঠিয়া বসিয়াছে। তারপরই সে আবার শুইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিল—মুখে রক্তের দাগ, দেহ প্রাণহীন।

মৃত্যুঞ্জয়

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিল এবার লাউডস্পীকার আনানো হয় নাই। ঝুমরির মায়ের কণ্ঠেই এবার লাউডস্পীকার বাজিতেছে। ঝুমরির মা তাহার বাঁকা কোমর সোজা করিয়া গলার শির ফুলাইয়া কাংস্য-কণ্ঠে যেভাবে তাহার ভাসুর-পো শিবলালের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতেছে, তাহাতেই যথেষ্ট গোলমানের সৃষ্টি হইয়াছে। সে গোলমালে অবশ্য গানের লেশমাত্র নাই, কিন্তু গান যে একেবারে নাই তাহা নহে, মৃত্যুঞ্জয় জানে গানও আছে। সে গান ঝুমরির বুকের ভিতর বাজিতেছে। আর কেহ না শুনুক মৃত্যুঞ্জয় শুনিতে পাইতেছে সেটা। সে গানের গমক ঝুমরির চোখেমুখে ভাবে-ভঙ্গীতে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।

ঝুমরির জাঠতুতো দাদা শিবলাল 'চুমানা'য় আপত্তি করিয়াছিল। সে বলিতেছিল যে যদিও কাহার-সমাজে বিধবারা 'চুমানা' নামে একটা প্রহসন করিয়া দ্বিতীয় একটা পুরুষের সঙ্গে বাস করে, সেটা কি উচিত, না শোভন? বাধ্য না হইলে কাহারও 'চুমানা' করা উচিত নয়। শিবলালের মুখে একথা শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিল। ঝুমরির মা শিবলালকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তবে তুই বউ মরিতে না মরিতে 'চুমানা' করিতে গেলি কেন।

শিবলাল বলিল, সে কখনই 'চুমানা' করিত না যদি ঝুমরির মা কিংবা ঝুমরি তাহার সংসারের ভার লইত। কিন্তু সে দিকে কেহ দৃকপাতও করিল না। সে একা কি পাঁচটা ছেলেমেয়ে লইয়া সামলাইতে পারে? বাধ্য হইয়া সে 'চুমানা' করিয়াছে।

এই সব যুক্তি মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ভালো লাগিতেছিল। কিন্তু যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকিল না। দেখা গেল ঝুমরি 'চুমানা' করিবেই এবং রামটহলকেই করিবে। তাহার মতে রামটহলের মতো যুবক বিরল। ঝুমরির দুটি মেয়ে আছে—সুখিয়া এবং দুখিয়া। দুজনেই খুব ছোট। রামটহল বলিয়াছে তাহার দুই মেয়ের ভারই সে

'গছিয়া' লইবে। মেয়েরা বড় হইলে তাহাদের স্কুলে পড়াইবে, তাহার পর ধুমধাম করিয়া বিবাহ দিবে। রামটহলকে খুব পছন্দ তাহার। খুব ভালো। বয়সও অল্প। ঝুমরির চেয়ে বোধ হয় ছোটই। জব্বলপুরে পাকা ঘরদুয়ার আছে। চোখে মুখে কেমন একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। চমৎকার!

শিবলাল আর একটা 'হক্' কথাও বলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল একথা শুনিয়া হয়তো ঝুমরির মা অন্তত একটু ভাবিবে।

শিবলাল বলিয়াছিল—"যদি 'চুমানা' করতেই হয় তাহলে নিজের জাতের চেনাশোনা লোকের সঙ্গে করাই উচিত। নয়াবাজারের দুখন, ভিখনপুরের লখিয়া, আমাদের জাত, লোকও ভালো। অবস্থাও খারাপ নয়। দুখন বিড়ি পাকায়, লখিয়া রিক্শ টানে। এদের বউও অনেকদিন আগেই মরেছে, এরা দুজনেই 'চুমানা' করতে চায়। ঝুমরিকে পেলে তারা লুফে নেবে।"

এ কথাটা অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের ভালো লাগে নাই। ঝুমরিকে কেহ লুফিয়া লইতেছে এ দৃশ্যটা মোটেই মনোরম মনে হয় নাই তাহার। তবে এসব কথা শুনিয়া ঝুমরির মা যদি মত বদলায় এই আশায় ছিল সে।

মত কিন্তু বদলাইল না। ঝুমরির মা বলিল—"ঝুমরি যাকে পছন্দ করেছে তাকেই 'চুমানা' করুক। তুমি নিজেই তো অনেক দেখেশুনে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলে। তখন অনেক কিছু বলেছিলে তুমি। আমরাও তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, একটা ন্যাংটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। তার নিজের ঘরদুয়ার কিছু ছিল না। ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকত সে। রোজগার করত না এক পয়সা। তার ওপর ছিল রুগী। থাইসিস ছিল। আমাদের ডাক্তারবাবু তাকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল। তাই বেঁচেছিল কিছুদিন। না বাঁচলেই ভালো হ'ত। বেঁচে ছিল ব'লেই পর পর দুটো মেয়ে হ'ল। লাভ হ'ল কি তাতে। তুমি আর বিয়েতে কথা বলতে এসো না। ও নিজে পছন্দ ক'রে যাকে 'চুমানা' করছে তাকেই করুক।"

মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মর্মান্তিক কথাগুলি শুনিল। তাহার পর সুখিয়া দুখিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল খানিকক্ষণ।

ঝুমরির মা বলিল, "আমাদের সমাজে 'চুমানা' কে না করছে? আমিই তো আমার বড় ব্যাটার 'চুমানা' করিয়েছি। ঝুমরির কিই বা বয়স। এখনও চব্বিশ বছর পার হয়নি, তুমি আর বাগড়া দিতে এসো না।"

শিবলাল তবু ছাড়ে নাই। ঝুমরিকে আলাদা ডাকিয়া বলিয়াছিল—"তুই জব্বলপুরের ওই অচেনা ছোঁড়াটার সঙ্গে জুটেছিস কেন? ওকে কে চেনে? ও যে আমাদের জাত তারই বা ঠিক কি? যদি 'চুমানা' করতেই চাস আমি চেনা-শোনা ভালো ছেলে দেখে দিচ্ছি।"

ঝুমরি ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কানে মধুবর্ষণ করে নাই।

ঝুমরি বলিয়াছিল—"আমি স্বেচ্ছায় কুয়ায় ঝাঁপ দিচ্ছি তোমাদের তাতে কি? আমার ভৌজি (বৌদি) যখন মেরে আমাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিল তখন তোমরা কেউ আমাকে বাঁচাতে আস নি। আমি বাবুদের বাড়িতে 'নোকরি' ক'রে অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন তোমরাই আমার নামে ফুসফুস গুজগুজ ক'রে

নানারকম বলতে। দু'তিনটে বদমাস গুণ্ডা সত্যিই রোজ আমার পিছু পিছু ঘুরতো, কিন্তু কই তোমরা তো কেউ এসে তাদের আটকাও নি। আমি নিজে রোজগার ক'রেই বরাবর খেয়েছি, তোমরা কেউ কোনদিন ডেকে আমাকে একমুঠো খেতেও দাওনি। এখন আমি একজনকে পছন্দ ক'রে 'চুমানা' করতে যাচ্ছি আর তুমি ফফরদালালি করতে এসেছ। লজ্জা করে না তোমার? তুমিই তো আমার সর্বনাশ করেছ, কি লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে তা কি তোমার মনে নেই—?"

ঝুমরির চোখ দিয়া যেন আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। নির্বাক নিরুপায় মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া দেখিল সব। বুঝিল ঝুমরিকে আর রোখা যাইবে না, সে রামটহলকেই চুমানা করিবে। সহসা মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে পড়িল, ঝুমরির ছোট মেয়েটা ধুলোয় পড়িয়া কাঁদিতেছে। সুখিয়াও ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে একধারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা হইল দুখিয়াকে কোলে তুলিয়া লয়। কিন্তু পারিল না।

যেদিন 'চুমানা' হইবে সেদিনও মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির পাশে পাশে ঘুরিতেছিল। নীরবেই 'চুমানা'র আয়োজন দেখিতেছিল সে। এমন সময় দেখা গেল বাহিরে একটা অচেনা লোক আসিয়াছে। সে বলিল জব্বলপুর হইতে রামটহলের বাবা তাহাকে পাঠাইয়াছে। তাহার বাবা খবর পাঠাইয়াছে যে, বেবা (বিধবা) মেয়ের সহিত রামটহলের চুমানা সে হইতে দিবে না। একটি কুমারী মেয়ের সহিত রামটহলের বিবাহ দিবে। শিবলাল নিকটে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় বুঝিল শিবলাল শেষ চেষ্টা করিতেছে। শিবলালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শেষ চেষ্টাও বিফল হইল। ঝুমরির মা সিংহিনীর মতো আগাইয়া আসিয়া গালাগালি তুবড়ি ছুটাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হইল লাউডস্পীকারের অভাব পূর্ণ হইল এতক্ষণে।

পাড়ার সবাই আগাইয়া আসিল বলিল, এখন সব আয়োজন হইয়া গিয়াছে। এখন 'চুমানা বন্ধ হইবে না। রামটহল সেই লোকটিকে বলিল, তোমাকে আমি চিনি না। যাই হোক, তুমি বাবুজিকে গিয়া বল আমি এখানেই 'চুমানা' করিব। কুমারী মেয়ে আমার চাই না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন।

শিবলালের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিতে লাগিল যদিও লাউডস্পীকার বাজিতেছে না কিন্তু অন্যান্য আয়োজন কিছু কম হয় নাই। রামটহল ঝুমরির জন্য অনেক জিনিস আনিয়াছে। দামী শাড়ি, দামী জামা, গহনাও অনেক। রুপার গহনাই বেশী, একটা সোনার টিকলিও আছে। ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আসিয়াছে। খাজা, টিকরি, বোঁদে, 'সেও'-ভাজা, মণ্ড, লুচি। অনেক।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় দেখিতে পাইল সুখিয়া, দুখিয়ার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। রামটহল তাহাদের জন্যও রঙীন জামা কিনিয়া আনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নীরবে সব দেখিতে লাগিল। একবারও তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করিল না। একবারও না।

অবশেষে সিন্দুর-দান হইয়া গেল। সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া এবং তাহার উপর সোনার টিকলি ঝুলাইয়া ঝুমরিকে অপরূপ দেখাইতেছিল। সত্যই অপরূপ।

মৃত্যুঞ্জয় নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি তিনটার সময় দুইটা রিকশায় চড়িয়া বর-বধূ তাহাদের নূতন বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। মৃত্যুঞ্জয়ও তাহাদের রিক্শার পিছু পিছু চলিল।

মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির প্রথম পক্ষের স্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পাগলীর হাসি

আমাদের মন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখে। সর্বদাই সে এ কাজ করিতেছে। তাহার এই সংগ্রহশালার নাম স্মৃতি-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে সংগ্রহের পদ্ধতিটি কিন্তু অদ্ভুত। তাহা কোনও সামাজিক বা সাংসারিক নিয়ম মানিয়া চলে না। সেখানে ধনীর পাশে দরিদ্র বা মহারাজার পাশে ভিখারীর ছবি মোটেই বেমানান নয়। হাসির পাশে অশ্রু, সবলের পাশে দুর্বল, গম্ভীরের পাশে অগম্ভীরের সমাবেশ সেখানে দুর্লভ নয়। সকলের মনের মধ্যেই এই বিচিত্র 'মিউজিয়ম' আছে। আমরা কিন্তু সর্বদা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। প্রায়ই দেখা যায় একটা অন্যমনস্কতার পরদা এই সংগ্রহশালার দ্বারে ঝোলানো আছে। মাঝে মাঝে কিন্তু পরদাটা কোনও প্রবল আবেগের হাওয়ায় উড়িয়া যায়, তখন হঠাৎ আমরা এই বিচিত্র সংগ্রহের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া যাই। হয়তো একটা ছবি, হয়তো একটা অজানা ফুলের হঠাৎ-ভাসিয়া-আসা সৌরভ আমাদের আকুল করিয়া তোলে।

বিজন ডাক্তারও সেদিন একটি হাসির দিকে চাহিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল,—কি মনে হইল—তাহা পরে বলিব।

হাসিটি তিনি দেখিয়াছিলেন প্রথম যৌবনে। তখন তিনি চাকুরি করিতেন। সাঁওতাল পরগণার এক ডিস্পেন্সারিতে ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারখানার সামনে ভালো 'পীচ্'-বাঁধানো রাস্তা, সেই রাস্তার উপর বাস্-স্ট্যাণ্ড (bus stand) এবং সেই বাস-স্ট্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি দোকান। চায়ের দোকান, খাবারে দোকান, একটি ছোটখাটো হোটেল, পান-বিড়ির দোকান, একটি মনিহারী দোকানও। যখন 'বাস্' আসিত তখন সেই দোকানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ছোটখাটো একটা মেলা বসিয়া যাইত যেন। নানারকম লোক। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল সব রকম লোকই আসিত। এই ভিড়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু হঠাৎ একদিন সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো চেহারা তাহার। সর্বাঙ্গে যৌবন প্রস্ফুটিত, মুখে একটা মৃদু মুচকি হাসি। বড় বড় চোখ দুইটিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। একপিঠ চুল। কখনও আলুলায়িত, কখনও খোঁপা-বাঁধা। খোঁপার উপর মাঝে মাঝে ফুলও থাকিত, কখনও পলাশ, কখনও জবা, কখনও বা আর কিছু। যখন ফুল জুটিত না, তখন গাছের সবুজ পাতাই সে খোঁপায় গুঁজিয়া দিত। পরনে আড়-ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাঝে মাঝে তালি-দেওয়া। কখনও ভালো শাড়িও পরিত, হঠাৎ

দেখা যাইত ডগমগে রঙের একটা শৌখিন শাড়ি পরিয়া আছে। গায়ে কখনও জামা পরিত না, বুকের আঁচল সম্বন্ধেও খুব সচেতন থাকিত না সে, আঁচল বার বার খসিয়া যাইত, দ্রূক্ষেপ ছিল না তাহার। তাহার বাহিরের পোশাক মাঝে মাঝে বদলাইত বটে, কিন্তু তাহার মুখের হাসিটির কখনও পরিবর্তন হইত না। বিজন ডাক্তার যখনই তাহাকে দেখিতে পাইতেন, দেখিতেন তাহার মুখের সেই মৃদু মুচকি হাসিটি এবং চোখের কৌতুকদীপ্তি ঠিক তেমনই আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত—এই অনড় হাসির অর্থ কি। সকলে যে তাহার দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ইহা কি তাহারই প্রতিক্রিয়া কিন্তু বিজনবাবু ও হাসিতে গর্বের কোন আভাস তো পাইতেন না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি, না কৌতুকের? বিজনবাবু ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। আর একটা ব্যাপারেও তাঁহার খুব অবাক লাগিত। অমন রাজরানীর মতো চেহারা কিন্তু ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। লোক নাম দিয়াছে পাগলী। কোন্ জেলার লোক ঠিক বোঝা যায় না। বাংলা কথা বলে, কিন্তু একটু বীরভূমি টান আছে, ক্রিয়াপদগুলি শুদ্ধ। অনেকে বলে ও জাতে বাউরি। কিন্তু রং কালো নয় বরং বেশ ফরসা। অনেকের মতে ওর মা নাকি এক সাহেবের রক্ষিতা ছিল। মোটকথা তাহার আসল পরিচয় কেহ জানিত না। মাঝে মাঝে সে বিজন ডাক্তারের বাড়িতে আসিয়াও হানা দিত। বিজনবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিত, "মাইজি, খাইতে দে, দু'দিন কিছু খাই নাই।"

বিজনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিতেন, "ভিক্ষে ক'রে পয়সা পাস, দু'দিন অনাহারে আছিস?

"পয়সা পাই তো। এই যে। এইগুলো কিনলোম।"

কাপড়ের আঁচল হইতে প্ল্যাসটিকের-তৈরী কয়েকটা মাথার ফুল আর একগোছা রঙীন চুলের কাঁটা বাহির করিল। মুখে সেই মৃদু মুচকি হাসি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খেয়ে এই সব কিনেছিস? পাগলী সাধে বলে।"

পাগলীর চোখের কৌতুকদৃষ্টি আরও চিকমিক করিয়া উঠিল।

ইহার কিছুদিন পরে যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে পাগলী অন্তসত্ত্বা হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে আসন্ন মাতৃত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট। সবাই ইহা লইয়া হাসি-তামাশা করিত। কোথাও খানিকটা বিষ্ঠা বা কফ পড়িয়া থাকিলে যেমন মাছি ভনভন করে তেমনি অশ্লীলতা-গন্ধী কিছু একটা পাইলে তথাকথিত রসিকেরও অভাব হয় না। পাগলীকে দেখিলেই অনেকে ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করিত তাহার নাগরটি কে, কোথায় থাকে। পাগলী কোন জবাব দিত না, রাগও করিত না মুখে মৃদু মুচকি হাসিটি ফুটাইয়া চুপ করিয়া থাকিত। সকলের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিত যেন কিছুই হয় নাই। তাহার চরিত্রের এই নূতন দিকটার পরিচয় পাইয়া দাতার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ রোজ প্রায় এক টাকা রোজগার করিত সে।

একদিন আবার সে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল।

"মাইজি, খাইতে দে। দু'দিন কিছু খাই নাই।"

"মুখপোড়া, তোর লজ্জা করে না? এতো পয়সা পাস, কি করিস তা দিয়ে?"

"পয়সা পাই তো, এইগুলো কিনলোম।"

পেটকাপড় হইতে কয়েটা ছোট ছোট জামা, একজোড়া ছোট মোজা এবং একটা ছোট টুপি বাহির করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল। ডাক্তার-গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন তাহাকে খুব বকিবেন, কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসির দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রান্নাঘরে বাসী ভাত ছিল তাহাই বাহির করিয়া দিলেন। পাগলী বেশ খাইতে পারিত। সামান্য ডাল ও তরকারি দিয়া অনেকগুলি ভাত খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, "পেট ভরে নাই।—আরও দাও।"

"আবার কি দেব? আর কিছু নেই। যা এখন।"

"ওই শশাটা দাও।"

তরকারির ঝুড়িতে একটা শশা ছিল। পাগলী সেইটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দিতেই হইল শশাটা। বাঁ হাতে শশাটা ধরিয়া কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। ডাক্তার-গৃহিণীর রাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরেই আবার প্রত্যাশিত দৃশ্যটি দেখা গেল। একটা সদ্যোজাত শিশুকে বগলদাবা করিয়া পাগলী বাস্-স্ট্যাণ্ডে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। শিশুর গায়ে নূতন জামা, পায়ে নূতন মোজা, মাথায় নূতন টুপি। তবু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে সে। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাইতেছে না। সকলের সামনে বুকের কাপড় খুলিয়া পাগলী তাহাকে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তবু তাহার কান্না থামিতেছে না। এজন্য কিন্তু পাগলীর মুখে কোনও বিরক্তি, আশঙ্কা বা বিব্রতভাবে ফুটিয়া উঠিল না। ইহা লইয়া অনেকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গও করিল, কিন্তু পাগলীর মুখের মুচকি হাসিতে কোনও পরিবর্তন ঘটিল না। সে মুখের মুচকি হাসি বজায় রাখিয়াই তাহার রুদ্যমান সন্তানকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডাক্তার-গৃহিণী একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই ছেলেটাকে মেরে ফেলবি দেখছি। আমাকে দে আমি ওকে মানুষ করি।"

তাঁহার কোলে তখনও কোনও সন্তান আসে নাই। বীরেনের জন্ম হইয়াছিল অনেক পরে।

ওকথা শুনিয়া পাগলী ডাক্তার-গৃহিণীর দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের মুচকি হাসিতে আর এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল যেন। ধীর শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল—"না, দিব না।"

কিছুদিন পরে দেখা গেল পাগলীর কোলে শিশুটি নাই। কিন্তু তাহার মুখের মৃদু মুচকি হাসটি ঠিক আছে।

ডাক্তার-গৃহীণী একদিন ডাকিলেন তাহাকে।

"তোর খোকা কোথা?"

"থাকল না, চলে গেল, মরে গেল।"

তাহার মুখের মৃদু হাসিটির দিকে চাহিয়া বিজন ডাক্তার অবাক হইয়া গেলেন। শোকের ছায়া সে হাসিকে একটু ম্লান করে নাই।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রায় দশ বৎসর। অনেক ঠাকুরের নিকট অনেক আরাধনা করিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর কোলে বীরেন আসিয়াছিল। সে-ও কিন্তু বেশীদিন রহিল না। হঠাৎ একদিন মারা গেল। বিজন ডাক্তার শোকাচ্ছন্ন হইয়া ছাতের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা শোকাবেগে তাঁহার মনের সংগ্রহশালার পরদাটা উড়িয়া গেল। তিনি সেই পাগলীকে দেখিতে পাইলেন, মৃদু মুচকি হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

বিজন ডাক্তারের সহসা মনে হইল নিষ্ঠুর নিয়তিকে অগ্রাহ্য করিয়া আমিও যদি অমনি হাসি হাসিতে পারিতাম!

ঢেউ

সেদিন খুব ভোরে খোকনের ঘুম ভেঙে গেল। মনের মধ্যে কে যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল তার। ঠিক বুঝতে পারল না কি হ'ল। এপাশ ওপাশ করতে লাগল বিছানায়। ছোট ছেঁড়া খাটিয়ায় বিছানা তার। বিছানাটাও ছেঁড়া আর ময়লা। দুঃখের জীবন খোকনের। মা-বাবা বহুকাল আগে মারা গেছেন। দূর-সম্পর্কের এক পিসের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে সে। বয়স বছর সাতেক। লেখাপড়া এখনও আরম্ভ হয়নি। দিন-রাত পিসীমার ফরমাস খাটাতে হয় কেবল। বাসন-মাজা কাপড়-কাচা সব। পিসেমশাই এক বাসনের দোকানে কাজ করেন। একটা চাকরের মাথায় কিছু বাসন চাপিয়ে 'চাই বা—সো—ন' বলে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি ক'রে বেড়ান। খোকনের খুব ইচ্ছে করে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে। কিন্তু পিসীমা যেতে দেন না।

খোকন চোখ বুজেই শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার মনে পড়ল ঘুমই যখন আসছে না তখন বাসনগুলো মেজে ফেলা যাক। কাল রাত্রে যে থালাবাটিগুলো এঁটো হয়েছে সেগুলো কলতলাতেই প'ড়ে আছে। কলে জল ছিল না ব'লে ধোওয়া হয়নি। এখন হয়তো কলে জল এসেছে। বাসনগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। কাজ চুকিয়ে রাখাই ভালো। উঠে পড়ল খোকন। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল পিসেমশায়ের ঘরের কপাট তখনও বন্ধ। তখনও ওরা কেউ ওঠেনি। খোকন উঠোনে গিয়ে জলের কলটা ঘোরাতেই কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। জল বেরুল না, বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি মুণ্ডু, একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ। ছোট্ট কচি খুকীর মুখ।

"তুমি খোকন?"

মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে খুকী।

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে চেন নাকি।"

"চিনি বই কি, যারা দুঃখী সবাইকে আমি চিনি। কতদিন এই কলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে তোমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখেছি তুমি ঘুমুচ্ছ। তোমাকে ওঠাই নি। প্রায়ই তোমার কাছে আসি কিন্তু। আজ আমিই তোমার মনে ঢুকে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি।"

"তুমি কে?"

"আমি পরী। আমার নাম ঢেউ।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কি মিষ্টি হাসি।

"তুমি ঢেউ? কিন্তু তোমার চেহারা তো মানুষের মতো।"

"আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি হ'তে পারি। দেখবে—"

চট ক'রে ছোট্ট একটি পদ্মফুল হ'য়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হ'য়ে গেল আবার।

খোকনের বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। সে চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইল খুকীর দিকে। তার একটু গা ছমছমও করছিল। ভূত নয় তো।

"না আমি ভূত নই"—মুচকি হেসে বলল সে—"আমি পরী, আমি ঢেউ, আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, অচেনাকে চিনতে চাই। তাই তো তোমার কাছে এসেছি—"

"কলের নল দিয়ে এলে, তুমি জলে থাকো নাকি? শুনেছি একরকম জলপরী আছে—"

মিষ্টি হাসিতে আবার ভ'রে গেল তার মুখটা।

"এখন আমি জলে আছি, আমাকে জলপরী বলতে পার। কিন্তু আমি সব সময়ে জলে থাকি না। স্থলেও থাকি, আকাশেও থাকি। তোমাদের বাড়ির পাশের শিউলি গাছটাতে শিউলি ফুল হ'য়ে ফুটেছিলাম এক রাত্রে। তার পরদিন সকালেই ঝ'রে গেলাম। চলে গেলাম আকাশে। তারাদের সঙ্গে কাটালাম কয়েক রাত্রি। এখন জলে ভেসে বেড়াচ্ছি। তোমাদের গঙ্গার জলে কিছুদিন হ'ল এসেছি। তার আগে ছিলাম সমুদ্রে। সেখানে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি। কত রকম শাঁখ, কত রকম ঝিনুক, কত রকম মাছ, কত রকম হাঁস আর পাখি, কত রকম সাপ। নানা রঙের, নানা মাপের, নানা মেজাজের। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ছোট্ট রুপোলী পাখিটাকে। ইংরেজিতে ওটার নাম সিলভার বার (Silver bar), দেখলাম ছোট ছোট চারটি বাচ্চাকে মানুষ করছে। আর দেখেছি প্রকাণ্ড কালো চিলের মতো আকাশচারী শিকারী পাখিদের। একটার নাম রিনচপ্‌স্‌ (Rhynchops), আমি নাম দিয়েছিলাম কালো যমদূত, আর একটা অস্‌প্রে (Osprey)—বাংলা নাম বোধহয় উৎক্রোশ। কি বিশাল ডানা তাদের, বড় বড় মাছ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—"

খোকন বলল, "সাগরেই না মুক্তা থাকে শুনেছি—"

"থাকে। তোমার জন্যে তিনটে ভালো মুক্তা এনেছি। যাবার আগে দিয়ে যাব। তার আগে একটা কথা বলি শোন। তুমি অত ভীতু কেন? ভয় কিসের? ভয় মিথ্যা, ভয় নেই—"

"কিন্তু আমি যে ছোট, আমি যে গরিব, আমি যে দুর্বল—"

"কিন্তু ওইটেই তো ভুল। তুমি যদি ক্রমাগত ভাব আমি ছোট, আমি দুর্বল, আমি গরিব তা'হলে সত্যিই তুমি তাই হ'য়ে যাবে। তোমাকে ভাবতে হবে আমি বড়, আমি মহাধনী, আমার শক্তির সীমা নেই, তাহলেই তুমি বড় হ'তে পারবে—"

"তাই নাকি—"

"হ্যাঁ। তুমি নিজেই জান না তুমি কে। সেইটে জানতে চেষ্টা কর। তাহলেই তোমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। এই কথা বলতেই আমি এসেছি।"

বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

"তোমার নাম ঢেউ?"

"হ্যাঁ আমি জলের ঢেউ, স্থলের ঢেউ, আকাশের ঢেউ, শব্দের ঢেউ, আলোর ঢেউ, ইথরের ঢেউ, ঝড়ের ঢেউ, আবার মৃদু হাওয়ারও ঢেউ। রেডিওতে তোমরা আমারই গলা শোন, আলোতে তোমরা আমাকেই দেখ, আমিই বহন ক'রে আনি গান আর গর্জন। যে মহাকাশযাত্রীরা এখন আকাশ-পরিক্রমা করেছেন আমি তাঁদের সঙ্গে আছি—"

হঠাৎ খুকী রূপান্তরিত হ'ল একটা জ্যোতির্ময় আলোক-শিখায়। খোকন সবিস্ময়ে দেখল তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে অপূর্ব শিহরণে।

"ঢেউ, ঢেউ তুমি কোথা গেলে—"

চীৎকার করে উঠল খোকন।

"এই যে আছি—"

শিখা আবার রূপান্তরিত হল খুকীতে।

"তুমি কি এখনই চ'লে যাবে? আমার ঘরে এস না একবার।"

"আমি বেশীক্ষণ এক জায়গায় থাকতে পারি না। এখনই চ'লে যেতে হবে আমাকে। এই নাও—"

"কি—"

"এই মুক্তা তিনটে এনেছিলাম তোমার জন্যে, নাও, ধর—। এরা সাধারণ মুক্তা নয়, এর একটি সত্য, একটি শিব আর একটি সুন্দর। এদের খুব মুঠো ক'রে চেপে ধর। এরা তোমার মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যাবে। প্রবেশ করবে তোমার দেহে, মনে, কল্পনায়।"

খোকন মুক্তা তিনটি হাতে মুঠো ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সবিস্ময়ে। একটু পরে মুঠো খুলে দেখল হাত খালি। মুক্তা তিনটি অন্তর্ধান করেছে।

"বাঃ"

হাততালি দিয়ে উঠল ঢেউ।

"এইবার দেখো, কি হয়। আমি চললুম।"

জলের কলের ফাঁক দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

হ'তে পারে একটা স্বপ্ন।

খোকন কিন্তু অস্বীকার করে। সে বলে প্রত্যক্ষ দেখেছিল সে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। খোকন সত্যিই বড়লোক হয়েছে। তার অসামান্য প্রতিভাবলে অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যে উজ্জ্বল করেছে দেশের মুখ। তার প্রতিভার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। সে আজ দেশের গৌরব।

একদিন সে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিল। চেয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। তার মনে হ'ল সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

শেষ ছবি

প্রথম যৌবনে তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বন্ধুত্ব হইবার পর মনে হইয়াছিল এমন একটা জিনিস পাইলাম যাহা সহজে পাওয়া যায় না। রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় বেশ ভালো নম্বর পাইয়াছিলাম। সেই নম্বরই আমাকে ঠেলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের কূলে তুলিয়া দিয়াছিল। কূলে দেখিলাম বাঁশী হাতে শ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শ্যাম যে রাধার উদ্দেশ্যে বাঁশী বাজাইতেছে সে বৃন্দাবনবাসিনী রাধা নহে, সে বিদেশিনী। কখনও ফরাসী দেশে থাকে, কখনও বা রাশিয়ায়। সাহিত্যের কুঞ্জবনে শ্যামচাঁদ সেই অশরীরিণী নায়িকার মাঝে মাঝে দেখা পাইত এবং বাঁশী বাজাইত। সেই নায়িকা মুগ্ধ হইয়াছিল কি না জানি না কিন্তু আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। একজোড়া বাঁয়া-তবলা জোগাড় করিয়া তাহার সহিত মাতিয়া গেলাম সুর-সাধনায়। কিছুদিন পরে আরও জমিয়া গেল, সুরের আসরে সুরা দেবীও আসিয়া যোগ দিলেন।

সকলে আমাদের বলিত মাণিকজোড়। এক সঙ্গে শোয়া-বসা, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, এক চায়ের দোকানে আড্ডা মারা, এক সঙ্গে কণ্টিনেণ্টাল উপন্যাস পড়া, এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখা। হায়, প্রগতির পথে পিতারা চিরকাল কণ্টকস্বরূপ। আমার পিতা একেবারে পর্বতের মতো পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম, অবিলম্বে চলিয়া এস। গেলাম। পিতা গাল-মন্দ করিলেন না, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে আর কলিকাতায় পড়িতে হইবে না, এখানকার কলেজেই ভরতি হইয়া যাও। পিতা অনমনীয় চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। মনের দুঃখ মান চাপিয়া বহরমপুর কলেজেই ভরতি হইয়া গেলাম। এজন্য এখন এই বৃদ্ধবয়সে স্বর্গীয় পিতার চরণে বারম্বার প্রণতি জানাই। এখন আমি মুনসেফ, আশা আছে, রিটায়ার করিবার পূর্বে সাবজজ্ হইতে পারিব। শ্যামের সহিত বাঁশী বাজাইলে এসব হইত না।

শ্যামকে কিন্তু একেবারে বর্জন করিতে পারি নাই। চিঠি লেখালেখি চলিত। তাহার প্রথম চিঠিটার অংশ বিশেষ পড়িয়া এখন ভারি মজা লাগিতেছে।

"তোমরা ভালো ছেলে। ভালোকের বাঁধা সড়কে চলিয়া একদিন তোমরা একটা নির্দিষ্ট নাম-করা সরাই-খানায় পৌঁছাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বাঁধা সড়কের ধার ধারি না, যে পথে কেহই চলে নাই আমরা সেই পথের পথিক। আমাদের পথের বর্ণনা কবি নজরুল ইসলাম দিয়াছেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। কিন্তু এ কবিতায় কবি কল্পনা করিয়াছেন সঙ্গে আরও যাত্রী আছে। কিন্তু আমি যে পথে চলিয়াছি, সে পথে কেহ নাই, আমি একা। এমন কি সুনামও আমার সঙ্গী নহে। সবাই বলে আমি বখাটে ছেলে। সামাজিক অভিধানে সম্ভবত উহাই আমার সংজ্ঞা। কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা শেলী, কীটস, গ্যয়টেও একদিন আমার দলের লোক ছিলেন। সমাজের কাছে তাঁহারা ভালো ছেলের সার্টিফিকেট পান নাই। কিন্তু আমি একটা অভাব বোধ করিতেছি। মেয়েরা সাধারণত পুরুষের প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তাহাকে

অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত করিতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম মেয়ে কোথায়। সবাই যেন ছাঁচে-ঢালা পুতুল। হয় খেঁদি-নেড়ি-বগী-বিন্দীর ছাঁচে-ঢালা, না হয় তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত সমাজের ছাঁচে-ঢালা। স্বকীয়তার দীপ্তি কাহারও মধ্যে দেখি না। মেরি ফ্লগলে, বা হ্যারিয়েট বা লটির মতো মেয়ে আমাদের ভদ্রসমাজে কই। সবাই মুখস্থ করা নীতিকথা বলে, প্রাণের কথা কাহারও মুখে বড় একটা শুনি নাই। সোনিয়ার মতো মেয়ে এদেশের মাটিতে কল্পনাতীত। শেরীর দাম সম্প্রতি আকাশচুম্বী হইয়াছে। তুমি সিঁড়ি ছিলে অনেক আকাশচুম্বী রত্নই আহরণ করিতে পারিতাম। এখন সাধারণ ব্রাণ্ডি জোটানই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ধান্যেশ্বরীর সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছি, যদি তাহার প্রেমে পড়িতে পারি। একজন বহুদর্শীর মুখে শুনিলাম, ধান্যেশ্বরী শুধু যে সস্তা তাঁহাই নন, শরীরের পক্ষে উপকারীও। তিনি অবশ্য গাঁজাকেই সর্বোচ্চ সম্মানের আসন দিলেন, কিন্তু ভাই গাঁজা খাইতে পারিব না…।”

দ্বিতীয় আর একটি পত্রে দেখিতেছি ঃ

“ভাই শিবেন, শুনিলাম তুমি ভালো করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। জানি এইবার তোমাকে লাইন ধরিতে হইবে। এই লাইন ধরিয়া যে টার্মিনাসে পৌঁছিবে তাহার একটা বাঁধাধরা ছবি তোমার জানা আছে। আমি যে পথে চলিয়াছি তাহারও একটি নাম সবাই জানে। সে নামটি ‘অজানা’। আমি সম্প্রতি একটি খবরের কাগজে প্রুফ রিডারের চাকরি পাইয়াছি। বেতন যৎসামান্য, সিগ্রেটের খরচটা কোনক্রমে উঠিয়া যায়। আমার বাকি খরচ যে চালায়, তাহার নামটা আর নাই বলিলাম, তাহার নাম আর পরিচয় শুনিলে তোমরা হয়তো শারীরিক ও মানসিক বিক্ষোভ হইবে। প্লীহা চমকাইয়া যাইবে, নাসিকাও কুঞ্চিত হইয়া কুৎসিত রূপ ধারণ করিবে। সুতরাং নামটা আর করিব না। শুধু এইটুকুই জানিয়া রাখ, মেয়েটি মানবীরূপে দেবী। সমাজ বা সংসার তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই। তবুও সে সদা হাস্যমুখী। তবুও তাহার গানের ঝংকারে স্বর্গীয় সুর। যদি কোনদিন এ অঞ্চলে আস আলাপ করাইয়া দিব। আমার বাবাও একটি আশ্চর্য লোক। এখনও আমাকে টাকা পাঠাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বোধহয় এখনও আশা আছে, আমি বি-এ পাশ করিয়া তাঁহার আপিসে একদিন ঢুকিব। আমি যে অন্যত্র চাকুরি লইয়াছি সে কথা তাঁহাকে এখনও জানাই নাই। জানাইলে হয়তো তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দিবেন। এ বাজারে মাসে পঞ্চাশ টাকা তুচ্ছ করিবার মতো নয়। তবে এখন যে বন্দরে আমার নৌকা লাগিয়াছে তাহাতে মনে হয় আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। সোনা আমাকে একসেট ভালো কবিতার বই কিনিয়া দিয়াছে। ওই দেখ, নামটা শেষে বলিয়াই ফেলিলাম। কথাটা যেন চাউর করিও না। আলাপ হইলে দেখিবে, যে সব বড় বড় প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা তোমাদের বাণীমন্দির অলংকৃত করিতেছেন সোনা তাহাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু সমাজের চক্ষে সে পতিতা। আর কিছু নয়। স্যাফোর (Sapho) কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ, আমার মনে হয় সোনা স্যাফোরই সম-গোত্রীয়।

আর একটি চিঠিতে দেখিতেছি—

"ভাই, বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। বাবা এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। মেয়ে সুলক্ষণা এবং সদ্বংশীয়া। এ দুটি গুণ ছাড়া আর কোন গুণ নেই। দেখতে কুৎসিত, লেখাপড়ায় 'ক' অক্ষর গোমাংস। অত্যন্ত রোগা। আমি আপত্তি করেছিলাম। বাবা সেকেলে গোঁড়া লোক। আমাকে জানিয়েছেন—তুমি যদি বিয়ে না কর, তাহলে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব আর আমার বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব তোমাকে। আমি ওদের কথা দিয়েছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। ফেরত ডাকেই তোমার উত্তর চাই। আমি যে কি ক'রে এই গোঁয়ার-গোবিন্দ বাপের ছেলে হলুম তা ভেবে পাই না। মত দিয়েছি, মানে, দিতে হয়েছে। তুই কি আমার বিয়েতে আসবি ?"

আমার যাওয়া হয় নাই। সামনেই পরীক্ষা ছিল। সেদিন পুরাতন চিঠি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শ্যামের আরও চিঠি পাইলাম। একটা চিঠি এইরূপ—

"ভাই সোনাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। বাবা কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া ক'রে পিসিমা আর আমার বউকে এখানে পাঠিয়েছেন। সোনা বলছে তুমি আর আমার এখানে থেকো না। তুমি নির্মলার কাছে গিয়েই থাক। তোমার যদি টাকার দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। সোনাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছি না। সে আমাকে কিছুতেই তার কাছে থাকতে দেবে না। আমি যে সোনার বাসাতে থাকি এবং সোনাই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন সব—একথা বাবা টের পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। তা না হ'লে এখানে বাসা ভাড়া করতে যাবেন কেন ? সোনার সঙ্গে রফা হয়েছে একটা শেষকালে। তাকে বলেছি নির্মলার কাছে মাঝে মাঝে যাব। ইতিমধ্যে একদিন গিয়েছিলাম। রাত্রি দুটো নাগাদ, মত্ত অবস্থায়। গলিতে ঢুকে দেখলাম আমাদের বাড়ির জানালার আবছা অন্ধকারে একটি রোগা মেয়ে গরাদে ধ'রে পথের দিকে চেয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ছুটে নেমে এসে কপাট খুলে দিলে। আমি কোনও খবর দিয়ে যাইনি। হঠাৎ মনে হ'ল রোজই দাঁড়িয়ে থাকে না কি। জিগ্যেস করাতে চুপ করে রইল।"

শ্যামের আর কোন চিঠি পাইলাম না। সোনার এক নামজাদা ধনী বাবু ছিলেন। তিনি সোনাকে লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সোনার অনুরোধে শ্যামও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে গিয়াছিল। প্রায় তিন-চার বৎসর তাহার কোন খবর পাই নাই। হঠাৎ একদিন আমার আর এক বন্ধুর নিকট খবর পাইলাম শ্যাম খুব অসুস্থ। সে কলিকাতায় সোনার বাসাতেই আছে। একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতায় অন্য একটা কার্যোপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল, ভাবিলাম শ্যামকেও দেখিয়া যাই, অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই। তাহার বাসায় যখন পৌঁছিলাম তখন সোনা বাড়িতে ছিল না। খবরটা শুনিয়া আরাম বোধ করিলাম। দেখিলাম শ্যাম একাই বিছানায় শুইয়া একটা বড় ছবির অ্যালবাম দেখিতেছে।

"তুই একাই রয়েছিস ?"

"হ্যাঁ, সোনা ডাক্তারের কাছে থেকে গেছে।"

"শুনলাম তোর খুব অসুস্থ। কি হয়েছে ?"

"যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা। রাজকীয় জীবনযাপন করেছি তো—"

তাহার কোটরগত চক্ষু, খাঁড়ার মতো নাক, চোপসানো গালকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার সেই হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

"দুর্গম গিরি কান্তর মরু পার হ'য়ে অবশেষে এইখানে এসে পেঁৗছেছি। যবনিকা পড়বার আর দেরী নেই।"

খক খক করিয়া কাসিতে লাগিল।

"জীবনটা যে এত চট্ ক'রে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবিনি। শেষ হয়ে যাওয়াই নিয়ম অবশ্য।"

আবার কাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "ওসব কথা থাক। ইয়োরোপ গিয়েছিলি শুনলাম, কি কি দেখলি সেখানে—"

"দেখলাম দুরন্ত জীবন-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। আর দেখলাম ওদেশের আর্টগ্যালারিগুলো। প্রতিভাবান শিল্পীদের অমর সৃষ্টি সব। অনেক ছবি, অনেক মর্মর মূর্তি। আর দেখলাম সোনাকে। ওরকম মেয়ে হয় না, ও আমার জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন ভুল করেছি। রূপ, লেখাপড়া, শিল্প, নাচ, গান, সাহিত্য এই সব নিয়েই তো জীবন কাটল—কিন্তু তবু মনে হচ্ছে—"

চুপ করিয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল—"ছবি তো অনেক রকম দেখলাম। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটি ছবিই কেবল চোখের উপর ভাসছে, আর বাকী সব মুছে গেছে—"

"কি ছবি সেটা ?"

"একটা রোগা মেয়ে অন্ধকার রাত্রে জানলার গরাদে ধ'রে রাস্তার দিকে আকুল নয়নে চেয়ে আছে। এ ছবিটা সব ছবিকে আড়াল করে চোখের সামনে ফুটে উঠছে, মনে হচ্ছে ওইটেই শেষ পর্যন্ত থাকবে।"

বুঝিলাম আমি আসতে শ্যাম একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। বেশীক্ষণ বসিলাম না, চলিয়া আসিলাম।

পরদিনই শুনিলাম শ্যামের মৃত্যু হইয়াছে।

রত্নেশ্বর সাধু

বৈঠকখানা ঘরে ব'সে রেডিও শুনছি। নামজাদা একজন গায়ক ইমন কল্যাণ গাইছেন। তন্ময় হ'য়ে ব'সে আছি। একটু পরে কালো বেঁটে রোগা গোছের একটি লোক প্রবেশ করলেন। আগে দেখিনি কখনও। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করে তাঁকে বসতে বললাম সামনের সোফায়। উপবেশন করে তিনি প্রশ্ন করলেন, "বিশ্বনাথবাবু এসেছেন কি ?"

বিশ্বনাথ মুখুজ্যে আমার একজন বন্ধু, রোজই এই সময় আসেন, কিন্তু সেদিন তখনও আসেন নি।

বললাম "না এখনও আসেনি তো। বসুন, এখনই আসবে। রোজই আসে তো এ সময়ে—"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। একটু পরে প্রশ্ন করলেন, "সিগারেট খেতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই। এই যে—"

নিজের সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলাম। তিনি একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন, "সাধারণত আমি অন্যের সিগারেট খাই না। নিজে পাকিয়ে খাই। দেখা যাক এটা কেমন লাগে- "

ধরালেন। তখন তাঁর মুখটা ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম সারা মুখে একটা প্রচ্ছন্ন দর্প যেন চাপা-আগুনের মতো নীরব দাহ বিকীর্ণ করছে। রেডিওটার দিকে চেয়ে বললেন, "গান শুনছেন ? শুনেছি আপনি গান-বাজনার সমজদার। কিন্তু গত কুড়ি বছরের মধ্যে একটি ভালো গাইয়ে আর হয়েছে কি ? অবশ্য ভজ আর মতি ছাড়া। ওরা মন্দ গায় না।"

শুনে বিস্মিত হলাম। ভজহরি মিত্র আর মতিলাল আইচ আজকাল গান গায় বটে। কিন্তু ওরকম ওঁছা গান না গাইলেই ভালো হতো। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় বিশ্বনাথ ঢুকল। তার পিছনে একটা কুলি, কুলির মাথায় একটা বড় বাক্স।

"এই যে দাদা, আপনি এসে গেছেন দেখছি। রেকর্ডগুলো যোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। গ্রামোফোনও এনেছি একটা। ওই কোণে রেখে দাও।"

কুলিটিকে সাহায্য ক'রে বিরাট বাক্সটি বিশ্বনাথ কোণে রাখিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—"এঁকে চেনো না নিশ্চয় ?"

"না—"

"ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত লাগবগুাবং স্পেশ্যালিস্ট রত্নেশ্বর সাধু। একশ'খানা রেকর্ডে নানা ঢঙে কেবল লগবগুাবং বাজিয়েছেন। তোমার দোকান থেকে ওঁর রেকর্ডগুলো একটু পুশ করতে হবে, তাই তোমাকে রেকোর্ডগুলো শোনাতে এসেছি।

বিপন্ন বোধ করলাম।

"বাজাই ?"

"বাজাও।"

দশখানি রেকর্ড শুনলাম। সবই সেই একঘেয়ে লাগবগুাবং। প্রথমে দু'তিন খানা ভালো লেগেছিল, তারপর অসহ্য মনে হ'তে লাগল। থামিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, আমি পুশ করবার চেষ্টা করব।"

রত্নেশ্বরবাবু তখন বললেন, "আপনার কাছে আর একটা অনুরোধ আছে। বাদ্যযন্ত্র আর গ্রামোফোনের বড় বড় দোকানগুলোতে যদি একটু সুপারিশ ক'রে দেন—"

বললাম, "বিক্রি হয় বিজ্ঞাপনের জোরে। সেই ব্যবস্থা করুন।"

বিশ্বনাথ একটু নিম্ন কণ্ঠে বললেন—"উনি বদ্ধ কালা। গত ষোল বছর ধরে উনি একেবারে শুনতে পান না।"

তারপর রত্নেশ্বরবাবুর দিকে একটা মাথার ইঙ্গিত করতেই তিনি উঠে পড়লেন।

"এখন তাহলে আসি। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ।"

রত্নেশ্বরবাবু চলে গেলে জিজ্ঞাস করলাম—"ভজহরি মিত্র আর মতিলাল আইচের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ কি ?

"ওঁরা দু'জন ওর চাটুকার, পোষা কুকুরও বলতে পার।"

বিস্মিত হ'য়ে ব'সে রইলাম।

মহামানব কেনারাম ও ক

কেনারামকে বিধুভূষণ বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার বাড়ির বারান্দায় রোজ 'ক' এসে বসছে কেন। ওকে বেশী আসকারা দিও না। ওরা সাংঘাতিক জাত।

সকলেই জানে কেনারাম উদার-হৃদয় লোক। একটা উঁচুদরের হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বলল—তুমি জাত তুলে কথা কও কেন। আমাদের জাতের মধ্যেই কত সাংঘাতিক লোক আছে তা জান ?

বিধুভূষণ হাত জোড় ক'রে বলেছিল, ভাই তুমি মহাপুরুষ তা জানি। কিন্তু 'ক'-কেও জানি, তাই বন্ধু হিসাবে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তুমি নতুন বিয়ে করেছ, বউটি সুন্দরী।

একথা শুনে কেনারামের নাকটা কুঁচকে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণের মতো লোক যে এতদূর অশ্লীল হতে পারে তা তার কল্পনাতীত ছিল, তাই চট ক'রে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নাকটাই যা প্রকাশ করবার ক'রে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

বিধুভূষণ চলে গেল মুচকি হেসে।

দিন পনেরো পরে বিধুভূষণের নজরে পড়ল 'ক' কেনারামের বারান্দা থেকে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। কেনারামের দামী সোফায় ব'সে ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাই করছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বিশ্রম্ভালাপ। বিধুভূষণের মনে হ'ল—এই রে সেরেছে।

বিধুভূষণও ঢুকে পড়ল বৈঠকখানায়। ঢুকে দেখল, 'ক' পান চিবুচ্ছে চবর চবর ক'রে আর বলছে—আপনার বউ যে এমন সুন্দর পান সাজতে পারে তা কে জানত! অপূর্ব, অদ্ভুত। এ যেন পান নয়, গজল।

বিধুভূষণ আবার মনে মনে বলল—এই রে সেরেছে।

কেনারাম বিধুভূষণকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু বিধু আপনাকে ভয় করে। ওর মনের গঠন এমন বিশ্রী যে সন্দেহ কিছুতে ঘুচতে চায় না ওর প্রাণ থেকে।

বিধুভূষণ হেসে বলল—আমি মহাপুরুষও নই পাথরও নই। আমি রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। তাই ভয়ও করি, সন্দেহও ঘুচতে চায় না। রাগ দ্বেষ সবই আছে আমার।

'ক' দুলে দুলে হেসে বলতে লাগল—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। মনে প্রেম জাগান, প্রেম জাগলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ হেঁ—প্রেমই আসল চিজ।

এ শুনে বিগলিত কেনারাম কুণ্ডুর মুখভাব মাখন-মাখানো পাঁউরুটির মতো হয়ে গেল। বিধুভূষণ আর একবার মনে মনে ভাবল—এই রে, সেরেছে।

দিন দশেক পরে কেনারামের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল বিধুভূষণের। রাস্তার মোড়ে। কেনারামের হাতে একটি খাসির রাং।

কেনারাম। এই যে বিধুভূষণ। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালোই হ'ল। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে খেও। আমার বউ কোর্মা রাঁধবে, আর 'ক' করবে "সামী" কাবাব।

বিধুভূষণ। কি রকম? হঠাৎ এ-সব কেন?

কেনারাম। ভাই বিধু, 'ক' যে কত ভালো, তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সে আমার স্ত্রীকে একটা দামী শাল উপহার দিয়েছে, আমি মানা করলাম, তবু শুনল না। তুমি যদি আজ আস, তাহলে দেখবে কি রকম দামী শাল আর কি চমৎকার তার কাজ। সে বললে, এটা আমার প্রেমের উপহার, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি আর বাধা দিতে পারলাম না।

বিধুভূষণ। দেখ কেনারাম, তুমি যে একজন মহামানব, তা আগে জানতাম, কিন্তু তুমি যে নপুংসক, এটা আমার জানা ছিল না। ক একজন নারী-ধর্ষণকারী গুণ্ডা, এ-কথা কি তোমার জানা নেই? থানার দারোগা সাহেবের কাছে গেলেই সব জানতে পারবে। তিনি প্রমাণ পেলে ওকে গ্রেপ্তার করতেন, কিন্তু পুরো প্রমাণ পাননি। কিন্তু তাঁর ঘোর সন্দেহ—

কেনারাম। দেখ বিধু, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাই একবার নারী-ধর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাই বলে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করতে পারিনি। কখনও পারব না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও 'স্পট' আছে, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো দিকটা দেখ—

বিধুভূষণ। তুমি দেখ, আমি চললাম।

কেনারাম। রাত্রে তুমি খেতে আসবে কি?

বিধুভূষণ। না।

আরও মাসখানেক পরে।

কেনারাম বাড়ি ছিল না। হঠাৎ সে বাড়ি ফিরে দেখে 'ক' এসেছে। 'ক'য়ের ছড়িটি বৈঠকখানা ঘরের কোণে ঠেসানো রয়েছে, কিন্তু 'ক' নেই। কেনারাম অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। 'ক' তার শয়নকক্ষে ব'সে তার স্ত্রীর থুতনি ধ'রে আদর করছে। অন্য কেউ হ'লে চেঁচামেচি করত, জুতো-পেটা করত, লাঠালাঠি করত। কিন্তু কেনারাম মহামানব। এ-সব কিছুই না ক'রে সে আবেগ-গদগদ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করল শুধু।

বলল, ভাই ক, তোমার এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। পুটিবালা আমার বিবাহিতা পত্নী, তার গায়ে এভাবে হাত দেওয়া বে-আইনী। এ-কাজ তুমি আর কোরো না। ভেবে দেখ, এটা কি সঙ্গত?

এর উত্তরে ক যা বলল, তাতে হকচকিয়ে যেতে হ'ল মহামানবকে।

ক বলল, বন্ধু কেনারাম, কয়েকটা ভুল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পুঁটিবালাকে তুমি বিয়ে করেছ, তা মানি। কিন্তু ওই নজিরেই যে তুমি পুঁটিবালাকে চিরকাল দখল ক'রে থাকবে, এটা আমি মানব না। আধুনিক সভ্যসমাজের মহামানবেরা কেউ এ-কথা মানবে না। তুমিও একজন মহামানব, তোমাকে একথাটা চিন্তা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। এ-সব ব্যাপারে পুঁটিবালার মতই তোমাকে মানতে হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ এটা।

এই বলে নাটকীয় ভঙ্গীতে ক বেরিয়ে গেল। পুঁটিবালা পিছন ফিরে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু। বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল না।

অন্য কেউ হলে চুলের ঝুঁটি ধ'রে চাবকাত তাকে। কিন্তু কেনারাম মহামানব। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর করবার কিছু ছিল না। তাই রইল সে।

আরও মাস দুই পরে।

সেদিনও কেনারাম বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে দেখল ক এসেছে। বস্তুত ক রোজই আসত। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে আসা বন্ধ করেনি। লাঠিটি যথারীতি বৈঠকখানার কোণে ঠেসানো আছে। সেদিন কিন্তু কেনারাম বাড়িতে ঢুকে যা দেখল, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়তে হ'ল তাকে। সে দেখল 'ক' শুধু যে তার শয়নকক্ষে রয়েছে তাই নয়, বিছানায় উঠে বসেছে এবং সে আর পুঁটি যে অবস্থায় রয়েছে, তা অবর্ণনীয়।

কেনারাম বলল, ভাই ক, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাকে আপনজন বলে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলাম, এই কি তার প্রতিদান?

কেনারামের মনে হ'ল 'ক' একথা শুনে যেন মরমে ম'রে গেল। তার মনে হ'ল, তার অন্তরে অনুশোচনার মেঘ দেখা দিয়েছে। যা আপাতদৃষ্টিতে হাসি ব'লে মনে হচ্ছে তা হাসি নয়, লজ্জা।

এই উপলব্ধি হওয়ামাত্র তার সব রাগ জল হয়ে গেল, মহামানবসুলভ আনন্দে সে যে লোকে গিয়ে হাজির হ'ল, তা ভূগোলে নেই।

পরদিন পুঁটিবালা অন্তর্ধান করলে।

'ক'-কেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনা বিধুভূষণের মুখে একদিন শুনেছিলাম।

বিধুভূষণ বলল, কেনারাম তার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে' চৌমাথার কাছে একটুকরো জমি কিনেছে। সে জমির উপর সে একটি উঁচু মর্মরবেদী বানাবে, আর সেই মর্মরবেদীতে উঠে সে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তারস্বরে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজিতে যে বাণীটি ঘোষণা করবে তার সারমর্ম হচ্ছে—'অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুণ্ডা, কিন্তু আমি এ-কথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট আছে, গোলাপে কণ্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে

বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে, সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে। লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভালানে' বলে বলুক। লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।' এই এখন ঠিক করেছে কেনারাম। মহামানবদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

অনেকদিন পরে কেনারামের একটি ডায়েরী পেয়েছিলাম। একটি অদ্ভুত খবর ছিল তাতে। ডায়েরীতে কেনারাম লিখেছে—আমি মহামানব। কিন্তু হায় আমাকে কেউ পোঁছে না। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আমি যে মহামানব, তা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব। দেখি, লোকে আমাকে পোঁছে কি না।

কেনারাম এখনও পাগলাগারদের বাইরেই আছে।

বিলাস প্রসঙ্গ

শীতকাল। স্থান—পশ্চিমের একটি শহর। শহরের পাশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত। বিলাসবাবুর তিন বন্ধু নিমাইবাবু অতুলবাবু এবং সতীশবাবুর সেই শহরে থাকেন। বিলাসবাবু মাঝে মাঝে আসেন সেখানে। নিমাইবাবু বিলাসের সহধর্মী, দুইজনেই পক্ষী বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক। নিমাই যদিও ডাক্তার কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিলাসবাবু আসিলে উভয়েই গলায় দূরবীন ঝুলাইয়া বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অতুলবাবু বিলাসের সহপাঠী। সতীশবাবু বিলাসের সহকর্মী ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে চাকুরিটি গিয়াছে। সতীশের স্ত্রীর ধারণা বিলাসবাবু যদি চেষ্টা করেন তাহা হইলে সতীশ আবার চাকরিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ বিলাসবাবু এখন চাকুরি-জীবনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন।

সেবার বিলাসবাবু কার্য উপলক্ষে যখন টুরে আসিলেন তখন অতুলবাবুর বাসাতেই উঠিলেন। প্রতিবারই ওঠেন। সেবার উঠিয়া স্যুটকেশ বিছানা প্রভৃতি অতুলের বাসায় নামাইয়া দিয়া একটা মোটর যোগাড় করিয়া পরিচিত সকলের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব। তাছাড়া তিনি অনেকেরই প্রিয়। লোকটি বিদ্বান, রবীন্দ্র-ভক্ত, কাছা-খোলা, মুক্তহস্ত, ভুলোমন, হুজুকপ্রিয় এবং ব্যস্তবাগীশ। এরূপ লোক সকলেরই প্রেম আকর্ষণ করে। তাছাড়া তিনি একজন বড় পক্ষীতত্ত্ববিদ্। যেখানেই যান আপিসের কাজকর্ম অবহেলা করিয়া পাখী দেখিয়া বেড়ান।

নিমাইবাবু ডিস্পেন্সারি হইতে ফিরিয়া আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলেন। মোটরের হর্ণে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বাহির হইয়া দেখিলেন মোটরে উত্তেজিত বিলাসবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার গলায় দূরবীন ঝুলিতেছে।

"শিগ্গির চলে আসুন। গঙ্গায় শুনছি নানারকম হাঁস এসেছে। চলুন গিয়ে দেখে আসি।"

নিমাইবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র তরঙ্গ বলিল, "আমিও যাব।"

"নিশ্চয় যাবে। চ'লে এস তাড়াতাড়ি।"

নিমাইবাবু যখন মোটরে উঠিলেন তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা। শীতকাল। সুতরাং সন্ধ্যা আসন্ন।

"কোথায় যাবেন?"

বিলাসবাবু গঙ্গার যে ঘাটটির কথা বলিলেন তাহা শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে। বিলাসবাবু ড্রাইভারকে অনুরোধ করিলেন—দুবেজি জোরসে চালাইয়ে।

দুবেজি জোরেই মোটর চালাইয়া তাঁহাদের গঙ্গার ঘাটে নামাইয়া দিল। ইহার পর নৌকায় উঠিতে হইবে। কোনও মাঝিই যাইতে রাজি হইল না। দেখা গেল অনিশ্চিত হাঁসের সন্ধানে যাত্রা করিবার উৎসাহ কাহারও নাই। দূরে একটা মাঝিহীন নৌকা বাঁধা ছিল। অদম্য বিলাসবাবু ছুটিয়া গিয়া তাহাতেই লাফাইয়া উঠিলেন।

"নিমাইবাবু, আসুন। গঙ্গায় জল তো বেশী নেই। আমারই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি লগি ঠেলছি আপনি হালে বসুন।"

এমন সময় একটা কালো লম্বা ছোঁড়া জুটিয়া গেল। সে হিন্দীতে বলিল যে সেই তাহাদের লইয়া যাইবে। কিন্তু এক টাকা বখশিস চাই।

"কুছ পরোয়া নেই। চলে এস। এ নৌকো তোমার?"

"নেই। হামরা মামুকা—"

কিছুদূরে গিয়া হতাশ হইতে হইল। হাঁস কই? অনেক দূরে দুই একটা চখা রহিয়াছে কেবল। চখা সাধারণ হাঁস। বিলাসবাবু পিংকফুট, বার্ণাকল্ বা গীজ দেখিতে পাইবেন আশা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দূরবীনে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

"আচ্ছা, ওটা কি দেখুন তো—"

গঙ্গার মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপের মতো। তাহার উপর কালো একটা পাখী। নিমাইও দূরবীন লাগাইয়া দেখিলেন। প্রথমে কোন সিদ্ধান্তেই আসা গেল না। নৌকা আর একটু আগাইতে নিমাইবাবু বলিলেন, "ময়ূর ব'লে মনে হচ্ছে—"

বিলাসবাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইতে গিয়া নৌকার খোলের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। পাটা একটু ছড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে দূরবীন লাগাইলেন।

"কি বলেন মশাই, গঙ্গার মাঝখানে ময়ূর আসবে কি ক'রে? ওটা কররা হ'তে পারে। কিন্তু কররা তো একা থাকে না, চরেও থাকে না, তারা সাধারণত গম ক্ষেতে দল বেঁধে থাকে।"

এইবার নৌকা মাটিতে ঠেকিয়া গেল। জল খুব কম ছিল। কালো ছোঁড়াটা বলিল, "আর নেই চলে গা বাবু।"

বিলাসবাবু তখনও চোখে দূরবীন লাগাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"হ্যাঁ আমারও ওটা ময়ূর বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ময়ূর ওখানে কি ক'রে আসতে পারে! কাছে একটা লোকও রয়েছে দেখছি। নৌকো এখানেই থাক, চলুন আমরা নেবে গিয়ে দেখে আসি।"

বিলাসবাবু তড়াক করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদেও

পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দুইটি পা-ই কাদায় পুঁতিয়া গেল। অনেক কষ্টে যখন তাঁহাকে টানিয়া তোলা হইল তখন দেখা গেল তাঁহার এক পাটি জুতা কাদার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। নিমাইবাবু নামিতে সাহস করিলেন না। দেখা গেল জুতার জন্য বিলাসবাবুর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই। কিন্তু জ্ঞানপিপাসায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। বলিলেন, "ওখানে ময়ূর কেমন ক'রে এল তা ঠিক না ক'রে কি ফিরে যাওয়া উচিত হবে? কিন্তু কি ক'রে ওখানে যাওয়া যায়।"

তরঙ্গ বলিল, "আমি গিয়ে দেখে আসব?"

সে জলে নামিয়া পড়িল। তাহার ওজন কম। তাহার পা পুঁতিয়া গেল না। সে জলে ছপছপ করিতে করিতে চরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিলাসবাবু বলিতে লাগিলেন, "এ সময় বিদেশ থেকে অনেক ভালো ভালো হাঁস এখানে আসে। জার্মানি থেকে, হিমালয় থেকে, অদ্ভুত সব হাঁস।"

তরঙ্গ একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'ওটা ময়ূরই। ওখানে একটা ধোপানী কাপড় কাচছে, তার ময়ূর, ময়ূরটা ওর পোষা। ওর সঙ্গে রোজ আসে।"

কালো ছোঁড়াটা বলিল, "আব চলিয়ে হুজুর। মামু গোস্সা করে গা—"

ঘাটে আসিয়া দেখা গেল মামু মারমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লম্বা চওড়া তাগড়া লোক, ঝাঁকড়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি।

সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দীতে বলিল যে তাহার একটা 'কেরায়াদার' ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত পাঁচ টাকার চুক্তি হইয়াছিল। অবিলম্বে পাঁচ টাকা না দিলে—। বিলাসবাবু ও নিমাইবাবুর পকেট ঝাড়িয়া দেখা গেল মাত্র সাড়ে চার টাকা আছে। বিলাসবাবু সেই সাড়ে চার টাকা লইয়া অদ্ভুত হিন্দীতে মামুকে মিনতি করিতে লাগিলেন। মামু বিগলিত হইল। তখন সাড়ে পাঁচটা। বিলাসবাবুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"ছি, ছি, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। সতীশবাবু আজ আমাকে চারটের সময় চা খেতে বলেছিলেন। এঃ, খুব অন্যায় হ'য়ে গেল—।"

দুবেজি মোটর লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল মোটরের পেট্রোল ফুরাইয়াছে। অন্তত এক গ্যালন পেট্রোল না কিনিলে গাড়ি চলিবে না।

বিলাসবাবু সরল লোক। হাসিমুখে বলিলেন, "আমরা এখন কপর্দকশূন্য। যা ছিল সব মামুকে দিয়েছি। হেঁটেই চলে যাই তাহলে।"

দুবেজি চোখ পাকাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, একটা পেট্রোল পাম্প হইতে সে ধারে এক গ্যালন পেট্রোল কিনিয়া আনিবে কি?

বিলাসবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

শীতকাল। গঙ্গার ধারে প্রখর হাওয়া বহিতেছিল। বিলাসবাবুর পায়ে জুতা নাই, সর্বাঙ্গে কাদা, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তবু তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নানাবিধ হাঁসের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। বন্য হংসের যে কত প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী হাঁসের তফাত কি, প্রকৃত শাদা রাজহংস কোনও শব্দ করে না, তাহাদের গায়ের রং তুষারধবল—এই সব কাহিনী তিনি বিশদরূপে

বিব্রত করিতে লাগিলেন। গাড়িতে পেট্রোল ঢালিবার পরও যখন গাড়ি স্টার্ট হইল না, তখনও বিলাস দমিলেন না।

বলিলেন, "আসুন, আমরা ঠেলি—"

ঠেলিবার পর গাড়ি গর্জন করিল।

বিলাসবাবু নিমাইবাবুকে নামাইয়া দিয়া অতুলবাবুর বাড়িতে চলিয়া গেলেন। বলিলেন, সেখান হইতে সতীশবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন।

মিনিট পনেরো পরে হন্তদন্ত হইয়া বিলাসবাবুর পুনঃপ্রবেশ। নিমাই তখন সবে হাত-পা-মুখ ধুইয়া বসিয়াছেন।

"নিমাইবাবু, শিগ্‌গির চলুন। সতীশবাবুর হার্ট ফেল করেছে। পালস্‌ নেই। আপনার ব্যাগটা নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—"

"সতীশবাবুর বাড়িতে?"

"না, তিনি অতুলের বাসায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। অতুল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছে।"

নিমাই গিয়া দেখিলেন অতুলের বাসায় সতীশবাবু বাহিরের ঘরে একটি সোফায় আচ্ছন্নের মতো পড়িয়া আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহাকে একটি ইন্‌জেক্‌শন দিলেন।

অতুল সন্তর্পণে বাথরুমের দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বেঁচে আছে, না মরে গেল!"

"না, না ভয় নেই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে এক্ষুণি।"

সত্যই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক হইয়া গেল। সতীশবাবুর নাড়ী ও জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি ধীরে ধীরে সব খুলিয়া বলিলেন।

"বেলা চারটের সময় আমার স্ত্রী বিলাসবাবুর জন্যে গরম কচুরি আর সিঙাড়া ভেজেছিলেন। বিলাসবাবু এলেন না দেখে আমাকে তিনি বললেন, তুমি অতুলবাবুর বাড়ি থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। হয়তো গল্পে মেতে আছেন। অতুলবাবুর বাড়িতে এসে দেখি বিলাসবাবু নেই। অতুলবাবু বললেন, সে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সে ফিরলেই তাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সব শুনে গিন্নী বললেন, তুমি ফিরে এলে কেন। ওখানেই ব'সে থাক গিয়ে। ফিরে এসেই আবার গল্পগুজবে মেতে যাব। বিলাসবাবুকে চেন না? ব'সে থেকে ধ'রে নিয়ে এস ওঁকে। সিঙাড়া কচুরি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে কি খাওয়া যায়? আবার এলাম অতুলবাবুর বাড়িতে। আমাকে দেখে অতুলবাবু বললেন, কেন বার বার আপনি হাঁটাহাঁটি করছেন। ও এখনও ফেরেনি। আমি কথা দিচ্ছি ও এলেই ওকে নিয়ে আমি যাব। আপনি বাড়ি চলে যান। আমি বলালাম, একটু বসি না, তাতে ক্ষতি কি। অতুলবাবু কিন্তু কিছুতেই আমাকে বসতে দিলেন না। বললেন, কতক্ষণ বসবেন আপনি। তার ফেরবার কি কোনও ঠিক আছে। কতক্ষণ ব'সে থাকবেন, বাড়ি যান। আবার বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে একা ফিরতে দেখে গিন্নি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তোমাকে পই পই ক'রে ব'লে দিলুম, বিলাসবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। ওখানে ব'সে থাক না গিয়ে! আমি কচুরি সিঙাড়াগুলো উনুনের পাশে রেখে দিয়েছি। তুমি যাও। আবার অতুল-বাবুর বাড়িতে এলাম। অতুলবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে এক মাইল। আমার

হার্টটাও বরাবর দুর্বল। তাই এখানে এসেই মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। তারপর কি হয়েছে কিছু জানি না।"

গাড়ি করিয়া বিলাসবাবু, অতুলবাবু এবং নিমাইবাবু সতীশবাবুকে লইয়া তাঁহার বাড়িতে গেলেন। ভুরিভোজন হইল। সিঙাড়া কচুরি দুইই বেশ গরম ছিল। বিলাসবাবু বলিলেন, চিংড়ির কাট্‌লেট্‌টিও চমৎকার হইয়াছে। আরও কয়েকখানা খাইলেন।

বিলাসবাবু বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার স্টেনো কয়েকটি ফাইল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল, কয়েকটি জরুরি চিঠি আজ পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু ডাক তো চলিয়া গিয়াছে। চিঠিগুলি না গেলে সমূহ ক্ষতি হইবে।

বিলাসবাবু বলিলেন, "বেশ, পরের ট্রেন কখন ?"

"রাত দুটোর সময়—"

"কুছ পরোয়া নেই। এখুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। চিঠিগুলো নিয়ে একটা লোক চলে যাক। তুমি বস।"

অতুলবাবুর স্ত্রী এককাপ গরম কফি দিয়া গেলেন। বিলাস একটা কারুকার্যময় শাল গায়ে দিয়া উবু হইয়া বসিলেন এবং নিমীলিত নয়নে চিঠি ডিক্‌টেট্‌ করিতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একভাবে বসিয়া সব চিঠি শেষ করিয়া বলিলেন—"সবই তো হ'ল, কিন্তু যে ওয়াইল্‌ড্‌ গুজের সন্ধানে আজ বেরিয়েছিলাম, তারই দেখা পাওয়া গেল না।"

অতুল বলিলেন, "আমি তো সামনেই একটি 'ওয়াইলড্‌ গুজ' দেখতে পাচ্ছি। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও তাহলে তুমিও দেখতে পাবে—"

বিলাস তাঁহার সেই শিশু-সুলভ হাসিটি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন। মনে হইল একটু লজ্জিত হইয়াছেন।

প্রেমের গল্প ১৯৬৪,

ঘনঘোর বর্ষা নামিয়াছে। ভাবিতেছিলাম উপরে আমার যে খালি ঘরটি আছে সেখানে বসিয়া কবিতা লিখিব। বাড়ির সামনে কদম্ব গাছটি অসংখ্য ফুলে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, জানালা দিয়ে দেখিতে পাইতেছি দিগন্ত রেখায় মেঘদূত-বর্ণিত হস্তীযূথের ন্যায় নিকষকৃষ্ণ মেঘমালা সমবেত হইতেছে। আমার সমস্ত হৃদয়…এমন সময় পিওন সময় প্রবেশ করিল। দেখিলাম সম্পাদক মহাশয়ের চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন পূজাসংখ্যার জন্য একটি ছোট গল্প চাই। প্রেমের গল্প হইলেই ভালো হয়। আমি আমার উপরের তলার খালি ঘরটিতে বসিয়া যে কবিতা লিখতাম তাহাতে প্রেমের অভাব থাকিত না। আমার যে গৃহিণী রোজ ভাত রাঁধেন, কাপড় কাচেন, মশলা পেষেণ, সন্তান পালন করেন তাঁহারই উদ্দেশ্যে হয়তো আমি ভালো একটা প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিতাম, কিন্তু, হায়, সম্পাদক কবিতা চান না, গল্প চান। ভাবিলাম কবিতার ধাক্কাটাকে না সামলাইতে পারিলে গল্প মাথায় আসিবে না।

উঠিয়া জানলাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভাবিলাম উপরের ঘরটাতে গিয়াও জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া বর্ষাটাকে প্রথমে ঠেকাইতে হইবে, তাহা না হইলে গল্প মাথায় আসিবে না। এমন সময় দ্বারদেশে তিন মূর্তি আবির্ভূত হইলেন। একজন নারী, দুইজন পুরুষ। নারীটি যুবতী, কিন্তু মাথায় সিঁদুর নাই। পুরুষ দুইটির মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে যুবক আর একজনের বয়স একটু বেশী, কিন্তু ঠিক কত তাহা আন্দাজ করিতে পারিলাম না। কেন জানি না আমার মনে হইল, ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটা অদৃশ্য প্রেমের ত্রিভুজ হয়তো মূর্ত হইয়াছে এবং তাহা যদি কোনও কৌশলে জানিতে পারি হয়তো ভালো গল্পের একটা প্লট পাওয়া যাইবে।

মহিলাটিই আগে কথা বলিলেন।

"শুনেলাম আপনার উপরের ঘরটি খালি আছে ?

"না, ঠিক খালি তো নেই। ওই ঘরে বসে আমি লেখা-পড়ি করি—"

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি আগাইয়া আসিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "অন্তত দিন সাতেকের জন্য দিতে পারেন না ?"

"কেন বলুন তো ?"

"এটি আমার মেয়ে আর এইটি হচ্ছে জামাই। একটু আগে আইনত রেজিস্ট্রারের কাছে এদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আমরা হিন্দু, সিঁদুর-দান, ফুলশয্যা এসব না হলে মন ভরে না, বুঝলেন। আমার একটি বাড়ি আছে, কিন্তু সেখানে তিল-ধারণের স্থান নেই। উদ্বাস্তুতে ভরতি। খোলা ছাতেও লোক গিজগিজ করছে। আপনি লেখক মানুষ, আপনি আমার মনের কথা বুঝবেন। তাই আপনার কাছে এলাম। আশা আছে, আপনি রাজী হবেন।"

রাজী হইতে হইল। গল্প লেখা আর হইল না।

একটু পরেই বাড়িতে পিলপিল করিয়া লোক ঢুকিতে লাগিল।

সাতদিন পরে সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যখন গেলেন তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। দেখিলাম টেবিলের উপর একটি খামের চিঠি রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলাম চিঠি নয়, চেক। একশ টাকার একখানি চেক। গল্প লিখিতে পারিলে আমি উহার বেশী পাইতাম না। তবু মনটা খারাপ হইয়া গেল। আমি তো টাকার জন্য উহাদের ঘরটা দিই নাই। দিয়াছিলাম···শীলার মুখখানাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল। আমার মেয়ে শীলা এম. এ. পাশ করিয়াছিল। কালো বলিয়া বিবাহ হয় নাই। ধরাধরি করিবার লোক নাই বলিয়া চাকুরি জোটে নাই। এদেশে আজকাল যে জিনিসটা সুলভ তাহাই জুটিয়া গেল অবশেষে। প্রেমিক জুটিল একটি। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া শীলা চলিয়া গেল। শুনিয়াছি তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। শীলা ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার প্রেমিক নাপিত-নন্দন। আধুনিক আইনে তাহাতে আটকায় না। তাহাদের ফুল-শয্যা, বাসর-ঘর হইয়াছিল কি ? কোথায় ? সহসা চোখে জল আসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তে চটিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিলাম।

ছায়া ও বাস্তব

ডিস্‌পেনসারিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল একটি কালো কুচকুচে আসন্ন-প্রসবা মেয়ে বারান্দায় বসিয়া আছে। তাহার সামনে একটি নাক-বসা শিশু এবং তাহার পিছন দিকে একটি রোগাগোছের লোক। তাহার মুখের খানিকটা ঢাকা।

আমি যাইতেই আমার ডিস্‌পেনসারির চাকর সিতাবি বলিল—"এরা বাবু কাল রাত থেকে এখানে আছে—"

মনে পড়িল আমি গত সন্ধ্যায় ডিস্‌পেনসারিতে আসি নাই। সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম। সিনেমায় খুব ভালো 'হিট'-করা বই ছিল একখানা। গল্পটি চমকপ্রদ। এক বড়লোকের মেয়ে গান শুনিয়া এবং রূপে মুগ্ধ হইয়া একটি গরীব যুবকের প্রেমে পড়িয়াছিল। মেয়েটির 'বচ্‌পন্‌মে মা মর গয়ী থী'—সুতরাং তাহার বাবা কন্যা-স্নেহে প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মেয়ের কোন কাজে বাধা দিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। আদুরে মেয়ে যখন যাহা খুশি করিত। নাচিত গাহিত, সাইকেল চড়িত, ঘোড়ায় চড়িত, তরঙ্গসংকুল নদীর জলে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রকাণ্ড গাছে চড়িয়া গাছের মগডাল হইতে ফুল পাড়িয়া আনিত। বাবা কিছু বলিতেন না, সস্নেহে মাতৃহীনা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেন কেবল। মেয়েটির পরিচারক—যে তাহাকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়াছিল—সে কেবল এইসব লইয়া ভাঁড়ামি করিত। বাবা মৃদু হাসিতেন। কিন্তু মেয়ে যখন এক অজ্ঞাতকুলশীল গরীব ছোকরার প্রেমে পড়িয়া গেল তখন বাবা রুখিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু হিন্দীতে যাহা বলিলেন তাহার ইংরেজি করিলে দাঁড়ায়—Thus far and no further। তাঁহার বংশমর্যাদা, তাঁহার পূর্বপুরুষের ইতিহাস, তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর পবিত্র কৌলিক মহিমা এ সমস্তকে কলঙ্কিত করিয়া তিনি ওই বাঁশীওলা মাকাল ফলকে জামাই করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। মেয়েও হটিবার পাত্রী নয়। রাধা, মীরা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর উদাহরণ দেখাইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া যে যখন বলিল—"দুনিয়াতে প্রেমই অমূল্য সম্পদ, সে প্রেম যখন ভাগ্যক্রমে আমার জীবনে আসিয়াছে তখন কিছুতেই আমি তাহার অসম্মান করিতে পারিবে না। কুল? বংশমর্যাদা? প্রেমের চেয়ে বড় আর কি আছে জগতে—!" তখন তড়্‌তড়্‌ করিয়া হাততালি পড়িয়া গেল। প্রায় দুই মিনিট ধরিয়া সে হাততালি চলিল। নায়িকা তাহার প্রেমাস্পদকে লইয়া অকূলে ভাসিয়া পড়িল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল উক্ত প্রেমাস্পদ শুধু নায়িকার নহে, বহু কুমারীর হৃদয়-হরণ করিয়াছেন। তিনি বহুবল্লভ। বাস্‌ অমনি আবার লাগিয়া গেল। ইহার পর গল্পের নায়িকা যাহা করিল তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। সে রূপসী ও সুগায়িকা, সুতরাং তাহারও প্রণয়ীর অভাব হইল না। শেষ পর্যন্ত একটি দুর্ধর্ষ ডাকাত তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িল। সেই ডাকাতের সহায়তায় সে বাঁশী-ওলা ছোকরাকে বন্দী করিয়া আনিল, তাহাকে তাহার পায়ের কাছে হাতজোড় করিয়া বসিতে হইল, কান মলিতে হইল, নাকে খৎ দিতে হইল। তাহার পর নায়িকা বলিল—'আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। পার্থিব প্রেম মানেই পাশবিক প্রেম, একথা আমি

বুঝিয়াছি। পুরুষমাত্রেই পশু ইহাতেও আমার সন্দেহ নাই। তাই আমি স্থির করিয়াছি আমার পবিত্র প্রেম আমি মানুষকে দিব না, ভগবানকে দিব। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে গলিতে গলিতে তাঁহারই নাম কীর্তন করিয়া তাঁহাকেই আমি অনুসন্ধান করিব।' ডাকাতটি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—'চলুন দেবি, আমি আপনাকে বৃন্দাবনে পোঁছাইয়া দিতেছি।' ইহাই গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এছাড়া অবশ্য অনেক সিনসিনারি আছে, ছুটাছুটি আছে, পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য আছে, হাতী, ঘোড়া, বাঘ, অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে, যেখানে সেখানে নৃত্যগীত আছে, তীরন্দাজদের খেলা আছে, এবং আরও অনেক হাবভাব আছে—কিন্তু সে সব আমি বাদ দিলাম। প্রেমের এই উচ্চ পরিণতিটাই আমার সমস্ত চিত্তটাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। ডিসপেনসারিতে যখন প্রবেশ করিলাম তখনও এ অনুভূতির রেশ কাটে নাই।

আমি চেয়ারে বসিতেই মেয়েটি সসঙ্কোচে প্রণাম করিয়া আমার টেবিলের ওপাশে দাঁড়াইল। এদেশের গরীব রোগীরা সাধারণত যে ভাষায় কথা কয় তাহাকে 'ছেকা-ছেকি' ভাষা বলে। সেই ভাষাতেই আমাদের কথা হইতে লাগিল। আপনাদের হয়তো বুঝিতে অসুবিধা হইবে তাই তর্জমা করিয়া দিতেছি।

"কি হয়েছে তোর—"

"আমার নয় ডাক্তারবাবু। আমার স্বামীর। মাথা গরম হয়ে গেছে—"

"ডাক ওকে।"

আদেশের ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল—"এদিকে এস না।"

মাথায় কাপড়-ঢাকা লোকটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

বলিলাম, "মুখের কাপড় সরাও।"

মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিতে পাইলাম—ডান চোখটা ঈষৎ বড়, ডান দিকের ঠোঁটের কোণটা ঈষৎ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখের ডানপাশটা ভাবলেশহীন।

বলিলাম,—"চোখ বোজ।"

ডান চোখটা ভালো বুজিল না।

"শিস দাও"—

—শিস দিতে পারিল না।

বুঝিলাম মুখের ডানদিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে। ডাক্তারি ভাষায় ইহার নাম ফেসিয়াল প্যারালিসিস (Facial Paralysis)। অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে সিফিলিসও ইহার একটা কারণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার গর্মি হয়েছিল কখনও?"

"না বাবু—"

মেয়েটি ধমকাইয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবুর কাছেও মিছে কথা বলছ। হ্যাঁ বাবু, ওর গর্মি, সুজাক (গণোরিয়া) সব হয়েছিল।"

বলিলাম—"ওর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। এবেলা এখানে থাকতে পারবে?"

"থাকব বাবু—"

রক্ত লইলাম। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে।

লোকটা বাজারে খাবার আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্ত্রী ছেলেটিকে লইয়া বারান্দায় বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মুখটি শুকনো, চুল উস্‌কোখুস্‌কো, পেটের ভারে বিব্রত।

"তুই অত কষ্ট ক'রে ওর সঙ্গে এসেছিস কেন?"

"কি করব বাবু, ওর যে আর কেউ নেই। ওর হাতে টাকা দিতেও ভয় করে, হয়তো কোথায় মদ খেয়ে পড়ে থাকবে। বড় বদমাস।"

"তোর ছেলেপিলে কটি—"

"পাঁচটি বাবু, একটি পেট থেকেই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছেলেটাই সবচেয়ে ছোট—"

ছেলেটার নাক বসা। মাথার চেহারাও স্বাভাবিক নহে। বুঝিলাম কাল রোগ শিশুটার দেহেও সংক্রামিত হইয়াছে।

"রক্তে কি পেলেন ডাক্তারবাবু?"

"গর্মি'র বিষ পাওয়া গেছে।"

"যাবেই আমি জানতুম—"

"তুই ওরকম একটা পাজি দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে আছিস কেন। ওকে ছেড়ে দিলেই পারিস—"

"তা কি পারি বাবু। ওর সঙ্গে আমার 'সাধি' (বিয়ে) হয়েছে সেই কোন ছেলেবেলায়। আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। ওকে ছেড়ে যাব কেমন ক'রে—"

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে একটু যেন উষ্মার ভাব লক্ষ্য করিলাম। আমি আর কিছু বলিলাম না।

একটু পরেই লোকটা আসিয়া পড়িল। দেখিলাম গামছায় কিছু ছাতু বাঁধিয়া আনিয়াছে।

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার সব কীর্তি ধরা পড়ে গেছে—"

লোকটা অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিলাম, "এদিকে এস। তোমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দি। কি নাম তোমার?"

"বুলবুল।"

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতেছিলাম মেয়েটি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আপনার ফিস কত ডাক্তারবাবু?"

"দশ টাকা।"

সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার একখানা নোট সামনে রাখিল।

"কি করিস—"

"আমি মেছুনী বাবু। মাছ বিক্রি করি—"

"দশ টাকা দিতে যদি কষ্ট হয় তাহলে—"

"না বাবু। ডাক্তারের প্রণামী না দিলে অসুখ সারে না—"

তারপর হঠাৎ সে আমার পা'দুইটা জড়াইয়া ধরিল—"ওকে ভালো ক'রে দিন বাবু। আমি আমার জেবর (গয়না) বেচে ওর চিকিৎসা করাব—

"পা ছেড়ে দে। ভালো হয়ে ও আবার বদমাইসি শুরু করবে—"

মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মুচকি হাসিয়া বলিল, "তা করবে। জানেন বাবু,

ও আমার কাছ থেকে পয়সা কেড়ে নিয়ে গিয়ে এইসব বদমায়সি করে। কি করব বাবু, আমার নসীব—"

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধ বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। ওই কালো কুৎসিৎ আসন্নপ্রসবা মেছুনীর মুখটাই বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সিনেমার গল্পটা ও যেন মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

উপেনের ছেলে

॥ ১ ॥

উপেন আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু সেকথা আমার মনে ছিল না। ডিস্‌পেনসারিতে বসিয়া আছি এমন সময় একজন ফতুয়াপরা লোক ডান হাতে এক ঠোঙা তেলেভাজা এবং বাম কাঁধে একটি শিশুকে লইয়া প্রবেশ করিল। শিশুটির বয়স বছর তিনেক হইবে। লক্ষ্য করিলাম তাহার দুইটি নাসারন্ধ্রই 'সিক্‌নি'তে ভরতি। লোকটি তেলেভাজার ঠোঙাটি আমার টেবিলের উপর নামাইয়া সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, "ডাক্তারবাবু, চিনতে পারেন?"

প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রায়ই আমাকে অপ্রস্তুত মুখে স্বীকার করিতে হয়, "না। ঠিক মনে পড়ছে না তো—।"

এ ভদ্রলোককেও তাহাই বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার নাম উপেন। কুঙ্কুমগঞ্জে স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম—"

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির যবনিকা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি কচি কিশোর বালক স্কুলের পিছন দিকের ঝোপে-ঝাড়ে ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেছে।

"আরে উপেন! একদম বদলে গেছিস তো। নাকের নীচে অমন বাটার-ফ্লাই গোঁফ, মাথার সামনে টাক, একেবারে ভোল বদলে ফেলেছিস দেখছি। ব'স্‌ ব'স্‌—"

"দাঁড়া ছেলেটার নাকটা পরিষ্কার করে দি—"

উপেন ছেলেটাকে বাহিরে লইয়া গেল।

"ফোঁ কর, ফোঁ কর। এঃ ছি, ছি, তোমার মা কিছু দেখে না তোমাকে।"

দেখিলাম উপেন নিজের ফতুয়ার পকেট হইতে একটি রুমাল বাহির করিয়া তাহার নাক মুখ মুছাইয়া দিল।

"চল এবার তেলেভাজা খাওয়া যাক। দুটোর বেশি দেব না কিন্তু। পেটখারাপ হয়ে গেলে তোমার মা বকবে আমায়।"

উপেন ঘরের ভিতর আসিয়া বসিল এবং ঠোঙার ভিতর হইতে দুইটি ফুলুরি বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিল।

"তোর ছেলে নাকি—"

"না ভাই। হরেন কুণ্ডুর ছেলে। ওর বাসাতেই উঠেছি। তুই খাবি তেলে-ভাজা?"

তেলে-ভাজাতে আমার অরুচি নাই, কিন্তু ডাক্তারী বিবেকে বাধিতে লাগিল।

"কোথা থেকে কিনেছিস?"

"ওই যে রাস্তার ধারে ব'সে ভাজছে, ওই পানের দোকানটার পাশে—"

দোকানটা দেখিয়াছি। ওই নোংরা দোকানের তেলে-ভাজা খাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

"না ভাই, রাস্তার জিনিস খাব না—"

"আগে তো খুব খেতিস। দু'একটা খা না। কিছু হবে না, আমি তো রোজ খাই। কিছু হয় না। নে, দুটো খা—"

খাইতেই হইল। উপেন টপাটপ খাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠোঙা নিঃশেষ হইয়া গেল। ঠোঙাটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া উপেন বলিল, "জল খাস নি। জল খেলেই অম্বলটি হবে। তোর ছেলেপিলে কি?"

"দুটি মেয়ে দুটি ছেলে।"

"বাঃ বাঃ। বড়টির বয়স কত?"

"বছর সাতেক—"

"বাঃ। ছেলে, না মেয়ে—"

"মেয়ে।"

"বাঃ বাঃ।"

এই তুচ্ছ সংবাদগুলি সে যেন মহানন্দে উপভোগ করিতে লাগিল।

"তোর বাসা কতদূর এখান থেকে?"

"কাছেই—"

"তোর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। একে এর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। তারপর বাজারেও একটু ঘুরতে হবে। বিকেলে আসব। এইখানেই আসব। ক'টার সময় তুই আসিস?"

"চারটে সাড়ে চারটে—"

"ওই ঠিক হবে—"

"তুই কি করছিস?"

"ধান-চালের ব্যবসা। আমি চলি তাহলে, এটাকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। মহা বায়নাদার ছেলে, একবার কাঁদতে আরাম্ভ করলে ঝামেলা। কাল চেলো-পার্টিতে নিয়ে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিলাম এমন কান্না জুড়ে দিলে যে আমার ব্যবসা-ফ্যাবসা মাথায় উঠল, আবার রিক্সা ক'রে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হ'ল। চোখ বড় বড় ক'রে কেমন শুনছে দেখ না। চল—"

উপেন ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেল। অনেকদিন পরে বেশ লাগিল উপেনকে।

॥ ২ ॥

বৈকালে সে আসিয়া আমার ছেলেমেয়েদের সহিত খুব জমাইয়া ফেলিল। আগড়ুম-বাগড়ুম খেলিল, গল্প বলিল, গলার ভিতর হইতে নানা রকম শব্দ বাহির করিয়া আমার ছোট মেয়েটাকে হাসাইয়া হাসাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

শেষে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "চল আমরা বেড়িয়ে আসি।"

আমার ছোট মেয়েটাকেও সে কাঁথা মুড়ি দিয়া কাঁধে করিয়া লইল। আমরা বারণ করিলাম, কিছুতে শুনিল না। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরিল তখন অবাক হইয়া গেলাম। আমার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য জামা কিনিয়াছে, খেলনাও প্রচুর। শিশি শিশি লজেন্‌স, টফি, চকলেট, তা ছাড়া ভালো রসগোল্লাও এক হাঁড়ি আনিয়াছে দেখিলাম।

"কি কাণ্ড করেছিস তুই—"

"দেবতার পুজো করব না? ওরাই তো দেবতা।"

"অত খাবার কি ওরা খেতে পারবে?"

"পাড়ার ছেলেমেয়েদের দাও।"

উপেনের চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইল উহার উপর কি যেন একটা ভর করিয়াছে। আমার গৃহিণী চুপিচুপি আড়ালে আমাকে বলিলেন—" ওঁকে এবেলা আমাদের বাড়িতেই খেতে বল।"

কথাটা উপেনের কানে গেল। সে হাসিয়া বলিল, "আরে সে কথা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম এখুনি। ডাক্তারের সঙ্গে দরকার আছে আমার। আমার ছেলেটার পেটের অসুখ কিছুতে সারছে না। সেজন্য ওর কাছে প্রেসকৃপশন নিতে হবে—"

রাত্রে আমার ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ জাগিয়াছিল উপেন তাহাদের লইয়াই মত্ত ছিল সর্বদা। আমার ছোট মেয়েটাকে চটকাইয়া মটকাইয়া লুফিয়া, কাইকুতু দিয়া সে যে কাণ্ড করিতে লাগিল তাহাতে আমার গৃহিণীতো ভয়ই পাইয়া গেলেন।

"তোর ছেলের কি হয়েছে বল—"

"গ্রীন ডায়ারিয়া! আর বড্ড রোগা হ'য়ে গেছে—"

"বয়স কত?"

"পাঁচ মাসে পড়েছে—"

"দাঁত উঠবে বোধ হয়। ভয় নেই। আমি লিখে দেব ওষুধ একটা। তোর আর ছেলেপিলে কি?"

"ওইটেই প্রথম ছেলে। অনেক পরে বিয়ে করেছি যে। জীবনে অনেক স্ট্রাগ্‌ল্‌ করতে হয়েছে। তোমাদের মতো ভাগ্যবান তো আমি নই। তোমরা মহা ভাগ্যবান।"

পরদিন সকালে উপেন চলিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

বছর দুই তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। হঠাৎ তাহার দেখা পাইয়া গেলাম একটা মেলায়। মেলায় আমি গাই কিনতে গিয়াছিলাম। গাইটি কিনিয়া চাকরের সঙ্গে সেটি পাঠাইয়া দিয়া মেলাটা ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম উপেন একটা কাটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া আছে, তাহার সঙ্গে একটি শিশু। শিশুটির গায়ে সে জামা পরাইয়া দেখিতেছিল।

"উপেন যে। কি খবর—"

"আর তুই, এখানে কোথা থেকে?"

"আমি একটা গাই কিনতে এসেছিলাম। জামা কিনছিস?"

"হ্যাঁ ভাই, ছেলেটার জন্য একটা জামা কিনেছি?"

"এই তোর ছেলে না কি—?"

"না আমার ছেলে বাড়িতে আছে। এর মাপের জামা কিনলেই তার হবে। এটি হচ্ছে ওই আড়তদারের ছেলে।"

"তোর ছেলে আছে কেমন ?"

"তুই তো ধন্বন্তরি। তোর এক প্রেসকৃপশনে সে সেরে গেছে। তারপর থেকে আর কোনও অসুখই হয়নি।"

"আমাকে তো একটা খবরও দিলি না।"

"ওইটি ভাই পারি না। মুখ চলে, কলম চলে না। তুই কোথা উঠেছিস ?"

"কোথাও না। গাড়িতে এসেছি, এখনি ফিরে যাব।"

"আমার ছেলেটা সেরে গেছে বটে, কিন্তু তেমন জোর হয়নি। গায়ে। একটা টনিক লিখে দিবি ?"

"টনিক খেয়ে আর কি হবে ? ভালো ক'রে খেতে দে—"

"সব রকম দিই ভাই। ভালো ভালো বিলিতি ফুড্, মধু, কমলালেবুর রিস, ছাগলের দুধ—ওর জন্যেই ছাগল পুষেছি।"

"তাহলে আর টনিক দরকার নেই।"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে উপেন বলিল, "তবু একটা লিখে দে ভাই। তোর প্রেসকৃপশনের গুণই আলাদা।"

দোকানীর নিকট হইতে এক টুকরা কাগজ চাহিয়া লইয়া একটা ভালো টনিকের নাম লিখিয়া দিলাম।

"আধ চামচে করে দু'বার খাওয়াবি—"

"আচ্ছা। এখন যাচ্ছিস ?"

"হ্যাঁ ভাই, যেতে হবে। একটা সঙ্গীন রুগী আছে।"

॥ ৪ ॥

বছর তিন আর উপেনের সহিত দেখাশোনা নাই। কোনও খবরও সে দেয় নাই। হঠাৎ একদিন ট্রেনে আবার তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। দেখিলাম এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সহিত গাড়ির এক কোণে বসিয়া আলাপ করিতেছে। মনে হইল তাহার চেহারাটায় বার্ধকের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। মাথার টাকাটা আরও বড় হইয়াছে। জুলপির চুল কাঁচা-পাকা। গাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাসিমুখে ভুরু নাচাইল। তারপর কোণ ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল।

"আশ্চর্য, আমি তোর কথাই রোজ ভাবছি। একদিন হয়তো গিয়ে পড়তাম। ভারি মুশকিলে পড়েছি—"

"কি হ'ল—!"

"ছেলেটার লিভারের দোষ হয়েছে।"

"কি করে জানলি লিভারের দোষ—"

"হরি কম্পাউণ্ডার বললে। সেই তো ও অঞ্চলে নীলরতন সরকার।"

"কষ্ট কি হয় তার ?"

"কষ্ট বিশেষ কিছু নেই। খাচ্ছে-দাচ্ছে গায়ে-গত্তি লাগছে না। হাড়-পাঁজরা গোনা যায়।"

"আমার কাছে একবার নিয়ে আয় না। আলো করে দেখে ওষুধ দেব—"

"নিয়ে যাব। সময় পাই না ভাই। ব্যবসা অতি পাজি জিনিস, নাকে দড়ি দিয়ে দিনরাত খাটিয়ে নিচ্ছে।"

"তোর শরীরটাও তো খুব ভালো নয় দেখছি।"

"না। বোধহয় বেশীদিন বাঁচব না। মনে সুখও নেই।"

"কিসের অসুখ তোর ?"

"সব কথা কি বলা যায় !"

উপেনের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি পরের স্টেশনেই নামিলাম। উপেন বলিল আমার কাছে শীঘ্রই সে ছেলেকে লইয়া আসিবে। কিন্তু আসে নাই।

॥ ৫ ॥

আরও বছর পাঁচেক কাটিয়াছে। উপেনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় একদিন একটি লোক আমার ডিস্‌পেন্সারিতে আসিয়া বলিল, "আপনার বন্ধু উপেন-বাবুর কাছ থেকে আসছি, তিনি খুব অসুস্থ। আপনাকে একবার যেতে হবে। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।"

"উপেন কোথায় আছে ?"

"তাঁর দেশের বাড়িতে। কালনার কাছে একটা গ্রামে—"

'না' বলিতে পারিলাম না।

উপেনের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম তাহার শেষ অবস্থা। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভাই তুই এসেছিস। আমি আশা করতে পারিনি। আমি আর বাঁচব না। একটা কথা বলবার জন্যে তোকে ডেকেছি—আমার ছেলেটাকে দেখিস, বিনা চিকিৎসায় যেন না মরে।"

"কোথা তোর ছেলে—?"

"আঁতুড়-ঘরে। সাতদিন আগে জন্মেছে। আমার অপুত্রক নাম ঘুচেছে। আমি এবার শান্তিতে মরতে পারব।"

"এতদিন তাহলে—"

"এতদিন তোকে মিছে কথা বলেছি। এতদিন আমি আঁটকুড়ো ছিলাম। মাণিক এতদিন পরে এল। একটু আগে এলেই হ'ত! তুই ওর ভার নে ভাই—"

প্রতিশ্রুতি দিলাম লইব।

সেই দিনই উপেন মারা গেল।

অদ্ভুত গল্প

আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে রাঘবগঞ্জে যাইতেছিলাম। রাঘবগঞ্জের পূর্বনাম ছিল পুঁটিচক। জনৈক ধনী জমিদার নাকি পুঁটিচক গ্রামটি সেকালে নীলামে খরিদ করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং শ্বশুর স্বর্গীয় রাঘবচন্দ্র কুণ্ডুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত গ্রামটির নাম বদলাইয়া রাঘবগঞ্জ রাখিয়াছিলেন। শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার হেতু আধ্যাত্মিক নয়, আর্থিক। শ্বশুর মহাশয়ের টাকাতেই গ্রামটি খরিদ করিতে পারিয়াছিলেন তিনি—ইহাই জনশ্রুতি। রাঘবচন্দ্র কুণ্ডু একটি ধনকুম্ভীর ছিলেন। লোকে বলে, ডাকাতি করিয়াই নাকি প্রথমে তিনি বড়লোক হন। এজন্য সকলেই ঘৃণা করিত তাঁহাকে। পারতপক্ষে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে চাহিত না। রাঘববাবুকে তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করিতেও বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেহই নাকি ডাকাতের মেয়েকে বধূরূপে ঘরে আনিতে চাহে নাই। অনেক চেষ্টার পর রাঘবচন্দ্র না কি জামাতাটিকে জোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন। গরীবের ছেলে শিবধন সাধু অবশ্য বেশীদিন গরীব থাকেন নাই, শ্বশুরের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তিনি এবং পুঁটিচককে রাঘবগঞ্জে রূপান্তরিত করিয়া ও অঞ্চলের লোকের থোঁতামুখকে ভোঁতাও করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের নামই রাঘবগঞ্জ হওয়াতে রাঘব নামটা সকলকে উচ্চারণ করিতে হইয়াছিল।

এ সব নাকি বহুকাল পূর্বের কথা, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। আমার সহযাত্রী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকই রাঘবগঞ্জের ইতিহাস আমাকে শুনাইতেছিলেন। তিনি গাড়ির এক কোণে বসিয়াছিলেন, আমি রাঘবগঞ্জ যাইব শুনিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাহার পর গাড়ির লোকজন যখন নামিয়া গেল তখন আমার নিকট সরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাঘবগঞ্জে তো যাচ্ছেন? রাঘবগঞ্জের ইতিহাস জানেন?"

"না।"

তখন তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি আমাকে বলিলেন।

ভদ্রলোক কাছে সরিয়া আসিতে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিলাম। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, চোখের তারা কালো নয়, ধূসর। মুখের সমস্ত চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কপাল হইতে চিবুক পর্যন্ত থাকে-থাকে ঝুলিতেছে। এরকম মুখ পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। ভদ্রলোক ঈষৎ ঝুঁকিয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"আপনি এত সব ইতিহাস জানলেন কোথা থেকে?"

"আমি এককালে ওখানে ছিলাম যে। এখন অবশ্য সে রাঘবগঞ্জ আর নেই। এখন সেখানে স্টেশন হয়েছে, পোস্টাফিস হয়েছে, থানা হয়েছে, মিলও হয়েছে গোটা কতক। আগে কিছু ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ওখানে চাঁড়াল ফৌজরা থাকত। অনেক চাঁড়াল তখন ফৌজে ভর্তি হ'ত। একটা পাড়ার নামই ছিল ফৌজপাড়া।"

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলিয়া ঈষৎ ব্যায়ত-আননে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া

রহিলেন। তাঁহার নীচের ঠোঁটের উপর তাঁহার জিহ্বার ডগাটি নড়িতে লাগিল। আমি হঠাৎ ভয় পাইয়া গেলাম। কে এ ভদ্রলোক! শুইয়া ছিলাম, উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়িতে আর কেহ নাই।

"রাঘবগঞ্জে আপনি কোথায় উঠবেন?"

"পুষ্প পল্লীতে।"

ভদ্রলোকের মুখে মৃদু হাসি ফুটিল একটা।

"আগে ওটার নাম থাবা-পাড়া ছিল।"

"থাবা পাড়া? ও নামের মানে কি!"

"এখন মানে নেই, আগে ছিল। ওখানে আগে অনেক কুকুরের থাবা ছড়ানো থাকত, আর তাই নিয়ে শকুনিরা ছেঁড়াছেঁড়ি করত।"

"কুকুরের থাবা?"

"হ্যাঁ। আগে কুকুর কাটা হ'ত ওখানে। কুকুরের মাংস সরবরাহ করা হ'ত ফৌজদের। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ধ'রে আনবার জন্যে একদল লোকই ছিল—"

গাড়ির আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। শোঁ শোঁ করিয়া হাওয়া উঠিল একটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ট্রেন চলিতেছে। চাকর কাঁচকোঁচ শব্দ আগে লক্ষ্য করি নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, অসংখ্য কুকুর বুঝি আর্তনাদ করিতেছে। একটা হাহাকারের ভিতর দিয়া আমরা যেন ছুটিয়া চলিয়াছি। একটু পরে ট্রেনটা থামিয়াও গেল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কেন স্টেশন দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর দড়াম্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গাড়ির কোন কপাট খোলা ছিল কি? হাওয়ার বেগে হয়তো সেইটাই বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরে গাড়ি আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আলোও জ্বলিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না।

...একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া অদ্ভুদ স্বপ্ন দেখিলাম একটা। বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গায় বড় একটা বাড়ি রহিয়াছে। সেকেলে চক-মিলানো বাড়ি। দেখিতে অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতো। বাড়ির পাশে যে ফাঁকা মাঠটা রহিয়াছে তাহার একদিকে কয়েকটা বৃদ্ধ শিমুল গাছ। শিমুল গাছের উপর অনেক শকুনি। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা হাড়কাঠ পোঁতা রহিয়াছে। একটু পরেই ঢোলের বাজনা শোনা গেল। তাহার পর সবিস্ময়ে দেখিলাম, একদল বড় বড় কালো কুকুর গলায় ঢোল ঝুলাইয়া পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া সামনের পা দুটি দিয়া ঢোল বাজাইতেছে। সকলের মুখে একটা হিংস্র হাসি, সকলেই উত্তেজিত। তাহার পর যাহা দেখিলাম তাহা আরও ভয়ানক। দেখেলাম গ্রেট ডেনের মতো দুইটা বড় বড় কুকুর একটা লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে। একি, যে ভদ্রলোক আমাকে রাঘবগঞ্জের ইতিহাস বলিয়া গেলেন এ যে তিনিই। কুকুর দুইটি টানিতে টানিতে তাঁহাকে আনিয়া হাড়কাঠে ফেলিল। তাহার পর আর একটা বলিষ্ঠ কুকুর বিরাট একটা খড়্গ আনিয়া এক কোপে তাঁহার মুণ্ডটা উড়াইয়া দিল। ফোয়ারা দিল রক্ত ছুটিল। কুকুরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শকুনের দলও যেন তাহাদের সহিত সায় দিয়া একযোগ কলরব করিয়া উঠিল সমস্বরে।......ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম ভোর হইতেছে। ট্রেনে অনেক প্যাসেঞ্জারও উঠিয়াছে।

॥ ২ ॥

রাঘবগঞ্জে প্রায় বেলা বারোটার সময় পৌঁছিলাম। আমাকে স্টেশন হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য আমার দাদা আমাদের আর একটি আত্মীয়কে স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। কেহ না আসিলে অসুবিধায় পড়িতে হইত, কারণ রাঘবগঞ্জে পূর্বে কখনও আসি নাই। পিসামহাশয় কিছুদিন আগে এখানে আসিয়া একটি বাড়ি কিনিয়াছেন। খুব সস্তায় না কি।

বাড়িতে আসিয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। এই বাড়িই তো কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম! দেওয়ালগুলো শ্যাওলাধরা, কার্নিশে অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে, বাহিরের বারান্দার খানিকটা ভাঙা, অবিকল সেই বাড়ি। অথচ এ কথা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলাম না। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি প্রকাণ্ড চক-মিলান বাড়ি। দ্বিতলের একটি ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাইবামাত্র আত্মীয়-স্বজন আমাকে ঘেরিয়া ধরিল। নববধূ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। তাহার জন্য ভালো একটি শাড়ি আনিয়াছিলাম, সেটি তাহাকে দিলাম। পিসীমা বাড়ির সব খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তুই সারা রাত ট্রেনে এসেছিস, তাড়াতাড়ি খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। আজই তো বউভাতের খাওয়ানো ; সন্ধে থেকেই আবার লোকজন আসতে আরম্ভ করবে। এখনই তুই বিশ্রাম করে নে একটু—

পিসীমা চলিয়া গেলে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নীচে একতলায় প্রকাণ্ড একটা দালান রহিয়াছে। বেশ বড় দালান—প্রায় একশত লোক সেখানে বসিয়া খাইতে পারে। বেশ বড় বাড়িটা। উপরে বারোখানি ঘর। নীচেও অনেক জায়গা। অথচ ঠিক এই বাড়িটা আমি কাল স্বপ্নে দেখিলাম কি করিয়া! এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে পড়িতে লাগিল। ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম আসিল না। উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ির পাশ দিয়া একটা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। কিছু দূরে গিয়াই কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। এ কি, এ যে সেই মাঠ, এবং মাঠের ওপারে সারি সারি শিমুল গাছ! ঠিক সেই সময় প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল। চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। প্রখর দিবালোকে দেখিতে পাই নাই, কিন্তু সেই অন্ধকারে মনে হইল একটা হাড়কাঠও যেন মাঠের মধ্যে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।

ভোজের খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সবাই ঘুমাইয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। আমি আমার ঘরে একা শুইয়াছিলাম। সম্ভবত একটু ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল নীচের দালানে—যেখানে নিমন্ত্রিতরা একটু আগে খাইয়া গিয়াছে—যেন বাসনের শব্দ হইতেছে। চোর নয় তো?—উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম চতুর্দিক অন্ধকার। নীচের দালানটায় দেখিলাম কাহারা যেন সারি সারি বসিয়া আছে। টর্চটা লইয়া আসিলাম ভিতর হইতে। জ্বালিয়া দেখি সারি সারি কালো কালো কুকুর বসিয়া খাইতেছে, আর একদল কুকুর তাহাদের পরিবেশন করিতেছে।

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গীতার ভাষ্য

ট্রেনের কামরায় আমি আর সেই লোকটি ছাড়া আর কেহ ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল একটি গীতার ভাষ্য এবং টর্চ। টর্চটি সামনেই রাখা ছিল। গীতার ভাষ্যটি মন দিয়া পড়িতেছিলাম। লোকটির সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। গায়ে ময়লা কামিজ, কাপড় শতছিন্ন, চুল উস্‌কো-খুসকো, চক্ষু দুইটি লাল, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। নোংরা লোক। সে জানলার ধারে বসিয়া অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটু পরে বৃষ্টি নামিল এবং ট্রেন একটা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"একটি পয়সা দাও না বাবু। সারাদিন খেতে পাইনি—"

জীর্ণ শীর্ণ একটি ছোট মেয়ে তাহার রোগা হাতটি বাড়াইয়া দিল। আমি কখনও ভিখারীকে প্রশ্রয় দিই না। লোকটি দেখিলাম মেয়েটিকে একটি পয়সা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘচাং করিয়া গাড়িটাও ছাড়িল—

"আরে—"

লাফাইয়া উঠিল লোকটা। উঠিয়াই জোরে চেন টানিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হ'ল—

"পয়সাটা ওর হাত থেকে প'ড়ে গেল। আপনার টর্চটা একবার দিন তো—"

ট্রেন থামিতেই টর্চটা লইয়া দ্রুতবেগে নামিয়া গেল সে। একটু পরে ভিজিতে ভিজিতে ফিরিয়া আসিল। চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

"খুঁজে দিয়ে এলুম পয়সাটা। প্লাটফর্মের ওপরই পড়েছিল—"

গার্ড সাহেব আসিলেন। সব শুনিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। এ সব ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত। পরের স্টেশনে কিন্তু দারোগা পুলিশ আসিয়া হাজির। চেনের প্রসঙ্গ উঠিল না। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি রামলাল ধর?"

"হ্যাঁ—"

পকেট হইতে একটি ফটো বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন।

"আপনি নিজের মেয়েকে খুন করেছেন?"

"হ্যাঁ। খুন ক'রে বাঁচিয়েছি তাকে। তাকে খেতে দিতে পারতুম না। ক্ষিধের যন্ত্রণায় দিন রাত কাঁদত, একদিন চুরি করেছিল, তাই—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

"যাব না—"

হঠাৎ লোকটা লাফাইয়া উঠিয়া দারোগার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। মহা হুলস্থুল কাণ্ড। গতিক খারাপ দেখিয়া আমি সুট করিয়া নামিয়া পাশের কামরায় চলিয়া গেলাম।

বিক্রম হেম্‌ব্রোম

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন সাঁওতাল পরগণায় এক ডিস্‌পেন্সারিতে ডাক্তার হইয়া গিয়াছিলাম। তখন ট্রানজিসটার আবিষ্কৃত হয় নাই, ড্রাই-সেল ব্যাটারির রেডিও তখন অজ্ঞাত ছিল। সমস্ত দিন রোগীদের লইয়া কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার পর নিজের ভাঙা হারমোনিয়মটি লইয়া একাই গান করিতাম। শ্রোতা ছিলেন স্থানীয় পোস্টমাস্টার হরিভূষণবাবু। তিনিও সন্ধ্যার পর আমার বাসায় আসিতেন এবং চক্ষু বুজিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে আমার সঙ্গীত উপভোগ করিতেন। তাঁহারই মুখে খবর পাইয়াছিলাম দুমকা শহরের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রেডিও আছে। নাম শুনিয়া মনে হইয়াছিল, ডাক্তারবাবু সম্ভবতঃ আমার সহপাঠী। ভাবিলাম একদিন দুমকা গিয়া খোঁজ করিব। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি যেখানে ছিলাম দুমকা সেখান হইতে বেশ দূরে। আজকালকার মতো ঘন ঘন 'বাস্'ও ছিল না তখন।

তখনও আমার বিবাহ হয় নাই, একা একাই থাকিতাম। হাসপাতালের কাজ হইয়া গেলে, সময় যেন কাটিতে চাহিত না। এই সময় একদিন বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় যোগ দিবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। সভাটি নাকি প্রতি বছরই হয়। যদিও সভা আমার ডিস্‌পেন্সারি হইতে বেশ একটু দূরে হইবে শুনিলাম —প্রায় ক্রোশখানেক দূরে—তবু ঠিক করিলাম যাইব।

সেই সভাতেই প্রথমে আমি বিক্রম হেম্‌ব্রোমের সাক্ষাৎ পাই। দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো পোশাক এবং চেহারা। মাথায় প্রকাণ্ড পিগ্‌স্টিক্ হ্যাট্ (হ্যাট্‌টা তিনি সর্বদা পরিয়াই থাকেন শুনিলাম), গায়ে ফুল-হাতা শার্ট, পায়ে ভারী বুট জুতা এবং পরিধানে খাকি ফুল-প্যাণ্ট। সৌম্য শান্ত চেহারা। মনে হইল যেন কালো পাথরের একটি মূর্তি এক ধারে বসানো রহিয়াছে। গোলগাল ভারী মুখ। পরিষ্কার কামানো। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং একাগ্র। দেখিয়া মনে হইয়াছিল বয়স চল্লিশের কোঠায় হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্তরের কাছাকাছি।

বনবিভাগের পারিতোষিক-বিতরণ সভায় কৃতী কর্মচারীদের গভর্নমেণ্ট পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পর সেদিন এস. ডি. ও সাহেব (অবশ্য তিনি সাহেব নন, বাঙালী) নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা কেউ যদি বলতে চান, বলুন।"

বিক্রম হেম্‌ব্রোম উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, "আমি কিছু বলব।"

"বলুন।"

হেম্‌ব্রোম বলিতে লাগিলেন, "এই বনকে আমরা ভালোবাসি। এই বনের আশ্রয়ে আমরা লালিত, এই বনের দাক্ষিণ্যে আমরা পালিত। এই বনের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ, এই বনের গাছপালা, লতাগুল্ম, পশুপক্ষী, ফুল-ফল আমাদের পরম আত্মীয়। এই বনকে আমরা ভালোবাসি, খুবই ভালোবাসি, বনকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ সব। এই বনই আমাদের জীবন। এই বন যখন আমাদের

অধিকারে ছিল তখন এই বনকে আমরা সেবা করতাম, এই বনকে আমরা রক্ষা করতাম। এই বনকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারতাম। বনে যখন আগুন লাগত তখন আমরা দলে দলে ছুটে যেতাম সে আগুন নেবাতে। বনের ছোট গাছকে কেউ যদি আঘাত করতো আমরা শাস্তি দিতাম তাকে। অকারণে কোন গাছ কাটবার নিয়ম ছিল না, অসময়ে বা অকারণে বনের পশুপক্ষী শিকার করাটা আমরা পাপ বলে মনে করতাম। এখন কিন্তু বন আর আমাদের অধিকারে নেই। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আপনারাই বনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বনের সম্বন্ধে আমাদের কথা আর কেউ শোনে না। আইনতঃ এখন আপনারাই বনের রক্ষক। সত্যিই যদি রক্ষক হতেন, সত্যিই যদি এই বনদেবীকে আপনারা সেবা করতেন তাহলে আমাদের দুঃখ হতো না। এখন কিন্তু বড় দুঃখ হয়, কারণ আপনারা রক্ষক নন, ভক্ষক। সকলেরই লক্ষ্য বনকে লুট ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি, কিছু বলতে পারি না, কারণ বললেও আমাদের কথা কেউ শোনে না। আজ আপনি সুযোগ দিলেন তাই আমার মনের কথাটা ব'লে ফেললাম। আপনারা বনকে ভালোবাসতে শিখুন, তাহলেই আমার মনের দুঃখ আপনারাও অনুভব করতে পারবেন। আর আমার কিছু বলবার নেই, এইবার আমি থামলাম।"

বিক্রম হেমব্রোমের স্পষ্টবাদিতায় সেদিন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। সভার পর সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিক্রম হেমব্রোম সভার পরই চলিয়া গেলেন। শুনিলাম কোথাও তিনি খান না।

আর একদিনের ঘটনা।

হাসপাতালে কাজ করিতেছি। চারিদিকে সাঁওতাল রোগীর ভিড়। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিল। ঘাড় ফিরিয়াই দেখি দ্বারপ্রান্তে বিক্রম হেমব্রোম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রতিটি সাঁওতাল রোগী হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আগাইয়া গেল এবং নতমস্তকে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ইহাই নাকি সাঁওতালদের মধ্যে সম্ভ্রম প্রকাশের কায়দা।

অনুভব করিলাম বিক্রম হেমব্রোমকে সকলে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে তাহা আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখের চেয়ারটায় বসিতে বলিলাম। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবটা যেন তাঁহাকে যে আমি বিশেষ খাতির করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিতেছি ইহা তিনি চান না। তিনি সকলের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে চান।

আমার আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তিনি চেয়ারে বসিলেন এবং বলিলেন তাঁহার একটি নাতির জ্বর হইয়াছে তাহার জন্যই ঔষধ লইতে আসিয়াছেন। পাঁচ দিনের টেম্পারেচার চার্ট তিনি মুখস্থ বলিয়া গেলেন। অন্যান্য লক্ষণও এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করিলেন যে মনে হইল আমি রোগীটিকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

আমি একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলাম, তিনি সেটি লইয়া ঔষধ লইবার জানালায় দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি বসুন। আমি এখানেই আপনাকে ওষুধ আনিয়া দিচ্ছি।" কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া প্রেসক্রিপশনটা তাঁহাকে দিলাম। বিক্রম হেমব্রোম কুণ্ঠিত

অপ্রস্তুত মুখে বসিয়া রহিলেম। মনে হইল তাঁহাকে কেহ বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছে ইহা তিনি চান না।

হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাঁহার নজর পড়িল।

"ঘড়িটা বন্ধ দেখছি। সেট্ টমাসের ভালো ঘড়ি, চলছে না কেন?"

"কি জানি। আমি এসে থেকেই বন্ধ দেখছি।"

"আমাকে যদি দেন, আমি দেখতে পারি। যদি ভেতরে কিছু ভেঙে না গিয়ে থাকে বোধহয় ঠিক ক'রে দিতে পারব।

"আচ্ছা, আমি ওপরে লিখে দেখি, তাঁরা যদি বলেন সারাতে, দেব।"

"আচ্ছা।"

কম্পাউণ্ডারবাবু একটু পরে ঔষধ আনিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন হেম্‌ব্রোম। যতক্ষণ বসিয়া ছিলেন মাথার হ্যাট্ একবারও খোলেন নাই। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেলাম। দেখিলাম তিনি সাইকেলে করিয়া আসিয়াছেন, সাইকেলের পিছনে জলের একটি ফ্লাস্ক বাঁধা রহিয়াছে। শুনিলাম তিনি বাহিরে কোথাও জল খান না, যেখানে যান সঙ্গে করিয়া ফুটানো জল লইয়া যান।

কম্পাউণ্ডারবাবুর মুখে বিক্রম হেম্‌ব্রোমের আরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। জাতিতে তিনি সাঁওতাল, ধর্মে ক্রিশ্চান। ইংরেজদের আমলে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে সময় ইহার প্রবল প্রতাপ ছিল। ইঁহার চারিত্রিক নিষ্ঠার জন্য সকলেই ইঁহাকে খুব খাতির করিত, এমন কি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা পর্যন্ত। ইঁহার বিচার-বিবেচনার উপর সকলেরই আস্থা ছিল। ইংরেজদের আমলে ইনিই প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

স্বাধীনতার পর ইঁহার সে প্রতাপ আর নাই। ইনি এখন বনে বনে একা ঘুরিয়া বেড়ান, বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়াই ইঁহার অধিকাংশ সময় কাটে। ইঁহার আর একটা কাজ ঘড়ি-সারানো। এ অঞ্চলের সকলের বাড়ির ঘড়ি ইঁহারই তদারকে চলে। ইনি প্রতি সপ্তাহে গিয়া সকলের ঘড়ির খবর লইয়া আসেন।

কয়েকদিন পরে একটা 'কলে' যাইতেছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল বিক্রম হেম্‌ব্রোম একটি বাড়ির বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আমি সাইকেলে যাইতেছিলাম, নামিয়া পড়িলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বাড়িতেও তিমি সেই বিরাট হ্যাট্ পরিয়া বসিয়া আছেন।

"এইটে আপনার বাড়ি নাকি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন।"

"আমি একটা রোগীর বাড়ি যাচ্ছি এখন। পরে আসব। সেদিন আপনাকে হাসপাতালের দেওয়াল-ঘড়িটি দিতে পারিনি। কারণ ওটা সরকারী জিনিস, ওপরের হুকুম না পেলে দিতে পারি না। তবে আমার একটা পুরানো সোনার ঘড়ি আছে। বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। সেই ঘড়িটা চলছে না, সেটা আপনাকে সারাতে দেব।"

"বেশ দেবেন। দেখব।"

আমি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"আপনার এই হ্যাট্‌টি বড় অদ্ভুত। এত বড় হ্যাট্‌ আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ, এটি আমি সর্বদা পরে থাকি। রাত্রে ঘুমোবার সময় কেবল খুলি। খুলে মাথার শিয়রেই রেখে দি। এটি আমার কাছে অতি মূল্যবান জিনিস। আমার স্ত্রী বনের কাঠ কুড়িয়ে হাটে বিক্রি করত। সেই পয়সা জমিয়ে সে তখনকার কমিশনার সাহেবের স্ত্রীকে দিয়ে বলেছিল—আপনি বিলেত থেকে আমার স্বামীর জন্য একটা উপহার আনিয়ে দিন। সেটা তাঁর জন্মদিনে তাঁকে দেব। মেমসাহেব এই হ্যাট্‌টা আনিয়ে দিয়েছিলেন। মেমসাহেব আমার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তিনি হঠাৎ এসে একদিন ফিতে দিয়ে আমার মাথার মাপ নিলেন। কেন নিলেন কিছু বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কিছু বললেন না, মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন কেবল। কিছুদিন পরে এই হ্যাট্‌ লণ্ডন থেকে এল। আমি যৌবনে খুব ভালো শিকারী ছিলাম। বর্শা দিয়ে শুয়োর শিকার করতে পারতাম। তাই বোধহয় এই হ্যাট্‌ আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমার স্ত্রীও নেই, সেই মেমসাহেবও নেই, হ্যাট্‌টা কেবল আছে। তাই ওটাকে মাথা থেকে আর নামাই না।"

হেম্‌ব্রোম একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। আমি রোগী দেখিতে চলিয়া গেলাম। রোগীর বাড়ি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম তিনি আমার ডিস্‌পেনসারিতে আসিয়া বসিয়া আছেন।

"কই আপনার ঘড়িটা দিন, দেখি।"

তাঁহার মুখে একটা শিশুসুলভ আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভারী ভালো লাগিল।

ঘড়িটি বাহির করিয়া আনিলাম। এরকম ঘড়ি আজকাল দেখা যায় না। ঘড়ির সঙ্গে আলাদা চাবি থাকে, সেই চাবি দিয়া দম দিতে হয়। ঘড়ির সামনেটা ঢাকা দেওয়া। মাথার দিকে টিপিলে ঢাকনা খুলিয়া যায়। পিছনের দিকেও একটা ঢাকনা আছে, সেটাও স্প্রিংয়ের কৌশলে খোলা যায়। সেখানে ঘড়িতে দম দিবার জন্য একটি এবং ঘড়ির কাঁটা সরাইবার জন্য আর একটি ছিদ্র আছে।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন, "এ তো একটা অমূল্য জিনিস!"

দুই একবার নাড়িয়া ঘড়িটি কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন।

"না, চলছে না। কাল আমি বলব এটা সারাতে পারব কি না। যদি সারাতে না পারি, কালই ফেরত দিয়ে যাব। এখন আমি যাই। আপনি ধনেশ পাখি দেখেছেন?"

"না—"

"যদি এখন হাতে কাজ না থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আজ দুটো ধনেশ পাখি আসবে।"

"তাই নাকি? আজই আসবে কি করে বুঝলেন?"

"আমি জানি। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন ওরা আসে। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি—"

"চলুন।"

সাইকেলে চড়িয়া উভয়ে রওনা হইলাম। বনের প্রান্তে আসিয়া হেম্‌ব্রোম বলিলেন, "সাইকেল থেকে এবার নামতে হবে। সাইকেল দুটো এখানেই থাক।"

"কেউ নিয়ে যাবে না তো—"

"না। আমার সাইকেলে গরম জলের বোতল বাঁধা আছে। কেউ নেবে না ওটা। আপনারটাও নেবে বলে মনে হয় না।"

এমন সময় বনের প্রান্তে একটি সাঁওতাল কিশোরীকে দেখা গেল। হেম্‌ব্রোমকে দেখিয়া সাঁওতালী কায়দায় অভিবাদন করিল সে। বনের ধারে সে কাঠ কুড়াইতেছিল।

"ঝুমরি, তুই আমাদের সাইকেল পাহারা দে। আমরা বনের ভিতর যাচ্ছি।"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া আগাইয়া আসিল। কুচকুচে কালো রং, তবু সে শ্রীমতী। মাথায় একটি নীলকণ্ঠ পাখির পালক গোঁজা।

বনের ভিতর কিছুদূর গিয়া হেম্‌ব্রোম দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন—"সামনে ওই দূরের গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন। দুটি ধনেশ বসে আছে। আজ সমস্ত দিন এই বনে থাকবে, তারপর চলে যাবে।"

বিরাট চঞ্চু ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন,—"ওরা আসাম থেকে আসে। আসামের বনের খবর ওরা আমাদের বনকে দিয়ে যায়। আর আমাদের বনের খবর নিয়ে যায় আসামের বনে।"

"কি করে বুঝলেন?"

অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন হেম্‌ব্রোম,—"আমি জানি।"

আমি অবাক হইয়া ধনেশ পাখি দুইটিকে দেখিতেছিলাম, হেম্‌ব্রোম বলিলেন, "চলুন ওই গাছটার তলায় বসা যাক—"

একটা বড় গাছের ছায়ায় গিয়া আমরা দুইজনে উপবেশন করিলাম।

হেম্‌ব্রোম বলিলেন, "এই গাছটার উপর আমার বিশেষ মায়া আছে। এই গাছের তলায় আমার জন্ম হয়েছিল। আমার মা রোজ বনে কাঠ কুড়োতে আসতেন। যখন প্রসব-বেদনা ধরে তখন তিনি এখানেই ছিলেন।"

একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "—আমি সময় পেলেই এখানে চ'লে আসি—

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, "ওই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছেন, ওখানেও একটা গাছ ছিল। ঠিক এই গাছের জুড়ি। কেটে ফেলেছে ওরা গাছটাকে। কেটে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। বনের প্রতি কারো মমতা নেই, সবাই চোর।"

নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম দুইজনে।

পরদিন হেম্‌ব্রোম আসিয়া বলিয়া গেলেন ঘড়িটি তিনি সারাইয়া দিতে পারিবেন। তবে সারাইতে মাসখানেক লাগিবে। একমাসের কিছু পূর্বেই আমাকে আর একবার হেম্‌ব্রোমের বাড়ির দিকে যাইতে হইয়াছিল। ভাবিলাম জানিয়া যাই ঘড়িটা সারানো হইয়াছে কিনা। হেম্‌ব্রোম বাড়িতেই ছিলেন।

"ঘড়ি ঠিক হয়ে গেছে। তবে এখনও এক মিনিট স্লো যাচ্ছে। আজ ওটা দেব না, ঠিক একমাস পরেই পাবেন।"

তাহার পর ঘড়িটি বাহির করিয়া কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার

চোখের পাতা দুইটি বুজিয়া আসিল, তন্ময় হইয়া তিনি ঘড়ির শব্দ শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন।

"আর একটু রেগুলেট করতে হবে। চমৎকার ঘড়ি। যত্ন ক'রে রাখবেন আর ঠিক সময়ে খাবার দেবেন।"

"খাবার ?"

"খাবার মানে দম। ঠিক একই সময়ে দম দেওয়া চাই। আমি সকাল সাতটার সময় রোজ দম দিচ্ছি। আপনিও তাই দেবেন।"

আবার ঘড়িটি কানের কাছে ধরিলেন। আবার তাঁহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

ঠিক একমাস পরে ঘড়িটি তিনি আমাকে দিয়া গেলেন। আমি একটু স-সংকোচে জানিতে চাহিলাম এজন্য কত দিতে হইবে।

হেমব্রোম হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছুই দিতে হবে না। এটা আমার পেশা নয়। এটাকে আমি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আগে আমি এ অঞ্চলের সবই নিয়ন্ত্রণ করতাম। এখন আমার সে ক্ষমতা নেই। এখন কেবল ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করি। ঘড়ি ঠিক না থাকলে পাংচুয়ালিটি থাকে না। আর তা না থাকলে সমস্ত জীবনটাই এলোমেলো হয়ে যায়।"

হেম্‌ব্রোম হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেম্‌ব্রোম কতদূর লেখাপড়া করিয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। কিন্তু ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছিলাম তিনি শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি।

একমাস পরে দৈবাৎ একদিন আমার সেই দুমকার ডাক্তার বন্ধুটির সাহিত দেখা হইয়া গেল। নানা কথার পর সে বলিল,—"বিক্রম হেম্‌ব্রোমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে না কি।"

"তুমি কি করে জানলে—"

"ও প্রায় প্রতিদিনই রাত নটার সময় আমার কাছে যেতো, রেডিওতে ঘড়ি মেলাবার জন্য। তখনই ও বলেছিল তোমার একটা খুব ভালো ঘড়ি ও সারাচ্ছে।"

"অতদূর যেত রোজ ?"

"হ্যাঁ, সাইকেলে যেত। অদ্ভুত লোক!"

"ও রকম লোক আমি দেখিনি।"

আরও প্রায় বছরখানেক পরে একদিন একটি সাঁওতাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে খবর দিল—"শিগ্‌গির চলুন। হেম্‌ব্রোম অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

"বাড়িতেই ?"

"না, বনের মধ্যে।"

যে বনে ধনেশ পাখি দেখিতে হেম্‌ব্রোমের সহিত গিয়াছিলাম সেই বনেই সাঁওতালটি আমাকে লইয়া গেল। যে গাছের নীচে আমরা বসিয়াছিলাম সেই গাছের নীচেই হেম্‌ব্রোম চিত হইয়া শুইয়া আছেন। মাথার হ্যাটটি খুলিয়া গিয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর কুড়ালের দাগ। মনে হইল গাছটাকে কাটিয়া ফেলা হইতেছিল। কুড়ালের ক্ষতচিহ্ন হইতে রস ঝরিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হেম্‌ব্রোম মারা গিয়াছেন।

ক্ষতের গভীরতা

সরকারি কার্য উপলক্ষে ভাগলপুরের নিকট একটি গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে স্টেশন আছে, কিন্তু রিক্সা নাই। একটি কুলির মাথায় আমার মালপত্র চাপাইয়া প্রায় মাইল খানেক হাঁটিয়া মাড়োয়োরিদের একটি ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম।

কুলি জিনিসপত্র নামাইয়া ধর্মশালার ম্যানেজারের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল, আমার বিছানা খুলিয়া পাতিয়া দিল এবং পাশের মিথিলা ভোজনালয়ের পাচক চাঁদু ঝাকে ডাকিয়া দিল—"বাবু কলকাতা থেকে এসেছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খেতে দিও। কলকাতার বাবুরা শাফসুতরো পছন্দ করেন।" হিন্দীতে বলিল, আমি বাংলা অনুবাদ করিয়া দিলাম। তাহাকে তাহার মজুরি চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "কাল আমি সকালে সাতটার ট্রেনে যাব। তুমি আসতে পারবে কি?"

"নিশ্চয় আসব। ঠিক ছ'টার সময় হাজির হয়ে যাব আমি।" কুলি চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি কমনীয় কান্তি যুবক আসিয়া হাজির হইল। পরনে টেরিলিনের বুশ-শার্ট, ড্রেন পাইপ প্যাণ্টালুন, পাঞ্জাবী চপ্পল। চোখে কালো চশমা, মুখে কায়দা করিয়া ছাঁটা গোঁফ দাড়ি।

"আপনিই কি সুরেন বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি আসবেন সে খবর আমি পেয়েছিলাম। করে ফিরবেন—"

"কাল সকাল সাতটার গাড়ীতে। আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন। আমি বিনায়ক বক্সি—"

"এখানে কি করেন—"

"কিছুই করি না। আমার এক ভগ্নীপতি এখানে আছেন, চাষবাস করেন। তাঁর কাছেই থাকি।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বক্সি মশায়ই আবার বলিলেন, "ইকনমিক্সে এম. এ. টা-তে থার্ডক্লাস পেয়ে গেলুম। এখানে মশাই বাঙালী ছেলেদের আর ভদ্রস্থ নেই। বিহারী এক্জামিনাররা বাঙালী ছেলেদের আর উঠতে দেবে না। ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস সব বিহারী।"

এসব কথা অনেকবার শুনিয়াছি, রক্ত উত্তপ্ত হইল না। নিকটেই একটা মোড়া ছিল। সেটা দেখাইয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "বসতে পারি?"

"বসুন—"

বসিয়া তিনি নানারকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে হইল দেশের সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছেন। নেহেরু কি কি ভুল করিয়াছিলেন, চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, পাকিস্তানের সহিত মিটমাট করিতে হইলে নেতাদের এখন কি 'পলিসি' অবলম্বন করা উচিত, বাঙালীদের অতীত গৌরব কি করিয়া উদ্ধার করা সম্ভব—এই সব বিষয়ে তিনি নানা বক্তৃতা করিলেন। আমি একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। ভদ্রলোকের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বলিলাম—"আপনার সঙ্গে আলাপ

হ'য়ে খুব খুশী হলাম। কিন্তু এখন আমাকে একটু বেরুতে হবে। থানাটা কোন দিকে বলুন তো—

"থানা কাছেই। দারোগা বাবুর কাছ থেকেই খবর পেলাম, আপনি আজ আসবেন। ওহো, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। আপনি এখানে ক'দিন থাকবেন?"

"কাল সকালের ট্রেনেই আমাকে ফিরতে হবে—"

"ও, তা'হলে তো ভালোই হ'ল। আমার বোন একশিশি গোয়াভা জেলি পাঠাতে চায় কলকাতায় মায়ের কাছে। আপনি যদি দয়া ক'রে নিয়ে যান, বড়ই উপকৃত হব—"

"কোথায় থাকেন আপনার মা—"

"নিউ আলিপুরে। আপনি?

"আমি শ্যামবাজারে থাকি। আপনি তা'হলে এক কাজ করুন। আমার ঠিকানাটা আপনার মাকে পাঠিয়ে দিন। তিনি যেন আমার বাসা থেকে কাউকে পাঠিয়ে 'জেলি'টা নিয়ে যান—"

আমার ঠিকানা-লেখা একখানা কার্ড তাঁহাকে দিলাম।

"ও, আপনার নিউ আলিপুরে যাওয়ার সুবিধে হবে না বুঝি?"

"না। চৌরঙ্গীর ওপারে যাওয়া হয়ই না তেমন।"

"ভেরি গুড্। চিঠি লিখে দেব তাহলে—"

ভদ্রলোকের হাতে সুদৃশ্য দামী একটি রিস্টওয়াচ ছিল। সেটির দিকে চাহিয়া তিনি গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"জাস্ট সাড়ে তিনটের সময় আপনি বাসায় থাকবেন কি?"

"থাকব।"

"তখনই আমি জেলিটা নিয়ে আসব তা'হলে।"

"আমি কাল সকাল ছ'টায় বেরুব। সে সময় নিয়ে এলেও চলবে।"

"ভেরি গুড্। তাই আসব। ছ'টার সময়ই আসব। সে সময় আমি মর্নিং ওয়াক করতে বেরুই—"

আমি ঘরে তালা লাগাইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। একটু দূরে গিয়া একটা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—"এইটে ধ'রে স্ট্রেট চলে যান, থানায় পেঁাছে যাবেন।"

পরদিন সকালে কুলিটা ঠিক ছ'টার সময় আসিল। কিন্তু সে ভদ্রলোকের দেখা নাই। তাহার পর তিনি আর আসেন নাই। সারা বৈকালটা আমি তাঁহার অপেক্ষায় ছিলাম। আর অপেক্ষা করা চলে না। সাতটায় ট্রেন ছাড়িয়া যাইবে।

ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছি। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম বিনায়ক বক্সি জেলির শিশি হাতে করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে। ভদ্রলোক হঠাৎ হোঁচট খাইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পড়িয়া গেলেন। জেলির শিশি ভাঙিয়া চারিদিকে জেলি ছিটকাইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, তাঁহার দামী রিস্টওয়াচটাও বোধহয় ভাঙিয়া গেল।

বছর খানেক পরে আবার উক্ত গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। স্টেশনে নামিয়াই আমি সেই কুলিটির খোঁজ করিয়াছিলাম। তাহার কালীচরণ নামটা আমার মনে ছিল। শুনিলাম সে আর কুলিগিরি করে না। ধর্মশালার কাছে একটা দোকান করিয়াছে। ধর্মশালায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, ধর্মশালার কাছেই তাহার দোকানটি। খাবারের দোকান। মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু, কেক, পাঁউরুটি, চা—এই সব সাধারণ খাবার সেখানে পাওয়া যায়। দেখিলাম প্রচুর ভিড়। কালীচরণ আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং আগাইয়া আসিয়া নমস্কার করিল। দেখিলাম তাহার বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

কথায় কথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দোকানের আয় কি রকম হয়।"

"তা রোজ বিশ ত্রিশ টাকা হয়ে যায়। বক্‌সি বাবু সব হিসাব রাখে—"

"বক্‌সি বাবু?"

"হ্যাঁ, ওই যে—"

তখন দেখিতে পাইলাম দোকানের পিছনে একটা ময়লা টেবিলের সামনে বিনায়ক বক্‌সি বসিয়া কি লিখিতেছেন। কালীচরণ হাঁক দিল—"ও বক্‌সি বাবু, নিস্‌পিট্টার সাহেব এসেছেন।"

"আরে! আপনি, হ্যালো, হ্যালো—"

উদ্ভাসিত মুখে বিনায়ক আগাইয়া আসিলেন।

এক কাপ চা খাইতে হইল। কালীচরণ কিছুতেই দাম লইল না। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ধর্মশালায় সীট পেয়েছেন?"

"না, এখনও যাইনি সেখানে।"

"চলুন।"

কালীচরণই আমার সীট ঠিক করিল এবং বিছানা বিছাইয়া এক বালতি জল আনিয়া দিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আমিই আপনার খাবার পাঠিয়ে দেব হোটেল থেকে—।"

শুনিলাম বিনায়ক বক্‌সি এম. এ. নিরক্ষর কালীচরণের দোকানে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরি করেন। একটু পরে বিনায়কও আসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন, "ও মেড়ো ব্যাটার মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই। ভাগ্যে আমি আছি, তাই দোকানটাকে কোনক্রমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—।"

মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও, তাই নাকি।"

বিনায়ক উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুনন্দা

সুনন্দা দশটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্বেই লিফ্‌টের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। লিফ্‌টম্যান সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিল তাহাকে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সে দ্বিতলে নিজের আপিস ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে বেয়ারাও সেলাম করিয়া আপিস ঘরের পরদাটা তুলিয়া ধরিল। সুনন্দা নিজের চেয়ারে বসিয়া

"এ পেপার-ওয়েট কোথা থেকে এল ?"

"ওটা আমার নিজের পেপার-ওয়েট, আপনার ব্যবহারের জন্য এখানে এনেছি। এখানে যেটা ছিল সেটা বিশ্রী—"

"আপনার পেপার-ওয়েট আপনি নিয়ে যান। আপিস যে পেপার-ওয়েট দিয়েছে তাতেই আমার কাজ চলবে।"

"আপনার হাতে ওটা কি ?"

চন্দ্রকান্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "কাজু—"

"কাজু! আপিসে ব'সে ব'সে কাজু চিবুবেন ?"

"আপনার জন্যে এনেছি। শুনেছিলাম আপনি কাজু ভালোবসেন—"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল সুনন্দা। তাহার পর তাহার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল, চক্ষুর দৃষ্টি হইতে অগ্নিকণা ছুটিয়া বাহির হইল।

"এ সবের মানে কি! আপনি এখনি এ ঘর থেকে চলে যান। আপনাকে সাসপেন্ড করলাম আমি। যান দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—"

চন্দ্রকান্ত ঘোষ হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহার পর আগাইয়া আসিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে সুনন্দার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি অসহায়, আমাকে মাপ করুন, এবারকার মতো মাপ করুন—"

সুনন্দা তাহাকে মাপ করিল কিনা তাহা জানা গেল না, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছারপোকার কামড়ে সুনন্দার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। বীভৎস জীবনটা হঠাৎ প্রতিভাতে হইয়া উঠিল তাহার চোখের সামনে। সেই দুর্গন্ধ বিছানা, ময়লা দেওয়াল, আশে পাশে তাহার নগ্ন অর্ধনগ্ন ভাইবোনদের ঘুমন্ত চেহারা, রাশের ড্রেণের ভ্যাপসা গন্ধ। মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"সুনি ওঠ ওঠ। উনুনে তাড়াতাড়ি আঁচ দে। আজ সোমবার তোর বাবার আপিসের ভাত দিতে হবে না ?"

মনে পড়িল কয়েক দিন আগে চন্দ্রকান্ত ঘোষ একদল লোক লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। মনে পড়িল বাবা তাহাদের কি খোসামোদটাই না করিতেছিলেন। মনে পড়িল প্রায় দশ টাকার জলখাবার আনানো হইয়াছিল। চন্দ্রকান্ত কিন্তু তাহাকে পছন্দ করে নাই। সব মনে পড়িয়া গেল।

বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল তারপর।

"ওগো আজ সুনিকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখ বিকেল বেলা। আমাদের আপিসের রামতারণ মিত্তির আসবেন ওকে দেখতে—"

সুনন্দা লেখাপড়ায় ভালো ছিল। ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট-হইত। ফার্স্ট-ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাবা তাহাকে আর পড়ান নাই।

সুনন্দা উঠিল। তাহার পর খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না। হয়তো খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ কলমে তাহার ছবি আপনারা দেখিয়াছেন, কিম্বা দেখেন নাই।

মতিভ্রম

আজ যিনি উদীয়মান কবি সুখরঞ্জন সাঁতরা তিনি যে এককালে সাব-ওভারসিয়র ছিলেন একথা অনেকে হয়তো বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু কথাটি সত্য। তাঁহার নাম এককালে 'সুরকি' বাবু ছিল। একটি 'সুরকি'র কলে তিনি চাকরিও করিতেন। পারিবারিক নাম ছিল বিনয়ভূষণ বসাক। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই দুই এক বছর পরে কাব্যরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মাসিকপত্রে আত্ম-প্রকাশ করিতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছিল কিছু। ভালো সুরকি বাজারে পড়িতে পায় না, কিন্তু ভালো কবিতা গাদা গাদা পড়িয়া থাকে। কিন্তু একদিন বিধাতা সদয় হইলেন। 'নদনদী' পত্রিকার সম্পাদিকা তাঁহার একটি কবিতা একবার ছাপিয়া ফেলিলেন। বিনয়ভূষণের ছদ্মনাম 'সুখরঞ্জন সাঁতরা' নামটাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মহিলা ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.—সাঁতরা উপাধিটির তিনি মনে মনে অনুবাদ করিয়াছিলেন 'Swim on'—। সাঁতরাইবার সুযোগ তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সুখরঞ্জন মহানন্দে সাঁতরাইয়াও ছিলেন। কিন্তু একদিন বিপদে পড়িয়া গেলেন।

সেদিন সকালের ডাকেই 'নদনদী' পত্রিকার সম্পাদিকার একটি তীক্ষ্ন পত্র আসিয়া হাজির হইল।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি 'প্রাণেশ্বরী' সম্বোধন করিয়া সহজ গ্রাম্য গদ্যে যাহা আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহা এমন অনাবৃত অশ্লীলতা যে তাহা ছাপা গেল না। তাহা এত অশ্লীল যে পড়িবামাত্র আমি সেটি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিয়াছি। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি এরূপ স্বচ্ছ গ্রাম্য কবিতা আর আমাকে পাঠাবেন না। ইতি

সম্পাদিকা নদনদী।

পুনশ্চ। কোন কবিতাই আর পাঠাইবার দরকার নাই।

দ্বিতীয় বজ্রাঘাতটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইল। তাঁহার রোরুদ্যমানা সাধ্বী পত্নী পুত্র-কন্যা এবং ডাক্তার সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন। সঙ্গে দশ সের বরফ এবং একটি আইসক্যাপ। স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"কি অদ্ভুত চিঠি লিখেছ তুমি এবার। কিছু বুঝতে পারলাম না। মাকে দেখালুম তিনিও পারলেন না। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন চিঠিখানা, তিনি বলিলেন—পাগল হয়ে গেছে। আর দেরি করা নয়। শিগগির চল—। ওগো, এ কি হল আমার—"

বিনয়ভূষণ যে ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন তাহা স্ত্রীকে কখনও জানান নাই। বুঝিতে পারিলেন স্ত্রীকে লেখা চিঠিটি সম্পাদিকাকে পাঠাইয়াছেন এবং আধুনিক কবিতাটি স্ত্রীর নিকট পৌঁছিয়াছে। খাম বদল হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়—কবিতার নীচে নিজের নামটি এবং চিঠির নীচে সুখরঞ্জন সাঁতরা নামটি লিখিয়া তিনি জটটিকে জটিলতর করিয়াছেন।

মতিভ্রম আর কি।